রামমোহন
ও তৎকালীন
সমাজ ও
সাহিত্য
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রামমোহন

ও

তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

রামমোহন
ও
তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

রামমোহন রায়। এইচ. পি. ব্রিগ্‌স্‌ -অঙ্কিত চিত্র হইতে

ব্রিস্টল মিউজিয়ম সংগ্রহ

ভূমিকা

আজ থেকে প্রায় দেড় শো বৎসর পূর্বে, ১৮২৭ সালের অগস্ট মাসে, মদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গন্‌জাম জেলার ব্রহ্মপুরম্ বা বহরমপুর নগরের অন্ধ্রদেশীয় কতিপয় ভদ্রের নেতা রূপে সুর্যনারায়ণ (Soorajnaran) নামে জনৈক ব্যক্তি রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করবার জন্য বহু কষ্টে ও বহু ব্যয় স্বীকার করে কলকাতায় আসেন সমুদ্রপথে, উদ্দেশ্য সরজমিনে রামমোহনের 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম' আলোচনা। সাক্ষাৎকারের পর সুর্যনারায়ণ দেশে প্রত্যাবর্তন করে মদ্রাজের সাহেব খ্রীষ্টান গবর্নরকে জানালেন যে রামমোহনের ধর্ম ধর্মই নয়— 'is no religion and his laws are no laws, but a conglomeration of all stitched into singular one... He is neither a Christian, a Mahammedan or a Hindu, but a free-thinking man, abandoned by all religions'. কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য— সর্বধর্মমিলনের জন্য নানা বর্ণের মতের 'কতিকা' বা তালি জুড়ে জুড়ে রামমোহন নূতন ধর্মমত প্রচার করেন নি, নানা মতের মধ্যে নিহিত শাশ্বত বাণী উদ্ধার করে পরস্পরকে জানবার ও বুঝবার পরিবেশ রচনা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ব্রহ্মপুরমের সুর্যনারায়ণ ও তাঁর মতপক্ষীয় হিন্দুরা রামমোহনকে অ-হিন্দু, অ-খ্রীষ্টান, অ-মুসলমান বললেন, খ্রীষ্টানরা তাঁকে হীদন, ইনফিডাল বলে গালি দিলেন, হিন্দুরা তাঁকে 'পাষণ্ড' বলে অভিহিত করলেন, মুসলমানরা তাঁকে 'জবরদস্ত' বলেই চুপ করলেন। সমসাময়িক বাঙালিরা রামমোহনকে কী চোখে দেখতেন, তা তাঁর জীবনীপাঠকরা অবগত আছেন। জনৈক নিষ্ঠাবান হিন্দু রামমোহনের বিলাত যাওয়ায় দেশের যে কী ক্ষতি হতে পারে, তদ্‌বিষয়ে দীর্ঘ এক পত্রে নিজ মতামত ব্যক্ত করেন :

"রামমোহন রায় বিলাত যাওয়াতে আমারদের দেশের উপকারমাত্র নাই যেহেতু তিনি এতদ্দেশের সর্ব্বসাধারণের উপকারক নহেন বিশেষতঃ হিন্দুবর্গের বিশেষানিষ্টকারী ইহা এদেশে রাষ্ট্র আছে।"

লেখক এই পত্রে জানান যে রামমোহন রায়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা থাকার দরুন "এক জন অতিমান্য লোকের সন্তান বিদ্বান এবং অনেক ধনদানে বিলক্ষণ

সক্ষম" একটি চাকুরি পান নাই। "রামমোহন রায়ের সহবাসে এতাদৃশী দুরবস্থা লোকের ঘটিয়াছে।" লেখক এখনও নিবৃত্ত হন নাই; তিনি লিখছেন, "রামমোহন রায় অনেককালাবধি অনেক প্রকার ভাষা গ্রন্থ [বাংলা] ছাপ্য করিয়া লোককে প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রাপ্তিমাত্র সাধুসকল তুষ্ট না হইয়া মহারুষ্টপূর্ব্বক মিসন্যরি সাহেবেরদের রচিত গ্রন্থের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়াছেন যেহেতু তাহাতে যাহা লেখেন তাহার তাৎপর্য্য স্বেচ্ছাচারি হওয়া উত্তম দেবদেবীপূজা অপকৃষ্ট কর্ম্ম এবং পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই। ইহা এ প্রদেশের ইতর লোকের বালকেও বিশ্বাস করে না।"[১] পত্রখানি উপভোগ্য এইজন্য যে দেড় শো বৎসর পরে এখনও এই শ্রেণীর মানুষ দুর্লভ হয় নি।

রামমোহনের অপরাধ, তিনি হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব 'বেদান্ত'কে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রচার করেন। হিন্দু শাস্ত্র মন্থন করে যা বিশ্বধর্মে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে সেই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন। অথচ তাঁর এই প্রয়াসকে অ-হিন্দু আচরণ বলে ঘোষণা করতে তাঁদের বাধে নি। সূর্যনারায়ণের কথা অতি সত্য— হিন্দুরা তাঁকে গ্রহণ করেন নি; তা না হলে কলকাতায় ১৮১৭ সালে 'হিন্দুকলেজ' স্থাপনকালে রামমোহনকে উদ্যোক্তারা বাদ দেবেন কেন? রামমোহন এই বিদ্যায়তনের সঙ্গে যুক্ত থাকলে হিন্দুভদ্রেরা সহযোগিতা করতে অস্বীকৃত ছিলেন। রামমোহন দূরে থাকলেন। আশা করলেন 'হিন্দুকলেজে' ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে। কিন্তু কালস্রোতকে প্রতিহত করার ক্ষমতা কলেজের কর্তৃপক্ষের ছিল না; কালের হাওয়ায় হিন্দুকলেজের ছাত্ররাই 'হিন্দুত্ব'কে উপেক্ষা করল।

হিন্দুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কোম্পানি ১৮২৪ সালে কলকাতায় 'সংস্কৃত কলেজ' স্থাপন করলেন। পরবৎসর রামমোহন যথার্থ হিন্দুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য 'বেদান্ত কলেজ' করলেন; সেখানে পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের সহিত বেদান্ত-চর্চার আয়োজন হল। কিন্তু যেহেতু রামমোহন এই বেদান্ত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সেজন্য কলকাতার নিষ্ঠাবান হিন্দুরা এর সংস্রব থেকে দূরেই থাকলেন।

---

১ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৮০-৮১।

রামমোহন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচার করবার জন্য কী ভাবে সংস্কৃত 'প্রস্থানত্রয়' ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন, গ্রন্থমধ্যে সে-আলোচনা বহুবিস্তারে করা হয়েছে। বাঙালির মনকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে— এটাই ছিল তাঁর হৃদ্‌গত মনোভাব। কিন্তু তাঁকে বাংলা গদ্যরচনার পথিকৃৎ বলে স্বীকৃতি দান করতে আধুনিক এক শ্রেণীর পণ্ডিতম্মন্যদের একান্ত অনীহা। পুরাতন চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, পরকীয়া-স্বকীয়া সম্বাদের জয়পত্রাদির উদাহরণ অজ্ঞাত অবজ্ঞাত পুঁথি থেকে উদ্ধার ক'রে তাঁরা প্রমাণ করতে চেষ্টা পান যে, বাংলা 'গদ্য' বহু প্রাচীন। তাঁদের মতে বাংলা ভাষার ইতিহাসে রামমোহনের দানকে অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে।

আধুনিক কালে গদ্যে লেখা বাংলা বই ছাপা শুরু হয় ১৮০১ অব্দে। ১৮০১ থেকে ১৮১৪ পর্যন্ত যে-সব গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল, সে-সবের আলোচনা গ্রন্থমধ্যে করেছি। কেরী সাহেবের বাংলা শেখার উদ্দেশ্য— বাইবেল প্রচার; ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকদের বাংলা বই লেখা বা তর্জমা করার উদ্দেশ্য— ব্রিটিশ সিবিলিয়ান বা রাইটারদের দেশীয় ভাষা শেখানো। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের এই-সব বাংলা বই রামমোহনের দ্বারা অনূদিত বাংলা গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বেই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু সে-সব গ্রন্থের "ভাষাতে আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কথকগুলিন শব্দ আছে।··· এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে না···।" এই মন্তব্য রামমোহন-কৃত। মোটকথা বাংলা গদ্যের কোনো মান বা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় কোম্পানি তাঁদের যে-সব আইনকানুন ইংরেজি থেকে বাংলায় তর্জমা করাতেন, তার অর্থবোধ হঠাৎ হত না। অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' (পৃ. ১৪) যা লিখেছেন, তার থেকে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্‌ধৃত করছি—

"গীর্জা [পাদরিদের] ও পাঠশালার [ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের] বাহিরে আনিয়া, বিচার বিশ্লেষণে উচ্চতর চিন্তার বাহন হিসাবে প্রথম ব্যবহারে লাগাইয়া, বাঙ্গালা গদ্যকে জাতে তুলিলেন আধুনিক কালে··· রামমোহন রায়।··· বহুভাষী রামমোহন স্টাইলের দিকে নজর না দিয়া বক্তব্যের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তাই তাঁহার হাতে বাঙ্গালা

গদ্যের যে রূপ গঠিত হইল তাহাতে মাধুর্য না থাক স্পষ্টতা ছিল। এখনকার দিনে ছেদচিহ্ন-বিরল রামমোহনের বাক্যাবলী উদ্ভট ঠেকিতে পারে কিন্তু সে-সময়ের কলেজি রচনার সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে বোঝা যাইবে কেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মত প্রাচীনতার ভক্তও বলিয়াছিলেন 'দেওয়ানজী জলের মত বাঙ্গালা লিখিতেন।' এ সত্য রামমোহনের প্রবল প্রতিপক্ষ লেখক মৃত্যুঞ্জয়ও তাঁহাকে গালি দিতে গিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার মতে রামমোহন সংস্কৃত ছাড়িয়া এবং 'সাধুভাষা'র কাছে না ঘেষিয়া সাধারণের বোধগম্য ভাষায় বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিস্তার করিয়া অসৎ আচরণ করিয়াছেন।" রামমোহন বেদান্ত গ্রন্থের অনুষ্ঠান নামক ভূমিকায় লেখেন, "বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ [বাংলায়] সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম" নয়। এইজন্য বাংলা পদ্য রচনা ও পঠনের নিয়ম করে দেন এই অনুষ্ঠান ভূমিকায়।

রামমোহনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার; বাংলা গদ্য রচনায় তাঁর কৃতিত্বের কথা অবিস্মরণীয়। কিন্তু রামমোহনের বেদান্তের বাংলা ভাষায় বিবরণের পূর্বে মৃত্যুঞ্জয় কোনো শাস্ত্র-বিষয়ক রচনায় প্রবৃত্ত হন নি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের তাঁর সমকালীন পণ্ডিতদের মধ্যে কেহই দার্শনিক গ্রন্থ লেখেন নি। মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'কে আজকালকার ভাষায় 'রম্য রচনা' বলা যেতে পারে। গ্রন্থখানি ১৮১৩ সালে লিখিত হয়ে থাকলেও ১৮৩৩ সালের পূর্বে তা মুদ্রিত হয় নি। সুকুমার সেন মনে করেন, মুদ্রিত হবার পূর্বে বইখানির পাণ্ডুলিপি অন্য লেখকের লেখনী-স্পর্শ পেয়েছিল। বিতর্কমূলক 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র (১৮১৭) গদ্যশৈলী রামমোহনের ঐ জাতীয় রচনার তুলনায় অনেক আড়ষ্ট ও দুর্বোধ্য; কালের দিক থেকেও অগ্রাধিকার পায় না।

'বেদান্তগ্রন্থে'র ভাষা-বিবরণ প্রকাশের পর পনেরো বৎসরের মধ্যে রামমোহনের গদ্য রচনা ক্রমশই সহজ সরল ও অর্থবোধক হয়ে ওঠে। তাঁর গদ্য রচনাগুলি কালানুক্রমে পাঠ করলে এই মন্তব্যের সত্যতা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হবে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের অবিসম্বাদী পথিকৃতের অগ্রাধিকার রামমোহনের প্রাপ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৬৫ সালে 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতা' দিবার জন্য আহ্বান পাই। সে উপলক্ষে প্রদত্ত পাঁচটি ভাষণ বহুগুণিত হয়ে আজ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে বক্তৃতা দিবার সুযোগ দান করায় এই গ্রন্থ লেখা সম্ভব হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শ্রেণীর বক্তৃতা সাধারণের জন্য প্রদত্ত হয়; সেইজন্য বিষয়টি সহজ ও সরল করে বলবার চেষ্টা করেছি। গভীর তত্ত্বকথা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করার সামর্থ্যাভাবে লৌকিক ভাষায় বিষয়গুলিকে পেশ করবার চেষ্টা করেছি।

এই গ্রন্থ প্রণয়নকালে প্রায় এক মাস কাল কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে নিয়মিত কাজ করি। এই সময়ে গ্রন্থাগারের ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান, সুহৃদ শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, আমার কাজের জন্য যে অনুকূল পরিবেশ করে দেন, সে কথা ভুলতে পারি না। বন্ধুবর ডক্টর আদিত্য ওহদেদার মহাশয়ও আমার কাজে প্রভূত সহযোগিতা করেছেন। এঁদের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় গ্রন্থাগারের কয়েকজন সহায়ক-সহায়িকা আমাকে সকলপ্রকারে সাহায্য করেন। তাঁরা আমার অজানা বহু তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ ও পত্রিকা আমাকে এনে দিয়েছেন, ফলে আমি অনেক তথ্যের সন্ধান পেয়েছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে বক্তৃতামালা তাঁদের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। তথাকার কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অন্যত্র মুদ্রণের জন্য অনুমতি পাওয়ায় বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাস এই গ্রন্থ বিশ্বভারতী হতে প্রকাশ করতে সম্মত হন।

এই গ্রন্থের নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছেন বিশ্বভারতী-নিযুক্ত গবেষণা-সহায়ক শ্রীপ্রবীরকুমার দেবনাথ। গ্রন্থশেষে যে আকরগ্রন্থাদির নাম আছে, সেগুলি যাচাই করেছেন বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদ্বিজপদ হাজরা।

এই গ্রন্থের আরম্ভ থেকে যিনি নানা ভাবে সাহায্য করেছেন— উপদেশ দ্বারা, সমালোচনার দ্বারা এবং কখনো কখনো প্রুফ দেখায় সহায়তার দ্বারা— তাঁর পরিচয় অনুক্ত থাকল।

পৌষ ১৩৭৮

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্লেষিত সূচীপত্র

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকর্ষণ— ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা। রামমোহনের ধর্ম ও কর্ম -জীবন। তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীনের ইংরেজি ও বাংলা তর্জমা।

রংপুরে বাসকালে বেদান্ত ও তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন— 'প্রস্থানত্রয়'-এর আশ্রয়ে ধর্মব্যাখ্যা।

ভারতীয় দর্শনতত্ত্ব। বুদ্ধের দর্শনতত্ত্ব— বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর। আদিযুগের বর্ণবৈষম্য— বর্তমান কালের বর্ণ ও ধন -বৈষম্য। ইসলামের আবির্ভাব। 'সন্ত'দের সমন্বয়বাদ— সমন্বয়বাদের পথিকৃৎ রামমোহন।

রামমোহনের আবির্ভাবকালে বাংলা দেশে শিক্ষার অবস্থা— শিক্ষাপ্রসারে খ্রীষ্টান মিশনারি— মালদহে কেরী সাহেবের পাঠশালা। শ্রীরামপুরে কেরী, মার্শম্যান প্রমুখর উপনিবেশ ও শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা।

কলিকাতায় 'এসিয়াটিক সোসাইটি' (১৭৮৫), বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ (১৭৯২)। কোম্পানির নূতন সনদ প্রাপ্তি। ভারতে শিক্ষা-খাতে ব্যয়-বরাদ্দ— ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে রামমোহনের পত্র। কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪)।

শ্রীরামপুরের মিশনারীদের পাঠশালা— 'হিন্দু কলেজ' (১৮১৭)। কলিকাতার 'স্কুল বুক সোসাইটি'— 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' (১৮১৮)। প্রাচ্য ভাষা অথবা পাশ্চাত্য ভাষার প্রসার বিষয়ে মতভেদ— লর্ড মেকলে কর্তৃক ইংরেজি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করবার সুপারিশ (১৮৩৫)। ডাফ্‌ সাহেব ও ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার প্রসার— রামমোহন কর্তৃক ডাফকে সহায়তা দান।

ষষ্ঠ অধ্যায়। পৃ. ১০৭-৫৪

মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবে আধুনিক বাংলার জন্ম। হুগলিতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন (১৭৭৮)। কলিকাতায় প্রথম ইংরেজি পত্রিকার আবির্ভাব (১৭৮০)— মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস। হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' পত্রিকা (১৭৮০), 'ইণ্ডিয়া গেজেট' (১৭৮০)।

'ক্যালকাটা গেজেট', 'গবর্মেণ্ট গেজেট'। 'বেঙ্গল জার্নাল'— সম্পাদক ডুয়ানির গ্রেপ্তার ও স্বদেশে নির্বাসন। লর্ড ওয়েলেস্‌লি কর্তৃক পত্রিকা-সম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ— লর্ড হেস্টিংসের সংবাদপত্র পরিচালনা সম্বন্ধে

সপ্তদশ অধ্যায় । পৃ. ৩৩৪-৩৪১

'আত্মীয়সভা'য় বেদপাঠ ও ব্রহ্মসংগীত—প্রথম ব্রহ্মসংগীত "কে ভুলালো হায়"। গীত-ভজনাদি দ্বারা পরমার্থ-সাধন—গায়ক গোবিন্দ মাল, বিষ্ণু চক্রবর্তী। বাঙালির বিচিত্ররসের গান—রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), কালী মির্জা। রামমোহন রায়ের কয়েকটি ব্রহ্মসংগীত—সমকালীন ব্রহ্মসংগীত-রচয়িতা।

অষ্টাদশ অধ্যায় । পৃ. ৩৪২-৪৪৫

খ্রীষ্টানী প্রচার—পোর্তুগীজদের ধর্মপ্রচার—ব্যাণ্ডেলের ক্যাথলিক চার্চ (১৫৫৯)। দোম্ আন্তোনিও-রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' —মানোএল্-দা-আস্সুম্প্সাম্ -লিখিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' লিসবনে রোমান লিপ্যন্তরে মুদ্রিত।

কলিকাতায় খ্রীষ্টানী প্রচার—জব চার্নক (১৭৬০)—রেভারেণ্ড কিরনেন-ডার—চ্যাপলেনদের উপার্জন—কালীঘাটে কোম্পানির পূজা—নানা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব—লণ্ডন মিশনারি সোসাইটি। ভেলোর মিউটিনি—১৮১৩ সালে কোম্পানির নূতন সনদ। অ্যাংলিক্যান চার্চ—পাদরিদের শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা—নবাবগঞ্জে মার্শম্যানের বিদ্যালয়—'ল্যাংকাস্টার মেথড'। চার্লস গ্রাণ্ট—'বাইবেল সোসাইটি' স্থাপন (১৮০৪)।

'সেণ্ট পোলিটিশিয়ান'দের ধর্মোন্মত্ততা—উইলবারফোর্স ও খ্রীষ্টানী প্রচার বিষয়ে মত—খ্রীষ্টানীপ্রচারের ফলে ব্রিটিশ বাণিজ্যের প্রসার। জন্ স্টুয়ার্ট মিল্-এর গ্রন্থ 'ইউটিলিটেরিয়ানিজম্'। জেরম্ বেন্থাম্-এর উদার মত—রামমোহন ও বেন্থাম্।

ইংরেজের সরাসরি ভারতশাসন গ্রহণ করবার আন্দোলন—ভারতের ভাবী শাসন সম্পর্কে লর্ড মেকলের আদর্শ।

খ্রীষ্টধর্ম প্রচার সমিতি (SPCK, 1698)—আরবি ভাষায় বাইবেল তর্জমা —কোরানের লাতিন, ফরাসী, ইংরেজি তর্জমা—ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটির বাংলায় বাইবেল অনুবাদের ইচ্ছা—ব্যাপটিস্ট পাদরিদের শ্রীরামপুরে বাইবেল অনুবাদ আরম্ভ। কেরীর বঙ্গদেশে আগমন। টমাস ও রামরাম বসু—মালদহে বাইবেল অনুবাদ আরম্ভ—মুদ্রণকার্য শুরু (১৭৯৯)।

মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড-এর ভারত-আগমন— শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা। খ্রীষ্টান প্রচারকদের ভারতে আসা সম্বন্ধে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার— বহু খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়—খ্রীষ্টান পাদরিদের ধর্ম-প্রচারপদ্ধতি সম্বন্ধে রামমোহন, শ্রীরামপুরের পাদরি ও বিলাতের পাদরিদের মধ্যে মতান্তর— কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের মহত্ত্ব।

বাইবেলের বাংলা অনুবাদ— রামমোহন-কর্তৃক প্রস্থানত্রয়ের অনুবাদ আরম্ভ।

প্রাচীন হিব্রু ভাষায় ও নবীন গ্রীক ভাষায় লিখিত বাইবেল— ধর্মগ্রন্থ ঈশ্বরের বাণী (revelation)। কোরান একক গ্রন্থ, বাইবেল বহুগ্রন্থের একত্র গ্রন্থন। 'সেপ্টুয়াজেন্ট' প্রাচীন বাইবেলের গ্রীক তর্জমা— রামমোহন-কর্তৃক সিরিয়াক অনুবাদের ব্যবহার।

Precepts of Jesus সংকলন— গ্রীক বাইবেলের পাঠান্তরাদি লইয়া আলোচনা— Textual ও Higher Criticism। স্বেচ্ছাকৃত ভুল ও অপ-ব্যাখ্যা— *Song of Songs*— তথা গীতগোবিন্দ ও গস্‌পেল সম্বন্ধে আলোচনা। খ্রীষ্ট সম্বন্ধে সোয়াইৎজার— তলস্তয় ও চার গস্‌পেল। খ্রীষ্ট সম্বন্ধে মিথ্যা ব্যাখ্যা— সাধু পল।

তলস্তয় ও রামমোহনের মধ্যে বাইবেল সম্বন্ধে মতের মিল।

ইহুদি য়াহবার ইতিহাস ও স্বরূপ—যিশুর প্রেমধর্মের সহিত পার্থক্য। প্রিসেপ্‌টসের বাংলা অনুবাদ (১৮৫৯)— খ্রীষ্টানদের কাছে প্রথম নিবেদন (Appeal)। প্রিসেপ্‌টস-এর বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান পাদরিদের ক্ষোভ— রামমোহনের প্রতি 'হীদন', 'ইনফিডেল' প্রভৃতি আখ্যা প্রয়োগ। রামমোহনের দ্বিতীয় নিবেদনে খ্রীষ্টতত্ত্ব ও ত্রিত্ববাদের তীব্র সমালোচনা— রামমোহনের মতের পৃষ্ঠপোষক বাকিংহাম— শেষ নিবেদন (Final Appeal) ছাপতে খ্রীষ্টান প্রেসের অসম্মতি।

প্রিসেপ টস্ প্রকাশের কারণ বিশ্লেষণ— Biblical Criticism নামে মাসিক পত্র প্রকাশের ইচ্ছা।

'সমাচার দর্পণ'-এ রামমোহনের সমালোচনা— 'ব্রাহ্মণ সেবধি' ও *Brahmunical Magazine* প্রকাশ— 'শিবপ্রসাদ শর্মা' বেনামে রামমোহনের বক্তব্য পেশ— পাদরিদের সমালোচনা। বিশপ রেগিনাল্‌ড হেবার-এর ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে মতবাদের সমালোচনা। বিশপ মিডল্‌টন ও রামমোহন— 'বিশপ কলেজ' (১৮২০)।

প্রথম অধ্যায়

১

রামমোহন রায়ের মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষে যে স্মরণোৎসব হয় ১৯৩৩ সালের শেষ দিকে, তার এক সভা হয় কলকাতার পুরাতন সিনেট হলে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন যে ভাষণ দেন তা 'ভারতপথিক রামমোহন' নামে সুপরিচিত। ঐ সালের ১৪ পৌষ (১৩৪০) এই সভা হয় এবং সেদিনই এই পুস্তিকা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তার পর ১৩৬৬ সালের ১১ মাঘের (১৯৬০) রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংস্করণে এই পুস্তিকা বহু-রচনা-সমৃদ্ধ হয়ে পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়।

১৩৪০ সালে কবি লিখেছিলেন :

> হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার
> মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার।
> মৃত্যু-অন্তরাল ভেদি' দাও তব অন্তহীন দান,
> যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নব প্রাণ।
> যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব
> এনে দিক উদ্‌বোধন, এনে দিক শক্তি অভিনব।

সাত বৎসর পরে ১৩৪৭ সালে কবি তাঁর মৃত্যুর পূর্বের শেষ মাঘোৎসব উপলক্ষে রামমোহনকে স্মরণ করে লিখেছিলেন :

> নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
> যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে,
> যারা অন্যমনা, তারা শোনো,
> আপনারে ভুলো না কখনো।
> মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
> সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
> তাহাদের মাঝে যেন হয়
> তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
> তাহাদের খর্ব কর যদি

খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাষণদানের ত্রিশ বৎসর পরে ও রামমোহনের কলকাতায় এসে বসবাস আরম্ভের দেড় শত বৎসর পরে আমরা রামমোহন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়েছি।

২

আজকাল তরুণ বিদ্যার্থীদের কাছে রামমোহনের যুগটা প্রায় প্রাগৈতিহাসিক কালের মতোই অপরিচিত ও অস্পষ্ট। এটা খুবই স্বাভাবিক; কারণ বর্তমানের বিবিধ বিভ্রান্তিকর চাহিদা মানুষের মনের উপর নিরন্তর এমন প্রবলভাবে আঘাত করে চলেছে যে, প্রয়োজনাতীত কিছু জানবার ও বুঝবার জন্য অবসর খুঁজে পাওয়া যায় না। আর তা ছাড়া যা প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগে না, তার জন্য সময় ও সামর্থ্য দিতে আমরা নারাজ। আমরা 'কেজো' লোক হতে চলেছি— pragmatic। এই কেজো মনোবৃত্তির পাশাপাশি এর ঠিক বিপরীত কিম্ভূত বা exotic-এর বিচিত্র রূপ আমাদের জীবনে সাহিত্যে ও শিল্পকলায় রূপ নিচ্ছে। তৎসত্ত্বেও যাঁরা বাংলা সাহিত্যের ছাত্র তাঁদের পক্ষে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যয়নটা আবশ্যিক পরীক্ষণীয় বিষয় বলে রামমোহন সম্বন্ধে প্রসঙ্গত তাঁদের জানতেই হয় যে, বাংলা সাহিত্যের আদিযুগে রামমোহনের কিছু দান ছিল। বোধ হয় সেই ভেবেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যখন আমাকে ১৯৬২ সালের 'বিদ্যাসাগর বক্তা'র পদ দান করে পত্র দিয়েছিলেন, তাতে জানান যে, বক্তৃতার বিষয় হবে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে রামমোহন রায়ের দান'— Rammohun Roy's contribution to Bengali language and literature।

রামমোহন রায়ের কর্মময় জীবন তথা সাহিত্যিক জীবনের পর্ব এদেশে মাত্র পনেরো-বৎসর-কাল— ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুতরাং এই পর্বের মধ্যে রচিত লেখাগুলোর আলোচনাই মুখ্যত করতে

হবে। কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন উঠল, একটা মানুষের জীবনেতিহাসের পরিবেশ সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে একটা ধারণা শ্রোতা-পাঠকদের সামনে যদি তুলে ধরতে না পারি, তবে আমার এই আলোচনাই ব্যর্থ হবে।

কোনো মানুষের জীবনকে বাদ দিয়ে তার লিখিত রচনাবলীর আলোচনা হতে পারে না। তবে যদি তিনি বিশুদ্ধ সাহিত্যের স্রষ্টা হন তবে তাঁর সাহিত্যের আলোচনাই যথেষ্ট। বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, হোমারের জীবনকথা না জেনেও তাঁদের সাহিত্যের রসগ্রহণে বাধা হয় না। কিন্তু রামমোহনের মতো বহুমুখীপ্রতিভাপন্ন ব্যক্তি, যাঁর কর্মজীবন বিচিত্র বিষয় ও বস্তুর সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত, তাঁর জীবনের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় যদি শ্রোতা-পাঠকদের না করিয়ে দিই, তবে তাঁর রচনাবলীর আলোচনাটাই ঝাপসা ঠেকবে। মানুষ এমন একটা জীব, যে একক সাধনার সার্থক রূপ নয়; সে একটা সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তি, একটা দেশের নাগরিক, একটা কালের প্রতীক। তাই দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে সেই ব্যক্তিকে দেখতে পারলে তার সার্বিক রূপটা ফুটে উঠতেও বা পারে। আজকাল ও সেকালের ব্যবধানটা এতই দীর্ঘ যে সেকালের লোকের ভাষা ও ভাব, দুটোই আমাদের কাছে অত্যন্ত অস্পষ্ট। সেকালের মানুষের জীবনাদর্শ জীবনধারা ও জীবিকার পথ, তাদের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা, তাদের ভাষা ও সাহিত্য আমাদের কাছে ইতিহাস হয়ে গিয়েছে, আমাদের জীবন থেকে তারা সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত বলেই মনে হয়— যেমন আমাদের নাম-না-জানা বা নাম-ভুলে-যাওয়া প্রপিতামহের পূর্বপুরুষদের কথা। মানুষের চোখের দৃষ্টি সমতল ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বেশিদূর তো যায় না। যেটুকু চোখে পড়ে তা অন্তহীন বিচিত্রের কোলাহল মাত্র। তার মধ্য দিয়ে চোখ ও মন পথ কেটে চলে সামনের দিকে। মানুষের ইতিহাসও অনেকটা এই ধরণেরই অভিজ্ঞতা। প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে সামান্য ঘটনারাজি কখন যে ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করে নূতন রূপ ধারণ করেছে, সেই মুহূর্তকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যায় না, শুধু অনুভব করা যায় নূতন কাল এসেছে।

দেড় শো বছর পূর্বের বাংলাদেশের হাজার বছরের মরচে-পড়া

সমাজের সমস্যা আজ এই বিংশ শতকের সাত দশকের জগৎ থেকে এত পৃথক যে তাকে ঠিক মনের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা সহজ নয়। কিন্তু সেই অ-সহজ পথটা না ধরতে পারলে সেই অবিস্মরণীয় মানুষটির স্বরূপও ঝাপসা হয়ে থাকবে। রামমোহনের প্রতি অবিচার করব, যদি আমাদের ছোটো হাতের মাপকাঠিতে, আমাদের আধুনিকতার সংস্কার নিয়ে, তাঁকে বিচার করতে বসি।

৩

রামমোহন জন্মেছিলেন ১৭৭২ (মতান্তরে ১৭৭৪) খ্রীষ্টাব্দে, হুগলি জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রামে সাধারণ এক ব্রাহ্মণের ঘরে; আর তাঁর মৃত্যু হয় ইংলণ্ডের ব্রিস্টল শহরে ১৮৩৩ অব্দে। এই সময়ের মধ্যে ভারত তথা পৃথিবীর উপর দিয়ে এমন সব যুগান্তকারী ঘটনাপ্রবাহ বয়ে গিয়েছিল, যাদের ক্ষুব্ধ ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাতে পড়ে 'মধ্যযুগীয়' ভারত 'আধুনিক' যুগে এসে উত্তীর্ণ হয়।

তর্ক উঠবে 'মধ্যযুগীয়' বলে কি কোনো মার্কা-মারা দার্শনিক মতবাদ বা সমাজ-ব্যবহারের তালিকা খাড়া করা যায়? তা হয়তো যায় না। তবে এখনো ভারত— ভারত কেন পৃথিবীর বহু দেশ— সর্বতোভাবে মধ্যযুগীয়-মনোভাব-মুক্ত বলে তো মনে হয় না। আর মধ্যযুগীয়ই বা বলি কেন— 'প্রাচীন' কালের অতি অচল মতামত নিয়ে আধুনিক কালের 'শিক্ষিত'দের সমর্থন করতে দেখি। সেই-সব ব্যক্তিদের কথাবার্তা শুনলে, তাঁদের রচনা পড়লে এবং ব্যবহার দেখলে মনে হয় যে অতীত কাল— মধ্যযুগ, প্রাচীনযুগ, এমন-কি বর্বরযুগও— সমভাবে আমাদের ঘাড়ের উপর সিন্ধবাদের দৈত্যের মতো চেপে বসে আছে; নড়বার নাম তাদের নেই, নড়াবার শক্তিও আমরা হারিয়েছি— দেহমন atrophied— যেন একটা বিষাক্ত জারক-রসে সমস্তকে অসাড় করে দিয়েছে।

প্রশ্ন উঠবে— মধ্যযুগীয় মনোভাবের কি বিশেষ কোনো স্বরূপ আছে? সে কথার জবাব হবে আমার এই ভাষণের মধ্য দিয়ে, রামমোহনের জীবনকথা ও মতামতের আলোচনা-প্রসঙ্গে।

অবক্ষয়িত সমাজ যখন অধোগতির চরমে এসে দাঁড়ায়, তখনই সমস্ত মানুষের মর্মবেদনা কেন্দ্রীভূত হয়ে প্রকাশ পায় একজন মানুষের মধ্য দিয়ে— পৃথিবীর অভ্যন্তরে তপ্ত ক্ষুব্ধ গলিত ধাতু যেমন পথ পায় আগ্নেয়-গিরির গুহামুখে। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, মহাবীর জিন, কুংফুৎসু, লাওৎসু, সোক্রাতিস, খ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ এসেছেন মানুষের দুঃখ দেখে তাদের উদ্ধার করবার আশা নিয়ে; আর আধুনিক যুগে এই দুঃখ দূর করার বাণী বহন করে এলেন কার্ল্ মার্কস্ ও তাকে বাস্তবায়ন করলেন লেনিন। এঁরা সবাই সমপর্যায়ের মহাপুরুষ।

কথা হচ্ছিল মধ্যযুগ প্রাচীনযুগ কাকে বলে। সত্যি কথা বলতে গেলে বাংলার প্রাচীনযুগ নেই বললেই চলে, মধ্যযুগ দিয়েই বাংলার ইতিহাস শুরু হয়েছে। কথাটা শুনেই শ্রোতাদের জবাব করবার জন্যে মনটা উস্‌খুস্ করছে— এমন একটা অনৈতিহাসিক তথ্য বিদ্বজ্জন-সভায় পেশ করছি। আমার জবাব হচ্ছে, বাংলাভাষা তার রূপ পেল ইস্‌লামের আসার পর ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যের ছোঁয়াচ লেগে। তার পূর্বের প্রাচীনকালের অচল ভাষা ও সাহিত্য কেউ স্বেচ্ছাসুখে পড়ে না। যাঁরা পড়েন— পরীক্ষার চাপে, যাঁরা পড়ান— বৃত্তি হিসাবে, আবেগে উদ্‌বেলিত আনন্দে সে সাহিত্য কেউ পড়ে না।

ভারতের মধ্যযুগ শুরু হল দ্বাদশ শতাব্দীতে, যখন থেকে তার ভাষা রূপ পেল নূতন সাহিত্যে, পদাবলীকীর্তনে, চরিত্রলীলামৃত-রচনায়, রামায়ণ-মহাভারতের নবরূপায়ণে বা অনুবাদে। কাগজ কলম সিহাই দোয়াত বই কিতাব এল— সবই বিদেশী ভাষা থেকে পেলাম। পূর্বে লিখতাম তালপাতায়, এল কাগজ, কিন্তু সে 'পাতা' নামেই পরিচিত হয়ে থাকল। তবে তালপাতা কি নির্বাসিত হল? তা হয় নি, সংস্কৃতের বহু সহস্র পুঁথি তালপত্রে লিখিত হতে থাকে। মধ্যযুগে কাগজে শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতিলিপি (copy) করতে হয়তো ধর্মীয় বাধা ছিল— কাগজ তৈরি করত মুসলমানরা। মাঝে মাঝে দেখা যায়, তুলোট কাগজে লাল কালিতে ধর্মপুস্তক ছাপানো হচ্ছে; সে কাগজ কতখানি সাত্ত্বিকভাবে তৈরি হয়েছে জানি নে। ব্রাহ্মণ কম্পোজিটর দিয়ে পুস্তক মুদ্রিত হয়েছে এমন বিজ্ঞাপনও চোখে পড়েছে।

বাংলাদেশে মধ্যযুগের সূত্রপাত হয়েছিল ইসলাম তথা ফার্সি-আরবি সংস্কৃতির আবির্ভাবের সঙ্গে। বর্তমান যুগের সূত্রপাত হল খ্রীষ্টানী তথা য়ুরোপীয়দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। মধ্যযুগে পেয়েছিলাম কাগজ কিতাব, নূতন যুগে পেলাম মুদ্রাযন্ত্র, কাগজের কল, ডাকবিলির ব্যবস্থা। ফলে শুধু বই ছাপা হল তা নয়, প্রাচ্যের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত 'সংবাদপত্র' এল সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য। এর বিপ্লবী প্রভাব কত গভীর, কত ব্যাপক সে সম্বন্ধে আমরা আদৌ সচেতন নই— যেমন প্রতি-মুহূর্তের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে। একদিন সময়মত 'খবরের কাগজ' না পেলে সভ্য মানুষের কী দশা হয় তা কারো অজ্ঞাত নয়। সকালের চা-পেয়ালা না পেলে মেজাজ যেমন বিগড়ে যায়, পত্রিকাখানা না পেলেও মনটা তেমনি উতলা হয়ে পড়ে। মুদ্রাযন্ত্র বাঙালি তথা ভারতীয়দের নূতন শক্তিতে উদ্‌বোধিত করল যেদিন, সেদিন থেকে আমাদের জীবনে আধুনিকতার আবির্ভাব। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা যথাসময়ে করব।

৪

প্রতিমা-গড়ার আগে কাঠামোটা খাড়া করতে হয় বাঁশ-কাঠ দিয়ে; এই মজবুত ঠাটের উপর খড় চড়াও, মাটি দাও, রঙ মাখাও— মূর্তিটা ফুটে উঠবে। তেমনি হচ্ছে ইতিহাসটা। সেটাকে বুঝবার জন্যে কয়েকটা মোটা সন তারিখ মনে রাখতে হবে। খুব মোটা কথা, জানা তথ্য— তাই সংক্ষেপে বলছি:

দ্বাদশ শতকের শেষে তুর্কি-ইসলাম ভারতে প্রবেশ করে; পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারতের পনেরো-আনি তার দখলে আসে। ১৫২৬ অব্দে মুঘলরা ভারত জয় করে, কিন্তু সাম্রাজ্য পত্তন হয় আকবরের সময় ১৫৫৬ অব্দে। ইতিমধ্যে পোর্তুগীজরা এসে গেছে ভারতের উপকূলে, রাজ্যও পত্তন করেছে গোয়াতে। ১৬৫৭ অব্দে ঔরঙ্গজেব ভারতের বাদশাহ হন সমস্ত ভারতের একেশ্বর হয়ে। ১৭০৭ অব্দে মৃত্যু হয় তাঁর দক্ষিণ-ভারতে। সাম্রাজ্যের অবস্থা এমনি হয়েছিল যে তাঁর মৃত্যুর ত্রিশ বছরের মধ্যে পারস্যের

দস্যুসর্দার নাদিরশাহ এসে দিল্লী মহানগরী তছনছ করে দিল, তাকে কেউ রুখতে পারে নি। তার পর বিশ বছর যেতে না যেতে ১৭৫৭ অব্দে বাংলাদেশের গঙ্গাতীরে পলাশিগ্রামের কাছে সামান্য একটা যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ একটা বিদেশী কোম্পানির ফৌজের কাছে হার স্বীকার করলেন। বাংলা সুবা পদানত হল এক বিদেশী সাহসিকের কাছে।[১] ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সালের মধ্যে ইংরেজ ভারত-ইতিহাসের অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে বসেছে— ভারতীয়দের মরণ-বাঁচনের কাঠি এসে গেছে তাদের হাতে।

মুঘল-সম্রাটের নিযুক্ত বাংলার সুবাদারকে ধ্বংস করে সাহসিক আলিবর্দী খাঁ স্বাধীন নবাব হয়েছিলেন ১৭৪১ অব্দে। দিল্লীশ্বরের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার না করলে কখনো তাঁর নিযুক্ত সুবাদারকে নিধন করে মুর্শিদাবাদের রাজতক্তে বসা আলিবর্দীর পক্ষে সম্ভব হত না। সেই আলিবর্দীর দৌহিত্র সিরাজকে অপসারিত ও হত্যা করে তাঁর শূন্য আসন দখল করেন মীরজাফর আলি খাঁ— নবাবের আত্মীয় এবং সৈন্যবিভাগের সর্বাধ্যক্ষ; আজকের ভাষায় একে বলা যেতে পারে *coup d'etat*। অবশ্য এখানে সহায় ছিল ইংরেজ সৈন্য— ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে ছিলেন হিন্দু-মুসলমান আর রবার্ট ক্লাইভ। দিল্লীর বাদশাহ বাংলা সুবার নবাবদের পৃথক রাষ্ট্রত্ব ও স্বাধীনতা স্বীকার নিশ্চয়ই করতেন না, যদিও ব্যবহারিক দিক থেকে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনই ছিল। কিন্তু দিল্লী থেকে বিতাড়িত ও এলাহাবাদে সাময়িকভাবে আশ্রয়প্রাপ্ত মুঘল-সম্রাটের কাছ থেকে ক্লাইভ যখন বার্ষিক মোটা অঙ্কের রাজস্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলা সুবার 'দেওয়ানী' পদ আদায় করে নিলেন তখন থেকে শাসন ও শোষণের দ্বৈরাজ্যের সৃষ্টি। কিন্তু দেখা গেল দ্বৈরাজ্য তো নয়, বহুরাজকের আধিপত্য। কোম্পানির প্রত্যেকটি কর্মচারী— বড়ো, মাঝারি, ছোটো— ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান, আর্মানি, ফিরিঙ্গি— যে কেউ কোম্পানির সঙ্গে সামান্যত যুক্ত সেই মনে করত যে সে 'কোম্পানি'। কবে কোন্ সাহেব ডাক্তার কোন্ সুবাদারের কাছ থেকে ইংরেজ কোম্পানির জন্য

১ "In June 1757 we crossed the frontier and entered into a great new world to which a strange destiny had led Bengal".—Jadunath Sarkar, *History of Bengal*, Vol. II, p. 499.

নিঃশুল্ক বাণিজ্য করবার অধিকার লাভ করেছিলেন, তার সুযোগ নিচ্ছে প্রত্যেক কর্মচারী, দালাল, ফড়ে, বানিয়া— সবাই 'কোম্পানি'র নিশান উড়িয়ে শুল্ক এড়াচ্ছে। সেই-সব নিয়েই তো মীরকাসেম আলির সঙ্গে কোম্পানির বিবাদ ; এবং তার পরিণাম কী হয়েছিল, তা সকলেরই জানা। মীরকাসেম ইংরেজের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দেশত্যাগী হন, এবং তার পর কোথায় কী ভাবে সেই মহাপ্রাণ শাসকের জীবনান্ত হয় তার সংবাদ আজ অস্পষ্ট, এমন-কি তাঁর কবর কোথায় তাও অজ্ঞাত। এত বড়ো ট্রাজেডি ঘটে গেল পলাশিযুদ্ধে পরাজয় ও সিরাজ-বলির সাত বছরের মধ্যে।

এই-সব ঘটনার অল্পকাল পরে ক্লাইভ 'লর্ড'-উপাধি-ভূষিত হয়ে বাংলা-দেশের 'গভর্নর' হয়ে এলেন ও এলাহাবাদে মুঘল-সম্রাটের কাছ থেকে 'দেওয়ানী' পদ আদায় করে নিলেন। 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ড রূপে'— একটা বিদেশীর দল বাণিজ্য করতে এসে বিশাল সাম্রাজ্য যেন মুফৎ পেল। এই ব্যবসায়ী সাহসিকের দল নিজেদের জন্য 'লভ্যাংশ' যথেষ্ট রেখে উদ্‌বৃত্ত টাকা পাঠিয়ে দিত বিলাতে ডিরেক্‌টরদের জন্য। কোম্পানির স্থানীয় সাহেব-ভৃত্যদের প্রত্যেকটি বিষয়ে বিলাতের হুকুম মেনে চলতে হত ; কিন্তু স্থানীয় সাহেব-কর্মচারীদের মস্ত সুবিধা ছিল একটা— বিলাত থেকে আদেশ আসতে যেতে বছর-কাল কেটে যেত সে-যুগে। ফলে, স্থানীয় কর্মচারীরা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা মতে অনেক কিছু করে যেতেন— যার সম্বন্ধে বিলাতের পরিচালকমণ্ডলী অন্য মত পোষণ করতেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে বলে তাঁরা সেটাকে *fait accompli* বলে মেনে নিতেন। বিলাতের কর্তারা যখন দেখতেন ভারতের স্থানীয় গভর্নরদের কোনো কোনো অননুমোদিত কাজের ফলস্বরূপ তাঁদের রাজ্য-সীমানা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশে প্রচুর ধনাগম হচ্ছে তখন আর পূর্বে-অনুষ্ঠিত অন্যায়কে শোধন করবার উৎসাহ বোধ করতেন না। ওয়ারেন হেস্টিংসের দুষ্কৃতির শোধন হয় নি। আমীরদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে সিন্ধু দখল করে, বা Our conquest of the Punjab is no conquest, but mere breach of trust বলেও, নিশ্চিন্ত মনে সে-সব দেশ স্থায়ীভাবে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-ভুক্ত করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। বিলাতের কর্মকর্তারা (Directors) পার্লামেন্টে ব্যক্তিগত তথা দলগত

সুবিধা-সুযোগ বজায় রাখবার জন্য কখনো কখনো ভারতের গভর্নর-জেনারেলদের কোনো কোনো কাজকর্মের উপর বিরক্ত হয়ে তাঁদের কাউকে কাউকে ডেকে পাঠাতেন এবং নিজেদের মনোমত শাসককে নিযুক্ত করতেন— ওয়েলেস্‌লি, লর্ড হেস্টিংস তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ দুটি ঘটনা ঘটে উনবিংশ শতকের প্রথম দু-দশকের মধ্যে।

৫

পটভূমির মধ্যে মানুষকে দেখাই আসল দেখা, মানুষ বহুকে নিয়েই সার্থক। যে মানুষ যত বিচিত্র মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আপনার জ্ঞান আহরণ করেন এবং সেই জ্ঞানকে আপনার অন্তরের জারক রসে শোধন করে নূতন-ভাবে জনতার কাছে পরিবেশন বা প্রচার করতে সক্ষম হন, তাঁকেই বলি নরোত্তম। সূর্যের আলোর ঔজ্জ্বল্য বা তাপ নেতিধর্মী, পদার্থের স্পর্শে এলেই তার গুণাগুণের উপলব্ধি হয়; তেমনি পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত মানুষ যখন বিচিত্রের স্পর্শে আসে তখনই তাকে তার স্বরূপে জানতে পারি। তাই বলছিলাম রামমোহনের জন্মকালের (১৭৭২) সমসাময়িক পরিবেশটাকে দেখবার জন্যে গোলকের উপর মনশ্চক্ষুটাকে ঘুরিয়ে আনা যাক।

বাংলাদেশে নামে-মাত্র নবাব ঠুঁটো-জগন্নাথ হয়ে মুর্শিদাবাদের তক্তে আসীন, ব্যয় ও অপব্যয়ের উৎস ইংরেজ দেওয়ান-কোম্পানির প্রদত্ত বাৎ-সরিক ভাতা-নির্ভর জীবন যাপন করছেন। হৃত-ঐশ্বর্য মুর্শিদাবাদে বসে ‘গ্রাম্য’ পঞ্চায়েতি করেন, শূন্যগর্ভ খেতাব আশ্রিত ও চাটুকারদের খয়রাতি করেন। উত্তর-ভারতে আউধের নবাব দিল্লীর বাদশাহকে তোয়াক্কা না করে ‘স্বাধীন’ হয়েছেন: দেশরক্ষার শক্তি হারিয়ে সুখ-সাগরে গা ভাসিয়ে দিনাতিপাত করছেন। পশ্চিম-ভারতে পানিপথের শেষ যুদ্ধে মারাঠারা আফগান-সর্দারের কাছে মার খেয়ে এখনো টিকে আছে, কিন্তু মাজা ভেঙে গেছে। কারণ, মহারাষ্ট্র-সংহতি নষ্ট হতে চলেছে। জায়গিরদার তথা সেনাধ্যক্ষ হয়ে কেউ খুশি নন, সকলেই ‘স্বাধীন রাজা’ হতে চান— পেশবার তাঁবে থাকতে সবারই অনিচ্ছা। দিল্লীর মুঘল-সম্রাট এখন মারাঠা war-

lordদের হাতের ক্রীড়নক, কার তাঁবে তিনি পড়বেন তাই নিয়ে রেষারেষি। বোম্বাই-এ ইংরেজ ওৎ পেতে বসে আছেন, কখন পুনায় পেশবা ও মারাঠা-সেনাপতিদের মধ্যে বিরোধ শুরু হবে! এ-সব অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ কিভাবে গ্রহণ করতে হয় তা ইংরেজ-ডিপ্লোম্যাটরা ভালো করেই জেনে নিয়েছে কয়েক বছর হিন্দু ও মুসলমানদের সঙ্গে ব্যাপারিক সম্বন্ধে এসে। দক্ষিণ-ভারতেও তথৈবচ। আসফ-জান নিজাম-উল-মুল্‌কের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে বহু রাজ্য উপরাজ্য গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে নিত্য কলহ, ষড়যন্ত্র। মাদ্রাজের গভর্নর আছেন তাকে-তাকে, কখন ঝোপ বুঝে কোপ বসাবেন তারই সুযোগ খুঁজছেন। বিলাতের ডিরেক্টর-দের কাছ থেকে কোনো বিষয়ে অনুমতি-পত্র পেতে বৎসর-কাল কেটে যায়। কিন্তু সময় এত দ্রুতবেগে চলেছিল যে স্থানীয় কর্মচারীদের অত তর সয় না— নিজেদের বুদ্ধিবিবেচনা খাটিয়ে দ্রুত কাজ করতে হয়।

৬

কোম্পানি তো রাজ্য গড়ছেন, কিন্তু তাদের ব্যবসায়, যা থেকে বিলেতের অংশীদারদের মুনাফা, সেখানেই বেধেছে মুশকিল। লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাচ্ছে, অসৎ কর্মচারীরা ভারতীয়দের শোষণ করছে, মালিকদেরও ঠকাচ্ছে। নিজেদের খাতে ব্যবসায় করে বিলেতে যখন ফিরে যায় তখন তারা প্রত্যেকে টাকার কুমির, লোকে বলে 'নবাব' হয়েছেন। কোম্পানির দেউলিয়া হবার দশা। শেষকালে বিলেতে পার্লামেন্টের কাছে অর্থ-সাহায্যের জন্য আবেদন পেশ করতে হল গলবস্ত্র হয়ে। আড়াই শো জন মুনাফাখোর অংশীদারদের স্বার্থ থেকে দেশের আরো অন্য লোকের স্বার্থ দেখতে হবে, টাকা চাইলেই পার্লামেন্ট দেবে কেন? তা ছাড়া কোম্পানির কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বিলেতের লোক জানতে পারছে যা আদৌ ইংরেজ জাতির গৌরবজনক নয়। Bolts নামে এক সাহেব ভারত থেকে ফিরে কোম্পানির কুকীর্তির কাহিনী লিখে প্রচার করেন। লোকটার একটু পরিচয় দিই। উইলিয়াম বোল্‌টস্ (১৭৪০? -১৮০৮) ওলন্দাজ-জাতীয় সাহসিক। ১৭৫৯ সালে কলকাতায় আসেন,

বয়স তখন উনিশ-কুড়ি মাত্র। পলাশিযুদ্ধের পর কোম্পানির কাজকর্ম দেখবার লোকের অভাব, অথচ সমস্ত দেশটা হঠাৎ ক্লাইভের পায়ের তলায় এসে গেছে। বোল্‌টস্‌কে সিভিল-সার্ভিসের কাজে নিয়োগ করা হল। তখন কোম্পানির এ শ্রেণীর কর্মীদের বলত 'রাইটার' (writer)। কয়েক বছরের মধ্যে চাকরির সঙ্গে ব্যবসায় করে বোল্‌টস্‌ বিপুল ধনের অধিকারী হয়ে ওঠেন। কোম্পানির কর্তারা এজন্য তাঁকে তিরস্কার করেন। তিনি ১৭৬৬ অব্দে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় নানা রকমের ফাটকা কাজে প্রবৃত্ত হন। এখন থেকে তৎকালীন গভর্নর Verelst-এর সঙ্গে মাঝে মাঝে মতভেদ হতে থাকে; ভেরেল্‌স্‌ট কোম্পানির বাইরের লোকদের ব্যবসা বন্ধ করার জন্যে কৃতসংকল্প। অনেক হাঙ্গামার পর ১৭৬৮ সালে বোল্‌ট্‌স্‌কে পাকড়াও করে ইংলণ্ডে রওনা করে দেওয়া হয়। সেখানে ডিরেক্টরদের কাছ থেকে সুরাহা তো হলই না, বরং তাঁর বিরুদ্ধে মামলা শুরু করে দেওয়া হল (১৭৭১)। পরের বছর বোল্‌ট্‌সের বিখ্যাত *Consideration on Indian Affairs* প্রকাশিত হয় (১৭৭২)।[১]

এই গ্রন্থে বাংলাদেশে কোম্পানি-শাসনের নগ্ন মূর্তি প্রকাশ করে দেওয়া হয়। ইংলন্‌ডে এই বই প্রকাশিত হলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ভেরেল্‌স্‌ট্‌ তার উত্তর দিলে বোল্‌ট্‌স্‌ তার জবাব লিখে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন (১৭৭৫)। কোম্পানির সঙ্গে মামলায় আর বই ছাপাতে বোল্‌টসের বিস্তর খরচ হয়ে যায়। বাংলাদেশে তিনি ৯০ হাজার পাউণ্ড জমিয়েছিলেন, তার থেকে মাত্র হাজার ৩০ পাউণ্ড উদ্ধার হয়। এর পর এই দুর্দমনীয় সাহসিক অস্ট্রিয়ায় চলে যান, সেখানে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রসঙ্গত বলি, বোল্‌ট্‌সের ওই বই এখনো পড়ার মতো—অবশ্য যাঁরা সে যুগের ইতিহাস নিয়ে নাড়াঘাঁটা করেন তাঁদের পক্ষেই। তাঁতিদের আঙুল কাটা সম্বন্ধে যে কাহিনী খুব প্রচলিত আছে তা এই বোল্‌ট্‌স্‌ই প্রচার করেন। হতে পারে তাঁর রাগ

[১] "Bolts was a company's servant who had resigned the service and taken to commercial pursuits in Calcutta at which he amassed a fortune in a few years. He was eventually forcibly deported as interloper. He became the author of a valuable work 'Considerations on Indian Affairs'" —Busteed, *Echoes from Old Calcutta*, p. 182.

ছিল কোম্পানির কর্তাদের উপর। কিন্তু Dow সাহেবের লেখা ইতিহাসকে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এটা ১৭৭২ সালে বিলেতে ছাপা হয়ে বের হয়। ডাউ-এর তিন-খণ্ড ইতিহাসের প্রথম দুটো ফিরিশতারই[১] ভাবানুবাদ, কিন্তু তৃতীয় খণ্ড, বা ইংরেজ কোম্পানির আমলের কথা, তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে লিখিত। এই-সব আলোচনার ফলে ব্রিটিশ জনসাধারণ ও পার্লামেণ্ট কোম্পানির কাজকর্ম সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারলেন না, প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থকে কোম্পানির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে আইন পাস করতে হল। সেই Regulating Act (১৭৭৩) অনুসারে বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতের গভর্নর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হলেন (১৭৭৪)। এখন তিনি হলেন একাধারে বাংলা প্রেসিডেন্সির গভর্নর ও ভারতের গভর্নর-জেনারেল। সমস্ত ভারতের উপর অপার দৌরাত্ম্য করবার ছাড়পত্র পেলেন। ১৭৭৪ থেকে ১৮৫৪ পর্যন্ত গভর্নর ও গভর্নর-জেনারেল এই দুই পদ একজনের উপর বর্তায়, রাজধানী ছিল কলকাতা। ১৭৭২ থেকে ১৭৮৫ পর্যন্ত ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলা তথা ব্রিটিশ ভারত শাসন করেন।

এই সময়ের ইতিহাস পড়তে পড়তে বিস্ময় লাগে। দেওয়ানি পাবার কয়েক বছরের মধ্যে ইংরেজ কী শক্তি অর্জন করেছিল যাতে করে সে নন্দকুমারের মতো নামজাদা হিন্দু ব্রাহ্মণকে মুর্শিদাবাদ থেকে পাকড়ে এনে কলকাতায় বিচারের অভিনয় করে ফাঁসিতে লটকে দিতে পারলে (১৭৭৫)! কলকাতার লোকে বা বাংলার লোকে উপবাস করে গঙ্গাস্নান করে দিনটা কাটিয়ে দিলে! নগরে প্রতিবাদ হয় নি, দাঙ্গা হয় নি, বিদ্রোহ হয় নি। সবই সেদিন negative— নিষ্ক্রিয় বৃত্তি। হেস্টিংসের যে ভারতীয় অনুচর নন্দকুমারের নামে নালিশ করেছিল, সেই হিন্দুই নন্দকুমারের সাহেব-কৌন্সিলীকে আপীল করতে বাধা দেয়; আর এই হত্যাকাণ্ডের অন্তরালে ছিলেন এই মহানগরীর এক বিশিষ্ট হিন্দু নাগরিক। আর আজ শুনছি,

---

১ ফিরিশতা (Firishta) : মহম্মদ কাজিম (১৫৭০-১৬১১) ফার্সি ভাষায় ভারত-ইতিহাস লেখেন। ডাউ এই কেতাবের চুম্বক তর্জমা করেন। এল্‌ফিনস্টোন সাহেব তাঁর ভারত-ইতিহাস এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করেই লেখেন। জি. ব্রিগ্‌স্ ১৮২৯-এ এই বইয়ের অনুবাদ করেন। ফিরিশতা দক্ষিণ-ভারতে বিজাপুর সুলতান দ্বিতীয় আদিলশাহের দরবারে ছিলেন।

নন্দকুমারকে কোন্‌খানে লটকানো হয়েছিল সেই জায়গাটা গবেষকরা খুঁজছেন। বোধ হয় স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হবে! প্রশ্ন— কিসের স্মৃতি? কোন্ মহত্ত্বের স্মৃতি? কোন্ শৌর্যের স্মৃতি? নন্দকুমারের ফাঁসি যখন হয় তখন রামমোহন তিন বৎসরের শিশু— বড়ো হয়ে এ-সব কাহিনী শুনে থাকবেন। এই ঘটনাটা এইজন্যে বললাম যে, ইংরেজ কত অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের ধন-প্রাণ-মান সব কিছুরই নিয়ন্তা হয়ে বসেছিল এবং বাঙালিকে কিরকম হাড়ে-হাড়ে চিনে ফেলেছিল!

৭

বাংলা তথা ভারতে ১৭৭২ অবধি ইতিহাসের পাতা যখন এই-সব ঘটনার কালিতে কলঙ্কিত হচ্ছে তখন য়ুরোপের মধ্যে কী-সব শক্তি কাজ করছে তার মোটামুটি একটা হিসাব নিতে হবে— কারণ, রামমোহনের অনেক চিন্তা ও ভাবনার উৎস পাশ্চাত্য দেশ। তাঁর জীবনকালে য়ুরোপ ও আমেরিকার বহু ঘটনার প্রতি সহানুভূতি বা বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বহু রচনার মধ্যে। গ্রেট ব্রিটেনে তখন হ্যানোভার-বংশীয় তৃতীয় জর্জ রাজত্ব করছেন; আর ১৮৩০ সালে যখন রামমোহন ইংলন্‌ডে উপস্থিত হলেন তখন সেই বংশের চতুর্থ জর্জ সিংহাসনে আসীন। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ আর উনবিংশ শতকের প্রথম ত্রিশ বছরের মধ্যে ব্রিটিশ জাতি ঘরে-বাইরে সুপ্রতিষ্ঠ, বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী, শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্য দর্শন— সব বিষয়ে মধ্যযুগীয়তার অবসান হয়েছে সেখানেও।

১৭৭২ অব্দে ফ্রান্সে বিপ্লবের পরিবেশ রচিত হচ্ছে পঞ্চদশ লুই-এর রাজত্বকালে। তাঁর পুত্র ষোড়শ লুই রাজা হলেন ১৭৭৪ অব্দে, বাপ-ঠাকুর্দার পাপের বোঝা কাঁধে নিয়ে। প্রায়শ্চিত্ত করতে হল তাঁকেই, নিজের মাথাটি জনতা-জল্লাদের খাঁড়ার নীচে উৎসর্গ করে। রামমোহনের বয়স যখন কুড়ি বছর তখন (১৭৯২) ফরাসী-বিপ্লবের আর্তনাদ ধ্বনিত হল। বিলাতে এই সময়ে টমাস্ পেইন, যিনি তখন French National Convention-এর সদস্য, তাঁর বই *Rights of Man* প্রকাশের অপরাধে লর্ড কেনিয়নের এজলাসে তাঁর মামলার শুনানি হচ্ছে।

রামমোহনের মৃত্যুকালের (১৮৩৩) মধ্যে ফ্রান্সের উপর দিয়ে যে ঘটনাপ্রবাহ বয়ে যায়, তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। ফরাসী-বিপ্লব, ডিক্টেটরি, নেপোলিয়নের উত্থান-পতন— সবই ঘটে তাঁর জীবনকালে। পুরাতনকে ফিরে আসতেও দেখেন সেখানে।

রামমোহনের বয়স যখন চার বছর তখন (১৭৭৬) আমেরিকায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা বিদ্রোহী হয়। তার পর দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর ১৭৮৯ অব্দে তেরোটি স্টেটকে এক ফেডারেশনের[১] মধ্যেএনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। এই ঘটনা ফরাসী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল। আমেরিকায় পেইনের লেখা *Rights of Man* (১৭৯১-৯২) মানুষের মনে সেই প্রশ্নই এনেছিল যার উত্তর আজ পর্যন্ত ভালো করে সর্বত্র স্বীকৃত হয় নি; অথবা মুখে স্বীকৃত হলেও জীবনে তা বাস্তবায়িত করা সম্বন্ধে কার্পণ্য এখনো দূরীভূত হয় নি। পেইনের প্রভাব আমেরিকায় ও য়ুরোপে কতটা ব্যাপ্ত হয় তা হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর লেখা পড়ে অনেকেই জানেন। পেইনের *Age of Reason* লেখা হয় ১৭৯৪-৯৬-এর মধ্যে, যার প্রভাবে একদিন বাংলাদেশের তরুণরা উত্তেজিত হয়েছিলেন। সেদিনও angry youngman ছিল, তারা এদেশে নাম পায় Young Bengal। আলেকজাণ্ডার ডাফ লিখেছেন, "কেবলমাত্র একটা জাহাজেই

১ ১৮২৪ অব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন পর্যন্ত তার Federal মূর্তি গ্রহণ করেনি, প্রত্যেক স্টেট সম্পূর্ণভাবে প্রায় স্বাধীন। ১৮৬০ অব্দে দাসপ্রথা নিয়ে বিবাদ শুরু হলে দেখা গেল separatism বা বিচ্ছিন্ন হবার ভাব স্টেটগুলির মধ্যে স্পষ্ট রয়েছে; দক্ষিণের কয়েকটি স্টেট পৃথক হয়ে যায়। গৃহযুদ্ধের পর লিন্‌কন ঘোষণা করলেন যে ফেডারেশন থেকে বের হয়ে যাবার কথা তোলা বিদ্রোহের সমতুল্য। এখন রামমোহনের উক্তি আলোচ্য: ১৮২৪ অব্দে Rev. Wareকে যে পত্র দেন (On 'Prospects of Christianity' in India, *English Works*, p. 806) তাতে লিখছেন—I presume to say, that no native of those States can be more fervent than myself in praying for the uninterrupted happiness of your country, and for what I cannot but deem essential to its prosperity—the perpetual union of all the States under one general government. Would not the glory of England soon be dimmed, were Scotland and Ireland separated from her ?... I think no true and prudent friend of your country could wish to see the power and independence at present secured to all by a general government, exposed to the risk that would follow, were a dissolution to take place, and each State left to pursue its own resources. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মধ্যে বিপদ কোথায় তা এই মনীষী তখন স্পষ্ট করেই দেখতে পেয়েছিলেন।

এক হাজার -সংখ্যক 'এজ অব্ রিজন' কলকাতায় এসে পৌঁছল। প্রথম দিকে প্রতিটি বই একটাকা করে বিক্রি হচ্ছিল, কিন্তু বইয়ের চাহিদা এতই বেশি ছিল যে দেখতে দেখতে এর দাম অনেক বেড়ে গেল। কিছু-দিনের মধ্যে পেইনের সব লেখার একটা শস্তা সংস্করণ প্রকাশিত হল।"

Draper সে যুগের নাম-করা ঐতিহাসিক— তাঁর *Intellectual Development of Europe* গ্রন্থের একাংশের নামই দেন 'Age of Reason,' আর Will Durant তাঁর বিরাট বহু-খণ্ডে-প্রকাশিত বিশ্ব-ইতিহাসের একটা খণ্ডেরই নাম রাখেন 'Age of Reason'। রামমোহন রায় ভারতে এই Age of Reason বা বুদ্ধি-মুক্তির আন্দোলনের জনক।

এর পটভূমি ছিল পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রেরণা ; ব্রিটেনের সমকালীন মনীষীদের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে রামমোহন উদ্দীপনা পেয়েছিলেন—তাঁরা হচ্ছেন Bentham, Hume, Ricardo, James Mill, John Stuart Mill প্রভৃতি। এঁদের প্রভাব ভারতীয়দের চিন্তাকে কী পরিমাণ প্রভাবান্বিত করেছিল তার আলোচনা করেছেন Eric Stokes তাঁর *The English Utilitarians and India* (Oxford) গ্রন্থে। প্রসঙ্গক্রমে এই আলোচনায় আমাদের ফিরে আসতে হবে।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের মধ্যে ব্রিটেনে যে শিল্পবিপ্লব এসেছিল (Industrial Revolution) তার অন্তরালে আছে বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের চর্চা (Science and Technology)। মিতশ্রমিক ও বহুবিধ যুগান্তকারী যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে গত কয়েক দশকের মধ্যে। কিন্তু যন্ত্র নির্মাণ করা এক জিনিস, আর যন্ত্রসমূহকে উৎপাদনকর্মে প্রয়োগ করা অন্য জিনিস ; কারণ শিল্পজাত সামগ্রী উৎপাদন করতে গেলে সাহসী *entrepreneur* ও মূলধন-দেনেওয়ালা capitalist-এর প্রয়োজন। সেই মূলধন আসতে আরম্ভ করেছিল পলাশির যুদ্ধের (১৭৫৭) পর থেকে— লক্ষ লক্ষ টাকা, নানা ভাবে। সেই টাকার ব্যবহার হল শিল্পের উন্নতিতে। বহু লোকের স্বার্থ জড়িত হয়ে গেল নানাবিধ শিল্পের অংশীদার রূপে।

কিন্তু শিল্পজাত সামগ্রী উৎপাদন করলেই তো ধনবৃদ্ধি হয় না ; শিল্পজাত মাল বিদেশে বিক্রি বা বিনিময় করে স্বর্ণ অথবা কাঁচামাল আমদানি করতে পারলেই মুদ্রা বা ধনাগম হয়। কিন্তু শিল্পপতিদের সে পথ বহু বাধায়

সংকীর্ণ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজ-সনন্দের বলে পূর্ব-এসিয়ায় ও ভারতে একচেটিয়া ব্যাবসার অধিকারী, সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি বা ব্যক্তির প্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। সেই পরিস্থিতির অবসান হল ১৮১৩ অব্দে নূতন সনন্দ গ্রহণের সময়ে। একচেটিয়াত্বর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ জমে ছিল।

৮

রাজনৈতিক কারণ ছাড়া তৎকালীন অর্থনৈতিক মতবাদ জাগতিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে এই আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে একদল মনীষী সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা পৃথিবীর ধনদৌলতের তথ্য আলোচনা করতে করতে একটা নূতন তত্ত্বে উপনীত হন। এতদিন পণ্ডিতরা মনে করে আসছিলেন, 'ধন' বলতে বোঝায় সোনা ও দামি ধাতু; যে দেশ যত সোনা নিজ দেশে সংগ্রহ করে রাখতে পারবে সেই সার্থক ধনী রাষ্ট্র। অ্যাডাম্ স্মিথ বোঝালেন (১৭৭৬) money বা bullion ও wealth এক জিনিস নয়। মুষ্টিমেয়ের হাতে বা রাজকোষে স্বর্ণ সঞ্চিত হলেই দেশ সমৃদ্ধ হয় না। দেহমধ্যে একস্থানে রক্তাধিক্য বা স্ফীতি অস্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। সর্বদেহে রক্ত-চলাচল সহজ থাকার মতো সমাজে ধন সর্বব্যাপী হলেই দেশ বলশালী ও সমৃদ্ধ বলে স্বীকৃতি পায়। মোট কথা, শিল্পোন্নতি ও বাণিজ্যপ্রসার থেকে তথ্য নিয়ে নূতন তত্ত্বকথা বা শাস্ত্র লিখিত হল, সেই শাস্ত্রের নাম 'পোলিটিক্যাল ইকনমি', অর্থাৎ যে সঞ্চয়নীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। বহু-জনের স্বার্থ জড়িত বলে এই অর্থনীতিবাদের মধ্যে একশ্রেণীর বাস্তববাদী-ভাবুকের মনে নূতন নূতন চিন্তার উদয় হতে দেখা গেল।

ম্যালথাস, রিকার্ডো প্রভৃতি বড়ো বড়ো অর্থশাস্ত্রী এই যুগের মানুষ। অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডো এমন একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে তোলবার ইঙ্গিত দিলেন, যাতে করে মধ্যযুগীয় অর্থনীতিবাদ বরবাদ হল; আর তার স্থলে নূতন মূলধন-মালিকদের পথ হল সুগম। তখনো উৎপাদন-ব্যবস্থার বহু বাধা: সেই-সব হটিয়ে শিল্পকেন্দ্রে ও কারখানায় উৎপাদন-শক্তি বা production force-এর ব্যাপক বৃদ্ধি এবং উৎপন্ন

সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসার প্রভৃতি ছিল নূতন শিল্পপতিদের সমস্যা। 'অবাধ বাণিজ্য নীতি' মেনে নেবার দাবি উঠল ধনতান্ত্রিক শিল্পবাণিজ্যপতিদের পক্ষ থেকে। রামমোহন রায় ভারতে য়ুরোপীয় শিল্পপতিদের উপনিবেশের পক্ষে ছিলেন এই কারণে। বাংলাদেশের মধ্যযুগীয় শিল্প ও কৃষিনীতি কখনোই বাঙালির অর্থনীতিকে পুষ্ট করতে পারবে না, এ কথা তিনি ভালো করেই বুঝেছিলেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রথায় নীল, ইক্ষু উৎপাদন ও তাদের সম্পৃক্ত শিল্পের উন্নতির জন্য য়ুরোপীয়দের আগমন তিনি সমর্থন করেন। কৃষিবিদ্ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Handbook of Indian Agriculture* -এ এই মত সমর্থন করে লিখেছিলেন—"European planters have been the means of introducing important innovations. In the most out of the way places of India we find European planters carrying on agricultural experiments and improvements, imperceptibly and noiselessly." —Quoted by U. N. Ball in his *Rammohan Roy*, p. 223

রামমোহন বলেছিলেন, "If Europeans of character and capital were allowed to settle in the country ... it would greatly improve the resources of the country, and also the condition of the native inhabitants, by showing them superior methods of cultivation, and the proper mode of treating their labourers and dependents."[১] —*English Works*, p. 284

য়ুরোপীয় চিন্তানায়কদের ভাবনার সঙ্গে রামমোহনের অন্তরের কী গভীর যোগ স্থাপিত হয়েছিল, এই উক্তিটি তারই পরিপোষক। বেন্থামের বহুজনহিতের আদর্শবাদ রামমোহনকে আকৃষ্ট করেছিল।

পথ চলতে চলতে অসাবধানী উচ্ছৃঙ্খল ধনী-সন্তানের দ্বারা অসাবধানে পরিত্যক্ত স্বর্ণথলি কুড়িয়ে পেলে হতভাগ্য পথিকের কপাল যায় ফিরে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাংলাদেশের 'রাজত্ব' কুড়িয়ে পাওয়া স্বর্ণথলি। কিন্তু যারা এই রাজ্য পেল তারা ব্যবসায়ী— কাপড় চিনি সোরা কেনার দালাল ও কেরানি— তাদের হাতে এসে গেল রাজ্যশাসনের ভার।

১ তুলনীয়: চা, কফি, কুলু উপত্যকার ফলের চাষ, প্রভৃতি য়ুরোপীয়দের কর্ম-প্রচেষ্টারই ফলে সম্ভব হয়েছিল।

তার ফল কী হয়েছিল তা ভারত-ইতিহাসের সাধারণ পাঠকের কাছে অবিদিত নেই। বোল্‌ট্‌স্‌, ডাউ প্রভৃতির কথা পূর্বেই বলেছি। রামমোহন্‌ ১৮৩১ সালে বিলাতে পার্লামেন্টে Select Committee-র প্রশ্নমালার যে উত্তর দেন সেই পুস্তিকার ভূমিকায় লিখেছেন: "The Government of England... received frequent intimations of the questionable character of the means by which their acquisitions had been obtained and conquests achieved, and of the abuse of power committed by the Company's servants, who were sent out to India from time to time to rule the territory thus acquired..." —*English Works*, pp. 234-35

ব্রিটিশ সরকার কোম্পানির কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছিলেন ১৭৭৩ অব্দ থেকে; তখনই স্থির হয় যে প্রত্যেক বিশ বছর অন্তর কোম্পানির কাজকর্ম তদন্ত করে আবার সনন্দ দেওয়া হতে পারবে। রামমোহনের বিশ বৎসর বয়সে, ১৭৯৩ অব্দে, যখন সনন্দ পুনঃপ্রদত্ত হয় তখন তিনি দেশের ও দশের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হন নি। ১৮১৩ সালেও সনন্দ সম্বন্ধে তাঁর কোনো চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় না।

৯

ইতিহাসের পাতায় মহাকাল কখন কী যে আঁচড় কাটেন সব সময় বোঝা যায় না। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ইংরেজ আমেরিকা হারাল, ভারত পেল। আমেরিকার তেরোটা কলোনি সংঘবদ্ধ হয়ে যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ইংরেজের শাসনশৃঙ্খল-মুক্ত হল। ভারতের বিশ কোটি মানুষ বিচ্ছিন্ন বলে মুষ্টিমেয় ইংরেজের পদানত হয়ে পড়ল। বিশাল অতলান্তিক মহাসমুদ্রের দূরত্ব আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের সহায় হয়েছিল স্বাধীনতালাভে, কিন্তু ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে বিপুল দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও —The immense distance between India and England, impeding intercourse between the natives of the two countries— ভারতের স্বাধীনতা রক্ষিত হয় নি।

ব্রিটেনের এক কূল ভাঙল আমেরিকায়— অপর দিকে বিরাট কূল

গড়ে উঠল ভারতে। অপ্রাসঙ্গিক হবে না যদি এই অধীনতা-বরণের কারণ রামমোহনের উক্তি থেকে উদ্ধৃত করি :

"... conquests,... commencing about the middle of the 18th century have extended over the greater part of India, conquests principally owing to the dissensions and pusillanimous conduct of the native princes and chiefs, as well as to the ignorance existing in the East, of the modern improvements in the art of war, combined with the powerful assistance afforded to the Company by the naval and military forces of the crown of England."[১]

ব্রিটিশ নৌবাহিনী ও সৈন্যদল যুদ্ধ-অভিযানে সহায়তা করেছিল বলেই একটা ব্যবসায়ী কোম্পানির পক্ষে ভারত জয় করা সম্ভবপর হয়েছিল। ব্রিটিশ দ্বীপের মধ্যে ধনিকে-বণিকে শাসকে-শোষকে যতই মতভেদ থাক্, ভারত- শাসন ও শোষণ সম্বন্ধে সবার মধ্যে ঐক্য ছিল। কিন্তু আমেরিকার বিদ্রোহের মধ্যে বিপ্লবের বাণী ছিল; বিদ্রোহের একটা philosophy রচিত হয়েছিল। সেই দার্শনিক মতবাদের গুরু টমাস পেইন; মানুষের জন্মগত অধিকার সম্বন্ধে এবং মানুষের বুদ্ধিমুক্তির জন্য আচার থেকে বিচার (reason) বিশ্লেষণ করার বাণী শোনালেন তিনি। তাঁর বাণী-প্রচারের প্রত্যক্ষ ফল দেখা দিল ইংলিশ চ্যানেলের অপর পারে ফ্রান্সে ফরাসী-বিপ্লব রূপে। কিন্তু ফ্রান্সে বিপ্লবের পটভূমি রচিত হচ্ছিল বহুকাল থেকে। ভলটেয়ার ধর্মীয় (বা চার্চীয়) কুসংস্কার থেকে মুক্তির মন্ত্র শুনিয়ে ফরাসীদের মন জাগিয়ে দিয়েছিলেন। দা আলেমবাই, দিদেরো, প্রমুখ জ্ঞানীর দল মানুষের মনের মুক্তি আনলেন বিশ্বকোষ গ্রন্থে বিজ্ঞানী তথ্য সরবরাহ্ করে আর রুশো যোগান দিয়েছিলেন উচ্ছ্বাস ও ভাবুকতার আদর্শবাদ। টমাস পেইনের কথাও অবিস্মরণীয়। মানুষের মন এই বিচিত্র অভিঘাতে জাগ্রত হয়ে old regime বা পুরাতন জীর্ণ যুগের অবসান ঘটায়। একদিন ভারতেও তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল। সে কথা আসবে পরে।

রাজনীতিবিদ্‌রা জানতেন উচ্ছ্বাসের পরিণাম কী। যে এডমণ্ড বার্ক

---

১ Preliminary Remarks, Judicial and Revenue Systems of India ... London, 1832; see *English Works*, p. 234.

ভারতে ব্রিটিশ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, যিনি আমেরিকার বিদ্রোহের সময় পার্লামেন্টকে হুঁশিয়ার করেন, তিনি ফরাসী-বিপ্লবের পরিণাম কী হবে তার ভবিষ্যদ্‌বাণী করে ইংরেজকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, বিপ্লব ও অরাজকতার পরিণাম যথেচ্ছাচারী শাসকের অভ্যুদয়। ফরাসী-বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নেপোলিয়নের স্বৈরাচারী একনায়কত্ব। ফ্রান্সের বিপ্লববাণী সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ধ্বনি পৌঁছল ইংরেজ সাহিত্যিক দার্শনিকদের কানে।

১৭৮৯ থেকে ১৮১৫ এই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর ইংরেজের বিপদ-কাল— ফ্রান্সের সঙ্গে তার বিবাদপর্ব। ঠিক সেই সময়ে ভারতজয়ের পালা প্রায় শেষ হয়। ১৭৯৮ থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে ওয়েলেস্‌লি ও লর্ড হেস্টিংস ভারত-সাম্রাজ্য পত্তন করে ফেলেছেন— নিজাম, মহীশূর, মারাঠা, সবাই বশ মেনেছে। বিশ বছর আগে বাংলার দেওয়ানিটুকু ছাড়া ইংরেজের রাজ্য ছিল না বললেই চলে। ১৮১৮ সালে আমরা দেখতে পাচ্ছি, য়ুরোপের আন্তর্জাতিক দরবারে ইংরেজের আসন সুপ্রতিষ্ঠ আর ভারতে তার সাম্রাজ্য সুদৃঢ় হয়েছে।

কিন্তু ব্রিটেনের এত সাফল্য ও এত ঐশ্বর্যের মধ্যেও তার নিজের মানুষের সুখ নেই। কারণ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও ধন সঞ্চিত হচ্ছিল মুষ্টিমেয়ের হাতে। ব্রিটেনের Industrial Revolution -এ লাভবান হয়েছিল শিল্পপতি ও বণিকরা। রাষ্ট্রের আইনকানুন ধনী ও সম্ভ্রান্তের অনুকূলে রচিত হত, পার্লামেন্টে তখন সাধারণ জনতার প্রতিনিধি যায় নি। দরিদ্র সর্ববিষয়ে বঞ্চিত। এই জনতার মঙ্গলচিন্তা করছেন মুষ্টিমেয় দার্শনিক ভাবুকের দল, যাদের কথা আভাসে আলোচিত হয়েছে।

১০

রামমোহনের জন্মকালের পনেরো বছর আগে পলাশির যুদ্ধে (জুন ১৭৫৭) বাংলার নবাবদের স্বৈরাচারের অবসান হয়েছিল। তার পর কয়েক বছরের মধ্যে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' ঘটে যায়। মোগল-শাসনের অন্তে অপ্রত্যাশিতভাবে বাংলাদেশে ইংরেজের দেওয়ানি পদ -প্রাপ্তির ঘটনাকে রাষ্ট্রবিপ্লবেরই শামিল

ধরা যেতে পারে। রাজ্যশাসনে অনভিজ্ঞ একদল অর্থলোলুপ সাহসিক রাজস্ব-বিষয়ে নূতন নূতন ব্যবস্থা করছেন—উদ্দেশ্য কামধেনু-দোহন। নয়া ব্যবস্থায় নিলামের ডাকে যে সর্বোচ্চ রাজস্ব দেবার অঙ্গীকার করে তাকেই জমিদারির ইজারা দেওয়া হয়। নিলামে-কেনা জমিদারি, তাকে দোহন করে রক্তশূন্য করাই ছিল নূতন জমিদারদের উদ্দেশ্য। জমিদাররা বর্ণহিন্দুই প্রধানত, আর রায়তরা বেশির ভাগ 'শূদ্র' অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর লোক, যারা 'হিন্দুত্ব' ত্যাগ করে নি; কিন্তু হিন্দুত্ব ত্যাগ করে যারা ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল সেই মুসলমান রায়তের সংখ্যাও নগণ্য ছিল না। জমিদারদের এই শোষণ-কার্য বিনা বাধায় প্রায় বিশ বছর চলেছিল। এই সময়ে রামমোহনের পিতা 'জমিদারি' সংগ্রহ করে বিত্তবান হন। তার পর কর্নওয়ালিসী চিরস্থায়ী ভূমি-বন্দোবস্তের আইন এল ১৭৯৩ অব্দে, তখন রামমোহনের বয়স কুড়ি-একুশ বৎসর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন নিখুঁত ছিল না; অনেক জটিলতা দেখা দিল। ফলে অন্তহীন মামলা মোকদ্দমা শুরু হল ইংরেজের নূতন-স্থাপিত আদালতে; সূর্যাস্ত আইনের কড়াকড়ি আর 'অষ্টমের' চাপে কয় বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকাংশ ভূমি এক মালিকের হাত থেকে নিলামের পথ ধরে অন্য মালিকের হাতে গিয়ে পড়েছিল। বুনিয়াদি জমিদার-বংশ উৎসন্ন হয়ে গেল, তার স্থানে এল হঠাৎ-ধনীর দল— জমিদারি কিনে আভিজাত্য অর্জন করবার লালসা তাঁদের প্রবল। তাঁরা নগরবাসী, জমিদারি ইজারা দেন পত্তনিদারের কাছে; সে ইজারা দেয় দর-পত্তনিদারের কাছে; সে ইজারা দেয় সে-পত্তনিদারের কাছে— থাকে-থাকে মধ্যযুগীয় সামন্ত-চক্রের মতো শাসন ও শোষণ-যন্ত্র গড়ে উঠল বাংলা প্রেসিডেন্সিতে। বরিশাল জেলায় কোনো কোনো পরগনায় বিশজন মধ্যস্বত্বান ছিলেন— অবশ্য অনেকে একাধিক স্বত্বের মালিক। মোট কথা, বহুপ্রকারের মধ্যস্বত্বান মালিকের সমস্ত চাপটা গিয়ে পড়ে চাষী-রায়তদের উপর—গাঁয়ের জোতদার থেকে শহরের জমিদার পর্যন্ত সবার মুখের অন্ন সে যোগায়। এই অনির্দিষ্ট আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে; রাজস্ব-অনাদায়ের জন্য কোম্পানির জেলেও আটকা থাকতে হয়।

ভূমি-বন্দোবস্তের সঙ্গে রাজস্ব-সংগ্রহের অচ্ছেদ্য যোগ। নবাবী আমলের মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা অচল বোধে মুর্শিদাবাদের নবাবের ফৌজদারী শাসনের অধিকার অপহরণ করা হয়েছিল। তার পর বিচারের ভার সদর-নিজামত আদালতের সপারিষদ লাট-সাহেবের উপর বর্তায়। অতঃপর লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯০ অব্দে মুর্শিদাবাদের সঙ্গে শাসন-সংক্রান্ত সকল সম্পর্কের অবসান করে কলকাতাকেই কেন্দ্র করলেন। পূর্বের শাসনসংস্থা ও খাজনা আদায়ের ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হল কয়েক বছরের মধ্যে। ২৩টি জেলায় ২৩জন ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত হলেন, তাঁরা খাস বিলেতের লোক। কর্নওয়ালিস দেশীয় কর্মচারীদের চরিত্র সম্বন্ধে যা শুনলেন ও যা দেখলেন তাতে তাদের উপর তাঁর খুব ভরসা হল না; বুঝতে পারলেন, রাজস্ব আদায়ের ভার স্থায়ীভাবে তাদের হাতে রাখলে অনর্থ ঘটবে। ১৭৯০ অব্দে রামমোহনের বয়স ১৭।১৮ বৎসর—কোথায় আছেন, কী করছেন তার কোনো ইতিহাস কারো জানা নেই।

১১

ওয়ারেন হেস্টিংস ভারত-প্রসঙ্গে বলেছিলেন: "people over whom we exercise a dominion founded on the *right of conquest*"[১], অর্থাৎ দেশ 'জয়' করে শাসন করার অধিকার ইংরেজ অর্জন করেছে। ইংরেজ কোম্পানি মুঘল-বাদশার 'দেওয়ান' মাত্র বলে তার শাসন করবার অধিকার সম্বন্ধে সূক্ষ্ম আইনসংগত তর্ক উঠতে পারে, কিন্তু কার্যত ইংরেজ মুর্শিদা-বাদের উপাধি-সর্বস্ব নবাব বা দিল্লীতে আসীন মুঘল-বাদশাদের থোড়াই গ্রাহ্য করত। Legalistic বা ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচারে ইংরেজ মুঘল-বাদশার দেওয়ান মাত্র। ("The only legal title of the East India Company was to act as the Dewan or agent of the Moghul Emperor in revenue matters")। দিল্লীর শূন্যগর্ভ উপাধি-সর্বস্ব সাম্রাজ্যের আসল মালিক মুঘল-বাদশাহ। এই ধরণের ঐতিহাসিকতার দোহাই

১ সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৫২।

দিয়ে স্বৈরাচারের প্রতীক সেই-সব মধ্যযুগীয় নবাব-বাদশাদের ভারতেশ্বর বলে স্মৃতিরক্ষার অপচেষ্টা দেখা দিয়েছে এক শ্রেণীর সংস্কৃতি-maniacদের মধ্যে। বর্মায় বাহাদুর শাহের কবরে গিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সেলাম দিয়ে এলেন; টিপু সুলতানের বংশধরদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নাকি করা হয়েছিল।

ইংরেজের সার্বভৌমত্বের বুনিয়াদ গড়লেন লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩), পাকা ইমারত তুললেন ওয়েলেসলি। কর্নওয়ালিস স্বয়ং অভিজাত-বংশীয়, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পিট-এর বন্ধু ও কোম্পানির ডিরেক্টরদের বিশ্বাসভাজন। তিনি ব্রিটিশ জমিদারি প্রথার আদর্শে বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে জনতা ও সরকারের মাঝে একটা শক্তিশালী দ্বন্দ্ব-প্রতিরোধক (buffer) সংস্থা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এরা রাজভক্ত হবে এবং সরকারী খাজাঞ্চি-খানায় নিয়মিত রাজস্ব পাঠাবে— গভর্মেণ্টকে টাকা আদায় নিয়ে জনতার সঙ্গে ঝামেলা করতে হবে না, টাকা আদায়ের জন্য যা-কিছু উপদ্রব-অত্যাচার দেশীয়রাই করবেন। কর্নওয়ালিসের রোপণ-করা চারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত— দেড় শো বছর পরে ওপড়াতে গিয়ে দেখা গেল, তার জটিল শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত— সমস্ত বাংলাদেশের নাড়িতে নাড়িতে তা জড়িয়ে গেছে। তাকে উচ্ছেদ করতে গিয়ে দেখা গেল, সমস্ত সমাজ-দেহ ক্যান্সারের বিষে জর্জরিত। কর্নওয়ালিস ভারতীয় রাজকর্মচারীদের সততা ও কর্মক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন না বলে, প্রায় সব চাকুরিতে বসালেন ব্রিটিশ যুবকদের। কর্নওয়ালিস বাংলাদেশকে সর্বতোভাবে ইংরেজের তাঁবে আনবার ব্যবস্থা পত্তন করেন আর ওয়েলেসলির শাসনকালে তা সম্পূর্ণ হয়; ভারতের প্রায় সবটাই ব্রিটিশ শাসনের অধীনে এসে যায়।

ওয়েলেসলির শাসনকালের দুটি ঘটনা স্মরণীয়— বাংলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত তারা; একটি হচ্ছে ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজ স্থাপন, অপরটি শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা। দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সঙ্গে ভারতীয় তথা বাংলার সমাজ-জীবন ও সাহিত্য একান্তভাবে জড়িত। রামমোহনের ধর্ম তথা কর্ম-জীবনের সমকালীন ঘটনা— কেরী সাহেবের বাংলা গদ্যসাহিত্য-সৃষ্টির সাধনা ও শ্রীরামপুরের পাদরিদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচার-চেষ্টা। এই দুটি বিষয় নিয়ে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা করতে হবে— যথাস্থানে এবং যথাসময়ে তারা আসবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

পরিবেশ মানুষকে যেমন গড়ে, মানুষও তেমনি পরিবেশকে নূতন রূপ দিতে পারে— এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা। মানুষকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার ইতিহাস রচিত হতে পারে না, আর পরিবেশকে বাদ দিলে মানুষকেও বোঝা যায় না। তাই স্থান-কাল-পাত্র এই তিনের সমন্বয়ে সৃষ্টিকার্য গড়ে ওঠে— এই অতি সুপরিচিত তত্ত্বে আমরা বিশ্বাসী।

যুগটার কথা পূর্বে বলেছি, স্থানটার কথায় আসা যাক। রামমোহন যে শহরে এসে বাড়িঘর কিনে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে বসবাস শুরু করলেন এবং যেখানে পনেরো-বছর-কাল একাদিক্রমে বাস করেছিলেন, সেই কলকাতা শহরটা তখন ব্রিটিশ কোম্পানির এলাকা-ভুক্ত— ভারতের রাজধানী। এই নগরের পরম্পরাগত সংস্কৃতি তখনো স্পষ্ট হয় নি; মাত্র ১২৫ বছর আগে জব চার্নক ১৬৯০ অব্দে এখানকার এক গাছতলায় এসে সংসার পত্তন করেন। এ নগর ভুঁইফোঁড় বা upstart, কোনো ঐতিহ্য ছিল না এর পিছনে। এ দিল্লী নয়, যা মুঘল-যুগের অতীত স্মৃতি সম্বল করে শীর্ণ যমুনাতীরে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে; এ বিলাসে-মগ্ন নয়া শহর লখনৌ নয়— বাঈজি ও ওস্তাদদের নিয়ে নবাবজাদা ও ধনীরা মশগুল হয়ে আছেন যেখানে; এ কাশী নয়, গঙ্গাতীরে যেখানে যাগযজ্ঞের আড়ম্বর নিয়ে মুষ্টিমেয় অতি-শুচির দল অতীত ভারতকে দুর্বোধ্য এক ভাষার দুর্গে আটক রাখতে চান; এ মুর্শিদাবাদ নয়, সদ্য যার ধন-মান দুইই গিয়েছে ইংরেজ বেনিয়াদের হাতে। পুরাতন নগরগুলি তখন ক্ষয়িষ্ণু, তৎসত্ত্বেও অধিবাসীদের মধ্যে সংস্কৃতি ছিল, আভিজাত্য ছিল। নূতন নগর কলকাতায় সংস্কৃতির tradition গড়ে উঠতে বেশ সময় লেগেছিল। প্রাচীন গ্রাম্য সমাজ থেকে বন্ধনমুক্ত হয়ে এখানে যারা এসে বাস করছে তাদের আদর্শ স্বভাব-ধূর্ত ব্রিটিশ বেনিয়াদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনাংশ। সেই কলকাতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'আলালের ঘরের দুলাল' 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' 'নববাবুবিলাস' 'কলিকাতা কমলালয়' প্রভৃতি গ্রন্থে। আর ইংরেজ সমাজের চিত্র ফুটে

উঠেছে Busteed-এর বই *Echoes from Old Calcutta* -তে।

কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যখন সমতা থাকে তখনই সমাজ-জীবনকে সার্থক বলা যেতে পারে। মধ্যযুগের গ্রামীণ সভ্যতার মধ্যে অনেক ত্রুটি ছিল সত্য, কিন্তু পরস্পরের জাতীয় বৃত্তি অপহরণ ছিল পাপ। লোকে জানত স্বধর্মে নিধন ভালো, পরধর্ম ভয়াবহ। তাই তাঁতি তাঁতের কাজ করত, কামার লোহা পেটাত, সুবর্ণবণিক গন্ধবনিক শঙ্খবণিক সবাই নিজ নিজ বৃত্তি অনুসরণ করত— অপরের বৃত্তি নিলে 'জাত' যেত। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে য়ুরোপীয়দের আগমনের পর থেকেই শুরু হয় সমাজের আর্থিক বিপর্যয়। ঊনবিংশ শতকের গোড়াতে ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের প্রতিঘাতে বাংলার বয়নশিল্প লবণশিল্প লৌহশিল্প প্রভৃতি দারুণভাবে আঘাত পেল। যুগপৎ নীলের চাষ শুরু হতেই দেশের মধ্যে দু রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল— ভালো নীলকরের আশপাশের লোকেদের আর্থিক সাচ্ছল্য স্পষ্টতর হয়ে উঠল; কিন্তু অত্যাচারী দুর্বৃত্ত জমিদারদের ন্যায় নীলকরের অভাব ছিল না, সেখানে শোষণ পেষণ পুরোদস্তুর চলত। আমরা নীল চাষের এই নঙাত্মক দিকটার সঙ্গে সুপরিচিত। কিন্তু industrialization-এর অপর দিকটার প্রতি মনোযোগ দিই নি 'নীলদর্পণের' একপেশে কড়া বাস্তব রূপটা পড়ে।

অষ্টাদশ শতকে ভারতের শিল্পজাত সুতি ও রেশমের বস্ত্র, সোরা, চিনি ও শতবিধ সামগ্রী রপ্তানি করে বিলাতে কোম্পানির অংশীদাররা ও এদেশের ব্যবসায়ীরা প্রভূত ধনার্জন করত। ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত বাণিজ্যের balance ভারতেরই অনুকূল ছিল। তার পর দিনবদলের হাওয়ায় ইংলন্ডে এল শিল্পবিপ্লব; বিচিত্র কলকব্জা ও মিতশ্রমিক যন্ত্র আবিষ্কার ও তাদের সাহায্যে ভারত থেকে প্রেরিত জিনিসের অনুকরণে ভারতীয়দের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে ভারতেই সে-সব রপ্তানি শুরু করে দিল। সেইদিনই এদেশের গৃহশিল্পের সর্বনাশ সাধিত হল।

১৮১৩ সালের আগে পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচ্ছত্র বাণিজ্যাধিকার ছিল ভারতে ও প্রাচ্যে। নূতন সনন্দ দেবার সময়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কোম্পানির একচেটিয়াত্ব নাকচ করে দিতে বাধ্য হলেন—

আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির অভিঘাতে। য়ুরোপে তখন নেপোলিয়ান বোনাপার্টির দৌরাত্ম্যপর্ব— সমস্ত য়ুরোপ তিনি তছনছ করছেন। তাঁর প্রধান শত্রু nation of shopkeepers ইংরেজ। তাদের জব্দ করার জন্যে বার্লিনে বসে হুকুম দিলেন যে য়ুরোপের বন্দরে কোনো ইংরেজের জাহাজ ভিড়তে পারবে না। তিনি জানতেন, ইংরেজের ঐশ্বর্য তার বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যে; তাই য়ুরোপের বন্দরে আসা নিষেধ করে ভাবলেন, ইংরেজ এবার জব্দ হবে। য়ুরোপের রাজনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সে আলোচনায় আমাদের প্রবেশের প্রয়োজন নেই। ভারত ও পূর্ব-এসিয়ায় যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তার সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ।

এতকাল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ছিল প্রাচ্যে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার। ১৬০০ সালে এই কোম্পানির অংশীদার ছিল ২১৭ জন মাত্র। তার পর আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে কয়েক হাজার হয়। কিন্তু এদের বাইরে যারা শিল্পে নূতন পথ ধরেছে, তাদের তো বিক্রির জন্যে বাজার চাই— য়ুরোপের বন্দর বন্ধ করেছেন নেপোলিয়ান— ভারত ও প্রাচ্যের দরজা বন্ধ রয়েছে কোম্পানির জন্যে। অবাধ বাণিজ্য চায় শিল্পপতিরা; তারা নূতন নূতন যন্ত্র চালিয়ে কারখানায় প্রচুর মাল উৎপন্ন করছে— সে-সবের কাটতি কোথায় হবে। এই আন্দোলনের ফলে ১৮১৩ সালের সনন্দের অনেক শর্ত পালটাতে হল। সেদিন হতে ব্রিটেন থেকে পঙ্গপালের মতো শুরু হল নানা শ্রেণীর লোকের আনাগোনা— তা সে ধর্মের ব্যবসায়ী হোক, অথবা কাপড়চোপড় মনোহারি সামগ্রী, লবণের ব্যবসায়ীই হোক— সবাই কলকাতায় ভিড় জমাতে লাগল। ১৮১৫ সালে ভারত থেকে য়ুরোপে রপ্তানি বস্ত্রের মূল্য ছিল ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মতো। এই রপ্তানির মূল্য কমতে কমতে ১৮৩২ সালে— রামমোহন যখন বিলেতে পার্লামেন্টের সমক্ষে ভারত সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছেন সেই সময়ে— রপ্তানি বস্ত্রের মূল্য দাঁড়িয়েছিল ১০ লক্ষ টাকায়। এবং তার কয়েক বছর পরে তা শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। ১৮০০ সালে বিলেত থেকে এদেশে এক গজও কাপড় আসত না; ১৮১৪ সালে প্রথম বস্ত্র চালান হয়ে এল ম্যানচেস্টার থেকে। পূর্ব ও পশ্চিমের চাকা গেল ঘুরে; ভারতে ছিল কৃষি ও শিল্পে সাম্য, তা বিপর্যস্ত হয়ে গেল পশ্চিমের aggressive

policy-র জন্যে ; পশ্চিম জিতল বিজ্ঞান ও প্রয়োগশিল্পের উৎকর্ষের জন্যে, আর আমরা হারলাম বিজ্ঞানের পথ মুক্ত করে দিই নি বলে।

এই পূর্ব ও পশ্চিমে স্বার্থের অভিঘাতে এদেশে জাগল মধ্যবিত্ত নামে একটা সমাজ। অবশ্য এর সূত্রপাত হয়েছিল মুর্শিদকুলি খাঁর সময় থেকে, তিনি হিন্দুদের চাকরিতে বহাল করেন। তখন থেকে বাংলাদেশে চাকুরিয়া শ্রেণীর জন্ম হয়। তার পর ইংরেজ কোম্পানির সময় এটা স্পষ্টতর হল। কোম্পানির নানা কাজকর্মে সহায়তা করার জন্যে বহু দেশীয় লোকের প্রয়োজন—যারা কোম্পানির স্বার্থে প্রাণ দিয়ে খাটবে চাকরির লোভে। এতকাল দেশে ছিল হিন্দু আর মুসলমান—দুটো ভাগ। হিন্দুর মধ্যে ছিল বৃত্তি বা পেশা নিয়ে চুলচেরা এলাকার গণ্ডিকাটা ভাগাভাগি। কোম্পানির সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুটিরশিল্পগুলি ধ্বংস হওয়ায় বৃত্তিচ্যুত হিন্দু-মুসলমান সবাই ঝুঁকল মাটির দিকে চাষের জন্য; জমির উপর চাপ পড়ায় লাভবান হলেন হিন্দু জমিদাররা। বৃত্তিচ্যুত শ্রমিকদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান ও সাহসিক তারা গ্রাম ত্যাগ করল। তাঁতি বেনে কামার চুনারি গ্রামের বৃত্তি ক্ষীণ হতে দেখে এল কলকাতায়। সেখানে নূতন বৃত্তি বেছে নিল, অনেকে কোম্পানির কাজে ও বাণিজ্যে যোগ দিল। এইভাবে কলকাতায় আশপাশের নানা জাতের তদ্‌বিরি-মানুষ তগদির-গুণে বড়ো হয়ে উঠল। কেউ বড়ো হল কোম্পানির চাকরি করে, কেউ ব্যাবসার দালাল হয়ে ঠিকেদারি করে, কেউ বা দোকান করে। উনবিংশ শতকের গোড়ায় গ্রাম থেকে বৃত্তিচ্যুত নানা জাতের মানুষ এসে মধ্যবিত্ত বলে নূতন একটা সমাজ গড়ে তুলল কলকাতায়। এই মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে রামমোহনের জন্ম হয়। কারণ রামমোহনের চার পুরুষ নবাবদের চাকরি করেই ধনমানের অধিকারী হয়েছিলেন। মধ্যবিত্তরাই বাংলাদেশকে নূতন করে গড়ে আসছে বরাবর। নিম্নবিত্তদের কাল আগত।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি বাংলা সুবার দেওয়ানি লাভ করল, শাসন-মসনদে মুর্শিদাবাদের নবাব আসীন। কোম্পানি শাসনের পুরা-ভূমিকায় এখনো নেমে যায় নি, তবে মুর্শিদাবাদের নবাব ও দিল্লীর মুঘল

বাদশাহরা সবাই যবনিকার অন্তরালে চলে যাচ্ছেন। কর্নওয়ালিসের সময় মুসলমানী রাজ্যশাসন-পদ্ধতি বজায় রাখবার সংকোচ কমল, ওয়েলেসলির সময় বৃটিশ সাম্রাজ্য বাস্তব হয়ে উঠল। রামমোহনের জীবনকালে বাংলাদেশ তথা ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক যে বিবর্তন হয় তা যেমন বস্তুগত তেমনি ভাবগত। এই সত্তর বছরের মধ্যে বাঙালি মধ্যযুগীয়তা থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক যুগের সিংহদ্বারে হাজির হয়েছে। এই পর্বের সব থেকে বড়ো ঘটনা হচ্ছে কলকাতা মহানগরীর সৃষ্টি। ১৬৯০ অব্দে শহরের পত্তন হয় কয়েকটা গ্রাম ও পল্লী নিয়ে, ১৭৫৬ অব্দে সেখানে কোম্পানির কুঠি ও কেল্লা ছাড়া দুই কুড়িও পাকাবাড়ি ছিল না। তারও অনেক কিছু ধ্বংস হয় সিরাজের আক্রমণের ফলে। তার পর পলাশির যুদ্ধের পর ১৭৫৭ থেকে নূতন শহর গড়া শুরু হয় নবাবের কাছ থেকে প্রাপ্ত খেসারতের টাকা দিয়ে। আশি বৎসরের মধ্যে (১৮৩৫এ) সেই শহর হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ও বিচিত্র সংস্কৃতির কেন্দ্র। অথচ অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে কলকাতার কোনো সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে নি।

আমাদের এই আলোচনার একটা বিশেষ বিষয় হচ্ছে, বাংলা ভাষায় রামমোহনের দান সম্বন্ধে বিচার। কিন্তু সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বে, উনবিংশ শতকের পূর্বের যে পটভূমে বাংলা লেখ্যভাষায় রূপ পেয়েছিল তার রেখাঙ্কন করতে পারলে রামমোহন ও তাঁর সমসাময়িকদের দানের স্বরূপ প্রকট হবে এবং সে-সব রচনার সার্থক মূল্যায়ন হবে।

বিদেশী বিজয়ীরা চিরদিন নিজের ভাষা বিজিতের উপর চাপিয়ে দিয়ে আসছে। কিন্তু বিজয়ের আদিপর্বে নিজ ভাষার গরিমাটা কম থাকে। তখন বিজিতকে তোয়াজ করে তার বিত্ত ও চিত্ত হরণের জন্য তার ভাষাটা আয়ত্ত করে নেয়। বিদেশীকে আমার ভাষায় কথা বলতে শুনে আমরা এখন পর্যন্ত গদ্‌গদ হয়ে উঠি, ভাষা শিখে তারা যেন আমাদের কৃতার্থ করেছে এমন ভাবটাও প্রকাশ করে ফেলি। কিন্তু তার পর বিজয়পর্ব শেষ হলে নিজমূর্তি বেরিয়ে আসে; তখন বিজয়ীর ভাষা বিজিতকে শিখতেই হয়। সেই ভাষাতেই প্রভুজাতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। ইংরেজের

আপিসে কোনো লোক আশা করে না যে সাহেবের সঙ্গে সে তার নিজ মাতৃভাষায় কথা বলবে। কিন্তু এককালে সাহেবরা দেশীয় লোকদের ভাষা শিখে সেই ভাষাতেই কথা বলত।[১]

Verniacular শব্দটার মধ্যে এই ভাষা-সংকটের ইতিহাসটুকু প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ঐ শব্দের ধাতুগত অর্থ হচ্ছে, 'belonging to home-born slaves, domestic, native, indigenous, from *verna*, a home-born slave' (Webster), অর্থাৎ রোমান সাম্রাজ্যে গৃহপালিত দাসের সংখ্যা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, যে-ভাষা তারা ব্যবহার করত সেটাই কালে স্থানিক ভাষা রূপে পরিচিত হয়েছিল।

বাংলাদেশ ১২০০ অব্দ থেকে ১৭৬৫ অব্দ পর্যন্ত তুর্কি পাঠান মুঘল প্রভৃতি নানা জাতির অধীন ছিল। সবারই সরকারী দপ্তরের ভাষা ছিল ফার্সি। এদের কারো মাতৃভাষাই ফার্সি নয়, সবাইকে এই ভাষা শিখতে হয়— যেমন এককালে পশ্চিম-এসিয়ায় গ্রীক হয়ে উঠেছিল সাধারণের ভাষা।

ইংরেজি ভাষা যেমন আমাদের মাতৃভাষা নয়, অথচ তাই শিখে কাজ চালাতে হত (এবং এখনো হয়), ঠিক তেমনি মুসলমান-শাসন-কালে হিন্দু-মুসলমান সবাইকে রাজকার্য চালানোর জন্যে ফার্সি ভাষা আয়ত্ত করতেই হত। কালে উত্তর-ভারতে দেশীয় চলতি ভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে ফার্সি আরবি তুর্কি শব্দ মিশে গিয়ে একটা কথ্য ভাষার চল হয়, সেটা হল 'উর্দু', যাকে 'হিন্দুস্তানী' বলা হত ; সে নাম অচল হয়ে 'উর্দু' চলু হয়েছে। বাংলাদেশে সেরকম কোনো মিশ্র ভাষা চালু হয় নি। এখানে বাংলাসাহিত্য স্বকীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই এগিয়ে চলে আসছে— কি পশ্চিমবঙ্গে, কি পূর্ব-পাকিস্তানে বা পূর্ববঙ্গে। বাংলাদেশের মুসলমানরা বাংলাভাষাকে গোড়া থেকেই মাতৃভাষা বলে মেনে নিয়েছিল, কারণ, অখণ্ড বাংলার পনেরো-আনি মুসলমানই 'বাঙালি'। তাই তারা সেই মাতৃভাষার মাধ্যমেই কি ধর্মসাহিত্য, কি বিশুদ্ধ সাহিত্য লিখে আসছে আজ পর্যন্ত— বঙ্গচ্ছেদ হবার আগেও যেমন, হওয়ার পরেও তেমনি।

---

১ বাংলাদেশে যে-সব হিন্দি-ভাষী থাকেন তাঁদের সঙ্গে আমরা সাধারণত বাংলাভাষায় কথা বলি নে, বলি তাঁদের ভাষায়।

উত্তর-ভারতে হিন্দি আর উর্দু দুটি ভাষা দুটি পৃথক লিপিতে লেখা হয়ে পাশাপাশি চলে আসছে গঙ্গা-যমুনার ধারার মতো। স্পষ্টত স্বীকৃত না হলেও হিন্দি ভাষা ও নাগরী লিপি হিন্দুর, আর উর্দু ভাষা ও আরবি লিপি মুসলমানদের ভাবের বাহন রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে; যদিও অবশ্য বহু হিন্দু উর্দু ভাষার নাম-করা লেখক হয়েছেন এবং হিন্দিতেও দু-পাঁচজন মুসলমান লেখক যে নেই তা নয়। হিন্দির অতি-সংস্কৃততার কৃত্রিম সাজ খুলে দিলে এবং উর্দুর অতি-আরবি-ফার্সিতার প্রয়োগ-প্রচেষ্টা শিথিল করে দিলে দুই ভাষার ব্যবধান থাকে না— গঙ্গা-যমুনার মিল হয়ে একই ধারায় বয়ে যেতে পারত। তা হয় নি কেন, সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু বাংলাভাষায় ফার্সি-আরবি শব্দ superstructure রূপেই থেকে গেল, মিশ খেল না— উর্দু বাগ্‌বিধি গড়ে উঠল না, বাংলার basic রূপেও বদল আনতে পারল না।

মুসলমান-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মপ্রচারের জন্য মৌলানারা বাংলা শিখতে বাধ্য হয়েছিলেন, যেমন খ্রীষ্টান পাদরিদের শিখতে হয়েছিল। আজও দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ মত প্রচারের জন্য বিদেশীদের ভারতীয় নানা ভাষা শিখতে হচ্ছে। বাংলাদেশের মুসলমান মৌলানাদের প্রচেষ্টায় পড়ে যে বাংলা গড়ে উঠল তা ফার্সি আরবি শব্দে কণ্টকাকীর্ণ। এই বাংলা— যাকে বলা হয় 'মুসলমানী বাংলা'— তাতে বিরাট লোকসাহিত্য লিখিত হল, কিন্তু সে-সব রচনা 'সাহিত্য'পদবাচ্য হতে পারল না। এর একটা অংশ 'কিস্‌সা' বা গল্প বা রোমান্স-জাতীয় রচনা, আর বেশির ভাগই হচ্ছে ধর্মীয় গ্রন্থ। এ-সব লেখার প্রকাশশৈলীর উপর দৃষ্টি দেবার মতো শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাব ছিল লেখকদের। ফলে মুসলমান-সমাজের দরিদ্র, অল্পশিক্ষিত, 'ধর্ম'সর্বস্ব সংস্কারবদ্ধ লোকের হাতে সাহিত্যচর্চার ভারটা থেকে গিয়েছিল। সেই সাহিত্যের প্রচারক ছিলেন বটতলা, লোয়ার সার্কুলার রোডের প্রকাশকরা— কলকাতার কিতাব-মহলের অভিজাত পল্লীতে তাদের আসন কখনো হয় নি। সিলেটি 'নাগরী' লিপিতে ছাপা এক ধরণের মুসলমানী কিতাব ছিল, যার খবর শিক্ষিত হিন্দু বা মুসলমান বড়ো কেউ রাখতেন না। পূর্ব-পাকিস্তানে সদ্য তার আলোচনা শুরু হয়েছে। মোটকথা এককালে 'শিক্ষিত' সমাজের চোখের অন্তরালে যেমন বৈষ্ণব-

পদাবলী, পাঁচালি, কীর্তন প্রভৃতি সাধারণ জনতার চিত্ততোষিণী সাহিত্য লিখিত-পুনর্লিখিত হত, মুসলমানী লোকসাহিত্য তেমনি সাহিত্যিকদের খাস-দরবার থেকে দূরে নীচের মহলেই থেকে গিয়েছিল। এর কারণ, পূর্বেই বলেছি— বাংলার সঙ্গে ফার্সি-আরবি শব্দ ব্যবহারের বাহুল্যে basicএর সঙ্গে superstructureএর মিল হয় নি, সে বাগ্‌বিধি মাথাভারী হল বলে সে-ভাষা 'মুসলমানী বাংলা' থেকে গেল— বাংলা সাহিত্যের ভাষা হল না। প্রসঙ্গত বলি, শ্রীরামপুরী পাদরিদের বাইবেলি বাংলাও সাহিত্যে চলল না— সেটাও 'খ্রীষ্টানী বাংলা' বলে অভিহিত হল। কিন্তু 'পণ্ডিতী' বাংলা— তাই কি চলল? তাও চলল না। সাহিত্যিকরা আপনার পথ সৃষ্টি করে চলেছেন—তাদের ভাষাকে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টানী, কোনো আখ্যাই দেওয়া যায় না।

পশ্চিমবঙ্গে বৈষ্ণবাদি ধর্মসাহিত্য ও লোকসাহিত্যের প্রতি ভদ্র-সমাজের দৃষ্টি পড়েছে আধুনিক যুগে। প্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিত-সমাজে ও আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিতদের কাছে বৈষ্ণবসাহিত্য সমাদর-বঞ্চিত ছিল বহুকাল। সম্প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত মুসলমানদের এই অনাদৃত মুসলমানী লোক-সাহিত্যের প্রতিও মনোযোগ দেখা দিয়েছে। আশা করা যায় উভয়ত্র এই অথর্ববেদীয় আধুনিক ব্রাত্যরা তাঁদের যোগ্য সম্মান লাভ করবেন।

মুসলমানী পর্বে ফার্সি রাজভাষা ও দপ্তরের ভাষা হয়ে ছিল পুরো ছ শো বছর (১২০০-১৮৩৫)। এই ভাষাতে লোকের সকল কথা জানাতে হত রাজদরবারে। ফার্সি ভাষা ভারত-বিজয়ী তুর্কি পাঠান মুঘল কারো মাতৃভাষা ছিল না। মধ্যযুগে মধ্য-এসিয়ার প্রবলতম এই ফার্সি ভাষা শিয়া-সুন্নি মুসলমানদের সমভাবেই আয়ত্ত করতে হয়। তা ছাড়া আরবি ভাষাও তুর্কি-মুঘলদের ধর্মের জন্য শিখতে হয়। আরবি ভাষা ফার্সি ও তুর্কি থেকে যে কত দূরে তা আমরা আন্দাজ করতে পারি নে; আসলে আরবি অন্য জাতের ভাষা, সেমেটিক-গোত্রীয়, হিবরুর জ্ঞাতি। ভারতে তুর্কি-মুঘলরা নিয়ে এল ফার্সি ও আরবি ভাষা। ফলে ফার্সি ও আরবি শব্দকোষের দ্বারা বাংলাদেশের মৌখিক ও বৈষয়িক ভাষা প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। মধ্যযুগের যে-সব পত্র বা দলিল-দস্তাবেজ দেখতে পাই, তার বাক্যগুলি সংস্কৃত বাংলা ফার্সি আরবি তুর্কি ভাষাসমূহের মিশ্রিত এক অদ্ভুত ভাষা।

আমাদের দেশের রেজেস্টারি আপিস বা আদালত থেকে এখনো সে ভাষা সম্পূর্ণ নির্বাসিত হয় নি। "বাংলা দেশে যদি ইংরেজের আগমন না ঘটিত তাহা হইলে আজিও আমাদিগকে বাংলা ভাষা লিখিতে বসিয়া 'গরিব-নেয়াজ শেলামত' বলিয়া স্থরু করিয়া 'ফিদবি' বলিয়া শেষ করিতে হইত।"[১]

ফার্সি ভাষা যেদিন আদালত তথা রাজদরবার থেকে ছাঁটাই হল, সেদিন থেকে মধ্যযুগের অবসান সম্পূর্ণ হল। সেটা সরকারীভাবে ঘোষিত হয় ১৮৩৫ অব্দে। ফার্সি সেকালে ভদ্রদের, দরবারের ও সকলপ্রকার জ্ঞানের ভাষা ছিল বলেই রামমোহন ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর প্রথম কিতাব ফার্সিতেই লেখেন ১৮০৩ অব্দে; এবং সে রচনার বাগ্‌বিধি ও যুক্তিপ্রণালী ইস্‌লামী সাহিত্যের আদর্শে হয়েছিল। আর ফার্সি ভাষার পত্রিকা 'মীরাৎ-উল-আখবর' সম্পাদন করতেন এইজন্য যে সে-ভাষা ভারতের শিক্ষিতরা সবাই বুঝতেন।

আজকাল যাকে ভিয়েৎনাম বলে সে দেশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত ছিল ফরাসী-সাম্রাজ্য-ভুক্ত রাজ্য— ফরাসী-ইন্দোচীন। স্থানীয় অধিবাসীদের শিক্ষাদীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ফরাসীরা করে নি কোনোদিনই। প্যারিসের রাষ্ট্রসভায় ফরাসী কলোনিতে শিক্ষাপ্রসার সম্বন্ধে একদিন বিতর্ক উঠলে জনৈক সদস্য বলেছিলেন, "আমরা ইন্দোচীনের লোকদের শিক্ষিত করে সেই ভুল করি আর-কি, যে ভুল ইংরেজ করেছেন ভারতীয়দের শিক্ষিত করে।" কথাটা ভাববার মতো, কারণ nothing enfranchises like education— শিক্ষার মতো সর্বনেশে জিনিস আর নেই। সেটাই ভারতে এল উনবিংশ শতকের গোড়ায়। নেপোলিয়ান বলেছিলেন, "The Bourbons might have preserved themselves, if they had controlled writing materials. The advent of cannon killed feudal system ; ink will kill the modern social organisation." ভল্‌টেয়ার বলেছিলেন, "Books ruled the world, or at least those nations in it which have a written language ; the others do not count."[২]

---

১ সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ ৩২।

২ Quoted from W. Durant, *Outline of Philosophy*, p. 184.

সত্যই ইংরেজরা এদেশে শিক্ষাপ্রসারের কথা শুনলে আতঙ্কিত হয়ে উঠত। মার্শমান লিখছেন—

"The important question of education in India had hitherto been regarded by the public authorities on both sides of the water with feelings not of simple indifference, but of alarm and hostility. The subject was for the first time introduced to public notice by Mr. Wilberforce, in 1793, when the House of Commons passed resolution, that such measures ought to be adopted as might gradually tend to the advancement of the inhabitants of British India in useful knowledge, and to their moral and religious improvement. But the East India Directors and proprietors maintained that it was not the bounden duty of England to educate the people of India, but that it was the most 'absurd and suicidal measure which could be devised', and that it must end in our expulsion from the country. One proprietor, a man of great weight in the parliament of Leadenhall Street, maintained that America had been lost to England through the sanction which had been given to the establishment of seminaries and colleges there, and that we must in India avoid the rock on which we had split there. The clamours of the India House afforded Mr. Dundas an excuse for removing from the Bill the clause in which the educational and religious resolution was embodied, and the policy of excluding secular knowledge as well as religious truth from India was established by Parliament, during the currency of that charter, for twenty years."[১]

বাংলাদেশের তথা ভারতের মানসিক বিপ্লব শুরু হল মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের ও শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে। মানুষ এতকাল অন্ধের মতো অন্যের কথা শুনে চলে আসছিল, এখন সে দেখেশুনে চলতে শুরু করল, পাঁচজনের কথা বুঝতে শিখল পাঁচ রকমের বই পড়ে। মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের আবির্ভাব হল সেদিন, যেদিন শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র এল, আর পুস্তক-পুস্তিকা ছাপা আরম্ভ হল। সেদিন মানুষের মনে যে প্রচণ্ড বিপ্লবের

১ Marshman, *History of the Serampore Mission*, 1859, Vol. 2, pp. 80-81.

আগুন জেলে দেওয়া হয়েছিল তা আর নির্বাপিত হল না— আমরা সেই যুগে বাস করছি, সেই অমরশিখার আলোয় প্রতিদিন আমাদের মনের অন্ধকার ঘুচে যাচ্ছে।

ইংরেজের সাম্রাজ্য পত্তন হয় বাংলাদেশে কলকাতাকে কেন্দ্র করে। ইংরেজ এদেশ জয় করে বুঝতে পারল যে, বাংলাভাষা না শিখতে পারলে দেশের মানুষদের জানা যাবে না। ঠিক এই ভাবনা থেকেই বাংলাদেশের সুলতানরা বাংলাভাষার চর্চা, বাংলাসাহিত্যে গ্রন্থ রচনা, ইত্যাদিতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকে খ্রীষ্টান পাদরিদের কর্মপ্রচেষ্টা শুরু হয় নি। বাংলাভাষার প্রথম ব্যাকরণ ইংরেজি ভাষায় লিখিত ও উদাহরণ-মালা বাংলা লিপিতে মুদ্রিত হয় ১৭৭৮ অব্দে। তার লেখক হলেন ইংরেজ কোম্পানির চাকুরে ন্যাথনেল ব্রে. হ্যালহেড। হ্যালহেড প্রমুখ বাংলাভাষা-নবিশগণ সংস্কৃতকে বাংলাভাষার আদি-জননী বলে মনে করতেন, এবং ফার্সি আরবি ভাষার অনুপ্রবেশকে অস্বাভাবিক ভাবতেন। সাহেবরা সুবিধা পেলেই ফার্সি আরবি শব্দকে বাদ দিয়ে বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সংস্কৃত-ঘেঁষা করতে চাইতেন। মুসলমানদের কাছ থেকে ইংরেজ ভারত অধিকার করেছিল, তাই বোধ হয় মুসলমানদের প্রতি কোনোরূপ সদয়ভাব না দেখিয়ে নিরীহ হিন্দুদের উপরই আকর্ষণটা স্পষ্টতর করবার দিকে মনোযোগ দিয়েছিল; অথবা বুঝতে পেরেছিল, ফার্সি আরবি শব্দের বাহুল্য বাংলাভাষার প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায় না। কেরী প্রমুখ খ্রীষ্টান পাদরিরাও যখন বাংলাভাষা-চর্চায় মন দিলেন, তখনো তাঁদের দৃষ্টি গেল বাংলা বাক্য থেকে ফার্সি আরবি শব্দের বাহুল্য বর্জনের দিকে। শ্রীরামপুরের পাদরিরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন, 'মুসলমানী বাংলা' ইসলাম-প্রচারের কাজে ব্যর্থ হয়েছিল তাদের অতি-ফার্সি ও অতি-আরবীয়তার জন্যে। কেরী প্রমুখ পাদরিরা সে পথে গেলেন না।

বাংলাভাষার নিজস্ব রূপ প্রকাশের সূচনা হয় উনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই— অর্থাৎ ১৮০১ অব্দ থেকে। কালে হিন্দু লেখকদের সংস্কৃতের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ হেতু বিশুদ্ধ বাংলা লেখার প্রেরণায়

বাংলা গদ্য রীতিটাই সংস্কৃত-ঘেঁষা হতে চলেছিল।[১] এরই প্রতিক্রিয়ায় গ্রাম্য বাংলার ব্যবহার চালু হয়— কেরীর 'কথোপকথন', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা', প্যারিচাঁদ মিত্রের' আলালের ঘরের দুলাল' -এর রচনাশৈলী তারই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কিন্তু দেখা গেল বাংলাভাষার মনস্বিতা বা genius, না অতি-সংস্কৃততায়, না অতি-ফার্সি-আরবীয়তায়, না অতি-প্রাকৃততা বা গ্রাম্যতায় সার্থক হতে পারে। প্রাকৃত গ্রাম্য সংস্কৃত ও ফার্সি-আরবির সংমিশ্রণে স্বাভাবিক বাংলাভাষা সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ লাভের শক্তি অর্জন করল। আজ এই তিনটি ভাষা ছাড়াও য়ুরোপীয় ভাষার বহু শব্দ বিজ্ঞানে দর্শনে শিল্পে সাহিত্যে এসে বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করছে।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে আমাদের মানসিক বিকাশের সম্বন্ধ গভীরভাবে জড়িত বলে ভারতে ছাপাখানার আবির্ভাবের কাহিনীটা সংক্ষেপে বিবৃত করাকে অবান্তর বলে মনে করব না। বাংলাদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার দু শো বছর আগে পোর্তুগীজরা গোয়ায় সর্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপন করে। পোর্তুগীজদের দ্বারা ভারত-আবিষ্কার ও পশ্চিম-উপকূলে রাজ্য-পত্তনের অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে, ১৫৫৬ অব্দে, ছাপার যন্ত্র এসে গেল সেখানে। মুদ্রাযন্ত্রটির গন্তব্য ছিল আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া; কিন্তু নানা কারণে সেখানে সেটি পাঠানো না হওয়াতে গোয়াতেই থেকে যায়। আকবর শাহ যে বছর বাদশাহ হলেন সেই বছর ভারতে মুদ্রাযন্ত্র আনে পোর্তুগীজরা, তার প্রায় সওয়া দু শো বছর পরে বাংলা দেশে ইংরেজ আনল ছাপার যন্ত্র।[২]

ইংরেজ কোম্পানি বোম্বাই দ্বীপের মালিক হবার পর সেখানে মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপন ব্যাপারে সহায়তা করেন ভীমজি পারেখ নামে এক গুজরাটী। ভীমজি ছাপাখানা স্থাপন করতে চেষ্টা করলে, বিলাত থেকে কর্তৃপক্ষ লিখে

---

১ বাংলা ব্যাকরণ প্রথম লেখেন হ্যালহেড সাহেব ১৭৭৮ অব্দে; তারপর কেরী লেখেন ১৮০১-এ (২য় সং, ১৮০৫)। রামমোহনের ব্যাকরণ (১৮৩৯) সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।

২ পশ্চিম-ভারতের গোয়ায় পোর্তুগীজরা স্থানীয় ভাষায় (কোঙ্কণী-মারাঠা) যে-সব খ্রীষ্টানী পুস্তক-পুস্তিকা রচনা ক'রে ছাপিয়েছিল তার আলোচনা করেছেন এ. ডি. প্রিওলকর (*The Printing Press in India*, Bombay, 1958)। বাংলাভাষার আলোচনায় পোর্তুগীজদের কথায় ফিরে আসতে হতে পারে।

পাঠালেন— ভীমজির আয়োজনটা ভালোই বলে মনে হচ্ছে— "it may be a means to propagate our religion whereby soules may be gayned as well as Estates." অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করে ভারতীয়দের আত্মার উদ্ধার হবে এবং ইংরেজের ভূসম্পত্তি সমৃদ্ধ হবে। তবে এখানে মিশনারীরা প্রত্যক্ষভাবে প্রচারকার্যে ও দীক্ষাদানে নিযুক্ত হন নি।

দক্ষিণ-ভারতে পোর্তুগীজদের ক্যাথলিক-খ্রীষ্টানী প্রচারের উৎসাহে ও আতিশয্যে ভারতীয়রা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। তাই সেখানে যখন দিনেমার পাদরিরা এলেন, তাঁরা খুব হুঁশিয়ার হয়ে প্রোটেস্টাণ্ট-খ্রীষ্টানী প্রচারে মন দিলেন। ত্রাংকোবারে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র আসে ১৭১৩ অব্দে। এখানে তামিল ভাষায় তামিল লিপিতে বাইবেল মুদ্রিত হল; প্রসঙ্গত বলি, এখানেই সর্বপ্রথম কাগজের কল প্রস্তুত হয়। বাংলাদেশে কাগজ-কল আসে অনেক পরে।

ভারতীয় ভাষায় সব থেকে পুরোনো ছাপার নমুনা পাওয়া গেছে কোচিনে (কেরালা)। ১৫৭৯ অব্দে Marcos Jorge -এর *Doctrina Christiana* তামিল ভাষায় অনুবাদ করেন হেনরিকে (Fr. Henriquer)। ভূমিকাদি সব পোর্তুগীজ ভাষায় ও মূল অনুবাদ গ্রন্থ তামিল ভাষায় তামিল লিপিতে মুদ্রিত (বইখানিতে ১১২ পৃষ্ঠা আছে)। এখন জানা গেছে যে, গোয়া ছাড়া কোচিনেও একটা মুদ্রাযন্ত্র ছিল, সেখানে তামিল হরপ তৈরি ক'রে খ্রীষ্টধর্মমত সম্বন্ধে বইখানি ছাপানো হয়েছিল।[১] কিন্তু এরও আগে ১৫৭৭ অব্দে কুইলনে তামিল ভাষা ও লিপিতে সাধু ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার-প্রণীত খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে পুস্তিকা (৬৪ পৃষ্ঠা) 'তাম্বিরন্ বনক্কম' নামে অনূদিত হয়।[২]

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে সার্ আয়ার কুট যখন ফরাসীদের পণ্ডিচেরী অধিকার করেন, তখন সেখানে লুণ্ঠিত সামগ্রীর মধ্যে একটা মুদ্রাযন্ত্র পান। কেউ তার

---

১ Originally the Ms. was at the Bibliotheque Nationale, Paris; but now it is not available there. See George Schurhammer, S. J. and G. W. Cotterell, Jr., *The First Printing in Indic Character*, Harvard Library Bulletin, Vol. VI., No. 2, Spring 1952.

২ *The Carey Exhibition of Early Fine Printing*, at the National Library, Calcutta, 1955 পুস্তিকায় A brief note on early printing in India সম্বন্ধে প্রবন্ধে বহু তথ্য আছে।

ব্যবহার জানতেন না, তাই সেটি তামিল পণ্ডিত Fabricusকে দেওয়া হয়। তিনি তামিল ভাষায় খ্রীষ্টানী বই ও তামিল-ইংরেজি অভিধান মুদ্রণ করেন (১৭৭৯)। এই লোকটির পাণ্ডিত্য ও জ্ঞাননিষ্ঠা সম্বন্ধে তথ্য জানতে পারলে আজকালকার সাহিত্য-সাধকদের উৎসাহ হবে। তবে তা আমাদের আলোচনার প্রত্যক্ষ আওতায় আসছে না।

ত্রাংকোবারে দিনেমারদের প্রোটেস্টাণ্ট মিশনই বাংলাদেশে শ্রীরামপুরে মিশন খোলেন সর্বপ্রথম; কিন্তু সেটা ভালোভাবে চলে নি। সেখানে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ব্রিটিশ ব্যাপটিস্ট মিশনের কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতি এসে মিশন স্থাপন করেন; এ সম্বন্ধে আমরা অন্য পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি।

পৃথিবীর সর্বত্র ধর্মপ্রচারের জন্য মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তন করেন খ্রীষ্টান-পাদরিরা; তাঁরাই স্থানীয় জনতার ভাষা শিক্ষা ক'রে, তাদের ভাষায় বাইবেল ও খ্রীষ্ট-তত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। পুস্তিকা ছাড়া সাময়িক পত্রিকা সর্বপ্রকার মত প্রচারের অন্যতম প্রধান সহায়— তার প্রবর্তক খ্রীষ্টান পাদরিরা।

বাংলাদেশে বাংলাভাষায় পত্রিকা প্রকাশ কৃতকার্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন শ্রীরামপুরের পাদরিরা। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের টেকনিক আয়ত্ত হয়ে গেলে, সেই যন্ত্রের সাহায্যে দেশীয় লোকেরাও নিজ নিজ মত প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। তখন থেকে আর প্রচারকার্যটাও খ্রীষ্টানদের একচেটিয়া থাকল না। দেশীয়রাও খ্রীষ্টানীর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে আরম্ভ করে। বাংলাদেশের মুদ্রাযন্ত্র ও পত্রিকার ইতিহাসের সূত্রপাত এইভাবেই হয়।

আমরা অন্যত্র বলেছি, বোম্বাইতে ১৬৭৪ অব্দে মুদ্রাযন্ত্রের সবরকম সরঞ্জাম এসেছিল, কিন্তু সেখানে তার সদ্‌ব্যবহারের কোনো চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় না বহুকাল। প্রায় এক শো বছর পরে মাদ্রাজে, ১৭৭২ অব্দের প্রথমে, ছাপাখানা বসানো হয়। কলকাতায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র কবে স্থাপিত হয় সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ইতিহাস পাই নি। সকলেই বলেন, Official Printing Press ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৭৭৮ অব্দে হুগলিতে ইংরেজি

ছাপাখানা অ্যাণ্ড্রুজ নামে এক সাহেব স্থাপন করেন বলে জানা যায়; চার্লস উইলকিন্‌স্‌-এর চেষ্টায় এখানে বাংলা হরপের সাহায্যে হ্যালহেডের ব্যাকরণ ছাপানো হয়।

মিঃ বোল্‌টস্‌ খুব ভালো বাংলা জানতেন; তিনি সর্বপ্রথম বাংলা হরপ তৈরির চেষ্টা করেন লন্‌ডনের বিখ্যাত কারিগরদের সাহায্য নিয়ে; কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। বাংলা হরপের জটিলতা এই-সব অগ্রদূতদের বিশেষ কষ্ট দিয়েছিল।

মুদ্রণযন্ত্র ও মুদ্রণের হরপের রাজযোটক না হলে ছাপার কাজ চলে না। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি মধ্য-য়ুরোপে ছাপারহরপ পৃথক পৃথক ভাবে কেটে (movable type) মুদ্রণকার্য আরম্ভ হয়।[১] ইংলন্‌ডে ১৪৭৭ অব্দে প্রথম প্রেস চালু হয়েছিল— তার প্রায় তিন শো বছর পরে বাংলা দেশের এক মফস্বল শহরে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়। বাংলা ছাপার অক্ষর এখানে সর্ব-প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৭৭৮ অব্দে। অবশ্য, ইতিপূর্বে লন্‌ডনে বাংলা অক্ষরে খ্রীষ্টানী বই ছাপা হয়েছিল (১৭৬৭)।

বাংলা হরপ-কাটার ইতিহাস মোটের উপর সুপরিচিত হলেও সংক্ষেপে বলে রাখি। বাংলা হরপ তৈরির দিকে সর্বপ্রথম গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন্‌ হেস্টিংস-এর দৃষ্টি যায়।[২] অষ্টাদশ শতকের সাত দশকে চার্লস

---

১ "Perhaps the greatest revolution in Europe was produced by the invention of printing. Would you call the inventor...a great man ? ... You may call that clever... ; but surely there is nothing great in it. In fact that title of Great Man has been used so recklessly, that to most people it conveys no longer any meaning at all.

"And yet I like to call Rammohun Roy a Great Man, using that word, not as a cheap, unmeaning title, but as conveying three essential elements of manly greatness, namely, unselfishness, honesty and boldness." —F. Maxmuller, *Biographical Essays*, 1884. Quoted in *The Father of Modern India*, Rammohun Roy Centenary volume, 1935 ; Part II, p. 178.

২ "The advice and even solicitation of the Governor-General prevailed upon Mr. Wilkins, a gentleman who has been some years in the East India Company's civil service in Bengal, to undertake a set of Bengali types. He did, and his success has exceeded every expectation. ...He has been...the Metallurgist, the Engraver, the Founder and the Printer." —Halhead, *Bengal Language* ('Preface'), 1778, p. xxiii.

উইলকিন্‌স্[১] হুগলিতে কোম্পানির কাজে আসেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা হরপ কাটেন কাঠ কুঁদে। ঐ শহরের পঞ্চানন নামে এক কর্মকারকে তিনি পিতল কেটে হরপ বানাতে উৎসাহিত করলেন— বাংলার ইতিহাসের অবিস্মরণীয় দিন সেটি। হ্যালহেড বাংলা ব্যাকরণ ছাপবার জন্যে পাঁচ সিকা ক'রে এক-একটা হরপের দাম দিতেন—বিলাতি হরপের দাম অনেক বেশি। হ্যালহেডের ব্যাকরণ বিদেশীর জন্যে ইংরেজিতে রচিত; উদাহরণাদি রামায়ণ-মহাভারত অন্নদামঙ্গল থেকে গৃহীত। এ-সব বাংলা হরপে মুদ্রিত এবং এই-সব হরপই সরবরাহ করেন পঞ্চানন। হ্যালহেডের ব্যাকরণে বাংলা হরপ ছাড়াও কয়েকটি ফার্সি শব্দের হরপ দেখতে পেয়েছি, মনে হয় এগুলিও পঞ্চানন কর্মকারের তৈরি। এই পুস্তকের আবরণী-পত্রের শীর্ষদেশে লিখিত আছে, "বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদঙ্গেৃজী"। এই প্রচ্ছদপত্রে আরো একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে।

বাংলা হরপে পুস্তক মুদ্রিত হবার আগে বাংলা ভাষায় ও রোমান (ইংরেজি) হরপে কিতাব ছাপা হয় পোর্তুগালের রাজধানী লিসবনে। লিসবনে মুদ্রিত মাত্র দুটি বইয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এবং সেগুলো বাংলাদেশে সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ সেন-কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় এক গ্রন্থের পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, সেটা সম্পাদিত হয়ে মুদ্রিত হয়েছে। আমরা এখানে কেবল নামগুলোর উল্লেখ করব, বিষয়বস্তু ও ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা অন্যত্র করেছি। লিসবনে মুদ্রিত দুটি বই হল 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। 'পাদ্রি মানোয়েল-দা

---

১ Charles Wilkins (1749-50—1836) came to Bengal in 1770, when he was hardly 21 years of age and was appointed a writer in the East India Company's service. He was interested in the study of oriental languages. He devoted his leisure hours in the study of Sanskrit, wrote a grammar in 1779 and under the patronage of Warren Hastings, translated the Bhagvat Gita (1785). He himself prepared the first Bengali and Persian types (1778) and set up a printing press at Calcutta for the oriental languages. He was the right hand man of Sir W. Jones in founding the A. S. B. and established the *Asiatick Researches* (Journal). He left India in 1786, published various books in translation and in 1800 became the Librarian of India House Library, London.

আসসুম্পসাম রচিত বাংলা ব্যাকরণ' (*Vocabularo em-idioma Bengalla'e Portuguez*) বইটি বোধ হয় বাংলা ও পোর্তুগীজ ভাষার প্রথম শব্দ-সংগ্রহ। এইটির পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, এই বইগুলোর বাংলা শব্দ রোমান লিপিতে মুদ্রিত হয়।

হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত হবার পর ১৭৭৮ থেকে ১৭৮৫ সালের মধ্যে আর কোনো পুস্তক ছাপতে দেখা যায় না। পঞ্চানন কর্মকার উইলকিন্‌স্‌-এর ফরমাইস-মত হ্যালহেডের জন্যে একপ্রস্থ হরপ কেটে দিয়েছিলেন। তারপর কলকাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রেসে (১৭৭৯ অব্দে স্থাপিত) ১৭৮৫ অব্দে সার্‌ ইলাইজা ইম্‌পের রেগুলেশনের বাংলা অনুবাদ ছাপবার প্রয়োজন -বোধে পঞ্চাননের হরপের খোঁজ আবার হল। এই হরপে 'Regulations for the Administration of Justice in the Courts of Dewanee Adaulut' -এর অনুবাদ মুদ্রিত হয়। অনুবাদক জোনাথান ডান্‌কান— পরে যিনি কাশীর রেসিডেন্ট হয়ে সেখানে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন (১৭৯২)।

কর্নওয়ালিস গভর্নর-জেনারেল হয়ে এসে (১৭৮৬-১৭৯৩) শাসনকার্যের অনেক সংস্কার করেন। তাঁর রেগুলেশন বাংলায় প্রকাশ করবার জন্যে পঞ্চানন নতুন করে হরপ ঢালাইয়ের অর্ডার পেলেন। এক সুলেখকের হস্তলিপির আদর্শে এবার হরপ তৈরি হল ; সেই আদর্শলিপি এখনো চলছে।

হেনরি পি. ফরস্টার -কৃত গভর্মেণ্ট রেগুলেশনের বঙ্গানুবাদ ১৭৯৩ অব্দে কলকাতায় কোম্পানির ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।[১] অতঃপর ১৭৯৯ অব্দে এই ফরস্টার সাহেবের বাংলা-ইংরেজি ও ইংরেজি-বাংলা শব্দ-কোষ মুদ্রিত হয়। সেটি মুদ্রিত হয় কলকাতায় ফেরিস কোম্পানির মুদ্রাযন্ত্রে— যে মুদ্রাযন্ত্র থেকে ষোলো বৎসর পরে রামমোহনের বেদান্তবিষয়ক বই-দুখানি বাংলা হরপে ছাপা হয়। ১৭৯৩ সালে এ. আপজন্‌ 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলারি' প্রকাশ করেন। এটি ক্রনিকল প্রেসে মুদ্রিত হয়। দেখা যাচ্ছে, বাংলা হরপ এখন কোম্পানির ছাপাখানার বাইরে প্রাইভেট

---

১ Bengali Translation of Regulations for the Administration of Justice in the Fouzdarry or Criminal Court, etc.

মুদ্রণশালায়ও ব্যবহৃত হচ্ছে। জন্ মিলার -কৃত *The Tutor* বা 'সিক্ষ্যা গুরু' ১৭৯৭-এ কলকাতায় মুদ্রিত হয়। সজনীকান্ত দাস তাঁর বইয়ে এ-সব বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বলে আমরা আর তার পুনরাবৃত্তি করলাম না। মোট কথা এখন পর্যন্ত বাংলা বাক্যের মধ্যে কর্তা-ক্রিয়া-কর্মাদি পদের যথাযথ স্থান নির্দেশ হয়নি। সেটা দেখা যায় এই-সব বইয়ের পাতা উলটলেই।

রামমোহনের সমকালীন পরিবেশের কথা বলতে গেলে কেরী ও তাঁর শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টভক্তমণ্ডলীর সাহিত্য তথা ধর্ম-প্রচারের প্রচেষ্টার ইতিহাস এসে পড়বেই। কেরী প্রমুখ খ্রীষ্টান পাদরিদের ধর্মবিষয়ক কার্যাবলীর কথা আমরা অন্য পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি, যেখানে রামমোহনের সঙ্গে তাঁদের ধর্মসম্বন্ধীয় বিতর্কের কথা এসে গিয়েছে। আমরা এখানে কেরী ও তাঁর বন্ধুবর্গের দ্বারা বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা, এমন-কি ভারতের প্রতিবেশী দেশের ভাষায় গ্রন্থাদি প্রকাশ ও প্রচারের ইতিহাস আলোচনায় সীমিত থাকব।

কেরী খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ভারতে আসেন ১৭৯৩ অব্দে, এবং ৪১ বছর পরে ১৮৩৪ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয় এদেশেই। এই ৪১ বৎসরের মধ্যে দেশে যান নি। ১৭৯৩ অব্দে ভারতে আসার সময়ে জাহাজে বসেই তিনি বাংলা ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন টমাসের কাছে। এই টমাস সাহেব আসেন ১৭৮৩ অব্দে কোম্পানির ডাক্তার হয়ে; তখন থেকে তিনি বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন এবং ভালো রকম শিক্ষা করেন। টমাসের উৎসাহে ও প্রেরণায় কেরী ভারতে আসেন। কেরী কলকাতায় আসার পর কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন, কিছুই জানতেন না। অনেক ঘোরাঘুরির পর মালদহ জেলায় মদনাবাটীতে এক নীলকরের ফ্যাক্টরিতে চাকুরি নিয়ে সেখানে যান (১৫ জুন ১৭৯৪)। দু বছরের মধ্যে তিনি বাংলাভাষা বেশ ভালোরকম শিখে ফেলেন ও নিজের ব্যবহারের জন্যে একটা বাংলা-ব্যাকরণ ও বাংলা 'শব্দসংগ্রহ' সংকলন করেন। পরে এই বুনিয়াদের উপর তাঁর 'বাংলা ব্যাকরণ'[১] (১৮০১) ও 'বাংলা-ইংরেজি

১ ব্যাকরণটি ইংরেজিতে রচিত— *A Grammar of the Bengalee Language*, Serampore, Printed at the Mission Press, 1801.

অভিধান'[১] (১৮১৫-২৫) লিখিত ও প্রকাশিত হয়। খ্রীষ্টগতপ্রাণ কেরী মদনাবাটীতে থাকবার সময়ে বাংলায় বাইবেল প্রকাশ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একবার কলকাতায় এসে সেখানে একটা মুদ্রাযন্ত্র বিক্রির সংবাদ পেয়েই সেটা ৪৫ পাউণ্ড (প্রায় ৫০০ টাকা) দিয়ে কিনে ফেললেন ও মদনাবাটীতে পাঠিয়ে দিলেন নৌকাযোগে। মুদ্রাযন্ত্র হল— কিন্তু বাংলা টাইপ তখনো যোগাড় করতে পারেন নি। তখন কয়েক বছর হল কলকাতায় ইংরেজি পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়েছে; বিলাত থেকেই মুদ্রাযন্ত্র ও তার অন্যান্য সরঞ্জাম আমদানি হচ্ছে। কিন্তু বাংলা হরপ করছেন এদেশে মাত্র পঞ্চানন কর্মকার, হুগলিতে। ১৭৯৯ অব্দের ১ এপ্রিল কেরী এক পত্রে লিখছেন যে তিনি কলকাতায় গিয়ে হরপ ঢালাই করে আনার মতো অর্থ সংগ্রহ করেছেন স্থানীয় সাহেবদের কাছ থেকে। পঞ্চানন ইতিমধ্যে কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থায় কোম্পানির কাগজপত্র ছাপবার জন্যে বাংলা হরপ ঢালাই করে দিয়েছেন। কেরী পঞ্চাননকে অর্ডার দিলেন হরপের। তিনি লিখছেন, "The work is now begun and I hope may be completed in less than six months by which time the copy will be in... ."

কলকাতা থেকে মদনাবাটীতে ফিরে কেরী জানতে পারলেন যে তাঁর বন্ধু নীলকর উড্‌নি সাহেব কারবার চালাতে পারছেন না— লোকসান হচ্ছে। তখন কেরী মদনাবাটী ত্যাগ ক'রে, নিকটস্থ খিদিরপুর নামে এক গ্রামে নীলকুঠি কিনে, সেখানে পরিবার-পরিজন নিয়ে উঠে গেলেন— মুদ্রাযন্ত্রও সেখানেই স্থাপন করলেন।

এমন সময়ে তাঁর সম্মুখে জীবনের চরম পরীক্ষা-মুহূর্ত এল। মার্শম্যান প্রমুখ পাদরিরা শ্রীরামপুরে এসেছেন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্যে; অথচ এই দেশ সম্বন্ধে,

---

১ A Dictionary of the Bengalee Language in which the words are traced to their origin, and their various meanings given. Vol. I. By W. Carey, D. D. Professor of the Sungskrita and Bengalee Languages in the College of Fort William. Second Edition, with corrections and additions, Serampore: Printed at the Mission Press, 1818.

১ম ও ২য় খণ্ডের মোট পত্র-সংখ্যা ১৫৪৪। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, সজনীকান্ত দাস, উইলিয়ম কেরী, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৫, পৃ. ৪৯-৫১।

অধিবাসী সম্বন্ধে এবং লোকের ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের কোনো জ্ঞান নেই। শ্রীরামপুর দিনেমারদের শহর, তাই রক্ষা! কারণ, ইংরেজের রাজ্যের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করা নিষিদ্ধ ছিল। কোম্পানির ডিরেক্টররা পাদরিদের ডরাতেন। কারণ, তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে কোম্পানির কর্মচারীদের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ ক'রে ব্যাবসার কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করে—তারা উৎপাত-বিশেষ। নবাগত পাদরিরা পরামর্শের জন্যে কেরীর কাছে গেলেন। কেরীর জীবনের আদর্শ খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করা—নীলকরের ফ্যাক্টরি-পরিচালনা নয়। তিনি মালদহের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ চুকিয়ে চলে এলেন শ্রীরামপুরে, ১৭৯৯ অব্দের শেষ ভাগে। ১৮০০ অব্দের ১০ই জানুয়ারি শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হল। খিদিরপুর থেকে আনীত মুদ্রাযন্ত্রটি মিশনবাড়ির একটা ঘরে স্থাপন করলেন, এবং পঞ্চাননকে যে হরপ তৈরির অর্ডার দেওয়া ছিল তা কলকাতা থেকে এসে যাওয়াতে মুদ্রণকার্য আরম্ভ করে দিলেন।

শ্রীরামপুরে এসে কেরী প্রমুখ পাদরিরা নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ-কার্য শেষ করার দিকে মন দিলেন। ইতিমধ্যে আবার রামরাম বসু শ্রীরামপুরে এসে পাদরিদের সঙ্গে যোগ দিলেন; মালদহ-বাসের শেষ ভাগে রামরাম বসুর সঙ্গে মিশনের সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছিল। রামরাম বসু খ্রীষ্টান না হয়েও খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ভালো-রকম ওয়াকিবহাল হয়ে 'গসপেল্ মেসেঞ্জার' নামে পুস্তিকা সম্পাদন করেন ও হিন্দুধর্ম ও সমাজের কুপ্রথা ও ধর্মবিশ্বাসকে সমালোচনা ক'রে পুস্তিকা প্রস্তুত করে দেন। তিনি এ সম্বন্ধে একটি গানের বইও লেখেন। রামরাম বসুকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম শুকতারা বলা যেতে পারে।

কেরীদের বাইবেল তর্জমা তৈরি হয়েছে—এবার মুদ্রণকার্য। কিন্তু অর্থাভাব দারুণ। কলকাতায় য়ুরোপীয়দের কাছে সাহায্যের জন্যে আবেদন পাঠালেন। ওয়েলেস্‌লি এই বিজ্ঞপ্তি দেখে একটু বিব্রত। কলকাতার এত কাছে বিদেশী রাজ্য শ্রীরামপুরে যদি স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় তবে তো মুশকিল! ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চ্যাপলেন মিঃ ব্রাউনকে সমস্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, শ্রীরামপুরের পাদরিরা কোনোপ্রকার সাম্রাজ্যবিরোধী কাজ করতে পারেন না, তাঁরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করছেন মাত্র। তবুও ওয়েলেস্‌লির ভয়, "whether it would be safe

to circulate the Bible, which taught the doctrine of christian equality without the safeguard of a commentary."[১]

মিঃ ব্রাউন্ "বড়োলাটকে বুঝিয়ে দিলেন যে, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হলে ভালোই হবে, অর্থাৎ এর যে political দিকটা ছিল সেটা নগণ্য নয়। ওয়ার্ড লিখেছিলেন যে, শ্রীরামপুরের পাদরিদের ছাপাখানার উপর ব্রিটিশ সরকারের এই ছিল মনোভাব (jealousies), যদিও তারা বিদেশী শাসনের অধীন। মালদহ মদনাবাটীতে তাদের মুদ্রাযন্ত্র থাকলে কী দশা হত তা কল্পনা করা যেতে পারে। যাই হোক, ১৮০০ সালের ১৮ মার্চ বাইবেলের একপাতা ছাপা হল। পঞ্চানন এসে মিশনের ছাপাখানায় যোগদান করায় হরপের অভাব আর থাকল না। এ বৎসরের আগস্ট মাসে ম্যাথ্যু বা 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' প্রকাশিত হল।[২] শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসে ১৮০১ থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে যে-সব বই ছাপা হয় তার বেশির ভাগই বাইবেল। এই বাইবেল মূল গ্রীক হীব্রু ও ইংরেজি থেকে তর্জমা করতে গিয়ে অনুবাদকদের বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়। কারণ বাংলা গদ্যের কোনো মান (standard) তাদের সামনে ছিল না; পুরানো দলিল দস্তাবেজ ও রেগুলেশনের যে নয়া অনুবাদ সরকার করেছেন, তা এত ফার্সি-আরবি-ঘেঁষা যে, সে ভাষা কখনো জনতার দ্বারা স্বীকৃত হবে না— এটা কেরী প্রমুখ অনুবাদকরা এ কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে নিয়েছেন। বাইবেলের নানা সংস্করণের অনুবাদের ভাষা দেখলেই জানা যাবে, বাংলা বানান, বাক্যরচনা-পদ্ধতি ও ব্যাকরণের নিয়মাদি কী শিথিল ছিল। তাই বাংলায় গদ্য লেখা অত্যন্ত মেহনত-সাপেক্ষ ছিল।

লর্ড ওয়েলেস্‌লির চেষ্টায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হলে ব্রিটিশ সিবিলিয়ানদের ভারতীয় ভাষা শেখাবার জন্যে গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন হয়; সেই প্রয়োজনের তাগিদে কলেজের পণ্ডিতরা বাংলায় গদ্য-বই লিখতে আরম্ভ করেন। অবশ্য এ-সব বইয়ের বেশির ভাগই অনুবাদ, বা ইংরেজি, সংস্কৃত, ফার্সি কিতাবের ভাষা-বিবরণ। এই শ্রেণীর বইয়ের সংখ্যা খুব বেশি নয়— ১৫ বৎসরে মাত্র ১২ খানি বই লিখিত

১ Marshman, *History of the Serampore Mission*, Vol. 1, p. 133.

২ সজনীকান্ত দাস, উইলিয়ম কেরী, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১২, পৃ. ১৯।

ও মুদ্রিত হয়, এবং মুদ্রণসংখ্যাও খুব বেশি হত না। এই পর্বের শেষ বই বা নূতন-যুগের প্রথম বই হচ্ছে রামমোহন রায়-কৃত 'বেদান্তগ্রন্থ' (১৮১৫)। রামমোহনের পূর্বে লিখিত গ্রন্থগুলির ভাষা ও তাঁর রচিত বেদান্তাদির ভাষার মধ্যে বিষয়ের গুরুত্বের জন্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করেছি।

লর্ড কর্নওয়ালিস প্রথম গভর্নর-জেনারেল, যাঁকে ভাগ্যান্বেষী বলা যায় না। তিনি অভিজাত-বংশীয়, এবং ইংরেজের চারিত্রিক গুণের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সন্দেহহীন। তিনি বড়োলাটের কার্যভার গ্রহণ ক'রে ঘোষণা করলেন, শাসনকার্যে ভারতীয়রা অযোগ্য। তাই ইংলন্ড থেকে বেকার, অর্ধশিক্ষিত যুবকদের এনে সরকারী কাজে ভর্তি করে দিলেন। মার্কিন কলোনিগুলি হাতছাড়া হয়ে 'যুক্তরাষ্ট্র' হয়েছে আমেরিকায়—সেখানে আর ব্রিটেনের ফালতু লোক চাকরির জন্যে যাচ্ছে না; তাই ভারতের 'উপকারের' জন্যে সেই-সব বেকারদের এনে এখানে কাজ দেওয়া হতে লাগল। কর্নওয়ালিস আরো বললেন যে, ভালো মাইনে দিতে হবে তাদের। কিন্তু লর্ড ওয়েলেস্‌লির বাস্তববোধ দৃঢ়তর ছিল। যতদিন কোম্পানির একমাত্র কাজ ছিল মাল কেনা, হিসাব রাখা, জাহাজের মালের ফর্দ করা, ততদিন অশিক্ষিত লোকদের দিয়ে কাজ চলত। কিন্তু "the men who were to undertake the important office of judges, magistrates, collectors and ambassadors" তাঁদের পক্ষে গোমস্তার কাজ শিখলেই চলতে পারে না। ইংলন্ডের পাবলিক স্কুল থেকে সামান্য বিদ্যা নিয়ে পনেরো ষোলো বছরের বালকরা আসত 'writer' হয়ে; কোনো শিক্ষানবিশি না করে তারা গিয়ে বসত বড়ো বড়ো কাজে। ওয়েলেস্‌লি লিখেছেন যে, এই-সব ছোকরা এদেশে দু-তিন বছর থাকতে না থাকতে য়ুরোপের স্কুলে যা-কিছু বিদ্যা আয়ত্ত করে এসেছিল, তা সবই ভুলে যেত, আর এসিয়ারও কোনো কিছুই আয়ত্ত করতে পারত না। আর যারা স্বভাব-অলস ও উচ্ছৃঙ্খল, তারা জুয়া খেলে ও অন্যান্য পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়ে স্বাস্থ্য ও সম্পদ দুইই হারাত।[১]

১ Marshman, *History of the Serampore Mission*, Vol. I, p. 143. Quotation from Wellesley's Minute.

কেরী প্রমুখ পাদরিরা যেমন খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করবার জন্তে বাংলাভাষার চর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তেমনি ব্রিটিশ 'রাইটার' বা সিবিল সার্বিসের বালক ও যুবকদের রাজকার্য শেখাবার জন্তে নানা বিদ্যাচর্চার আয়োজন করে কলকাতায় ওয়েলেস্‌লি এক কলেজ স্থাপন করলেন। এই দুটি ঘটনা বাংলার সাহিত্য তথা বাঙালির মনোবিকাশের ইতিহাসে স্মরণীয়। ওয়েলেস্‌লি এই কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে যে মন্তব্যপত্র লিখেছিলেন তাতে ভাবী শাসকদের শিক্ষা-পাঠক্রম খুব স্পষ্ট করে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। বর্তমানে একজন অনার্স গ্রাজুয়েটকে যা শিখতে হয়, ঐ পাঠক্রম তার থেকে কিছু ন্যূন ছিল না। পরযুগে এই ধারায় বিলাতে হেলিবেরিতে সিবিল সার্বিসের ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮০৬ অব্দে। শিক্ষণীয় বিষয়ের ফর্দ নিতান্ত কম নয়; এবং পরীক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে কোনো শৈথিল্য ছিল না। ছাত্রদের যে-সব বিষয় শিখতে হত তার মধ্যে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ প্রভৃতি বিবিধ জাতির আইন-কানুন, ভারতীয় রেগুলেশন ও গভর্নর-জেনারেলের আইন, অর্থনীতি (পোলিটিক্যাল ইকনমি) অবশ্য-শিক্ষণীয় ছিল; ভাষার মধ্যে গ্রীক, লাতিন, ইংরেজি ছিল আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয়। প্রাচীন ও বর্তমান যুগের ইতিহাস— বিশেষ-ভাবে ভারতের ইতিবৃত্ত, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, রসায়ন ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে গ্রন্থাদি পড়তে হত। এ তো গেল সাধারণ শিক্ষা। কিন্তু এই-সব যুবকরা তো শাসন ও বিচার করবে, তাই ভারতীয় ভাষাগুলো শেখানোর ব্যবস্থা হল। ভাষার মধ্যে আরবি ফার্সি সংস্কৃত বাংলা হিন্দুস্থানী তেলেগু মারাঠী তামিল ও কন্নাড়। ফার্সি তখন রাজভাষা, প্রত্যেককেই শিখতে হত। এ ছাড়া বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির জন্তে বাংলা অবশ্য-শিক্ষণীয় ভাষা ছিল।

ওয়েলেস্‌লি কলকাতায় শিক্ষা-কেন্দ্র করলেন, কিন্তু বিলাতে ডিরেক্টররা খুশি নন; তাঁরা বলেন, বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রায় অনুরূপ প্রতিষ্ঠান হওয়া বাঞ্ছনীয়। আসলে ওয়েলেস্‌লি প্রমুখ কয়েকজন ও বিলাতের ডিরেক্টর ও অংশীদারদের মধ্যে একটা শক্তিশালী অংশ Bengal Squad নামে অভিহিত হত। ওয়েলেস্‌লি বিলাতের ডিরেক্টরদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাহীন ছিলেন এবং তাঁদের মতামত না নিয়েই কলেজ স্থাপন করেছিলেন; ফলে এটাকে

কিভাবে নষ্ট করা যায় তার চেষ্টা ডিরেক্টরগণ গোড়া থেকেই শুরু করেন, এবং ১৮০৬ সালে বিলাতে নূতন বিদ্যালয় খুলে কলকাতার কলেজকে অনেকটা কানা করে দিলেন। খরচপত্র যদি করতেই হয় (এ সব খরচই কোম্পানির অর্থাৎ ভারতের) তবে সেটা বিলাতেই করা যাক।

যাই হোক, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানের উপযোগী নানা কর্মচারী নিযুক্ত করে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ খোলা হল। ফার্সি ভাষা শেখাবার মতো বিদ্বান ইংরেজ ছিলেন গিলক্রাইস্ট; অন্যান্য ভাষারও অধ্যাপক ও শিক্ষক মিলল, কিন্তু বাংলা-জানা লোক কলকাতায় মেলে না। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট পাদরিদের মধ্যে কেরী সাত বছর বাংলা চর্চা করছেন, ওয়েলেস্‌লি তা জানতেন— তাঁকেই আনা স্থির হল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় ১৮০০ সালের ৪ঠা মে। এক বছর আগে ঐ দিনে ওয়েলেস্‌লি টিপু সুলতানকে ধ্বংস করেন— সেই দিনটি স্মরণ করে কলেজের পত্তন হল। কিন্তু কলেজের কাজকর্ম আরম্ভ হতে হতে নবেম্বর মাস এসে গেল।

কেরীকে নিয়োগ করা হয় ১৮০১ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে; তখন তিনি 'শিক্ষক', অধ্যাপক নন। অধ্যাপক হলে বেতন হত হাজার টাকা। কিন্তু তাঁকে অধ্যাপক করার বাধা ছিল— তিনি যে ব্যাপটিস্ট খ্রীষ্টান— ইংরেজেরা যে সম্প্রদায়-ভুক্ত অর্থাৎ অ্যাংলিকান তা যে তিনি নন। তখনো ইংরেজদের মধ্যে ধর্মবিষয়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাব খুবই উগ্র।

১৮০৭ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ভেঙে গড়া হল— ডিরেক্টররা তো ব্যয়-সংকোচের জন্য উঠিয়ে দেবারই পক্ষপাতী। নিতান্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ পিটের প্রভাবে ও চাপে সেটা করতে পারলেন না। ওয়েলেস্‌লির কাজ ডিরেক্টররা পছন্দ করেন নি গোড়া হতেই। অথচ সেই আদর্শে তাঁরা Haileybury-তে কলেজ স্থাপন করলেন। কলকাতায় সিবিল সার্বিস শিক্ষার ও বিদ্যার মান যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেটাই বিলাতের কলেজে বজায় রাখতে হয়। তবে এ-কথা স্বীকার্য যে য়ুরোপীয় জ্ঞানবিদ্যার শিক্ষা বিলাতের এই নূতন কলেজে অনেক ভালোভাবে হল।

ডিরেক্টরদের আদেশে কলেজের ব্যয়-সংকোচ করতে গিয়ে প্রোভোস্ট

ও ভাইস-প্রোভোস্টের পদ উঠিয়ে দিতে হয়। ব্রাউন ও বুকানন সাহেবদ্বয় কাজ ছেড়ে দিলেন। তাতে যে ব্যয়সংকোচ হল তার থেকে কেরীকে বেশি টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এখন তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রফেসর-পদে প্রতিষ্ঠ হলেন; পূর্বে পেতেন পাঁচ শো টাকা, এখন হল হাজার।

নানা ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য কলেজে নানা দেশের পণ্ডিতকে কেরী শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। এই-সব পণ্ডিতদের কাছ থেকে কেরী বহু বিদ্যা আহরণ করেন। তিনি যে অতগুলি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করতে পেরেছিলেন, এবং অনেকগুলি ভাষার ব্যাকরণ লিখতে ও শব্দসূচী সংকলন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তার পটভূমে আছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। সেখানকার পণ্ডিত ও মুনশিরা তাঁকে প্রচুর সাহায্য দান করেছিলেন।

কেরীকে যে সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে নিয়োগ করা হয় তার কয়েক দিনের মধ্যে শ্রীরামপুরের উপর দিয়ে একটা রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটে গেল। ডেনমার্ক ১৮০০ সালে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে নর্দার্ন কনফেডা-রেসিতে (League of Armed Neutrality) যোগদান করে। শাস্তি দেবার জন্য ব্রিটিশ নৌবাহিনী নিয়ে নেলসন ২ এপ্রিল (১৮০১) কোপেনহেগেন আক্রমণ করেন। য়ুরোপে ডেন্‌মার্কের সঙ্গে ব্রিটেনের যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশেও ডেনমার্কের রাজ্যগুলি ইংরেজের শত্রু ব'নে গেল। য়ুরোপের শত্রুতার প্রতিধ্বনি শোনা গেল ভারতেও— শ্রীরামপুর অধিকৃত হল ১৮০১ সালের ৮ই মে। বারাকপুর থেকে ব্রিটিশ সৈন্য নদী পার হয়ে এসে শ্রীরামপুর অধিকার করল বিনা রক্তপাতে। ব্যাপটিস্ট পাদরিরা এতদিন দিনেমার গবর্মেণ্টের আশ্রয়ে ছিল। এখন তাদের ভয় হল, ইংরেজদের রাজ্যে বিদেশী খ্রীষ্টানদের সম্বন্ধে যে আইন চালু আছে, নব-অধিকৃত শ্রীরামপুরেও হয়তো তা প্রবর্তিত হবে। তা হলে তো তাদের নির্বাসন সুনিশ্চিত। কিন্তু ওয়েলেস্‌লি সে ভাব দেখালেন না, তিনি শ্রীরামপুরের *status quo* বজায় রাখলেন।[১] চোদ্দ মাস ইংরেজের অধীন থাকার পর শ্রীরামপুর আবার ডেনিসদের হাতে ফিরে আসে ১৮০২ সালের

---

১ Smith, *Life of William Carey*, pp. 279, 318-21.

মাঝামাঝির দিকে। কিন্তু ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের সঙ্গে ডেনমার্ক মিতালি করতে বাধ্য হলে ইংরেজ আবার শ্রীরামপুর দখল করে। তার পর ১৮১৮ অব্দে ছেড়ে দেয়, অর্থাৎ দিনেমারদের হাতে আবার আসে। অতঃপর ১৮৪৫ সালে ইংরেজ এই শহর কিনে নেয়।

১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপিত হয় ডেনমার্কের রাজার সনদ পেয়ে— মিশনারিদের শিক্ষার জন্য চার্টার (১৮২৭) ডেনমার্কের রাজার প্রদত্ত। এটি এসিয়ার প্রথম কলেজ যেখান থেকে ছাত্রদের বিদেশী উপাধি বা ডিগ্রি দেওয়া হল। এখনো খ্রীষ্টানী উপাধি এই কলেজ থেকে দেওয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে সাধারণ কলেজ বাংলা সরকারের sponsored college, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীন।

যাই হোক, এ-সব রাজনৈতিক উপদ্রব কেরী প্রমুখ পাদরিদের মনকে স্পর্শ করে নি। কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলাভাষার 'শিক্ষক' নিযুক্ত হয়ে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে প্রধান পণ্ডিত ও রামনাথ বাচস্পতিকে দ্বিতীয় পণ্ডিত নিযুক্ত করলেন। পাঁচজন সহকারী পণ্ডিতের পদের একটিতে রামরাম বসুকে নিয়োগ করা হল। কেরী যখন ১৮০১ সালে বাংলাভাষা শেখাবার ভার পেলেন তখন বাংলায় পড়াবার মতো বই কোথায়?[১] তিনি লিখেছিলেন, "When the appointment was made, I saw that I had a very important charge committed to me and no books or helps of any kind to assist me." তখন তিনি নিজে বাংলা ব্যাকরণ লিখতে আরম্ভ করলেন ও রামরাম বসুকে প্রতাপাদিত্যের

১ ক্যালকাটা গেজেটে (২৩ এপ্রিল ১৭৮৯) The humble request of several Natives of Bengal প্রকাশিত হয়, তাতে বাংলাভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সম্পাদনের অনুরোধ ছিল। এই বইয়ে সাধারণ বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ থাকলে ইংরেজ সরকারের কাজের সুবিধা হবে। অর্থাৎ, ইংরেজের হুকুম যাতে সহজে বুঝতে পারা যায় তার জন্য ইংরেজি শব্দ শেখার দরকার!

"...a Bengali Grammar and Dictionary, in which we hope to find all the common Bengali country words made into English. By this means we shall be enabled to recommend ourselves to the English Government and understand their orders; this favour will be gratefully remembered by us and our posterity for ever."—Seaton-Karr, *Selections*, Vol. IV, p. 497.

জীবনী লিখতে প্রবৃত্ত করলেন : "I got Ram Bashu to compose a history of one of their kings, the first prose book ever written in the Bengali Language." ইতিপূর্বে নিউ টেস্টামেণ্টের বাংলা তর্জমা শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে— "ইহাই শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম পুস্তক এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জয়যাত্রার ইহাই প্রথম পদক্ষেপ।"[১]

যে বছর রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশিত হয় সেই বছর গোলোকনাথ শর্মা (মুখোপাধ্যায়)-অনূদিত 'হিতোপদেশ' মুদ্রিত হয়ে বের হয়; এটিও শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসেই ছাপা হয়। বহুকাল গোলোকনাথ সম্বন্ধে কোনো তথ্য জানা ছিল না; সজনীকান্ত দাস বহু গবেষণা করে জানতে পেরেছেন যে গোলোকনাথ যখন পাদরি টমাসের কাছে মালদহে ছিলেন তখন 'হিন্দু-ফেবল্‌স্' অনুবাদ করেছিলেন। ইনি শ্রীরামপুরে এসেছিলেন বলেও মনে হয়। "টমাসের নির্দেশে রচিত হিতোপদেশের[২] গল্পগুলিই ১৮০১ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকরূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।"[৩]

ইংরেজ ভাবী কর্মচারীরা যাতে কথ্য বাংলাভাষা শিখতে পারেন তার জন্যে কেরী একটি বই সংকলন করেন—"Dialogues intended to facilitate the acquiring of the Bengali language"। 'কথোপকথনে'র ভাষা একেবারে গ্রামের মেয়ে-পুরুষের কথা— যেন একেবারে টেপ-রেকর্ডে তোলা। বিদেশীদের শিক্ষার জন্যে ব্যবহৃত হবে ব'লে গ্রন্থের বামদিকের পৃষ্ঠায় বাংলা ও ডানদিকের পৃষ্ঠায় কেরী-কৃত ইংরেজি তর্জমা প্রদত্ত হয়েছিল। আজকাল অনেক বিদেশী ভাষার বই এইভাবে মুদ্রিত দেখা যায়— Loeb

১ সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস (১৩৬৯), পৃ ১২৫।

২ হিতোপদেশের হিন্দুস্থানী বা উর্দু তর্জমা : Uklaqi Hindee, / Or / India Ethics, / Translated from / Persian Version / of the celebrated / Hitoopudes, or Salutary counsel, / By / Meer Buhadoor Ulee; / Head Moonshee in the / Hindoostanee Department / of the New College, at Fort William, / for the use of the students, / under the superintendence / of / John Gilchrist / Calcutta, / Printed at the Hindoostanee Press. / 1803.

৩ সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস (১৩৬৯), পৃ ১৮৭।

classics তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই পদ্ধতিতে কেরী ও জশুয়া মার্শম্যান বাল্মীকি-রামায়ণ সম্পাদন ও অনুবাদ করে প্রকাশ করেন; অবশ্য মাত্র প্রথম কাণ্ডটিই করা সম্ভব হয়েছিল (১৮০৬)। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের দ্বারা কেরীর নির্দেশে আরো কয়েকখানি বই লিখিত ও অনূদিত হয়। এই পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রধান ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। এঁর মতো বিদ্বান পণ্ডিত সে সময়ে কলকাতায় আর ছিলেন কি না সন্দেহ। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর মসীযুদ্ধ হয়; তৎসত্ত্বেও রামমোহন বলেছিলেন যে, যদি কেউ হিন্দুশাস্ত্রের মূল পুঁথি দেখতে চান তো মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের বাড়িতে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত-পণ্ডিত হয়েও বাংলায় বই লিখতে প্রবৃত্ত হন— ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্মীরূপে, আর কেরী সাহেবের নির্দেশে। কারণ সে যুগে বাংলা-চর্চা কোনো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে করতেন না, সংস্কৃত—দেবভাষাই—ছিল একমাত্র অধিতব্য ভাষা। যাই হোক, মৃত্যুঞ্জয়ের বাংলা ভাষা খুবই প্রাঞ্জল; তাঁর 'বত্রিশ সিংহাসন' 'হিতোপদেশ' 'রাজা-বলি' গ্রন্থত্রয় ১৮০২-০৮ অব্দের মধ্যে রচিত ও প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত বই 'রাজাবলি' "ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস"।[১] মৃত্যুঞ্জয় ইংরেজি জানতেন না, সুতরাং এর মালমসলা কলেজের ইংরেজিনবিশ অধ্যাপকরাই সম্ভবত যোগাড় করে দিয়েছিলেন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে একটি সংস্কৃত 'রাজাবলি' পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন; তাতে হিন্দুযুগের পৌরাণিক রাজবংশের তালিকা প্রদত্ত হয়েছে, মুসলমান-বিজয়ের কথাও আছে; কিন্তু ইতিহাস না বলে এ বইকে উপাখ্যান বললেই ভালো হয়। তবে এই সংস্কৃত পুঁথির মতো কোনো পুঁথি মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থভাণ্ডারে ছিল কি না জানা যায় না।[২]

মৃত্যুঞ্জয়ের অপর গ্রন্থ 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' ১৮৩৩ অব্দে প্রকাশিত হয়েছিল; কিন্তু ১৮১৯-এর মধ্যে বইখানি লিখিত হয় ও শ্রীরামপুর প্রেস থেকে মুদ্রিত হবার কথাও পাকাপাকি হয়ে যায়। কিন্তু যে মাসে এই প্রস্তাব

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৩, পৃ. ২১।

২ 'সংস্কৃত রাজাবলি গ্রন্থ', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪৬। পৃ. ২৩৩-৩৯।

কাউন্সিলে গৃহীত হল সেই মাসেই মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হয় (জুন ১৮১৯), সেইজন্য বই ছাপা আর হয় নি ; চোদ্দ বৎসর পরে মুদ্রিত হয়। মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার 'উৎকটত্ব' দেখাতে গিয়ে রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮) পুস্তিকায় 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র যে বাক্যটি বারংবার উদ্‌ধৃত করেছেন সেই অতিসমাসবদ্ধ বাক্যের সুকঠিন বাহ্য রূপই পাঠক-সম্প্রদায়কে মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে বিরূপ করে তুলেছে। এই বিরূপতা রবীন্দ্রনাথে সংক্রামিত হয়।[১]

'বীরবল' প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় "মৃত্যুঞ্জয়··· কালের হিসাব এবং ক্ষমতার হিসাব,— দুই হিসাবেই এই [পণ্ডিত] শ্রেণীর লেখকদিগের অগ্রগণ্য।" বীরবলের মতে রামমোহনের "অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গসাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই তাহার প্রধান কারণ, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনা-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।"[২]

'প্রবোধ চন্দ্রিকা' গ্রন্থে চল্‌তিভাষার যে নমুনা আছে তা সত্যই সুখপাঠ্য ; কিন্তু যেজন্য কেরী সাহেবের 'কথোপকথন' বাংলা গদ্যসাহিত্যের আদর্শ হয় নি, ঠিক সেই কারণেই মৃত্যুঞ্জয়ের চল্‌তি ভাষা এবং পরযুগের আলালী ভাষা বা হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার আদর্শ সাহিত্যিকগণ-কর্তৃক গৃহীত হয় নি। রামমোহনের বাংলা সংস্কৃত-ভাষ্যকারদের পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল শাস্ত্রালোচনা-কালে, কিন্তু রামমোহন যেখানে আপনার মত ব্যক্ত করে লিখে গেছেন সে বাংলাকে তো তাচ্ছিল্য করা যায় না, কালের দিক থেকে এ তথ্যগুলি বিচার্য। আমরা রামমোহনের রচনার বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করেছি।

আমাদের আলোচ্য পর্ব ১৮০১ হতে ১৮১৫ অব্দ। এই পনেরো বছরের মধ্যে যে-সব বই মুদ্রিত হয়েছিল তার মধ্যে পাদরি কেরী

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৩, পৃ. ৪৬।

২ সবুজপত্র, ফাল্গুন ১৩২১। উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি রূপে প্রদত্ত ভাষণ। রামমোহনের বাংলা গদ্যগ্রন্থাবলী ভালো করে পড়লে বীরবল এ শ্রেণীর শিথিল উক্তি হয়তো করতেন না।

সাহেবের লিখিত অনূদিত ও সম্পাদিত বইয়ের তালিকা একপাশে, ও অন্যদের লেখা বইয়ের তালিকা অপর পাশে কালানুক্রমে সাজিয়ে দেওয়া গেল :

	কেরীর লেখা	অন্য লেখকদের লেখা
১৮০১	নিউ টেস্টামেণ্ট	হিতোপদেশ। গোলোকনাথ শর্মা
	বাংলা ব্যাকরণ	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত। রামরাম বসু
	কথোপকথন	
১৮০২	কৃত্তিবাস-রামায়ণ	বত্রিশ-সিংহাসন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
	কাশীরাম-মহাভারত	লিপিমালা। রামরাম বসু
১৮০৩	ওল্ড টেস্টামেণ্ট	ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট। তারিণীচরণ মিত্র
১৮০৫		তোতা-ইতিহাস। চণ্ডীচরণ মুন্সী
		মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং। রাজীব-লোচন মুখোপাধ্যায়
১৮৭০	ওল্ড টেস্টামেণ্ট	
১৮০৮		Fables হিতোপদেশ। রামকিশোর তর্কালঙ্কার
		হিতোপদেশ। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
		রাজাবলি। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
১৮০৯	ওল্ড টেস্টামেণ্ট	
১৮১২	ইতিহাসমালা	
১৮১৪		পুরুষপরীক্ষা। হরপ্রসাদ রায়
১৮১৫		বেদান্ত গ্রন্থ। রামমোহন রায়
		বেদান্তসার। রামমোহন রায়

সব কাজই প্রথমে আরম্ভ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে একটু সময় লাগে, কিন্তু তার পর সে বিদ্যুদ্‌বেগে চলতে থাকে। বাংলা লেখকরা বিচিত্র বিষয়ে পুস্তকাদি লিখতে শুরু করলেন, এবং পুস্তক-মুদ্রণের জন্য কলকাতায় বহু ছাপাখানা স্থাপিত হওয়ায় সে-সব প্রকাশেরও সুযোগ পেলেন। রামমোহনের প্রথম গ্রন্থ ১৮১৫ অব্দে মুদ্রিত হয়, তার পর প্রতি বৎসর নানা লেখকের গ্রন্থ

ছাপা হতে থাকে এবং সেই ধারা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। আমাদের বক্তব্য, রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ-সংক্রান্ত পুস্তক ও পুস্তিকার পাশাপাশি নানা ভাবের, নানা রসের নূতন ও পুরাতন বই প্রকাশিত হতে থাকে; নূতন জ্ঞানবিজ্ঞানের বই ইংরেজি থেকে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা যাকে সাহিত্য বলি, এখনো কিন্তু তার আবির্ভাব স্পষ্ট হয় নি। বাংলার শেষ কবিওয়ালা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর মধ্যে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের শেষ ম্লান ছবি ও নূতন সাহিত্যের অরুণোদয়ের আভাস পাই। সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলে এখানে বর্জন করলাম।

১৮০০ থেকে ১৮৩৪ অব্দের মধ্যে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে ৪০টি ভাষায় মোট ২ লক্ষ ১২ হাজার গ্রন্থের কপি মুদ্রিত হয়েছিল; মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা ২৬১। সব বইই যে বাইবেল, বা খ্রীষ্টধর্ম-সংক্রান্ত, তা কিন্তু নয়। কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ১৮১৮ অব্দে স্থাপিত হয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার জন্য। ১৮১৮ থেকে ১৮২২ পর্যন্ত চার বছরে শ্রীরামপুর প্রেসে বাংলা, ইংরেজি, ফার্সি, আরবি এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত ১২ খানি বইয়ের ৪৭,৯৪৬ কপি ছাপানো হয়। এই প্রেসে বাংলা হরপ ছাড়াও অসমীয়া, আর্মেনীয়, আরবি, ইংরেজি, ওড়িয়া, কান্নাড়ী, কাশ্মীরী সারদা-লিপি, গুজ-রাটী, তামিল, তেলেগু, পশতু, নেপালী, পাঞ্জাবী, ফার্সি, বলুচি, মারাঠী, মালয়, সংস্কৃত, সিন্ধী, হিন্দুস্তানী বা উর্দু লিপিতেও বই মুদ্রিত হয়। এ ছাড়া সিংহলী, বর্মী, চীনা, জাভানী হরপেও বই ছাপা হয়। এ-সব হরপ পঞ্চানন ও তার আত্মীয় মনোহর কেটে দিত, তার পর অবশ্য ঢালাই করে ছাপবার জন্যে হরপ তৈরি হত। মোট কথা, তখন পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো একটা স্থানের একটা ছাপাখানা থেকে এত ভাষার বই মুদ্রিত হবার আয়োজন ছিল না— যা এই মুষ্টিমেয় বৃটিশ পাদরিরা ত্রিশ বছরের মধ্যে বাস্তব করে তুলেছিলেন।[১] কিন্তু ১৮০১ সালে শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার

---

১ বাইবেলের তর্জমা কোন্ কোন্ ভাষায় করা হয় এবং কখন তা শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয় তার একটা তালিকা দেওয়া হল; সবগুলিই নিউ টেস্টামেণ্ট: বাংলা, ১৮০১; মারাঠী, ১৮০৭; সংস্কৃত, ১৮০৮; পাঞ্জাবী, ১৮১১; ওড়িয়া, ১৮১১; তামিল, ১৮১৩; হিন্দী, ১৮১৪; তেলেগু, ১৮১৮; পশতু, ১৮২১; চীনা, ১৮২২; কান্নাড়ী, ১৮২৩; অসমীয়া, ১৮২৩। (১৮০৯ সালে কুংফুৎস্থর চীনা মূল ও ইংরেজি অনুবাদ মুদ্রিত হয়। চীনা movable হরপ বোধ হয় এখানে প্রথম তৈরি হয়)।

পর, বিশেষভাবে ১৮১৩ সালের পর অবাধ বাণিজ্য চালু হলে, বিদেশ থেকে নবাগত ব্যবসায়ীরা যে-সব ইংলন্ডীয় সামগ্রী এদেশে আমদানি করে তার মধ্যে মুদ্রাযন্ত্র কাগজ প্রভৃতি মুদ্রণ-সম্বন্ধীয় বহুপ্রকার দ্রব্য ছিল। তাই কলকাতায় ও তার আশেপাশে বহু ছাপাখানা স্থাপিত হয়; এবং শ্রীরামপুরের বুনিয়াদী প্রেস ছাড়া এই-সব মুদ্রাযন্ত্রালয় থেকেও বহুশত বাংলা বই মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৮১৩ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে। আমরা পরিশিষ্টে এই সময়ের মধ্যে স্থাপিত মুদ্রাযন্ত্রালয়ের একটা তালিকা দিয়েছি; সেটা দেখলেই বুঝা যাবে বাঙালির চিত্ত পুস্তক-প্রকাশ-বিষয়ে কতটা সজাগ হয়ে উঠেছিল। তবে সবাই যে জ্ঞান-বিতরণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল তা ভাববার কারণ নেই, অনেকেই ধনার্জনের সোপান রূপেই এই ব্যবসায়ে নামেন। কলকাতার ফেরিস্ সাহেব ১৭৯৯ অব্দে যে ছাপাখানা স্থাপন করেন সেইখানে ১৮১৫ অব্দে রামমোহনের বেদান্ত গ্রন্থ ও বেদান্তসার মুদ্রিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ইংরেজ ইস্ট ইন্‌ডিয়া কোম্পানির বাংলা-সুবার দেওয়ানি লাভের ব্যাপারটা পৃথিবীর ইতিহাসে একটা অতুলনীয় ঘটনা। লোকে জানত দেশের গণ্যমান্য বিজ্ঞ জবরদস্ত ন্যায়নিষ্ঠ পুরুষকেই রাজা-বাদশাহরা দেওয়ান বা মন্ত্রীর পদ দান করেন। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের দশ বছর পরে বাঙালী অবাক হয়ে দেখল যে, গত দেড় শো বছর ধরে যে ফিরিঙ্গিরা ব্যবসা করেছে দেশের মধ্যে, তারাই দেওয়ান-পদ পেল! সেদিন থেকে বাংলা-দেশের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের সূত্রপাত।

কোম্পানি তো দেওয়ান হলেন, কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীদের 'দেওয়ানি' কাজ সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। এতকাল তারা দেশের নানা কেন্দ্র থেকে কাপড়, সুতো, সোরা, চিনি, মসলাপাতি সংগ্রহ করে জাহাজে বোঝাই দিয়ে বিলাতে পাঠিয়েছেন; সেই বাজারী-গোমস্তা শ্রেণীর লোকেদের উপর হঠাৎ বাংলার রায়ত-জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের ভার এসে গিয়েছিল। এরা থাকেন ফোর্ট উইলিয়াম এলাকার কলকাতায়; অপর দিকে দেশশাসনের ভার রয়ে গেছে মুর্শিদাবাদের নবাবের উপর। কিন্তু তারও নির্ভর রেজা খাঁ ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের উপর— এ-সব ইতিহাস বাঙালী পাঠকের সুপরিচিত। এই সময়ে রামমোহনের পিতা-পিতৃব্যরা অন্যান্য মধ্যবিত্ত ভদ্রজনের মতোই ধনমান-অর্জনে ব্যাপৃত— যার কথা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

১৭৬৫ অব্দে ইংরেজ-কোম্পানি বাংলা সুবার দেওয়ানি লাভ করে, আর তার সত্তর বছর পর ১৮৩৫ অব্দে কোম্পানির ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্বন্ধ ভারত থেকে লুপ্ত হয়; প্রশাসনের সমস্ত ভারই তার উপর ন্যস্ত হয়। রামমোহনের জীবনকাল এই পর্বের সমকালীন— ১৭৭২ অব্দ থেকে ১৮৩৩ অব্দ পর্যন্ত। এই পর্বে বাঙালী তার মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে আধুনিক যুগের পরিবেশের মধ্যে প্রবেশ করল; অর্থাৎ ফার্সি ভাষার মধ্যযুগীয় কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ইংরেজি ভাষার মুক্ত অঙ্গনে বিচরণের স্বাধীন অধিকার লাভ করল। সেদিন থেকে বিশ্বজগতের জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি

তার হাতে এসে গেল— সমাজ-বিপ্লবের সূত্রপাত হল সেদিন। ১৭৬৫ সালের বাংলা-সুবা ও ১৮৩৫ সালের বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম নিয়ে গঠিত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির কায়িক ও মানসিক অবস্থার দূরত্ব অনেক। এই সত্তর বছরের মধ্যে বাঙালীর একটি ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর মনে বিপ্লবের যে বহ্নিকণা দেখা দিয়েছিল, কালে তা সারা বাংলা তথা ভারতকে প্রদীপ্ত করে তোলে। আধুনিক ভারতের চিত্ত-উদ্‌বোধনে রামমোহনের স্থান আজ সর্ববাদী স্বীকৃতি লাভ করেছে।

জব চার্নক কর্তৃক কলকাতা স্থাপিত (১৬৯০) হবার সাতষট্টি বছর পরে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) ও আরো আট বছর পরে কোম্পানির বাংলা সুবার দেওয়ানি লাভ ঘটে (১৭৬৫)। কোম্পানি-চালিত রপ্তানি-আমদানি বাণিজ্যে তখন balance of trade ভারতের অনুকূলে ছিল; কার্পাস ও রেশম-জাতীয় বস্ত্র, শর্করা, সোরা. প্রভৃতি রপ্তানি করে ভারত তার পরিবর্তে স্বর্ণ আমদানি করত— বুলিয়নে বা সভ্‌রেনে। বলা বাহুল্য, টাকা এক-হাতে জমা হয়ে থাকতে পারে না, সে ঘুরতে ঘুরতে দেশময় ছড়িয়ে পড়বেই, তা না হয়ে মুষ্টিমেয়ের হস্তগত হলেই সর্বনাশ! বিদেশী-বাণিজ্যের লাভের একটা অংশ কলকাতার ব্যবসায়ীদের হাতে আসত। বাংলাদেশে ধনভেদের সোপান নির্মিত হতে শুরু হল সেদিন থেকে। জাতিভেদের উপর ধনভেদের নূতন উপসর্গ সমাজদেহে দেখা দিল।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে চিরস্থায়ী জমিদারি-ব্যবস্থা চালু হয়েছে। গ্রামের মধ্যে ধনভেদের স্তর দেখা দিল। 'সূর্যাস্ত আইন'এর কঠোরতায় অনেক বুনিয়াদি পরিবার ফকির হয়ে গেলেন, এবং তার স্থানে হঠাৎ-জমিদার শ্রেণীর অভ্যুদয় হল। কালে কলকাতায় ও মফস্বলে ব্যবসায় ও কোম্পানির ঘরে দালালি-মুৎসুদ্দি-বেনিয়ানগিরি-করা বহু 'বাবু'র আবির্ভাব হয়েছিল। এঁরাই সমাজপতির সম্মান লাভ করেন। তখন গ্রামের 'জমিদার' আর কলকাতার 'বাবু' হওয়াই ছিল সকলের কাম্য। কিন্তু দেখা গেল, কর্নওয়ালিস যে ব্রিটিশ আভিজাত্যের আদর্শ নিয়ে বাংলাদেশে জমিদারি-প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন তার কিছুই রূপ গ্রহণ করল না। গ্রাম্য জমিদাররা স্কুল খুললেন, হাসপাতাল স্থাপন করলেন— enlightened

selfishness থেকে। গ্রাম ও মফস্বল শহরের জমিদাররা কলকাতার 'বাবু'দের ও সাহেবদের অনুকরণে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু বিলাতের গ্রাম্য 'লর্ড'দের মতো কৃষির উন্নতি (সম্প্রসারণ নয়) বা কোনো নূতন শিল্পের সৃষ্টির দিকে তাঁদের মন গেল না। ব্রিটেনের জমিদাররা গোরু, ঘোড়া, শূকর, কুকুরের বংশোন্নতির দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন বলেই সে-সবের খ্যাতি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে— ব্রিটিশ শিল্পজাত সামগ্রীর উৎকর্ষতার মতোই। বাঙালী জমিদারদের দৃষ্টি সে দিকে যায় নি— এমন-কি কৃষির জন্য যে গোপালন অতি-আবশ্যিক ক্রিয়া বলে পরিগণিত হওয়া উচিত ছিল, সে দিকেও তাঁদের মন গেল না। মোট কথা, সম্পূর্ণ দুষ্ট ও অলস জীবন যাপন হল জমিদার ও বাবুদের আদর্শ। 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে সেই চিত্রই সুনিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে। কলকাতার হঠাৎ-ধনী 'বাবু'রা আভিজাত্য অর্জন করবার জন্য জমিদারি নিলামে ক্রয় করতেন। কিন্তু জনতা বা প্রজাদের সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্বন্ধ থাকত না— কলকাতা বা বড়ো বড়ো শহরে তাঁরা বাস করতেন, বিনাশ্রমে 'প্রাপ্ত' ধন উপভোগ করাই ছিল তাঁদের একমাত্র কাম্য। ইংরেজ শিল্পপতিরা যখন এ দেশে এসে নানা শিল্পকর্মে মন দিল তখন বাঙালীরা বিদেশীদের যৌথ কারবারে শেয়ার কিনলেন— নিজেরা কোনো শিল্পকর্মে প্রবৃত্ত হলেন না। বিনাশ্রমে প্রাপ্ত রায়ত-শোষণ-করা খাজনা ও অপরের শ্রমে সৃষ্ট লাভের অংশ বা শেয়ারের উপর নির্ভরশীল সমাজ গড়ে উঠল বাংলাদেশে। বাঙালীর শ্রমহীন আয়ের আর-একটি পথ উন্মুক্ত হয় সেদিন, যেদিন থেকে 'কোম্পানি' সাধারণের কাছ থেকে টাকা ধার করতে আরম্ভ করলেন 'কোম্পানির কাগজ' বিক্রি করে। এইভাবে অর্জিত অপরিমিত ধনাগমের ফলে এক দিকে একশ্রেণী পেলেন অগাধ অবসর— সুকুমার কলা ও সাহিত্যের জন্ম হল এই অবসর থেকে— অপর দিকে প্রভূত ধনাধিকারের ফল দেখা গেল বিলাস-ব্যসনে ও ব্যভিচারে। পরিশ্রম না করে যে ধন বংশানুক্রমে সন্তানদের মধ্যে এসে যায় তা অপব্যয়িত হবেই হবে; সেইজন্য দেখা যায় যে, তিন-চার পুরুষের মধ্যে ধনসম্পত্তি 'পার্টিশন' হতে হতে এককালের অভিজাতরা মধ্যবিত্ত এবং কালে নিম্নমধ্যবিত্তের পংক্তিতে নেমে এসেছেন। হিন্দুদের মধ্যে জাতি মেল কুল গোত্র গাঁই প্রভৃতি নানা বিচার করে কন্যার

বিবাহ-দান ও শাস্ত্রমতে ও সমাজের প্রথা-মতে পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধাদিতে ব্যয়, পৈত্রিক পূজাপার্বণের 'পালি' সামলানো, প্রভৃতি বিবিধ কর্তব্য পালনে বহু পরিবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এবং অবশেষে শহরে বা নগরে চাকরির সন্ধানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ভাগ্যে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে ইংরেজি-শিক্ষা সাদরে গৃহীত হয়েছিল, তাই তাদের জীবিকার নূতন পথ উন্মোচিত হয়ে গেল। রামমোহন ও তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালীরা এই নূতন শিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

কলকাতার বাঙালী ও সাহেব আদিবাসিন্দাদের ইতিহাস অনেকেই লিখেছেন সমকালীন নথিপত্র ঘেঁটেঘুঁটে। উনবিংশ শতকের গোড়ায় ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার হঠাৎ-ধনী বাবুদের যে চিত্র তাঁর 'নববাবু-বিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে অঙ্কিত করেছেন তা প্রত্যক্ষদর্শীর সওয়াল বলে গ্রহণ করা যেতে পারে (১৮২৫)। তিরিশ বছর পরে প্যারীচাঁদ মিত্র 'টেকচাঁদ ঠাকুর' নাম গ্রহণ করে 'আলালের ঘরের দুলাল' নামে গল্পোপন্যাস লেখেন —তার আদর্শ 'নববাবুবিলাস'। উভয় গ্রন্থেই 'অনেক ধনাঢ্যের চরিত্র অবিকল' অঙ্কিত হয়েছিল। 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশের কয়েক বছর পর কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকৃশা' মুদ্রিত হয় (১৮৬২)। উনবিংশ শতকে কলকাতার নানা চিত্র বা নকশায় গ্রন্থখানি পূর্ণ। বাঙালীর সমাজজীবন কোথায় নেমে গিয়েছিল তা এই বইগুলি থেকে জানতে পারা যায়।

গল্প বা নকশা রূপে যা বর্ণিত হয়েছে তার সমর্থন পাওয়া যায় সমকালীন পত্রিকাদি ও ইংরেজ ভ্রমণকারীদের রোজনামচা, ডায়েরি, পত্রাবলী প্রভৃতি থেকে। ইংরেজি প্রথম পত্রিকা হিকি-র 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হয় ১৭৮৩ অব্দে, অর্থাৎ ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে। পঁয়ত্রিশ বছর পরে প্রথম বাংলা পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' বের হয় শ্রীরামপুর থেকে (১৮১৮)। ইতি-মধ্যে প্রকাশিত বহু ইংরেজি পত্রিকাতে বাংলাদেশের, বিশেষ করে কলকাতার, ইংরেজ সমাজের কীর্তিকলাপ অমার্জিত ভাষায় লিপিবদ্ধ হত। ১৮১৮ সাল থেকে 'সমাচার দর্পণ' ও আরো কিছুদিন পরে প্রকাশিত

'সম্বাদ কৌমুদী', 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রভৃতি পত্রিকায় সমকালীন সমাজ সম্বন্ধে বহু তথ্য ও চিত্র পাওয়া যায়; এবং সে-সব চিত্র থেকে 'নববাবুবিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রভৃতির চিত্রের সমর্থন পাই।

ইংরেজ সমাজ-জীবনের চিত্র পাই হিকির জর্নাল থেকে। তা ছাড়া ক্যালকাটা গেজেট, ক্যালকাটা জর্নাল প্রভৃতি সাময়িক পত্রও সমকালীন ঘটনার বর্ণনাতে পূর্ণ। ১৭৮৪ থেকে ১৮২৩ পর্যন্ত ক্যালকাটা গেজেটের Selections সংকলিত হয় Record Commission -এর দ্বারা। এই সংকলন-গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে ১৮৬৪-৬৯ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়; পাঁচ খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৬৯৩। প্রথম তিন খণ্ড সংকলন করেন W. S. Seaton-Karr ও শেষ দু খণ্ডের সম্পাদক David Sandeman— উভয়েই সিবিল-সার্ভিসের লোক। এই সীটন-কারের অনুরোধে নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ করানো হয়; অনুবাদ করার অপরাধে লং সাহেবের কারাদণ্ড হয় ও সীটন-কার গভর্মেণ্ট কর্তৃক ভর্ৎসিত হন। Seaton-Karr ও Sandeman-সম্পাদিত গ্রন্থগুলি ইতিহাসের আকরগ্রন্থ— অতি পরিশ্রমের সঙ্গে সংগৃহীত। এই পাঁচ খণ্ড প্রকাশিত হবার ৯০ বছর পরে ষষ্ঠ খণ্ডে, *The Days of John Company* নামে, ক্যালকাটা গেজেটের অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ ১৮২৪ থেকে ১৮৩২ অব্দ পর্যন্ত তথ্য সংকলন করেন শ্রীঅনিলচন্দ্র দাসগুপ্ত; ভূমিকা লেখেন ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ও মুখবন্ধ লেখেন তৎকালীন মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার (১৯৫০)। পূর্বের পাঁচ খণ্ডের সঙ্গে এই খণ্ডের standard বা মানের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

সমকালীন আর যে একটি ইংরেজি পত্রিকা যা স্বাধীনভাবে নিজ মত ব্যক্ত করত সেটি হচ্ছে 'ক্যালকাটা জর্নাল'; অন্যত্র এই পত্রিকা সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই পত্রিকাতেও সমকালীন বহু তথ্য ও চিত্র পাই।[১]

বাংলাভাষায় উনিশ শতকের গোড়ার চিত্র প্রথম পাই দেওয়ান

---

১ দ্রষ্টব্য, *Selection from the Indian Journal*, Vol. I : Calcutta Journal (1963).

কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের 'আত্মজীবনচরিতে'। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে (১৮৯৭) 'সাহিত্য' পত্রিকায় এই অমূল্য গ্রন্থের কিয়দংশ প্রকাশিত হয়; সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় ১৯০৪ সালে। কিন্তু ইতিপূর্বে আর-একখানি এই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল (১৯০৩)— সেটি শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'। এই উভয় গ্রন্থই পশ্চিমবঙ্গের ও বিশেষ করে রাঢ়দেশের চিত্র হলেও, বর্ণিত বহু সামাজিক চিত্র ও তথ্য অখণ্ড বাংলাদেশ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলে মেনে নিতে পারি। কারণ তখনো ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রসারের দ্বারা সমাজে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত-দের মধ্যে গুণগত ভেদ সৃষ্টি হয় নি; তখন সমাজের প্রায় সকল স্তরের লোকের ধর্মবিশ্বাস-সমাজচেতনাদির মধ্যে বৈষম্য ছিল কম; সংস্কারগত ও শাস্ত্রগত বিদ্যা কারো বেশি ছিল, কারো ছিল কম। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা -প্রসারের ফলে একদল পেল নূতন জ্ঞান, অন্যদল পুরাতন নিয়ে পড়ে রইল। নূতন সমাজে জ্ঞানের যে বৈষম্য দেখা দিল তা এখনো পর্যন্ত দূরীভূত হয় নি। যাই হোক, এই দুখানি বই থেকে আমরা বাংলাদেশের একটা পরিবর্তন-যুগের সংগ্রাম-বেদনার চিত্র পাই।

ইংরেজি সমকালীন সংবাদপত্র ও পত্রিকা মন্থন করে Record Commission কাজ শুরু করেন ১৮৬৪ অব্দে, অর্থাৎ দেওয়ানি পাবার এক শো বছর পরে গভর্মেণ্ট এই তথ্য মন্থন করবার আয়োজন করেন। বাংলা পত্রিকা ১৮১৮ সাল থেকে প্রকাশিত হতে থাকে— কিন্তু সেই সংবাদপত্র-সাহিত্য মন্থন করবার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা গভর্মেণ্ট অগ্রণী হয় নি; বাংলার তথ্যানু-সন্ধানী কর্মবীর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কর্মে একা ব্রতী হন এবং ১৯৩২ সালে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে এই গ্রন্থের পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়— উনবিংশ শতকের ১৮১৮-৪০ সালের তথ্য এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।[১]

রামমোহন যখন কলকাতায় এসে মুষ্টিমেয় ভদ্রের সহায়তায় প্রথমে 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫) ও পরে ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করে (১৮২৮-৩০)

১ এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: শ্রীবিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, তিন খণ্ড।

নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা-পদ্ধতি প্রচারের জন্য চেষ্টা করছিলেন, তখন সারা কলকাতায় ধর্মের আবহাওয়া ছিল সম্পূর্ণ তাঁর প্রতিকূলে।

বাংলাদেশে দুর্গাপূজা এখন প্রায় ন্যাশন্যাল ফেস্টিভ্যাল বা জাতীয় ধর্মোৎসবে পরিণত হয়েছে। সমাচার দর্পণ (১৭ অক্টোবর ১৮২৯) দুর্গাপূজা সম্বন্ধে যে একটি তথ্য প্রকাশ করেন তা থেকে জানতে পারি যে, "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় [১৭১০-৮৩] প্রথমতঃ এই উৎসবে বড় জাঁকজমক করেন এবং তাঁহার ঐ ব্যাপার দেখিয়া ক্রমে২ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আমলে যাঁহারা ধনশালী হইলেন তাঁহারা আপনারদের দেশাধিপতির [ইংরেজের] সমক্ষে ধন সম্পত্তি দর্শাইতে পূর্ব্বমত ভীত না হওয়াতে তদ্দৃষ্টে এই সকল ব্যাপারে অধিক টাকা ব্যয় করিতেছেন।" রাজভয়ে যে পূজা এতকাল সাত্ত্বিকভাবে অর্থাৎ দরিদ্রভাবে অনুষ্ঠিত হত তা এখন রাজসিক হয়ে উঠল।[১]

রামমোহনের সময়ে কলকাতায় অনেকগুলি দুর্গাপূজা হত, তবে নাম-করা উৎসব হত চার-পাঁচটা। শোভাবাজারের রাজবাটীতে পূজার দিন বড়োলাট লর্ড বেন্টিংক ও জঙ্গীলাট কম্বরমী ও প্রধান প্রধান ইংরেজরা আসেন, সেখানে নানা প্রকারের আমোদ-প্রমোদ নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করেন। হিন্দুর পূজাপার্বণে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করে নানাবিধ খাদ্যপানীয় সরবরাহ করা ছিল ধনী বাবুদের উৎসবের প্রধানতম অঙ্গ।

দুর্গাপূজা সে যুগে সংগতিপন্ন প্রায় হিন্দুর গৃহে অনুষ্ঠিত হত, আজও যেমন হয়ে থাকে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের 'পূজার দালান'-এ দুর্গাপূজা হত। বলা বাহুল্য ঠাকুরবংশের ধনাগমের পরই এই পূজার প্রবর্তন হয়। রামমোহনকে দুর্গাপূজায় নিমন্ত্রণ করবার জন্য বালক দেবেন্দ্রনাথ যান; রামমোহন হেসে বলেছিলেন, 'বেরাদার, আমায় কেন, রাধাপ্রসাদকে বলো।' দেবেন্দ্রনাথ বহু বছর পরে নিজে যখন প্রতিমাদির পূজা পরিত্যাগ করেন তখন রামমোহনের এ উক্তির অর্থ বুঝতে পেরে-ছিলেন।

রামমোহন যখন কলকাতায় এসে বাস আরম্ভ করেন তখন সেখানে ও মফস্বলে নানা দেবদেবীর পূজার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অষ্টাদশ শতকের শেষ

---

১ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড (১৩৫৬), পৃ. ১৩৮।

অর্ধ থেকে উনবিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল; তার কারণ রপ্তানি-বাণিজ্য আমাদের অনুকূলে থাকায় বিদেশী মুদ্রার প্রচুর আগম হয়েছিল। এই বিদেশী মুদ্রা দিয়ে পূজার দালান ও অট্টালিকার জন্য কাঁচের বিলাতি ঝাড়লণ্ঠন প্রভৃতি আলোকসজ্জা, মূল্যবান কাষ্ঠাসন, টেবিল, সোফা, কাউচ প্রভৃতি গৃহ-অলংকার এবং আরো কত কী আমদানি হত। এই যুগে পূজাপার্বণ ও বিবাহাদি ব্যাপারে বাঙালী হঠাৎ-ধনী বাবুর দল ধনের ব্যয় ও অপব্যয় কী পরিমাণে করতেন তার সমকালীন বর্ণনা পড়লে অবাক হতে হয়।

কিন্তু বিশ বছরের মধ্যে রপ্তানির বাজারে ঘাটতি ও আমদানির বাজারে বাড়তি হওয়ায়, যে বাণিজ্য ছিল বাঙালীর অনুকূলে তার পটপরিবর্তন হয়ে গেল এবং ধনাভাবে পূজার সংখ্যা ও জৌলুস কমতিমুখী হল। ১৮১৭ অব্দে রামমোহন 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' গ্রন্থে যা লিখেছিলেন তার থেকে জানতে পারি যে, দেশে ধনবৃদ্ধি-হেতু পূজার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। "পূর্ব্বকালে একাল অপেক্ষা··· প্রতিমা প্রচারের অল্পতা ছিলো। ইহার এক প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই হিন্দোস্থানের যে কোনো স্থানের চতুর্দ্দিকে ২০ ক্রোশের মণ্ডলীতে ভ্রমণ করিয়া যদি কেহ দেখেন তবে আমরা অভিপ্রায় করি যে ওই মণ্ডলীর মধ্যে বিংশতিভাগের এক ভাগ প্রতিমা এক শত বৎসরের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এমৎ পাইবেন, আর উনিশ ভাগ এক শত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ইহা দেখিবেন বস্তুত যে২ দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ক্রুটি হইবেক সেই২ দেশে প্রায় পরমার্থ সাধন বিধিমতে না হইয়া লৌকিক খেলার ন্যায় হইয়া উঠে।"[১]

পূজার সময় আজকাল যেমন জলসা বা গানের আসর বসে, সে যুগে তেমনি বাইজীর নাচ ছিল উৎসবের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই-সব বাইজীরা সাধারণত মুসলমানই হত, কারণ অপমানিত নারীকে ইসলাম আর খ্রীষ্টানী ছাড়া আশ্রয় দিয়ে মর্যাদা দান আর কোনো ধর্ম করতে পারে না। ১৮২০ সালে "দুর্গোৎসবে নাচ প্রায় কাহারো বাটীতে হয় নাই তাহার কারণ এই মুসলমান লোকেরদের মহরম প্রযুক্ত মুসলমান বাই লোক প্রায় নাচ

১ রামমোহন গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ ১৭৬।

প্রভৃতি করে নাই।"[১] দশ বছর পরে ১৮৩০ সালেও এই কথা সমকালীন পত্রিকায় লিখিত হয়— "দুর্গোৎসব রাসযাত্রা প্রভৃতিতে যবনীর নৃত্যগীতাদি এবং ইঙ্গরেজের মদ্যমাংস ভোজনাদিতে কোন দোষ দৃষ্টি করেন না।"[২]

১৮১৭ সালে দুর্গোৎসবের যে আড়ম্বর হত, ১৮২৯ সালে সমাচার দর্পণে প্রকাশিত তথ্য থেকে সে আতিশয্যের সংবাদ আর পাওয়া যায় না। "পূর্বে এই দুর্গোৎসবে যেরূপ সমারোহপূর্বক নৃত্যগীতাদি হইত এক্ষণে বৎসর বৎসর ক্রমে ঐ সমারোহ ইত্যাদি হ্রাস হইয়া আসিতেছে।··· পূর্বে পাঁচগুণ ঘটা হইত···।" এর কারণ সম্বন্ধে লেখক বলেন, "কলিকাতাস্থ অনেক বড় বড় ঘর এখন দরিদ্র হইয়া গিয়াছে।" এই দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ, ধনীদের মোকদ্দমা করবার শখ; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার "কহিতেন যে ধনাঢ্য যতলোক সুপ্রিমকোর্টে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই আদালত হইতে মুক্ত হইয়াছেন ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখি নাই।"[৩] ১৮২৯ সালের সমাচার দর্পণ লিখছেন— "উৎসবের যে শোভা হইত তাহা রাহুগ্রস্ত হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার অনেক কারণ দর্শান যায়। কলিকাতাস্থ অনেক বড়২ ঘর এখন দরিদ্র হইয়া গিয়াছে যাঁহারা ইহার পূর্ব্বে মহাবাবু এবং সকল লোকের মধ্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁহারদের মধ্যে অনেকেরি এখন সেই নামমাত্র আছে। কেহ সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমা-করণেতে নিঃস্ব হইয়াছেন, কেহই আপনারদের অপরিমিত ব্যয়ে দরিদ্র হইয়াছেন কেহবা অধিকারের যে অংশকরণেতে [সম্পত্তি পার্টিশন] বাঙ্গালিরা ক্রমেং হ্রাসপ্রাপ্ত হন তাহাকরণে নির্ধন হইয়া গিয়াছেন। এতদ্দেশে পূজা ও বিবাহ ও শ্রাদ্ধ এই তিন ব্যাপার টাকা ব্যয়ের প্রধান কারণ এবং ইহাতে অনেকে দরিদ্র হইয়া যান বিশেষতঃ এই তিন ব্যাপারে সুখ্যাতি প্রাপণার্থে এমত অপরিমিতরূপে ব্যয় করেন যে তাহাতে ঋণেতে একেবারে ডুবিয়া গিয়া পুনর্ব্বার ঐ সকল ব্যাপারকরণে অক্ষম হন। উৎসবের হ্রাস হওনের আরো এক কারণ এই যে জ্ঞানবৃদ্ধি। হিন্দুশাস্ত্রে লেখে যে যাঁহারা জ্ঞানকাণ্ডে আসক্ত তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডে অনাসক্ত কলিকাতাস্থ মান্য

১ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড (১৩৫৬), পৃ ২৫৯।

২ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ৩২০।

৩ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ১৮০।

লোকেরদের মধ্যে এখন বিদ্যার অতিশয় অনুশীলন হইতেছে এই-প্রযুক্ত বহুব্যয়সাধ্য যে কর্ম্মেতে মানসিক সন্তোষ অল্প এবং বহুসম্পত্তির নাশ এমত কর্ম্মেতে লোকেরা প্রবৃত্ত হন না।” ১

সার্বজনিক পূজা চালু হবার পূর্বে শহরের পাড়ায় পাড়ায় ‘বারএয়ারি’ পূজা প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে পূজা ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম, দেবতার সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধ individual-এর, অথবা পুরোহিতের মারফত। গ্রামের চণ্ডীতলা, কালীতলা, ধর্মতলায় সাধারণের যাওয়া-আসায় বা পূজা দেওয়ায় বাধানিষেধ ছিল না। তবে সে-সবের মালিক হচ্ছেন ‘সেবায়েত-দেয়াশি’রা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই-সব দেবস্থানের পূজা ও ভোগাদির ব্যয় বহনের জন্য অতীতকালে কোনো দাতা সম্পত্তি দান করে বা ‘দেবত্র’ সৃষ্টি করে গিয়েছেন। হিন্দু রাজা-মহারাজাই হোন আর মুসলমান নবাব-বাদশাই হোন— সকলেই শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের অপরিমিত পুঞ্জীভূত ধনের দিকে লোলুপদৃষ্টি দিতেন। তাই বুদ্ধিমান লোকে দেবতার নামে উৎসর্গ করে দিত উদ্‌বৃত্তের কিছু অংশ। এটা যে কেবল ভারতের হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য তা নয়, খ্রীষ্টান মুসলমান সমাজেও এই দানরীতি প্রচলিত ছিল। ইতালির বারো-আনি অংশ ছিল পোপের ‘দেবত্র’ সম্পত্তি। মুসলমান-দের মসজিদ ও মক্তবের জন্য ধনীরা দান করে গেছেন ‘ওয়াকফ’ এস্টেট। ভারতবর্ষময় দেবত্র ও ব্রহ্মত্র এবং ওয়াকফ ও পীরত্র সম্পত্তি ছড়িয়ে আছে। আমরা পূর্বেই বলেছি এ-সব সম্পত্তির মালিক আছে এবং ভক্তদের দান তাঁদের প্রাপ্য।

বারোয়ারি পূজা community বা সাধারণের চাঁদা-তোলা টাকা থেকে নিষ্পন্ন হত— যেমন আজকাল সার্বজনিক পূজা শহরে নগরে গ্রামে। বারোয়ারি পূজা বাংলাদেশে অজ্ঞাত ছিল; গুপ্তিপাড়ায় প্রথম এটি উদ্‌ভাবিত হয় আঠারো শতকের শেষ ভাগে।

বারোয়ারি পূজা সম্বন্ধে শ্রীরামপুরের মাসিক *The Friend of India* (মে ১৮২০) যা লেখেন তার থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিরিশ বছর পূর্বে শান্তিপুরের নিকটস্থ গুপ্তিপাড়া গ্রামে ব্রাহ্মণরা সংঘবদ্ধ হয়ে

১ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড (১৩৫৬), পৃ ১৩৮।

এক পূজার আয়োজন করেন। বারোজন সদস্য নিয়ে 'কমিটি' হয় বলে নাম হয় 'বার এয়ারি' বা বারোজন বন্ধুর কাজ। নানা স্থান থেকে হাজার-সাত টাকা তুলে সাত দিন ধরে তাঁরা 'জগদ্ধাত্রী' পূজা করেন। ইতিপূর্বে জগদ্ধাত্রী পূজা অজ্ঞাত ছিল। "The formulas of worship were of course regulated by the established practice of the Hindoo ritual, but beyond this, the whole was formed on a plan not recognized by the Shastras." বাংলাদেশের নানা স্থান থেকে গানের ওস্তাদরা নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন; সাত দিন উৎসব-কোলাহলে গুপ্তিপাড়া মুখরিত হয়ে থাকে। তখন থেকে নানা শহরে ও গ্রামে এই 'বারএয়ারি' পূজা চালু হয়—অবশ্য স্থানীয়রাই নিজ নিজ দেবতার পূজার ব্যবস্থা করতেন।[১]

পূজা-অনিচ্ছুক বা অপারগ লোকের প্রতি সামাজিক অত্যাচার-কাহিনী শোনা যায়। কোনো কোনো শক্তি বা কালী-মন্দিরে 'গুপ্ত' পূজার বিস্তারিত বিবরণ সাময়িক সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। ১৮১৯ সালের নবেম্বর মাসে নবদ্বীপের পশ্চিমে পূর্বস্থলীর নিকট ব্রহ্মাণীতলা নামে এক প্রসিদ্ধ স্থানে "অত্যাশ্চর্য্য রূপ পূজা হইয়াছে তাহার বিবরণ এই অষ্টোত্তর শত ছাগ ও দ্বাদশ মহিষ বলিদান ও চেলীর শাড়ী ও সূতার শাড়ী বিশ পঁচিশখান ও প্রধান নৈবেদ্য আটখান তাহার প্রত্যেক নৈবেদ্যে অনুমান দুই২ মোন আতপ তণ্ডুল ও তদুপযুক্ত উপকরণাদি। এই২ সকল সামগ্রী দিয়া গুপ্ত রূপে পূজা করিয়া গিয়াছে।"[২]

১৮২২ সালের মাঘ মাসে অনুরূপ গুপ্তপূজা তারকেশ্বরের নিকট এক গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমার সম্মুখে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বহুবিধ সামগ্রী ছিল, আট আটটি বাটীতে রক্ত ছিল—অনুমান নরবলি হয়েছিল। "এবং নগদ ৫ পাঁচটী টাকা রাখিয়াছে ও লিখিয়া রাখিয়াছে যে এই তাবৎ সামগ্রী ও পাঁচ টাকা দক্ষিণা সেরাকারি ব্রাহ্মণের কারণ রাখা গেল।"[৩] এই বর্ণনা পড়ে মনে হয় পূজাকারী ব্রাহ্মণকে নরবলি দেবার পূর্বে সরিয়ে দেওয়া হয়। মোট কথা, আমাদের আলোচ্যপর্বে রামমোহন ও তাঁর ক্ষুদ্র বন্ধুগোষ্ঠী

১ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড (১৩৫৬), পৃ ২৬০-৬১, ৪৭৫-৭৬।
২ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ২৫৮ ও ২৬১-৬২।
৩ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ২৬৩।

যখন কলকাতায় বিশুদ্ধ ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত, তখন সারা বাংলাদেশে হিন্দুদের নানা বিশ্বাস-মতে বিচিত্র ধর্মানুষ্ঠান নিষ্পন্ন হচ্ছে।

দুর্গোৎসব ছাড়া রথ, দোল, রাস প্রভৃতি বৈষ্ণবীয় পূজা ও উৎসব খুবই ধুমধামের সঙ্গে সম্পাদিত হত এবং হিন্দু জনতা তাতে যোগ দিত, আজও যেমন দেয়। বাংলাদেশের বাইরে পুরী-জগন্নাথের রথ বহুকাল থেকে খ্যাত; বাংলাদেশে ত্রিবেণী বা মাহেশের রথে আজকালকার মতো তখনো বহুলক্ষ লোক জমায়েত হত। কলকাতার মধ্যে মাড়েদের রথ, চোর-বাগানের মল্লিকদের বাড়ির রথ, জোড়াবাগানের ঘোষেদের রথ ছিল বিখ্যাত। "বহুবাজারে ধরেদের রথ বড় ধুমধামে রাস্তায় গান নৃত্যাদির সহিত সমারোহে অনুষ্ঠিত হইত।" মাহেশের রথ দেখবার জন্য কলকাতা থেকে অনেকে ভাউলে, পানশি করে, সেজেগুজে আমোদ করতে যেতেন। 'হুতোম প্যাঁচার নকৃশা'য় মাতালের মুখে রথের যে বর্ণনা আছে তা আর উদ্ধৃত করলাম না। কলকাতার অনেক 'বাবু' বজরানৌকা ঝাড়লণ্ঠনে সাজিয়ে বাইজী খেমটা নাচ-গান খাওয়া-দাওয়া করতে করতে মাহেশে যেতেন। রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে-বাইরে'র মধ্যে বাবুর নৌকাবিহারের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার পটভূমে সত্যকাহিনী আছে। ধর্মের সঙ্গে অর্থ-উপার্জন ও কাম-চরিতার্থতা যতটা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল, মোক্ষ ছিল ততটাই আলগা। ১৮১৮ সালে মাহেশের রথের সময় খুব বৃষ্টি হয়; রাস্তা নূতন নির্মিত হয়েছিল, তাই রথ বেশিদূর টানা সম্ভব হয় নি। "রথ না চলাতে অনেকের অনেক ক্ষতি হইল যে ব্যক্তি বাজার ইজারা করিল এবং যে ব্যক্তি ঠাকুরের মন্দির ইজারা করিল তাহারদিগের লাভ কিছুমাত্র হইল না এবং দোকানী পসারী কলিকাতা হইতে এবং অন্য২ স্থান হইতে আসিয়াছে তাহারদিগেরও সামগ্রী বিক্রয় না হওয়াতে যথোচিত ক্ষতি হইল।"[১]

এতক্ষণ আমরা হিন্দুদের যে-সব পূজাদির কথা বললাম, তাদের প্রবর্তক ধনী-হিন্দুরা— ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা নির্বাহক ও ফলভোগী, অর্থাৎ পূজার

১ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড (১৩৫৬), পৃ ২৫৫।

আর্থিক লাভটা তাঁদেরই প্রাপ্য হত, অবশ্য সেটা নির্ভর করত ভক্তদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও তাদের দান-বিষয়ে অকৃপণতার উপর। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরাই শাস্ত্রজ্ঞানবিরহিত ও সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ ছিলেন।

তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও ধনীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত পূজাপার্বণের বাইরে, সাধারণ নিম্ন তথা দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে, চড়ক-পূজা ছিল জনপ্রিয়। চড়ক-পূজা শিবের সঙ্গে যুক্ত; কলকাতার পদ্মপুকুরে চড়কতলার গাজনে এখনো ভিড় জমে। সে-যুগের চড়কের বর্ণনা আছে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য়। চড়কে নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের ভিড় বেশি, কারণ তাদের মধ্য থেকে অনেকেই সন্ন্যাসী হয়— এই সময়ে তাদের কী সম্মান! সাময়িক সাহিত্যে[১] কলকাতার চড়কের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা অত্যন্ত বীভৎস; ১৮১৯ সালের চৈত্র-সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত চড়কের যে চিত্র 'সমাচার দর্পণে' (২৪ এপ্রিল) প্রকাশিত হয় তা উদ্‌ধৃত করবার মতো নয়। ১৮২৭ সালের চড়কের কাণ্ডকারখানা দেখে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তা নিবারণ করতে প্রচেষ্ট হন। "হরকরা প্রকাশক লিখিয়াছেন যে এরূপ কর্ম্ম হিন্দুরদের শাস্ত্রসিদ্ধ নয় তথাপি যদি কর্ত্তব্য হয় তবে যাহার তাহাতে অনুরাগ হয় সে কোন নির্জন স্থানে বনে কিম্বা নিজ ভবনে গিয়া তাহা করুক কিন্তু এরূপ ভদ্রলোকের সম্মুখে না করুক।"[২]

চড়কের দেবতা শিব, তারকেশ্বর চড়কের সন্ন্যাসীদের পীঠস্থান। এখনো চড়কের সময়ে তারকেশ্বরে বিরাট জনতার সমাবেশ হয়। তারকেশ্বরের মোহান্তের 'পুণ্যপ্রকাশ' শীর্ষক যে সংবাদ ১৮২৪ সালের ২৭ মার্চের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয় তা ধর্মের পক্ষে অত্যন্ত গ্লানিকর, কারণ এই শ্রেণীর লোক ধর্মগুরুর আসন অলংকৃত করেন। তারকেশ্বরের মোহান্তরা ব্রহ্মচারী, বিবাহ করেন না। শিষ্যদের মধ্য থেকে যোগ্যতমকে গদিতে বসানো হয়— অনেকটা রোমের পোপদের মতো ব্যবস্থা। তারকেশ্বরের মোহান্ত মন্তরাম গিরি তাঁর রক্ষিতার নূতন নাগরকে হত্যা করেন। সেই অপরাধে তাঁর ফাঁসি হয়।[৩] আমাদের যুগে এই তারকেশ্বরের এক মোহান্তের নৈতিক দুর্বলতার কাহিনী প্রচারিত হওয়ায় সত্যাগ্রহাদি হয়েছিল।

১ *Selection from the Calcutta Gazette*, Vol. V, Pp. 301-04.
২ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড (১৩৫৬), পৃ ২৫৮।
৩ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ৩১৯।

অর্ধশতাব্দী পূর্বে কেন্দুলীর মোহান্তকে সকালবেলায় মাঠের মধ্যে লোকে কেটে ফেলে দেয়— শোনা যায়, তিনি সর্বদা বন্দুক নিয়ে চলাফেরা করতেন, সেদিন সকালেই বিনা বন্দুকে বের হয়েছিলেন। মোট কথা, ধর্মের নামে অর্থ ও ঐশ্বর্য বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে জমা হলেই সেখানে শক্তির খেলা, প্রভুত্বের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা এসে পড়বেই। যে ঈশ্বরের নামে মানুষ এক হতে চায় সেই ঈশ্বর চলে যান যবনিকার আড়ালে।

১৭৬৫ থেকে ১৮৩৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের নানা সম্প্রদায়ের ধনী সমর্থকরা কিভাবে নিজ গ্রামে ও তীর্থক্ষেত্রে মন্দিরাদি স্থাপন করে হিন্দুধর্ম রক্ষার ও প্রচারের সহায়তা করেছিলেন, তার সম্যক্‌ আলোচনার ক্ষেত্র কখনো এ গ্রন্থে হতে পারে না। আমরা রামমোহনের সমকালীন সমাজ তথা ধর্ম-জীবনের রূপরেখা কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে অঙ্কিত করবার চেষ্টা করলাম। সকল হিন্দুর পক্ষে যা 'ধর্ম' রূপে স্বীকৃত হবে, রামমোহন জানতেন তাই হবে বিশ্বধর্ম। নিরাকার একেশ্বরের ধ্যান ও উপাসনা ব্যতীত সর্বমানবমিলনকেন্দ্র কোনো বিশেষ প্রতিমা, প্রতীক বা গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ'-গৃহ স্থাপন করে 'ত্রাস্তি'-পত্রে যা লিখেছিলেন তার মধ্যে বিশ্বমানবকে একাসনে বসিয়ে মিলিত করবার ইঙ্গিত রয়েছে। আমরা তার কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করছি—

"যে কোন প্রকার লোক হউক না কেন, যাহারা ভদ্রতাকে রক্ষা করিয়া পবিত্র ও নম্রভাবে বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপিতা অকৃত অমৃত অগম্য পুরুষের উপাসনার অভিলাষ করে, তাহারদের সমাগমের জন্য এই সমাজ-গৃহ সংস্থাপিত হইল। যে কোন লোক, বা যে কোন সম্প্রদায়, নাম রূপ-বিশিষ্ট যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, এখানে তাহার উপাসনা হইবেক না।... যাহাতে বিশ্ব-স্রষ্টা বিশ্বপিতা পরমেশ্বরের প্রতি মন ও বুদ্ধি ও আত্মা উন্নত হয়; যাহাতে ধর্ম্ম, প্রীতি, পবিত্রতা, সাধু-ভাবের সঞ্চার হয়; যাহাতে সকল ধর্ম্মের লোকদিগের মধ্যে একটা ঐক্য-বন্ধন হয়; উপাসনার সময় এই প্রকার বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, স্তোত্র, গান ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ব্যবহৃত হইবেক না।"[১]

---

১ ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত, ফাল্গুন ১৭৮২ শক। ২১১ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

চতুর্থ অধ্যায়

আমরা বাংলাদেশের যে রেখাঙ্কন করলাম, সেই পরিবেশের মধ্যে রামমোহনের জন্ম হয় এবং তাঁর ধর্ম ও কর্ম-ময় জীবনের পনেরো বছর অতিবাহিত হয় কলকাতায়। দেশের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁর জীবনের যে বিবর্তন ঘটেছিল সেটাই তাঁর জীবন-আলেখ্যের বর্ণনীয় বিষয়। আমরা আগেই বলেছি, আঠারো শতকের সাত দশকের বাংলাদেশ ও উনিশ শতকের তিন দশকের বাংলাদেশের মধ্যে বস্তুগত যত পরিবর্তন হয়েছিল, চিত্তগত বিবর্তন তার থেকে কিছু কম হয় নি। এক দিকে বাঙালীর চিত্তে এসেছিল বিদ্রোহ, তেমনি পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে রাখবার তীব্র বাসনা জেগেছিল যুগপৎ। জীবমাত্রকেই দেশ ও কাল নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু দেশ ও কালের প্রভাবকে স্বীকার করেও যিনি তাকে উত্তীর্ণ হন তিনিই মহাপুরুষ। তাঁর দেহে-মনে অতীত ও বর্তমান কালের স্পর্শ থাকলেও তাঁর ভার থেকে তিনি অনেকটা মুক্ত, আর অন্তর্দৃষ্টিবলে ভাবী-কালকে তিনি অনুভব করতে পারেন দেহের শিরায় শিরায়—অচেতন মনের রুদ্ধ আবেগের মধ্যে। সেই ভাবী-কালের আবির্ভাবের পথ উন্মোচন করতে হয় ধ্যানযোগে উপলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা, কঠিন শ্রমের দ্বারা। যুগ-যুগান্ত থেকে মানুষ প্রকৃতির গুপ্ত ঐশ্বর্য আর সুপ্ত শক্তিকে কঠিন আঘাত দিয়ে দিয়ে এবং কঠিনতর আঘাত পেয়ে পেয়ে উদ্ঘাটিত করে আসছে। মানুষের মতো মানুষ যাঁরা তাঁরা চির-মানব-মনের অন্তরে অবগাহন করে, আপনার বংশগত ভাষাগত ধর্মগত রাষ্ট্রগত সমাজগত বিচিত্র সংস্কারের বহু আবরণ ভেদ করে বিশ্বের মুক্ত অঙ্গনে এসে দাঁড়ান। কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার হয়ে এসেছেন যিনি তাঁকেই বলি নরোত্তম।' তাঁদেরই অন্যতম রামমোহন।

রামমোহনের ধর্ম ও কর্মের জীবন শুরু হয় কলকাতায়—তাঁর বেয়াল্লিশ বছর বয়সের পর। কিন্তু তাঁর ধর্মজীবনের সূচনা বা প্রেরণার অন্তরালে কোনো অনৈসর্গিক ঘটনা আমরা আবিষ্কার করতে পারি নি। যুক্তিবাদী ব্রাহ্মদের হাতে পড়ে তাঁর সম্বন্ধে miracles প্রশ্রয় পায় নি; তাই রামমোহন নরোত্তমই থেকে গেলেন—দেবত্ব বা পূর্ণ-ব্রহ্মত্ব লাভ করে 'পূজা' পাবার

অবকাশ পেলেন না। তিনি মানুষই থেকে গেলেন এবং সেইজন্য আমরা তাঁকে মানুষের মতো করেই দেখে আসছি, তাতে তাঁর মর্যাদার হানি হয় নি। তবে কিছু কিছু legends যে তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নি তা বলতে পারি নে। সেরকম অতিশয়োক্তি অনেকের সম্বন্ধেই মুখে মুখে রটনা হয়। সৌভাগ্যক্রমে বৈজ্ঞানিক গবেষণাপদ্ধতি দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়ে অনেক গল্পগুজবই এখন বর্জিত হয়ে গেছে তাঁর জীবনী থেকে। এই মানুষ রামমোহন, এই জ্ঞানী ও ধ্যানী রামমোহনের উপরে কোনোপ্রকার অলৌকিকত্ব আরোপ না করেও তাঁকে শতগুণ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতে দেখা যায়।

ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করলেও রামমোহনের পাঁচপুরুষের মধ্যে কাউকে কোশাকুশি নিয়ে ত্রিসন্ধ্যা করে, যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রভৃতি সদ্-ব্রাহ্মণোচিত কর্মে লিপ্ত হয়ে জীবিকা অর্জন ও জীবন যাপন করতে দেখি নে। অপ্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণ-আদর্শ বহুকাল দেশ থেকে লুপ্ত। রামমোহনের পিতৃ-পিতামহেরা সাধারণ মানুষের মতোই বিষয়ভোগী ও বিষয়ী ছিলেন, তৎসত্ত্বেও ব্রাহ্মণত্বের গৌরব বহন করতেন— আজকালকার চাকুরিজীবী অথবা বৈশ্য-বৃত্ত ব্রাহ্মণদের মতোই। বলতে গেলে মুর্শিদকুলি খাঁর সময় থেকে বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত চাকুরে সমাজের উদ্ভব হয়। রামমোহনের অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ বাংলার স্বাধীন নবাব-সরকারে চাকরি করে 'রায়' উপাধি পেয়েছিলেন, আসলে তাঁরা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এঁরা ছিলেন সুরাই মেলের ব্রাহ্মণ। বর্তমানে কুলীন, ভঙ্গজ, মেল, কাপ প্রভৃতি শব্দের অর্থ ঝাপসা হয়ে এসেছে; কিন্তু আমাদের আলোচ্যপর্বে এই-সব নিয়েই ছিল সমাজ তথা সমাজপতিদের গুরুতর ভাবনা।

রামমোহনের নামে ছড়া চলিত হয়—

> "সুরাই মেলের কুল,
> বেটার বাড়ি খানাকুল,
> ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে ইস্কুল।"

খানাকুল এখন হুগলি জেলার অন্তর্গত। তখন জেলা ভাগ হয় নি— বর্ধমান চাকলার মধ্যে ছিল এই গ্রাম। রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র এখানে এসে বাস করেন সর্বপ্রথম; পরে দ্বারকেশ্বর নদীর ওপারে রাধানগরে গিয়ে বসতি আরম্ভ করেন। দ্বারকেশ্বরের এক তীরে কৃষ্ণনগর, অপর তীরে

রাধানগর ; নদিয়ার কৃষ্ণনগরের সঙ্গে নামের পাছে গোলমাল হয়, তাই লোকে বলত খানাকুল কৃষ্ণনগর। রাধানগরে রামমোহনের জন্মস্থান ; বহু বছর পরে সেখানে একটি ক্ষুদ্র মন্দির স্থাপন করা হয়—স্মারকরূপে। দক্ষিণ-রেলপথের কোলাঘাট স্টেশন থেকে স্টীমারযোগে রানীচক ও সেখান থেকে নৌকায় বা মোটরযানে খানাকুল যাওয়া যায়।

রামমোহনের পিতামহ ব্রজবিনোদ আলিবর্দী খাঁর সেরেস্তায় বড়ো চাকুরে ছিলেন। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ-আলম্ যখন পূর্বদেশে ছিলেন তখন তিনি তাঁর অধীনে কর্মচারী হিসেবে খুব সুনাম অর্জন করেন। ব্রজবিনোদ সিরাজ-উদ্দৌলার সময়েও মুর্শিদাবাদে চাকুরি করতেন ; শোনা যায় তাঁর প্রতি কোনো অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদে ব্রজবিনোদ কার্য ত্যাগ করে স্বগৃহে ফিরে আসেন।

রামমোহনের পিতা রামকান্তও জীবিকার জন্য মুর্শিদাবাদে চাকুরি করতে যান, কিন্তু তাঁর প্রতিও অসদ্‌ব্যবহার করা হয় এবং সেইজন্য তিনিও চাকুরিতে ইস্তফা দেন। তবে মুর্শিদাবাদেই যে রামকান্তের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে, তা নয়। জীবনভোর তিনি ভাগ্যদেবীর সঙ্গে সংগ্রাম করে যান, তবুও চঞ্চলা লক্ষ্মীকে বাঁধতে পারেন নি।

ইংরেজের দেওয়ানি লাভের সাত বছর পরে রামমোহনের জন্ম হয়। তখন বাংলাদেশ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর সবেমাত্র ডাঙা পেতে শুরু করেছে। ওয়ারেন হেস্টিংস গবর্নর হয়েছেন ১৭৭২ অব্দে—রামমোহনের জন্ম হয় ২২ মে ১৭৭২ অব্দে। তবে এ বিষয়ে মতভেদ যথেষ্ট ছিল এবং এখনো যে তা সম্পূর্ণভাবে নিরাকৃত হয়েছে তাও নয়— একদল বলেন রামমোহনের জন্মের সালটা হবে ১৭৭৪ অব্দ।

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সেটা অত্যন্ত সাধারণ জীবতাত্ত্বিক ঘটনা ও ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে সামাজিক সংবাদ মাত্র থাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই মানুষটি যদি কোনোভাবে সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে সক্ষম হন তখনই তাঁর জীবনকথা জানবার জন্যে লোকে কৌতূহলী হয়। রামমোহন জন্মালেন রামকান্ত রায়ের সংসারে— তৃতীয় সন্তান বা দ্বিতীয় পুত্র। কেউ তাঁর ঠিকুজি বা জন্মকোষ্ঠী করে নি ; তাই রামমোহনের জন্মকাল সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার অভাব আজও রয়ে গেছে।

রামমোহনের মাতৃকুল ছিল গোঁড়া শাক্ত, পিতৃকুল নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। মাতা তারিণীদেবী নিষ্ঠাবতী দৃঢ়চরিত্রা মহিলা, তাই মায়ের সঙ্গে রামমোহনের কোনোদিন বনিবনা হয় নি; ধর্মত্যাগী বলে তারিণীদেবী পুত্রকে বিষবৎ দেখতেন।

পিতা রামকান্ত বিষয়ী মানুষ। তিনি চেয়েছিলেন রামমোহন লেখাপড়া শিখে বিষয়সম্পত্তি দেখাশুনা করেন। তখনকার দিনে সরকারে চাকুরি পেতে হলে ফার্সিভাষা শিখতে হত। মাতামহের ইচ্ছা দৌহিত্র সংস্কৃত শিখে শাস্ত্রচর্চা করেন। রামমোহন সবার ইচ্ছাই পূর্ণ করেন— ফার্সি ও সংস্কৃত দুইই শেখেন, শাস্ত্রচর্চা করেন, এবং বিত্তশালীও হন। রামমোহন 'অর্থ অনর্থের মূল' এ-কথা মুখে আউড়িয়ে তার পেছন পেছন ঘুরে বেড়াবার আদর্শবাদে বিশ্বাস করতেন না।

ফার্সিভাষা রাজভাষা ছিল মুঘলযুগে। ইংরেজ আমলের গোড়া থেকে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ফার্সি ছিল সরকারী দপ্তরের ভাষা। উনিশ শতকের গোড়ায় মুষ্টিমেয় লোক ইংরেজি শেখে; সামান্য বিদ্যা হলেই কোম্পানির ঘরে, বানিয়াদের আপিসে কাজ জুটত। কলকাতার বাইরে গ্রামাঞ্চলে সাধারণের শিক্ষার অবস্থা কী ছিল তা অ্যাডাম সাহেবের 'ভার্নাকুলার' শিক্ষার অবস্থা বিষয়ক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, তবে তা য়ুরোপের বহু দেশের শিক্ষার অবস্থা থেকে খুব বেশি পার্থক্যযুক্ত নয়। রামমোহনের শৈশবে, অর্থাৎ ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে, বাংলাদেশে পাঠশালায় পড়ার জন্য কোনো প্রকার পুস্তক ছিল না; কারণ ১৮১৮ সালের আগে শিশুপাঠ্য পুস্তক লিখিত বা মুদ্রিত হয় নি। রামমোহনকে মুখে মুখে শ্লোক শুভঙ্করী শিখতে হয়, আর তালপাতায় হাতের লেখা মক্স করতে হয়। শহরের প্রান্ত-বাসী মুসলমানরা কাগজ বানাত— শ্লেট, পেন্‌সিল সবই বহুকাল পরে এসেছে।

সে যুগে ভদ্রলোকের ছেলেদের ফার্সি শিখতেই হত— কিন্তু তখন রাধানগরের গ্রামে ফার্সি শিক্ষার কী ব্যবস্থা ছিল তা স্পষ্ট করে জানা যায় না। তবে মনে হয় কিছুটা শিখে রামমোহন তার পর পাটনা গিয়েছিলেন ভালো করে রাজভাষাকে আয়ত্ত করবার জন্যে। ফার্সি কিভাবে ও কতটা শেখানো হত তার বিস্তারিত খবর পাই কার্তিকেয় চন্দ্র বসুর আত্মজীবনী

থেকে। সেটা ১৮৩০-৩১ অব্দের খবর হলেও পঞ্চাশ বছর পরের ফার্সি-শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে তার বিশেষ কিছু তফাত ছিল না। বোধহয় একটু বেশি বয়স হলে রামমোহন পাটনায় যান ফার্সি শেখবার জন্যে। রামমোহন পাটনায় ফার্সি শিখে যে কেবল মুসলমানদের শাস্ত্র পড়েছিলেন তা নয়; আমাদের মনে হয় শিখদের একেশ্বরবাদ ও অমূর্ত উপাসনাদিও তিনি দেখে থাকবেন। পাটনা গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্মস্থান (১৬৬৬), সেখানে তকৃত পাটনা সাহেব বা গুরুদ্বার হরমন্দির সাহেব অবস্থিত। ১৭৮১ অব্দে সার চার্লস্ উইলকিন্স্ এখানে উপস্থিত হন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিখদের ধর্মকার্য পর্যবেক্ষণ করেন।[১] রামমোহনের মতো বুদ্ধিমান ও অনুসন্ধিৎসু বালক পাটনার শিখ গুরুদ্বার নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। পরযুগে ব্রাহ্মসমাজ-স্থাপনকালে গুরুদ্বারের মৃদঙ্গাদির সাহায্যে গান, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছিল কি না ভাববার বিষয়। ইসলামে সংগীতাদি নিষিদ্ধ ছিল।

রামমোহন কাশীতেও ছিলেন সংস্কৃত শিখবার জন্যে। এ-সবের বিস্তারিত সংবাদ জানবার বিশেষ কোনো উপায় নেই; কারণ তখনকার দিনে কত ছাত্র দেশ বিদেশ থেকে এসে অন্নছত্রে খেয়ে পড়াশুনা করত—কে তাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রাখত।

রামকান্তর ভাগ্যোদয় ও ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ সে যুগের ভূমিব্যবস্থা বা রাজস্ব-বিষয়ক আইনের কঠোরতা। লর্ড কর্নওয়ালিস-কৃত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে প্রায় ত্রিশ বছর জমিজমার মালিকানা, শর্ত ও অধিকার নিয়ে অনেক পরীক্ষা হয়। এই অব্যবস্থিত অবস্থায় অনেকেরই ধনাগম হয় যেমন, অনেকে তেমনি আবার নিঃস্বও হয়ে পড়েন। রামকান্ত অনেক তালুক-মুলুক কিনে ভেবেছিলেন, আরামে জীবন কাটাবেন, কিন্তু বিধি বাম।

রামকান্ত ১৭৯৬ অব্দে তাঁর বিষয়সম্পত্তি দানপত্র দ্বারা পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেন। সেকালের আইন এমন ছিল যে সামান্য খাজনার দায়ে ষোলো-আনিতে টান পড়ত, তাই বোধহয় পিতা পুত্রদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দানপত্র সম্পাদিত করেন। রামমোহনের অংশে দু-একটি মূল্যবান

[১] *Indian Studies*, Vol. III, No. 2: Gonda Singh.

সম্পত্তি পড়েছিল ; রাজস্ব আদায়ের খরচ বাদে তাঁর হাতে প্রায় বাইশ হাজার টাকা উদ্‌বৃত্ত থাকত। রামমোহন বুদ্ধিমান হুঁশিয়ার যুবক। কলকাতায় যাওয়া-আসা করেন, নানা লোকের সঙ্গে মেশেন। তখন শহরে বহু ইংরেজের বাস ; তাদের মধ্যে অনেকেরই আয় থেকে ব্যয় বেশি, অভাব তাদের লেগেই থাকে। তখনো ব্যাঙ্ক হয় নি— টাকা ধার পাবার কোনো উপায় ছিল না। এই-সমস্ত সাহেবদের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা কী ছিল তার চিত্র পাওয়া যাবে Busteed-এর *Echoes from Old Calcutta* গ্রন্থে। রামমোহন এই-সব সাহেবদের টাকা ধার দিতে আরম্ভ করলেন, যেমন আরো দশজন ধনী 'বাবু' কলকাতায় বসে লগ্নি কারবার করতেন। লগ্নি কারবারের সূত্রে অনেক ইংরেজের সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় হয়। আমরা জানতে পারি, অ্যাণ্ড্রু র‍্যাম্‌জে নামে এক 'রাইটার' সাহেবকে সাড়ে সাত হাজার টাকা ধার দেন তিনি— অবশ্য এটর্নির ঘরে দলিলাদি লিখিত হয়। সাহেবদের সঙ্গে সেই পরিচয়ের সুযোগে ইংরেজি ভাষাটা তিনি ভালো করে শিখে ফেলেন। তা ছাড়া, সদর-দেওয়ানী আদালতে মুসলমানী আইন বোঝাবার জন্যে যে-সব মৌলানা ছিলেন তাঁদের সঙ্গেও তিনি পরিচিত হন। ফার্সি ও আরবি ভাষার চর্চাটা ঝালিয়ে নিতেন এঁদের সঙ্গে মোলাকাত করে। বলা বাহুল্য, ভাষাটা ভাবের বাহক— ফার্সি ও আরবির মাধ্যমে তিনি য়ুরোপীয় প্রাচীন দর্শন ও বিজ্ঞানের যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন তার পরিচয় আমরা দেব 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন' আলোচনা-কালে।

কলকাতায় লগ্নির কারবার করার সময়ে টমাস্ উডফোর্ড নামে এক ইংরেজ রাজকর্মচারী রামমোহনের অধমর্ণ হন। সাহেবরা ধার সম্বন্ধে জানা-জানি বিষয়েও খুব হুঁশিয়ার ছিল ; তাই প্রাইভেট লোকের কাছে তারা টাকা ধার করত। উডফোর্ড যখন ঢাকার কলেক্টর সেই সময়ে তিনি রামমোহনকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন (মার্চ ১৮০৩) ; কিন্তু কয়েক মাস পরেই ঐ কাজ তিনি ছেড়ে দেন। বোধহয় পিতার অসুস্থতার খবর পেয়েই তিনি কলকাতা যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে অনেক সাংসারিক পরিবর্তন হয়ে গেছে। বাকি খাজনার দায়ে ১৮০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে রামকান্ত রায় হুগলির দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ ও পরের বছর রামমোহনের জ্যেষ্ঠ জগমোহন, যাঁর পৃথক সম্পত্তি ছিল, তিনিও রাজস্ব-অনাদায়ের জন্য মেদিনীপুর দেওয়ানী

জেলে আটক পড়েন।[১] রামমোহন যখন ঢাকা হতে প্রত্যাবর্তনের পথে, তখন বর্ধমানের বাড়িতে রামকান্তর মৃত্যু হয়—পুত্রের সঙ্গে পিতার অন্তিমকালে সাক্ষাৎ হয় নি। জ্যেষ্ঠপুত্র জগমোহন মেদিনীপুর জেলেই পিতার শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করেন; রামমোহন-কর্তৃকও পৃথকভাবে কলকাতায় পিতৃশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বোধহয় জননী তারিণীদেবী এই ম্লেচ্ছভাবাপন্ন পুত্রের অর্থে স্বামীর শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন হয় তা চান নি, তাই অলংকারাদি বন্ধক দিয়ে নিজগ্রামে তিনিও স্বামীর শ্রাদ্ধ করিয়েছিলেন। মাতা-পুত্রে মিলন হল না— পিতার মৃত্যুর পরেও। তবে শেষকালে তারিণীদেবী বুঝতে পেরেছিলেন পুত্রের মহত্ত্ব কোথায় এবং একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবার পর তিনি পুরী-শ্রীক্ষেত্রে বাস করতে যান, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

১৮০৩ অব্দে রামমোহনের অধমর্ণ র‍্যাম্‌জে ও উডফোর্ড উভয়েই মুর্শিদাবাদে চলে যান। সে সময় রামমোহন সেখানে কিছুকাল বাস করেন। এইখানে বাসকালে রামমোহন তাঁর প্রথম বই 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন' লিখে প্রকাশ করেন বলে মনে হয়। তখন ফার্সি-আরবি বই লিথো করে ছাপা হত— মুর্শিদাবাদেও তার ব্যবস্থা ছিল। রামমোহন পরে লেখেন যে, "In order to avoid any future change in the book by copyists I have had these few pages printed just after completion." এই বই সম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বহুবিস্তারে আলোচনা করেছেন রামমোহনের জীবনীগ্রন্থে। আমরাও পরে সামান্যভাবে এই ছোটো কিতাবটির কথা আলোচনা করব।

কলকাতায় আসা-যাওয়ার সময়ে রামমোহনের সঙ্গে আর-একজন ইংরেজ-যুবকের পরিচয় হয়, ইনি উইলিয়ম ডিগ্‌বি— সন্থনিযুক্ত সিবিলিয়ান ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষানবীশ। এঁর সঙ্গে পরিচয় বিশেষভাবে স্মরণীয়, কারণ রামমোহনের এতবড়ো বন্ধু আর ছিল না। ১৮০৫ থেকে

---

১ লর্ড কর্নওয়ালিসের ভূমিব্যবস্থায় জমিদারগণ কর্তৃক সরকারকে ১০/১১ অংশ রাজস্ব দিতে হত। রিকার্ডস্ পার্লামেণ্টে এই কথা তুলে প্রতিবাদ করেন (2,14 June 1813): "...the exorbitance of this land tax completely destroyed, from the beginning, all the other benefits of the permanent system of Lord Cornwallis and counteracted the good effects..."

—Robert Rickards, The Speeches in the Debate in Parliament on the Renewal of the Charter of the...East India Company...1814.

১৮১৪ অব্দ পর্যন্ত দশ বছর ডিগ্‌বির সঙ্গে নানা ভাবে তিনি যুক্ত ছিলেন। ডিগ্‌বির সঙ্গে প্রথমে রামমোহন রামগড়ে যান; রামগড় হাজারিবাগের প্রধান শহর সে সময়ে। রামগড়ের পর ডিগ্‌বির সঙ্গে যশোহর, যশোহর থেকে ভাগলপুর ও সর্বশেষে ভাগলপুর থেকে রংপুর যান। ভাগলপুরে তিনি দীর্ঘ দিন বাস করেন। ভাগলপুরের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। ১ জানুয়ারি ১৮০৯ অব্দে রামমোহন ভাগলপুরে পৌঁছান। তখনকার দিনে নৌকাই ছিল যাওয়া-আসার বাহন। ঘাটে নেমে রামমোহন পাল্‌কি চড়ে সহরের ভিতর যাচ্ছেন। পথের পাশে একটা ইঁটের পাঁজার উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন কলেক্‌টর স্যর ফ্রেডারিক হ্যামিলটন। একজন দেশীয় লোককে তাঁর সুমুখ দিয়ে পাল্কি চড়ে যেতে দেখে তিনি অপমানিত বোধ করলেন, এবং প্রথমে পাল্কি থামাতে বললেন, তার পর ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে গিয়ে রামমোহনের পথ আটকে তাঁকে খুব অপমান করলেন। রামমোহন তাঁকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলেন যে তিনি কলেক্‌টর সাহেবকে দেখেন নি। কিন্তু কে কার কথা শোনে। স্যর ফ্রেডারিকের ক্রোধ শমিত হল না দেখে রামমোহন পাল্কি চড়েই নিজগৃহে চলে গেলেন। এর পরে তিনি এক আবেদনপত্রে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে বড়োলাট লর্ড মিন্‌টোর কাছে পাঠিয়ে দিলেন! এটিই বোধ হয় তাঁর প্রথম ইংরেজি রচনা। আমাদের মনে হয় ডিগ্‌বি-সাহেব এই খসড়া রচনায় সাহায্য করেছিলেন।

স্যর ফ্রেডারিককে বড়োলাট বোধ হয় তিরস্কার করেছিলেন। কিন্তু এতে ফল হয়েছিল বিপরীত। কলকাতার সরকারী সাহেব কর্মচারীমহল রামমোহনের উপর হাড়ে হাড়ে চটে রইলেন। এর জন্যে তাঁকে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। গবর্মেণ্টের কাছে লিখিত পত্র ও ন্যায্য দাবি চাপা দিয়েছেন বা নাকচ করেছেন এই শ্বেতাঙ্গ-দল।

রংপুরে যে পাঁচ বছর ছিলেন তার মধ্যে সবটাই তিনি সরকারী কাজে লিপ্ত ছিলেন না। বেশির ভাগ সময় ডিগ্‌বির ব্যক্তিগত দেওয়ানের কাজ করেন। ডিগ্‌বি তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনিও ডিগ্‌বিকে সম্মান দিতেন বলে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধবোধ কারও মধ্যেই ছিল না। য়ুরোপীয় ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শনের বহু গ্রন্থ তিনি ডিগ্‌বির কাছ থেকে পান এবং এতে তাঁর ইংরাজি ভাষা চর্চার সুবিধা হয়।

✓ রংপুর-বাস-কালে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী তাঁর কাছে এসেছিলেন ; হিন্দু-শাস্ত্রের প্রতি তাঁর দৃষ্টি এই অবধূতের দ্বারাই আকৃষ্ট হয়। হরিহরানন্দর সঙ্গে রামমোহনের সম্বন্ধের কথা আমরা অন্যত্র আলোচনা করব। এখানে থাকা কালেই তিনি বেদান্তের অনুবাদ শুরু করেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা কিন্তু তাঁর এই কাজকে আদৌ ধর্মসংগত কাজ বলে মনে করতেন না—শূদ্রেরা শাস্ত্র পড়ে ফেলবে এই তাঁদের আপত্তি ও আশঙ্কা।

রংপুর-বাস-কালেই রামমোহনকে ভুটান যেতে হয় অপর একজন বাঙালি কর্মচারীর সঙ্গে। ভোট-রাজের সঙ্গে কোচবিহারের সীমান্ত নিয়ে প্রায়ই বিবাদ হত— সেই বিরোধ যাতে গুরুতর আকার ধারণ না করে তারই জন্য ভুটানরাজকে সমঝাতে হবে। তা ছাড়া তখন নেপাল-যুদ্ধ চলছে ; ইংরেজের ভয়, পাছে ভোটরা গুর্খাদের পক্ষ অবলম্বন করে।[১]

ভুটান-দরবারের সঙ্গে যে-সব পত্রালাপ হয় তা ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন -সম্পাদিত 'প্রাচীন বাংলাপত্র সংকলন' (১৯৪২) গ্রন্থে উদ্‌ধৃত হয়েছে। ভূমিকায় লিখিত হয়েছে : "এই সময়ে বাঙ্গালা দেশ হইতে সীমানা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ভুটানে উকিল পাঠাইবার অনিবার্য প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ভুটান-ভ্রমণ তখনকার দিনে নিতান্ত সহজও ছিল না। কৃষ্ণকান্ত ও রামমোহনের পূর্বে মাত্র দুইজন ইংরেজ কর্মচারী— জর্জ বোগ্‌ল (Bogle) ও কাপ্তেন টার্ণার (Turner) ভুটানে গিয়াছিলেন।' ভুটানের কাগজপত্রে রামমোহন কলেক্টরের দেওয়ান রূপে বর্ণিত হয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে একদল লোক প্রমাণ করতে চান যে, রামমোহন সঙ্গে ছিলেন মাত্র। ১৮১৫ অব্দের শেষ ভাগে এই সফর হয়েছিল বলে মনে হয়। পত্রাদি পাঠ করলে বেশ বোঝা যায় যে, রামমোহন এই দৌত্যকার্যের নেতা ছিলেন। কারণ ভুটান-দরবারের পত্র-মধ্যেও রামমোহনের নামই প্রথম করা হয়। যিনি নেতা তাঁরই নাম প্রথমে করা স্বাভাবিক।

১৮১৫ সালের গোড়া থেকে পাকাপাকিভাবে রামমোহন কলকাতায় বসবাস শুরু করেন ; ইতিপূর্বে ১৮১৪ সালে তিনি দুখানি বাড়ি কিনেছিলেন—

[১] কেরী ভুটানে মিশনারী রবার্টসনকে পাঠান ; তিনি বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। তবু মিতালি করে আসেন। নানা উপহারের মধ্যে একটি ঘড়ি দেন রাজাকে— সেটাই খুব কৌতুকের জিনিস, কারণ সেটা টিক্ টিক্ করে। তারা সময় দেখে না, কান দিয়ে টিক্ টিক্ শব্দ শোনে।

একখানি চৌরঙ্গি-পাড়ায়, দ্বিতীয়টি মানিকতলায়। ছুটি বাড়িই সাহেবদের কাছ থেকে কেনা। দ্বিতীয় বাড়িটি বর্তমানে কলকাতার পুলিসের আপিস—সার্কুলার রোডে চলাফেরার সময় অনেকেরই চোখে পড়ে, ফলকে লেখা আছে, রামমোহন এখানে বাস করতেন। আমহার্স্ট স্ট্রীট ও সুকিয়া স্ট্রীটের মোড়ে যে লাল বাড়ি আছে তার সঙ্গে রামমোহনের কোনো স্মৃতি জড়িত আছে বলে তথ্য সুস্পষ্ট নয়।

রামমোহনের জীবনে অনেক আঘাত আসে—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে। আত্মীয়দের কাছ থেকেও আঘাত ও অপমান তিনি কিছু কম পান নি। পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি রামমোহন নষ্ট তো করেনই নি, বরং বুদ্ধিবলে নানা ভাবে তার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। সাধারণত লোকে অপরের বৈষয়িক উন্নতি দেখলে দ্বেষান্বিত হয়; অন্যে যে নিজের গুণে বা শক্তিতে ধনী হতে পারে, এ-কথাটি দুর্বলচিত্ত লোকে কিছুতেই স্বীকার করতে চান না। একে রামমোহনের বৈষয়িক উন্নতি, তায় ধর্ম সম্বন্ধে রামমোহনের মত প্রচলিত হিন্দু-সংস্কার-বিরোধী হওয়ায় তাঁর আত্মীয়রাও শত্রু হয়ে ওঠেন। রামমোহনের মৃত জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ তাঁর নামে যে মামলা করেছিলেন তার সওয়ালে প্রতিবাদী পক্ষ থেকে যে প্রশ্নগুলি করা হয় সেগুলি পড়লেই জানা যায়, কী পরীক্ষার মধ্য দিয়ে রামমোহনকে দিনাতিপাত করতে হচ্ছিল।

তারিণীদেবীকে যে জেরাগুলি করার জন্য খসড়া তৈরি হয়, আমরা তার তর্জমা উদ্ধৃত করছি; বোধ হয় এই সওয়ালের সম্ভাবনায় গোবিন্দপ্রসাদ খুল্লতাতের কাছে ক্ষমা চেয়ে পত্র লিখে মামলা উঠিয়ে নেন। তারিণী দেবীর জন্য এই প্রশ্নগুলির খসড়া করা হয়েছিল—

"আপনার পুত্র রামমোহনের ধর্ম্মমতের জন্য তাহার সহিত আপনার কি বিবাদ ও মনান্তর হয় নাই এবং আপনি যে-ভাবে হিন্দুধর্ম্মের পূজা-অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করেন সেই সকল করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় প্রতিশোধস্বরূপ কি আপনি আপনার পৌত্রকে মকদ্দমা করিতে প্ররোচিত করেন নাই? আপনি বাদী এবং আপনার অন্য পরিজনেরা কি রামমোহনের রচনাবলী ও ধর্ম্মমতের জন্য তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই? আপনি কি বার-বার বলেন নাই যে, আপনি রামমোহনের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে চান,

এবং ইহাও কি আপনি বলেন নাই যে, ইহাতে পাপ হওয়া দূরে থাকুক, রামমোহন পূর্ব্বপুরুষের আচার পুনরায় অবলম্বন না করিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিলে পুণ্যই হইবে? আপনি কি সর্ব্বসমক্ষে বলেন নাই, যে-হিন্দু প্রতিমাপূজা ত্যাগ করে, তাহার প্রাণ লইলেও পাপ নাই? হিন্দুধর্ম্মের প্রতিমাপূজা-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি করিতে কি রামমোহন প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করেন নাই? বাদী, আপনি এবং বিবাদীর অন্য আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কি এই বিষয়ে পরামর্শ হয় নাই? ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিবাদী যদি আপনার ইচ্ছা ও অনুরোধ এবং পূর্ব্বপুরুষের প্রথার বিরুদ্ধাচরণ না করিতেন, তাহা হইলে এই মকদ্দমা হইত না— এ-কথা আপনার জ্ঞান ও বিশ্বাস মত শপথ করিয়া অস্বীকার করিতে পারেন কি? বিবাদী প্রতিমা-পূজা বজায় রাখিতে অস্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিবার জন্য যথা-সাধ্য করা, এমন কি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াও কি আপনার বিবেকবুদ্ধিতে অনুচিত নয় বলিয়া বিশ্বাস করেন না? এই মকদ্দমা আরম্ভ হইবার পর আপনি নিজে বিবাদীর কলিকাতাস্থ সিমলার বাড়ীতে আসিয়া কি বিগ্রহের সেবার জন্য কিছু জমি চান নাই? বিবাদী কি উহার পরিবর্তে দরিদ্রের সাহায্যের জন্য অনেক টাকা দিতে চাহেন নাই, এবং প্রতিমা পূজার জন্য কোনরূপ সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন নাই? তখন কি আপনি বিবাদীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করাতে বিবাদীর উপর বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই?"[১]

তারিণীদেবীকে শেষ পর্যন্ত আদালতে উপস্থিত হতে হয় নি, এবং রাম-মোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দ, যে মামলা রুজু করেছিল, সে খুল্লতাতের কাছে ক্ষমা চেয়ে পত্র দিয়ে মামলা উঠিয়ে নেয়।

এই-সব পারিবারিক অশান্তির মধ্যেও রামমোহন তাঁর জীবনের কাজ করে গেছেন— ধর্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, রাষ্ট্রবিধি-সংস্কার প্রভৃতির চেষ্টা। আমরা তাঁর রচনাসমূহ নিয়ে পরে আলোচনা করেছি বলে তাঁর সাহিত্যিক কীর্তির কথা এখানে আর তুলছি নে।

সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কার বিষয়ে তাঁর দুটো কাজের জন্য তিনি বাংলাদেশে

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৬, পৃ ৪৯-৫০।

অমর হয়ে আছেন। একটি সতীদাহ-নিবারণ-আন্দোলন সৃষ্টি ও দ্বিতীয়টি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেশ-মধ্যে প্রচলন-প্রচেষ্টা। সতীদাহ-প্রথার সঙ্গে নারীর সম্পত্তিতে অধিকার সম্পর্কীয় প্রশ্নটি জড়িত। এককালে নারীর সম্পত্তিতে অধিকার ছিল। তার পর মুসলমান বিজয়ের পর বহু বিধবা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মুসলমান-পরিবার-ভুক্ত হয়ে যেতে থাকে। তখন হিন্দু-বিধিমতে বিধবা নারী তার পূর্বের সম্পত্তিতে দাবিদার হয়। ফলে এক পরিবারের সম্পত্তি ও গৃহাদি মধ্যেই মুসলমানদের অনুপ্রবেশের জন্য সমস্ত সংসার ভেঙে যেত। বোধ হয় সেইজন্যই স্মৃতিকারগণ নারীর সম্পত্তিতে অধিকার নিষিদ্ধ করে দেন। রামমোহন এই বিধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন[১] কিন্তু সফল হন না। তাঁর চেষ্টার শতাধিক বৎসর পরে স্বাধীন ভারতে নূতন বিধান করে নারীকে তার অপহৃত অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করা হয়েছে।

ধর্ম-সংস্কারের জন্য রামমোহন আত্মীয়সভা, ব্রহ্মসভা ও পরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। সে সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

১৫ই নভেম্বর ১৮৩০ সালে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন, ৮ই এপ্রিল ১৮৩১ সালে পৌঁছান। বিলাত যাবার ইচ্ছা তাঁর বহুকালের, কিন্তু এতদিন সুযোগ পান নি। সুযোগ এল দিল্লী থেকে। তৎকালীন মুগল-বাদশার কতকগুলি দাবিদাওয়া স্থানীয় ইংরেজ শাসকরা মান্য করছিলেন না, সেই-সব দাবি পার্লামেন্টের কাছে পেশ করবার জন্যে রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে তাঁর 'দূত' বলে পাঠাতে চাইলেন বাদশাহ। স্থানীয় ইংরেজ সরকার হৃতসর্বস্ব মুগল-বাদশার 'দূত'-এর অস্তিত্ব স্বীকার করতে চাইলেন না, তাই রামমোহন 'সাধারণ' ভাবেই বিলাত যান।

ইংলন্ডে রামমোহন প্রায় আড়াই-বছর-কাল ছিলেন, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ অব্দে।

---

১ Brief remarks regarding modern encroachments on the ancient right of females, according to the Hindoo Law of Inheritance.

পঞ্চম অধ্যায়

১

রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয়সভা' (১৮১৫) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। য়ুরোপে club বা society নাগরিক জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে বহুকালই সুপরিচিত। সংঘ বা দলবদ্ধ ভাবে মত ব্যক্ত করা ও সৎকর্মাদির অনুষ্ঠান করা জাতীয় স্বভাবের অন্তর্গত হয়েছিল। কিন্তু ভারতে এ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান অজ্ঞাত ছিল। ১৭৮৪ অব্দে কলকাতায় Asiatic Society প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু সেখানকার সকল সদস্যই য়ুরোপীয় এবং তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ইত্যাদি। তত্ত্বজ্ঞান ও ভারতের সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার সমাজ ছিল না, 'আত্মীয়সভা' প্রথম 'ক্লাব' যেখানে এই-সব আলোচনার সূত্রপাত হয়। যদি কেউ বাংলাদেশের ক্লাব বা সমিতির ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন তবে তাঁকে 'আত্মীয়সভা' থেকে শুরু করতে হবে।

রংপুর থেকে এসে রামমোহন স্থায়ীভাবে কলকাতায় বাস করবেন মনস্থ করলেন। বুদ্ধিমান ও ধনবান বলে রামমোহনের নাম কলকাতার ভদ্র ও ধনী-মহলে সুপরিচিত ছিল। সে সময়ের বহু মানী ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। "কিন্তু রাজা পৌত্তলিক ধর্মের অনাদর পূর্বক যখন সর্বত্র তত্ত্বজ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন অনেকেই তাঁহার সংস্পর্শে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সহবাস ও আলাপাদি পর্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। কেবল শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, জয়কৃষ্ণ সিংহ ও গোপীনাথ মুন্সীর সহিত তাঁহার হৃদ্যতা স্থিরতর রহিল।"

১৮১৫ অব্দে রামমোহন "মানিকতলার উদ্যানগৃহে 'আত্মীয়সভা' স্থাপন করিলেন, কিয়ৎকাল পরে সে স্থান পরিবর্ত্ত হইয়া তাঁহার ষষ্ঠীতলার বাটীতে সভা হইত, তদনন্তর কতক দিবস তাঁহার সিমুলিয়াস্থিত ভবনে সভা হইয়া পুনর্বার মানিকতলার উদ্যানে আরম্ভ হইয়াছিল।

"সায়াহ্নকালে আত্মীয়সভাতে বেদপাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইত, কিন্তু বেদ-ব্যাখ্যার নিয়ম তৎকালে ছিল না। রাজার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ মিশ্র

বেদপাঠ করিতেন ও গোবিন্দ মাল ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিত। শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয় তথায় সময় সময় উপস্থিত হইতেন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন মজুমদার, রাজনারায়ণ সেন, রামনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, দয়ালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হলধর বসু, নন্দকিশোর বসু [রাজনারায়ণ বসুর পিতা] এবং মদনমোহন মজুমদার ইঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনারূপ পরম ধর্মকে অবলম্বন করিলেন।✓সেই কাল অবধি... এ ধর্মের প্রতি লোকের বিষম দ্বেষ অবসন্ন হয় নাই...। তাঁহারদিগের প্রতি লোকে স্বেচ্ছাচারী ও নাস্তিক শব্দ পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিত।...রাজার প্রিয়তম বন্ধু...তাঁহার দ্বেষী হইয়া এমত অসত্য অপবাদ প্রচার করিতেন যে আত্মীয়সভাতে গোহত্যা হইয়া থাকে।...স্পষ্ট শত্রু যাহারা তাহারা নানা মতে তাঁহার বিরোধী আচরণে সচেষ্ট হইল, আর যাহারা তাঁহার মিত্ররূপে স্বীকার করিত, তন্মধ্যেও অনেকে কেবল স্বার্থপর মাত্র ছিল। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি আত্মীয়সভার নির্ব্বাহক [সেক্রেটারী] ছিলেন, তাঁহার অতি কপট ব্যবহার ছিল, তিনি রাজার সম্মুখে ব্রাহ্মধর্ম্মে অচলা ভক্তি জানাইতেন, অথচ [পাথুরিয়াঘাটার] শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঠাকুরের নিকট প্রত্যহ গমন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দৃঢ় শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া দেবনিন্দা ও পৌত্তলিকদের প্রতি দ্বেষ উক্তি করিতেন, ও আপনারদিগকে অতি শুদ্ধচিত্ত আত্মজ্ঞান নিষ্ঠরূপে ব্যক্ত করিতেন, রাজা আশুতোষ-স্বভাবে তাঁহারদিগকে অতি সুবোধ জ্ঞান করিয়া ধন দান করিতেন। কিন্তু তাঁহারা রাজার নিকেতন হইতে বহির্গত হইবামাত্র আপনারদিগের প্রচ্ছন্ন বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অতি কুশ্রাব্য কটূক্তি করিতে কিছু ত্রুটি করিতেন না।

"শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার যিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত নামে খ্যাত হয়েন, তিনি যদিও রাজার সন্নিধানে ছায়াবৎ অনুগত ছিলেন, কিন্তু তিনি তন্ত্রোক্ত সাধন বামাচারে রত ছিলেন, বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান অনুশীলনে তাঁহার নিষ্ঠামাত্র ছিল না।...রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার [রাজার] সম্যক্ অনুবর্ত্তী ছিলেন, কিন্তু লোকভয়প্রযুক্ত তিনিও সর্ব্বদা স্বমতানুগত ব্যবহার করিতে সমর্থ হইতেন না। সহমরণ নিবারণের ব্যবস্থা

প্রচার হইলে তাহা রহিত করিবার জন্য প্রবর্ত্তক পক্ষয়া রাজবিচারালয়ে যে আবেদন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে বিদ্যাবাগীশ লোকভয়ে স্বনাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, ইহাতে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেন।

"ইতিমধ্যে ১৭৩৯ শকে [১৮১৭ অব্দে] রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র [গোবিন্দপ্রসাদ] তাঁহার বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্ট বিচারালয়ে অভিযোগ করেন, ইহাতে তিনি প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত বিব্রত থাকাতে জ্ঞানচর্চ্চার জন্য তাঁহার তিলমাত্র অবকাশ ছিল না, আত্মীয়সভা পর্য্যন্ত আর হইত না। পরন্তু তিনি সেই অন্যায় অভিযোগ হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার সভা আরম্ভ করিলেন [১৮২০]।"[১]

আত্মীয়সভার অধিবেশন অন্য ভদ্রের গৃহেও আহূত হত, যেমন বৃন্দাবন মিত্রের গৃহে ও ভূকৈলাসে রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের বাটীতে। তুলা-বাজারে বেহারীলাল চৌবের বাটীতে এক সভায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত রাজার ধর্ম বিষয়ে বিচার হয়।

ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদরি মি. উইলিয়াম অ্যাডাম কিভাবে রামমোহনের প্রভাবে এসে ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টানী মত গ্রহণ করেছিলেন তা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। অ্যাডাম তাঁর পত্রিকা 'বেঙ্গল হরকরা'র কার্যালয়ের দোতলায় সপ্তাহের মধ্যে এক সন্ধ্যায় ধর্মোপদেশ করতেন। তাতে কয়েকজন সাহেব যেতেন; আর বাঙালীদের মধ্যে রামমোহন, তাঁর কয়েকজন দূর-কুটুম্ব এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব উপস্থিত হতেন। "একদিবস রাজা সেই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দেব ও তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে কহিলেন যে বিদেশীয় লোকের ধর্মযাজন গৃহে যাইয়া আমারদিগের উপদেশ শুনিতে হয়, আমারদিগের এমত কোন সাধারণ স্থান নাই যে তথায় বেদ অধ্যয়ন বা অন্য প্রকার পরমার্থ প্রসঙ্গ হয়, ইহা অতি অসুখের কারণ।"[২] রাজা এতে

---

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৬৯ শক। দ্রষ্টব্য শ্রীবিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১০৫-০৬।

২ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ১০৭।

সম্মতি প্রকাশ করে দ্বারিকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায়, মথুরানাথ মল্লিক প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করে জোড়াসাঁকোস্থিত কমল বসুর বাটীতে 'ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করলেন (৬ ভাদ্র ১৭৫০ ॥ ২২ অগস্ট ১৮২৮)।

"তৎকালে প্রতি শনিবার সায়ংকালে সমাজ হইত, তাহাতে প্রথমত দুইজন তৈলঙ্গি ব্রাহ্মণ বেদ উচ্চারণ করিতেন, তদনন্তর শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদের মূল পাঠ করিতেন, অনন্তর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্যাখ্যান করিতেন। পরিশেষ ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সমাজের কার্য্য সম্পন্ন হইত। কলিকাতাস্থ অনেকেই তথায় গমন করিতেন। তৎকালে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সমাজের নির্ব্বাহক ছিলেন।" পরে চিৎপুর রোডের উপর 'ব্রাহ্মসমাজ' গৃহ নির্মিত হলে ১১ মাঘ (১৮৩০) গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান ও উপাসনা হয়।

"এই স্থানে মধ্যে মধ্যে দিবাবসান কালে মোসলমান ও ফিরিঙ্গি বালকেরা পারসীক ও ইংরাজী ভাষাতে পরমেশ্বরের স্তবগান করিত। তৎকালে মেকিণ্টস্ কম্পানি সমাজের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন, প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে সমাজের জন্মদিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে দান বিতরণ করা যাইত, তাহাতে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায় ও মথুরানাথ মল্লিক বিশেষ আনুকূল্য করিতেন।"[১]

বিলাত-যাত্রার পূর্বে রামমোহন সমাজের জন্য রমানাথ ঠাকুর, বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী এবং নিজপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়কে 'বিশ্বস্ত' (ট্রাস্টী) নিযুক্ত করে যান। রামমোহনের বিলাত-যাত্রার পর দ্বারিকানাথ ঠাকুর অর্থসাহায্য দ্বারা সমাজকে জীবিত রাখেন কিন্তু তা প্রাণশূন্য হয়ে যায়। রামমোহনের ব্যক্তিগত আকর্ষণে যাঁরা সমাজে যোগদান করেছিলেন তাঁদের অনেকেই ক্রমে ক্রমে সরে যান। বিলাতে রামমোহনের মৃত্যুর প্রায় ছয় বৎসর পরে কলকাতার এক প্রান্তে দ্বারিকানাথের তরুণ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকরা 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করেন (২১ আশ্বিন ১৮৩৯); সেই সভা ১৮৪৬ অব্দে (১৭৬৮ শকে) ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। ইতি-মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ১৮৪৩ সালের ভাদ্র মাস থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং ১৮৪৩ সালের ২২ ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ

১ শ্রীবিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১০৭।

বিশজন যুবক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট 'ব্রাহ্মধর্মে' দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেইদিন হইতে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত। এখন থেকে ব্রাহ্মরা আর আগের মতো সর্বধর্মের মানুষদের মিলনের clubএ সমবেত হবার ভাব থেকে সংবদ্ধ হন না— এখন সেটা একটা ধর্মের cult নিয়ে আবির্ভূত হল— তার নাম 'ব্রাহ্মধর্ম'।

রামমোহন সব ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ধর্মের নিগূঢ় বাণী সংগ্রহ করেন হিন্দু শাস্ত্র থেকে— তার নাম দেন Universal Religion। রামমোহনের বিশ্বধর্ম-ভাবনার তরঙ্গ কয়েকজন সমকালীন যুবকের মনকে স্পর্শ করেছিল বলে বোধ হয়। 'নববাবুদিগের নবকীর্তি' নামে যে এক সংবাদ 'সংবাদ-প্রভাকরে' ১৮৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় তা আমাদের যুক্তিরই সমর্থন করছে। হুগলি-বাঁশবেড়িয়ার কয়েকটি যুবক "একত্র হইয়া মোং কাঁচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাঁচঘর সাকিনে একজন পোদের ভবনে এক ইষ্টক নির্মিত বেদি তদুপর চৌকী এবং তদুপরে কুসুমমাল্য প্রদানপূর্বক পরম সুখে পরমসত্য নামক বেদি স্থাপন করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আয়োজনপূর্বক বিবিধবর্ণ পঞ্চ সহস্র লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া ও হালিশহর নিবাসি প্রায় শতব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিত্তলের থাল ও সন্দেশাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং তৎসঙ্গে ফিরিঙ্গিতে বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমান কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন এবং ঐ পরমসত্য বিষয়ে দুই নহবত দুই স্থানে বসাইয়াছিলেন।"[১] এই সংবাদ সত্য বলেই মনে হয়; তা যদি হয় তবে স্বীকার করতেই হবে যে রামমোহন রায়ের 'বিশ্বধর্ম' আদর্শে এই সর্বশাস্ত্র পাঠের আয়োজন হয়েছিল। রামমোহন ১৮৩০ সালে যে 'ব্রাহ্মসমাজ' গৃহ স্থাপন করেন সেখানে সর্বধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের ব্যবস্থা করতে পারেন নি, কয়েকটি নববাবু সেই অঘটন ঘটালেন।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে কেশবচন্দ্র সেন নববিধান সমাজের জন্য যে শ্লোক-সংগ্রহ-গ্রন্থ সম্পাদন করেন, তাতে সর্বধর্মের শাস্ত্রের সার সংকলিত হয়। তাঁদের উপাসনাকালে সর্বধর্মশাস্ত্র পঠিত হয়।

---

১ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড (১৩৫০), পৃ. ২৯।

২

রামমোহন রায়ের ধর্ম ও কর্ম-জীবন এদেশে মাত্র পনেরো বছরের— ১৮১৫ সাল থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ রংপুর থেকে এসে কলকাতায় বসতি আরম্ভ ও বিলাত-যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত। চল্লিশ বছর বয়স পেরিয়ে যাবার পর রামমোহনকে ধর্ম ও সমাজ নিয়ে চর্চা ও আন্দোলনে প্রবৃত্ত হতে দেখি। চল্লিশ-পার বয়স্টা মানুষের পরিপক্ব বা matured জীবনই বলব। হজরত মহম্মদ এই বয়সে তাঁর বিশ্বধর্ম-প্রচার-কার্য আরম্ভ করেন। কিন্তু মনের maturity বয়স-নিরপেক্ষ; তার প্রমাণ যীশুখ্রীষ্ট, শঙ্করাচার্য, ডিরোজিও, কীটস, বিবেকানন্দের জীবন— চল্লিশ বৎসর না পৌঁছতেই এঁদের তিরোধান হয়। বেয়াল্লিশ বছরের আগে রামমোহনকে কোনো বাংলা, সংস্কৃত বা ইংরেজি বই বা পুস্তিকা, এমন-কি কোনো প্রবন্ধও লিখতে দেখি নে, অথবা লিখে থাকলেও তার কোনো প্রমাণ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তবে ১৮০৯ সালের ১২ই এপ্রিল গবর্নর-জেনারেল লর্ড মিণ্টোকে যে আবেদনপত্র লেখেন সেটিই তাঁর সর্বপ্রথম ইংরেজি রচনা বলে মনে হয়, অবশ্য তাঁর ভাষার মুন্সিয়ানায় ডিগবি সাহেবের হাত ছিল বলে আমাদের সন্দেহ হয়।[১]

ত্রিশ বছর বয়সে তিনি ফার্সি ভাষায় লেখেন 'তুহ্ফাৎ-উল-মুয়াহ্হিদীন'। ১৮০৩ সালে মুর্শিদাবাদ-বাস-কালে এ পুস্তিকা লিখিত ও লিথো প্রেসে মুদ্রিত হয় বলে অনুমান। এ ছাড়া আরবি ভাষায় 'মনজারাত্-উল্-আদিয়ান' নামে একটা বড়ো কিতাব লিখেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। তুহ্ফাৎ-এ যা সংক্ষেপে বলতে গিয়ে অস্পষ্ট হয়েছিল তা এই গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লিখিত হয়েছিল বলে জানা যায়।[২]

---

১ দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রামমোহন রায়', সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৬, পৃ ২৫-২৭।

২ ১৮২০ সালে *An Appeal to the Christian Public* নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন যে 'although he was born a Brahmin, not only renounced idolatry at a very early period of his life, but published at that time a treatise in Arabic and Persian against that system...' (*English Works*, pt. 548) এখানে যে পুস্তিকার কথা বলেছেন সেটি তাঁর ত্রিশ বছর বয়সে প্রকাশিত তুহ্ফাৎ-উল-মুয়াহ্হিদীন, আরবি ও ফার্সিতে লেখা; কারণ 'তুহ্ফাৎ'-এর ভূমিকা আরবিতেই লিখিত।

তুহ্‌ফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদীন বা একেশ্বর-বিশ্বাসীদের উপহার-পুস্তিকায় রামমোহন বিশুদ্ধ যুক্তির ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তবে এ বইয়ের বহুল প্রচার হয় নি। মুর্শিদাবাদে ১৮০৩ অব্দে লিথোছাপার আশি বছর পরে ১৮৮৪ সালে রাজনারায়ণ বসুর অনুরোধে তাঁর বন্ধু ঢাকার মৌলবী ওবেদউল্লা সাহেব ইংরেজিতে এই ফার্সি পুস্তিকাটির তর্জমা করেন এবং তখন থেকে এটি রামমোহনের গ্রন্থাবলীভুক্ত হয়। আরো পনেরো বছর পরে ১৮৯৯ অব্দে মূল ফার্সি থেকে তুহ্‌ফাৎ-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয় নব-বিধান সমাজের মুখপত্র 'ধর্ম্মতত্ত্বে' (বৈশাখ-ভাদ্র ১৮২১ শক) ; তর্জমা করেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, যিনি কোরান, হাদিস ও অন্যান্য আরবি, ফার্সি কিতাব তর্জমা করে যশস্বী হন। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' সাপ্তাহিক পত্রিকার মুষ্টিমেয় পাঠকগোষ্ঠীর বাইরে বাংলাদেশে এ অনুবাদের খবর কেউ রাখে নি। আরো চল্লিশ বছর পরে ১৯৪৯ অব্দে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ দাস মহাশয় ওবেদউল্লা সাহেবের ইংরেজি তর্জমা থেকে তুহ্‌ফাৎ-এর বাংলা অনুবাদ করেন। বলা বাহুল্য, মূল ফার্সি থেকে সরাসরি অনূদিত না হওয়ায় এই অনুবাদকে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা কঠিন ; ভাই গিরিশচন্দ্রের মূল থেকে অনুবাদটা পুস্তিকাকারে পুনর্মুদ্রণ করলে রামমোহনের মৌলিক চিন্তার স্পর্শ পাওয়া যেতে পারে। তুহ্‌ফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদীন সম্বন্ধে রাম-মোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সাহায্যে পরে অতি বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন।[১]

১ আল্‌লাহ্‌ শব্দ সম্বন্ধে মুসলমান মওলানাদের পরম্পরাগত অর্থ তপসীর কবির-এ যে আলোচনা আছে তা উদ্‌ধৃত করছি কোরান শরিফ থেকে। 'আল্‌লাহ্‌' এই অনুপম শব্দটি বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তার 'এসমে-আজম' বা সর্বোত্তম বিশিষ্ট নাম। এই পবিত্র শব্দটি লিঙ্গভেদ বা বচন-ব্যতিক্রম হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। ইহা কোনো বিশেষ ধাতু হইতে উৎপন্ন হয় নাই এবং জগতের কোনো ভাষায় অথবা কোনো শব্দে বা প্রতিশব্দে ইহার অনুবাদও হইতে পারে না। 'আল্‌লাহ্‌' বলিলে এই একমাত্র অদ্বিতীয় অনাদি অনন্ত ও সর্বশক্তিমান সৃষ্টি-কর্তাকেই বুঝাইয়া থাকে।...ইহাই এমাম রাজী ও অধিকাংশ আলেমের সুদৃঢ় অভিমত।' —দ্রষ্টব্য. মো. আকবর হাকিম ও মো. আলী হাসানের কোরান শরিফ-এর তস্‌মিয়া।

জনাব আবুল হায়াত লিখছেন—

'আল্‌লা,' 'আল্‌লাহ্‌' আরবি শব্দ। 'অল্‌ ইলাহ' হইতে আল্‌লাহ বা আল্‌লাহ্‌ শব্দ আসি-য়াছে। 'অল' বিশিষ্টার্থক আরবি উপসর্গ (ইংরেজি 'দি' এর সমার্থক)। ইহা মূল সেমেটিক ভাষার শব্দ এবং হিব্রু 'এল' ও ব্যাবিলনীয় 'ইলু' শব্দদ্বয়ের সমগোত্রীয়। 'ইলাহ্‌' শব্দের অর্থ উপাস্য, দেবতা। সুতরাং অল্‌ ইলাহ (আল্লা)—'একমাত্র উপাস্য।' দ্রষ্টব্য (ভারতকোষ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৮৬)।

রামমোহনের যৌবনকালে যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচিত হয় তার মধ্যে যে কথা তিনি বলেছিলেন, সেটাই ছিল তাঁর জীবনভর সাধনার মূল উৎস। কোরান অধ্যয়ন, আরবি ভাষার মাধ্যমে গ্রীক দার্শনিকদের মতসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও য়ুরোপীয় যুক্তিবাদী দার্শনিকদের গ্রন্থ পাঠ করে তাঁর মন কঠোর যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছিল।

তুহ্‌ফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদীন পুস্তিকার অনুবাদ থেকে সবটাই উদ্‌ধৃত করা সম্ভব নয় বলে, তার থেকে কিছুটা অংশ এখানে উদ্‌ধৃত করছি :

"বর্তমানকালে ভারতে অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস লোকেদের মধ্যে এমন বেড়েছে যে, একটা অভিনব বস্তু দেখলেই, সেটাকে পুরাকালের বীর অথবা বর্তমান যুগের মহাপুরুষ বা সন্তদের কীর্তি বলে আরোপ করা হয়; সেই-সব কার্যের কারণ স্পষ্টতঃ বর্তালেও তারা সেগুলিকে অগ্রাহ্য করে। কিন্তু যাদের মন সুস্থ ও যারা ন্যায়ের পক্ষপাতী তাদের কাছে এ তথ্য [কার্য-কারণ-সম্বন্ধ] প্রচ্ছন্ন থাকে না। য়ুরোপের লোকেদের বহু অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার এবং বাজীকরের কেরামতি প্রভৃতির ন্যায় এমন অনেক জিনিস আছে যার কারণ দৃশ্যত অজ্ঞাত এবং মানুষের বুদ্ধির অগম্য বলেই মনে হয় ; কিন্তু তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও শিক্ষা পাবার পর, কারণগুলি [কার্যসমূহের] সন্তোষজনক ভাবেই জানা হয়ে যায়। বুদ্ধিমান লোক অনুমানী যুক্তির (inductive reason) প্রভাবে যথেষ্টই সুরক্ষিত থাকে— এই-সব অতিপ্রাকৃত ঘটনার দ্বারা তারা প্রতারিত হয় না। তবে এ বিষয়ে আমরা যতদূর বলতে পারি সেটা হচ্ছে এই, তীক্ষ্ণ ও অন্তর্প্রবেশী বিচারশক্তি থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি আশ্চর্য ঘটনার কারণ কতক লোকের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যায়। সে-সব ক্ষেত্রে আমাদের স্বীয় আন্তরবোধের (intution) শরণাপন্ন হয়ে এই প্রশ্ন করতে পারি, আমাদের কার্য-কারণ-সম্বন্ধ বুঝবার অক্ষমতা অথবা প্রাকৃতিক বিধির বিরুদ্ধে কোনো অসম্ভব মাধ্যমের উপর কারণ আরোপ করাটা— এর মধ্যে কোন্‌টা যুক্তির সঙ্গে মানায় ভালো ? আমি মনে করি আমাদের আন্তবুদ্ধি বা সুযুক্তি প্রথমোক্ত পথই বেছে নেবে। তাছাড়া যে জিনিস ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-প্রসূত নয়, যা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিধি-বহির্ভূত ঘটনা— যেমন বহু শত শত বছর পূর্বের কোনো এক মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছিল বা কেউ স্বর্গারোহণ করেছিলেন, প্রভৃতি— সে-সব

বিশ্বাস করবার প্রয়োজনটা কী?

"সাংসারিক ব্যাপারে এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর কোনো কার্য-কারণ-সম্বন্ধ না জানলে মানুষ একটাকে কারণ ও অন্যটাকে তার ফল বলে মেনে নিতে রাজি নয়, কিন্তু যখন ধর্মের বা ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব এসে পড়ে, তখন যেখানে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নেই, সেখানেও একটা কারণ ও অন্যটাকে কার্য বলে স্বীকার করতে সে দ্বিধা বোধ করে না। যেমন, একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে— কোনো সংগ্রাম না করে, অথবা কোনো রকমের প্রতিকারের চেষ্টা না করেই, কেবল প্রার্থনার জোরে, বা তুক্-তাক তাগা-তাবিজের গুণে, দুর্গতি দূর হয়েছে বা অসুখ সেরেছে, এ-সবের মধ্যে কোনো কার্য-কারণ-সম্পর্ক নেই।

"ধর্মনেতারা তাদের শিষ্যদের সন্তোষের জন্য ব্যাখ্যা করেন— ধর্ম ও বিশ্বাসের ব্যাপারে যুক্তিতর্কের স্থান নেই; এবং ধর্মের ব্যাপারে শুধু বিশ্বাস ও ঈশ্বরের কৃপাই একমাত্র নির্ভর। যে বিষয়ের কোনো প্রমাণ নেই, যা যুক্তিবিরুদ্ধ, তা একজন যুক্তিবাদী কী করে গ্রহণ বা স্বীকার করতে পারেন?"

আমরা এই পুস্তিকা থেকে আর-একটিমাত্র স্থান উদ্‌ধৃত করব :

"বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা পৃথিবীতে এক-ঈশ্বরে-বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা কম দেখে মাঝে মাঝে এই বলে গর্ব করেন যে, তাঁরাই দলে ভারী।...একটি উক্তির সত্যতা...সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নির্ভর করে না।... সর্বশক্তিমান এক-মাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসই প্রত্যেক ধর্মের মূল সূত্র। জাতি বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয় পরস্পরের প্রতি প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে জয় করাই প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট গ্রহণীয় বিশুদ্ধ পূজা। এই হৃদয়জয়ের চেষ্টা না করে যাঁরা ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাভাবিক ও সহজ প্রেরণার চাইতে তথাকথিত মনগড়া যে প্রত্যাদেশ— যা শুধু তাদের সমজাতীয় জীবের সামাজিক জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে—সেই প্রত্যাদেশেরই অধিক মূল্য দেয়, তারা কোনো বিশেষ তন্ত্র-মন্ত্র বা যোগাদি অঙ্গচালনাকেই মোক্ষের কারণ, এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কার লাভের উপায় মনে করে। প্রকৃতপক্ষে তারা যেন তাদের দেবতাতেই একটা পরিবর্তন আনার ভাণ করে এবং মনে করে যে তাদের বাহ্যিক প্রক্রিয়া ও মানসিক উচ্ছ্বাসের প্রভাবে অপরিবর্তনশীল ঈশ্বরের মধ্যেও পরিবর্তন আনতে পারে। আমাদের

তুচ্ছ প্রচেষ্টা কিছুতেই ঈশ্বরের রাগ প্রশমনের কিম্বা তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহলাভের কারণ হতে পারে না। একটু চিন্তা করলেই এই মতের অসারতা ধরা পড়বে।"

'তুহ্‌ফাৎ'-এর শেষাংশে হাফিজের দুইটি বয়াৎ উদ্ধৃত আছে—

"শায়েখ-এর এত ভণ্ডামিপূর্ণ কাজের এক ছিদাম মূল্য নেই; মানবের অন্তরে তৃপ্তি দাও, উহাই পারমার্থিক উপদেশ।"

শেষ বয়াৎটি—

"কোনো জীবের অনিষ্ট কোরো না, এ ছাড়া যা-খুশি তা করতে পার; কারণ, অন্যের অনিষ্ট করা ছাড়া আর কোনো পাপ আমাদের পথে নেই।"

এই দুই বয়াৎ-এর মধ্যে সংক্ষেপে মানবজাতিকে চারটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—

"প্রথমত, এক শ্রেণীর লোককে প্রতারক বলা যায়, যারা লোককে তাদের দলে টানবার জন্যে ইচ্ছামত নানা মতবাদ, ধর্মমত ও বিশ্বাস প্রভৃতি বানিয়ে প্রচার করে, লোককে কষ্ট দেয় ও তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

"দ্বিতীয়ত, আর-এক শ্রেণীর লোককে 'প্রতারিত' বলা যায়, যারা কোনো সত্য খবর না করেই অন্যের দলে যোগ দেয়।

"তৃতীয়ত, এক শ্রেণীর লোক— তারা প্রতারক এবং প্রতারিত। তারা অন্যের উক্তিতে বিশ্বাস করে এবং অপরকেও তা আঁকড়ে ধরতে প্ররোচিত করে।

"চতুর্থত, যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রতারকও নয় প্রতারিতও নয়।"

'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদীন' ঐসলামিক 'বিশ্বধর্ম'র আদর্শে রচিত, অথচ গোঁড়া মুসলমানী মতের প্রতিরোধক। আসলে ইসলামের মধ্যে যে উদারপন্থী সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিল তাদেরই আদর্শে এটি রচিত। সেই উদার পথ দু ভাবে দু শ্রেণীর সাধক গ্রহণ করেছিলেন— একটি 'মোতাজল' ও অপরটি 'সুফী'বাদ— একদল যুক্তিবাদী, অপরদল ভক্তিবাদী। 'মোতাজল' শব্দের অর্থ সম্প্রদায়ত্যাগী, অথবা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝখানে যারা আছে। যে মানুষের জীবনে প্রশ্ন জাগে না, যার মনে সংশয় আসে না, যে কেবল বিশ্বাস করে, তার চিত্তের পূর্ণ বিকাশ হয় না বলেই তো মনে হয়। রামমোহনের শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল ঐসলামিক ধর্ম ও দর্শনের কড়া

যুক্তি ও ব্যবহারিকবাদের উপর। কোরান তিনি ভালো করেই অধ্যয়ন করেছিলেন; তবে কোথায়, কার কাছে তিনি পড়েছিলেন সে ইতিহাস আমরা জানতে পারি নি। ভাষ্য ছাড়া বেদ যেমন পড়া যায় না, কোরানও তপসীর বা ভাষ্য ছাড়া বুঝা দায়।

ইসলামের মধ্যে যে-সব মতামত আধুনিক বিজ্ঞানী বুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত হতে পারে না, অথবা যে-সব কথা বিশ্বধর্মবোধের বাধা বলে তাঁর মনে হয়েছিল, তারই সমালোচনা রূপে এই পুস্তিকা লিখিত হয়েছিল। কোরানের মধ্যে পৌত্তলিকদের নিধন করবার কথা আছে, "এখন প্রশ্ন এই যে যিনি স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ ও দয়ালু, অনাসক্ত বদান্য এবং সেই ভগবানের পক্ষে বিরুদ্ধ মতের উপদেশ ও আদেশ দেওয়া কি সম্ভব?" রামমোহন বলতে চান, "এ-সবই কি ধর্মানুবর্তীদের মনগড়া জিনিস? আমার তো মনে হয় যে সুস্থমনের লোক কেউই শেষেরটি মানতে ইতস্তত করবে না।" রামমোহনের ইচ্ছা ছিল, ইসলামের যা শ্রেষ্ঠ বাণী[১] তাই প্রচারিত হোক— সেটাই ইসলামের বিশ্বধর্মচেতনা। পরে হিন্দু ও খ্রীষ্টান-ধর্মগ্রন্থ থেকেও তিনি ঐ দুটি ধর্মের মহৎ ভাবনা সংকলন করবার চেষ্টা করেন। সেখানেও বিশ্বধর্মের শ্রেষ্ঠ বাণী আবিষ্কার ছিল অন্তরের একমাত্র কামনা।

---

১ 'ইসলাম শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'শান্তির মধ্যে আত্মস্থ হওয়া'। ইহার তাৎপর্য্য, যে ব্যক্তি ঈশ্বর এবং মনুষ্যের সহিত শান্তির বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিয়াছে সে-ই মুসলিম। ঈশ্বরের সহিত শান্তির বন্ধনের অর্থ তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারা এবং মানুষের সহিত শান্তি বলিতে বুঝিতে হইবে অপরকে আঘাত এবং তাহার অনিষ্টসাধন করিবার প্রবৃত্তি হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকা ও তাহার মঙ্গল কামনা করা। কোরানে এই দুটি তত্ত্ব ইসলাম-এর সারমর্ম হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে (২।২১২)।

'মহম্মদ বলিলেন, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে ঈশ্বরের সম্মুখে সকলেই এক, সকলেই সকলের ভাই। জাতি, বর্ণ, পেশা, বংশমর্যাদা কিছুই মানুষকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। ঈশ্বরের নিকট সকলেই সমান; যে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে সে-ই মুসলিম। ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য তিনি নামাজ, জাকাত, হজ, জিহাদ প্রভৃতি ধর্মকৃত্যের বিধান দিয়াছিলেন। যে ধনী, তাহাকে অধিকতর অর্থসংগ্রহ করিয়া আত্মসুখপরায়ণ হইলে চলিবে না। দরিদ্রের জন্য তাহাকে নিয়মিত দান করিতে হইবে। সমবেত নামাজে কোনো ভেদাভেদ না রাখিয়া সম্মুখের সারিতে যদি কোনো দরিদ্র ব্যক্তি থাকে তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া তাহারই পদতলে মাথা নোয়াইয়া ধনী ব্যক্তিকে প্রার্থনা করিতে হইবে। মক্কার তীর্থযাত্রাকালে সকলকেই একবেশে, এক নিয়মে চলিতে হইবে।' —আবুল হায়াত, ভারতকোষ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৩৫।

রামমোহনের ত্রিশ বছর বয়সে রচিত এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা, যা ফার্সিভাষায় লিখিত হয়, তার মূল বক্তব্য তিনি জীবনভর প্রচার ও নিজ জীবনে সাধনা করেছিলেন। রামমোহনের যে মত এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হয়েছে তার পটভূমি রয়েছে আরবীয় মোতাজল সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদ এবং য়ুরোপীয় আঠারো শতকের দার্শনিকদের মতবাদে। অলৌকিককে অবিশ্বাস— এটি ভলটেয়ার, হিউম প্রভৃতি দার্শনিকদের ভাবনালব্ধ সত্য। আমরা আগেই বলেছি, রামমোহন পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতামত সম্বন্ধে ভালো রকম ওয়াকিবহাল হন ডিগ্‌বির সংস্পর্শে এসে। ১৮০৩ সালে 'তুহ্‌ফাৎ' যখন লেখেন তখন তাঁর জ্ঞানের পটভূমে প্রধানত ছিল আরবীয় যুক্তিবাদী সম্প্রদায়ের মত ও ভাবনারাশি। ১৮১৫ সাল থেকে তাঁকে হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্লেষণে ও ব্যাখ্যানে নিযুক্ত দেখি; এ সময়ের পর যা-কিছু লিখেছিলেন, তার সমস্তের মধ্যে ছিল যুক্তি ও বিচার। (শাস্ত্রগ্রন্থ তখনই প্রামাণিক বলে স্বীকৃতি পেতে পারে যখন তা যুক্তি ও বিচার দ্বারা সমর্থিত হয়।) প্রাচীনত্বের দাবিতে মিথ্যা কখনো সত্য হয় না। তেমনি নূতন তত্ত্ব পরম্পরাগত প্রাচীনতার দাবি করতে পারে না বলে তাকে অস্বীকার করা যায় না। যুক্তি ও বিচার হচ্ছে সত্যের কষ্টিপাথর; গণিত ও দর্শনের উপর সত্যের ইমারত উঠতে পারে

৩

রামমোহনের বহুমুখী জীবনের বুনিয়াদ গড়ে ওঠে রংপুরে। এখানে তাঁর মনিব তথা বন্ধু ডিগ্‌বি সাহেবের কাছ থেকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পেয়ে তাঁর মন নানা দিক থেকে জ্ঞানঋদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই রংপুরে হরিহরানন্দ স্বামীর সংস্পর্শে এসে বেদান্তাদি শাস্ত্র ও বিশেষ করে তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান দৃঢ়ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। রংপুরে কয়েকজন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এইটুকু বুঝেছিলেন যে, হিন্দুদের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বোঝাতে গেলে তাদেরই শাস্ত্রের মাধ্যমে তা বলতে হবে— বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ কেউ শুনবে না। সাধারণ মানুষ যুক্তির সমর্থন থেকে শাস্ত্রের অনুমোদন পেলে

সরলভাবে সব-কিছু মেনে নেয়; চিন্তার মেহন্নত, বুদ্ধির চর্চা করতে হয় না বলে বেঁচে যায়।

এখন প্রমাণ করতে হবে রামমোহন যে নিরাকার ঈশ্বর ভজনার মত প্রচার করেছেন তা হিন্দুর পরম্পরাগত-শাস্ত্র-সম্মত। তখন প্রশ্ন ওঠে— শাস্ত্রবাক্য কী? দেবভাষা সংস্কৃতে যা-কিছু শ্লোকবদ্ধ দেখা যায় তাকেই কি শাস্ত্রের মান দেওয়া যায়? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, বিশুদ্ধ যুক্তি দিয়ে মানুষকে কি সব-কিছু বোঝানো যায়? আগে দ্বিতীয় প্রশ্নটার মীমাংসা করি, তার পর শাস্ত্র বলে কাকে স্বীকার করা যায় তার আলোচনা আসবে।

মানুষ গর্ব করে বলে, "আমরা rational being, আমরা চলি reason দিয়ে, মানবেতর জীব instinct দিয়ে চালিত হয়— তারা animal।" এ-সব অতি ছেঁদো কথা বা truism। যখন দেখি দুজন ভদ্রলোক নানা গুণের অধিকারী, কিন্তু যেই অত্যন্ত অবচ্ছিন্ন শব্দ 'দেশ' বা 'জাতি' অথবা 'ধর্ম' বা 'ঈশ্বর' সম্বন্ধে কথা উঠল অমনি দেখি— কোথায় গেল ভদ্রতার মুখোশ, বের হয়ে এল আদিম মানুষের যুক্তিহীন অসংস্কৃত মনের কুৎসিত নগ্ন রূপ! প্রত্যেকেই আপন আপন মনগড়া বিশ্বাস ও রুচিকে সভাস্থ করবার জন্যে 'যুক্তি'র পরিচ্ছদে সাজিয়ে তোলেন। কিন্তু দেখা যায়, অচিরকালমধ্যে সেই পুরাতনী বুলি, বিশ্বাস, এমন-কি যুক্তিজালকে নূতনের দল এসে শতধা-ছিন্ন করে আবর্জনা-কুণ্ডে নিক্ষেপ করেছে। কালে সেই নবীনও আবার প্রাচীন হয়ে যায়। এইভাবে মতের জোয়ার-ভাঁটার অশ্রান্ত চলাচল মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হতে পারছে না। বারে বারে ভাঁটার টানে অ-বুদ্ধির কঙ্কাল পঞ্জর বের হয়ে আসে, মন-মুক্তির জোয়ার এলে বারে বারে মানুষ তাকে যুক্তির জালে আটকে ফেলতে চায়। কিন্তু কোথায় যুক্তির স্থান? দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে অগণিত তত্ত্ববিদ্‌দের যুক্তি, বিচার, ব্যাকরণ প্রাণহীন মমির মতো গ্রন্থাগারের মঞ্চ-মধ্যে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। কচিৎ কখনো কোনো গবেষক উপাধিলাভের লোভে তাদের স্পর্শ করে, নূতন কালের নূতন সমস্যার দিকে তাকাবার সময় কোথায়!

রামমোহন বুঝতে পারলেন, হিন্দুদের সংস্কারাবদ্ধ মনের মুক্তি আনবার জন্য তাদের ধর্মশাস্ত্রকেই সামনে তুলে ধরতে হবে। এই নূতন দৃষ্টি বোধ হয় তিনি পেয়েছিলেন তাঁর গুরু হরিহরানন্দ স্বামীর কাছ থেকে। হরিহরানন্দ

সাধক, পণ্ডিত। তিনি জানতেন যে হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা ধর্ম ও দর্শনের নূতন কথা শোনাতে চেয়েছিলেন, তাঁদের সবাইকে 'প্রস্থানত্রয়'-এর আশ্রয় নিতে হয়েছিল। রামমোহনও বুঝলেন তাঁকে সেই পথ ধরেই দেখাতে হবে যে শাস্ত্রে নিরাকার নির্বিকার ব্রহ্মের উপাসনাই সমর্থিত, অর্থাৎ পূর্বাচার্যগণের দ্বারা তাঁর মত ও পথ অনুমোদিত। সেইজন্য তিনি গভীর মনোনিবেশসহকারে 'প্রস্থানত্রয়' অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হলেন।

কেবল হিন্দুদের শাস্ত্রের মধ্যেই সে চেষ্টা সীমিত থাকে নি, তখনকার দিনের হিন্দু-মুসলমানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী খ্রীষ্টানী ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠ অবদান 'যীশুর উপদেশ-বাণী' প্রকাশ করেন। নানা ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ থেকে শাশ্বত ধর্মের শ্রেষ্ঠ বাণী সংগ্রহ করে বলতে পেরেছিলেন— সর্বমানবের ধর্ম এক বিশ্বধর্ম। রামমোহন যে সত্য নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ও যুক্তি এবং বিচার-বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তাকে বলেছেন Universal Religion, রবীন্দ্রনাথ তাঁর আন্তর-দৃষ্টি থেকে অনুভবের দ্বারা সেই সত্যের নাম দেন Religion of Man— মানুষের ধর্ম— তা হিন্দুর ধর্ম নয়, মুসলমানের ধর্ম নয়, খ্রীষ্টানের ধর্ম নয়— তা শাশ্বত মানবের ধর্ম। আজ জগতে ভাষা ভূগোল ও ইতিহাসের স্পর্শে ধর্ম খণ্ডিত হয়েছে।

৪

প্রাচীন ভারতে বহু জাতি, উপজাতির বিচিত্র মতের ধারা বহন করে আছে বৈদিক সাহিত্য। দেব-আরাধনা, যাগ-যজ্ঞের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বৈদিক ধর্ম নামে একটা অস্পষ্ট দার্শনিক মতও গড়ে ওঠে। কিন্তু বৈদিকতার পাশাপাশি বহু মানবের বিচিত্র ভাবনার মধ্যে পুঁথির পাতায় আটক পড়ে টিঁকে গেল ষড়্‌দর্শন। কিন্তু ষড়্‌দর্শনের মতামত জীবনের মধ্যে রূপ পায় নি, ধর্ম নামে অভিহিত হবার সুযোগই পেল না তারা। দর্শন বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে জীবনে রূপায়িত করলেন গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর জিন; জীবনদর্শন জীবনধর্ম হল। বৈদিক কর্মকাণ্ডের রাহস্যিকতার সমর্থন করে মীমাংসাকাররা অনেক কসরত দেখিয়ে দার্শনিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত মানুষের ব্যবহারিক জীবনে তা

কোনো কাজে লাগল না—একটা কালে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। অচল হল ক্রিয়াকর্ম-যাগ-যজ্ঞে বিশ্বাস। বিশ্বাস হারাল লোকে সে-সবের ফলাফলে। দর্শনশাস্ত্রগুলিও সবাই সমান্তরালে আপন আপন পরিসীমিত পথে চলতে চলতে কখন স্তব্ধ হয়ে গেল— মানুষের জীবনের স্পর্শ বাঁচিয়ে অবচ্ছিন্ন তুরীয়তার মধ্যে তাদের বন্ধ্যা-জীবনের অবসান হয়ে গেছে। মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের প্রকোষ্ঠের মধ্যে আজও তাদের শেষ নিশ্বাসের শব্দ শোনা যায়, স্পন্দন দেখা যায় না। প্রাচীনকালের জীবন ও দর্শনকে যাঁরা গাঁঠ-ছড়ায় বাঁধতে পারলেন তাঁরাই টিকে গেলেন— তাঁরা হচ্ছেন ভগবান বুদ্ধ ও মহাবীর জিন। Abstraction-এর মরুকান্তারে তাঁদের অবসান হয় নি—এখনো তাঁদের ধর্ম জীবিত ও প্রাণবন্ত।

ভারতের মানস-ইতিহাস চলমান। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেল, মহাকালের স্পর্শে এল জীর্ণতা। তথাকথিত বৈদিকযুগ ও বৌদ্ধযুগের অবসানে হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান হল পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র আগমাদিকে কেন্দ্র করে— অসংখ্য দেবদেবীর পূজা-আরাধনায় দেশ মুখরিত হয়ে উঠল। কিন্তু মানুষের দুঃখ দূর হল না— এত করেও মানুষে মানুষে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বিস্তৃততর হয়ে চলল। আদিকালে যা ছিল বর্ণবৈষম্য, অর্থাৎ সিত-আর্য ও অ-সিত বা কৃষ্ণবর্ণ অন্-আর্য'র মধ্যে ভেদ, তা কালে জৈব-জীবনের অনিবার্য তাগিদে বহুশত সংকরবর্ণের আবির্ভাবে শতধা হয়ে গেল। এখন অসংখ্য জাতি-উপজাতি ; তাদের মধ্যে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, শুচি-অশুচি বোধ উদগ্র। তার উপর এসেছে ধন-বৈষম্য— ধনী-নির্ধন বা সর্বহরা-সর্বহারার দুরপনেয় জাতিভেদ।

এমন সময়ে এল ইসলাম— আরব তুর্কি পাঠান মুগলদের সঙ্গে। এতকাল হিন্দুরা আপনাদের ধর্মের মধ্যে অন্যদের স্থান দিয়ে এসেছিল। সকলেই যে-যেমন ভাবে এল সিঁড়ির ধাপে ধাপে বসে গেল পাশের লোকের স্পর্শ বাঁচিয়ে— উঁচুনিচু বোধটা সূক্ষ্মভাবে সবার মনেই অত্যন্ত টন্‌টনে। ইতিহাসের ওঠাপড়ার ঢেউয়ের মাথায় উঠে এলেন মধ্যযুগের 'সন্ত'রা। রামানন্দের আহ্বানে এলেন জোলা-মুসলমান কবীর, অজ্ঞাত-ব্রাত্য-অশুচি দাদূ, নাভা, রবিদাস। কালধর্মে এলেন নানক, চৈতন্য মহাপ্রভু ও আরো কতজন। একমাত্র গুরু নানকের দল ছিটকে বের হয়ে

গেল হিন্দু-সমাজের দরবার থেকে— শিখরা পৃথক হয়েই থাকতে চায়। ইসলামের আবির্ভাবে দেশ-মধ্যে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তার সমাধানে আত্মনিয়োগ করলেন মধ্যযুগের 'সন্ত'রা। ইসলামের নূতন সাম্যের বাণীর সঙ্গে সায় দিয়ে হিন্দু-ভারতকে নূতন তত্ত্ব শোনালেন তাঁরা— সে বাণী সমগ্রের মধ্যে ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস। কিন্তু এঁরা অতীতের শাশ্বত সত্যকে অস্বীকার করেন নি, নবীনের ভাবকেও অগ্রাহ্য করেন নি, ভাবের রাজ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-বুনিয়াদ প্রোথিত করলেন তাঁরা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী গেল, 'সন্ত'দের বাণী আখড়ায় আখড়ায় আটকে গেল— প্রাণের বহতা হারিয়ে সেখানে এসে গেল গুরুপূজা, অতীতের পুনরাবৃত্তি করে বেঁচে থাকবার ব্যর্থ প্রয়াস! এল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে শ্বেতকায় খ্রীষ্টানরা। রামমোহনের অভ্যুদয় হয় সেই মাহেন্দ্রক্ষণে; পশ্চিমের সংস্কৃতি ও ধর্ম সাদরে স্বীকার করে নিয়ে তিনি বললেন, হিন্দুধর্মকে শাশ্বত মানবধর্মের সঙ্গে অভিন্ন করে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

"তিনি··· অনুভব করিয়াছিলেন যে, যে দেবতা সর্বদেশে সর্বকালে সকল মানুষের দেবতা না হইতে পারেন, অর্থাৎ যিনি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করেন, অন্যের কল্পনাকে বাধা দেন, যিনি আমার অভ্যাসকে আকর্ষণ করেন, অন্যের অভ্যাসকে পীড়িত করেন, তিনি আমারও দেবতা হইতে পারেন না, কারণ সকল মানুষের সঙ্গে যোগ কোনোখানে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষের পক্ষে পূর্ণ সত্য হওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না এবং এই পূর্ণ সত্যই ধর্মের সত্য।"[১]

রামমোহন তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে, জীবনের মধ্য দিয়ে যা প্রচার ও প্রকাশ করেছিলেন তা মানবের বিশ্বধর্মবোধ। ভারতের শাশ্বত বাণী হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রমধ্যে উদ্‌গীত হয়েছে এবং সেই বাণীর সঙ্গে পৃথিবীর অন্য শ্রেষ্ঠ ধর্মের বাণীর বিরোধ নেই— এটাই তাঁর সাধনার মর্মকথা। কিন্তু তাঁর বাণী স্বীকার করবার পরিবেশ রচিত হয় নি, কারণ দেশে শিক্ষা ছিল অত্যন্ত সীমিত।

---

১ মাঘ ১৩১৮। ভারতপথিক রামমোহন, পৃ. ১২৯-৩০।

৫

রামমোহনের আবির্ভাবকালে, অর্থাৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাংলা দখলের সময়ে, বাংলাদেশের শিক্ষার কী অবস্থা ছিল তা আমরা এখন কল্পনাও করতে পারি না। মোটামুটিভাবে শিক্ষা ছিল তিন ধরণের— গ্রাম্য পাঠশালা, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী বা টোল আর মুসলমানী মকতব। প্রথমটিতে বাংলা লেখা, অঙ্ক ও শুভঙ্করী শেখানো হত ; পড়বার বই ছিল না, মুখে মুখে চলত শিক্ষা। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, ধনীর দালানে অথবা দোকানের বারান্দায় 'গুরুমশায়'রা পড়াতেন। গুরুমশায়দের বিদ্যাবুদ্ধিও যে খুব বেশি ছিল তা নয়। সেই সময়ের পাঠশালার বর্ণনা পাই দেওয়ান কার্তিকেয়-চন্দ্র রায়ের 'আত্মজীবনচরিতে', শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের রচনায় এবং আরো নানা জায়গায় কিছু কিছু। আমরা যাকে জনতার সাক্ষরীশিক্ষা বলি তা তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ; কারণ সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিতরণ করতে হবে এ কথা তখন, এ দেশে কেন, সব দেশেই অজ্ঞাত। তা ছাড়া বাংলাদেশে মুদ্রিত বই তো ছিল না— সুতরাং কী দিয়ে বা কী নিয়ে পড়াবে? আর যাঁরা গুরুমশায়দের কাছে 'শিক্ষিত' হতেন, তাঁদের এবং তাঁদের গুরুমশায়-দেরও বাংলা বানান-বোধ ও বাংলা ভাষা-বোধের নমুনা যা পাই তা দেখে অবাক হয়ে ভাবি— এঁরাই ছিলেন বাঙালীর সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

টোল বা চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ-স্মৃতি-ন্যায়-কাব্যই প্রধানত অধ্যাপিত হত। অবশ্য সংস্কৃত-চর্চা ছিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমিত। 'স্মৃতি'টাই কাজে লাগত বেশি, কারণ হিন্দুর দশকর্মের বিধানের জন্য জনতা ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হতেন। বেন্টিংক-এর আদেশে অ্যাডাম সাহেব বাংলাদেশের শিক্ষা-অবস্থার একটা রিপোর্ট লেখেন। তার থেকে জানা যায় সংস্কৃতের চর্চাটা ভালোই ছিল। নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, ফরিদপুরের বহু টোলে বহু শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। একটা টোল থেকেই বিলেতের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার মতো সংখ্যার অধ্যাপক সংগ্রহ করা যেত। এই পণ্ডিতরা বাংলার চর্চা করতেন না এবং পুঁথির বাইরের দুনিয়ার কোনো সংবাদ তাঁরা রাখতেন না। অথচ এই পণ্ডিতরাই ছিলেন হিন্দু-সমাজের স্তম্ভ!

মুসলমানরা মৌলবীর কাছে দরগা-তলায় বা মসজিদ-প্রাঙ্গণে অথবা

তাঁর নিজের বাড়িতে উর্দু ফার্সি শিখতেন, আর আরবি-কোরানের খানিকটা মুখস্থ করা ছিল মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার আবশ্যিক অংশ। ফার্সি তখন রাজভাষা, অর্থাৎ আদালতের ভাষা। ওয়ারেন হেস্টিংস দেখলেন, হিন্দুদের সংস্কৃত-চর্চার ব্যবস্থা বেশ ভালোই আছে, কিন্তু মুসলমানী শাস্ত্র শেখাবার জন্যে উত্তম মৌলবী প্রস্তুত হতে পারে এমন বিদ্যালয় বাংলাদেশে নেই। তাই ১৭৮১ অব্দে তিনি কলকাতায় নিজব্যয়ে 'মাদ্রাসা' স্থাপন করলেন। মুসলমানী শাস্ত্র ও উর্দু ফার্সি আরবি শেখবার আসল কেন্দ্র তখন পূর্ব-ভারতের পাটনা। কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপনের এগারো বছর পর বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় ইংরেজ রেসিডেণ্ট জোনাথান ডানকানের প্রচেষ্টায়।

বলা বাহুল্য, এই সংস্কৃত ও ফার্সি শিক্ষা বহু শতাব্দী ধরে একইভাবে চলে আসছিল। আমরা যাকে আজ 'জনতা' বা 'সাধারণ' লোক বলি তাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের কথা তখনো ভদ্রদের মনোগত হয় নি। সে চেষ্টায় প্রথম মনোযোগ দেন খ্রীষ্টান সাহেবরা। কেরী সাহেব এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক। মালদহে মদনাবাটী গ্রামে আশ্রয় পাবার অনতিকাল-মধ্যে চার দিকের চাষীবাসীদের শিক্ষা দেবার জন্যে তিনি বিদ্যালয় খুলেছিলেন। য়ুরোপীয় মতে শিক্ষা দেবার চেষ্টা ইতিপূর্বে সামান্যভাবে শুরু করেছিলেন জন্ এলারটন নামে আর-এক নীলকর সাহেব মালদহেরই এক গ্রামে। নীল ও রেশমের জন্য তখন বহু সাহেব সে দিকে যান— মালদহের অপর নামই হয় ইংরেজ-বাজার। এই বাংলা বিদ্যালয়ে কেরী যে কেবল বর্ণমালা শিক্ষা দিতেন তা নয়, ভারতীয় টোল চতুষ্পাঠীর পরম্পরাগত রীতি-অনুসারে তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের ছেলেদের অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। শিক্ষণীয় বিষয় ছিল সংস্কৃত ও বাংলা, এবং ফার্সি ভাষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিতরণ করা হত, যেমন আমাদের ছেলেবেলায় সব জ্ঞান ইংরেজির মাধ্যমে পেতাম। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে কেরী 'নিউ টেস্টামেণ্ট'-এর বাংলা তর্জমা করতে আরম্ভ করলেন। ছাপবার জন্যে যে ব্যবস্থা তিনি করেন তার কথা অন্যত্র বলা হয়েছে বলে আর পুনরুক্তি করলাম না।

মদনাবাটী থেকে ছাপাখানা নিয়ে কেরী শ্রীরামপুরে এসে মার্শম্যানদের সঙ্গে মিলিত হলেন ও ১৮০০ অব্দে সেখানে এক দেশীয় পাঠশালা স্থাপন

করে বালকদিগকে বাংলাভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলেন। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে বাঙালীর ভাষা শুদ্ধ করে বাঙালীকে শেখাবার আয়োজন করলেন খ্রীষ্টান বিদেশী পাদরিরা! পাদরি কেরী বাংলাভাষার জন্যে যা করেছেন তা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর ঘটনা রূপে লিপিবদ্ধ থেকে যাবে, নানা গ্রন্থে সে বিষয়ে ভূরি আলোচনা হয়েছে।

৬

ইতিমধ্যে ১৭৮৫ অব্দে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারক সার উইলিয়াম জোন্‌স্‌ প্রমুখ ব্রিটিশ ভদ্রদের চেষ্টায় Asiatic Society স্থাপিত হয়েছে। জোন্‌স্‌ প্রমুখ ইংরেজ ভদ্ররা সংস্কৃতভাষা-অভিজ্ঞ ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাশীল। তাঁরা ভারতের সংস্কৃত-সাহিত্য-মন্থনে মন দিলেন। এই জ্ঞানান্বেষী ইংরেজদের মধ্যে জোনাথান ডানকান বারাণসীতে রেসিডেণ্ট হয়ে যাবার পর সেখানে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন (১৭৯২)। পরে সেটার নাম হয় কুইন্‌স্‌ কলেজ— বর্তমান বারাণসী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়।

শিক্ষাবিস্তারের জন্য লর্ড ওয়েলেস্‌লি কলকাতায় যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন তা সাধারণের বিদ্যালয় ছিল না— বাঙালী ছাত্রদের শিক্ষার সঙ্গে তার কোনো যোগ ছিল না। এটি বিলাত থেকে আনীত সিবিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেবার জন্যেই স্থাপিত হয়। এ বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের দানের কথা অবিস্মরণীয় ঘটনা হয়ে রয়েছে, কিন্তু বৃহত্তর বাঙালী-সমাজের উপর তাদের প্রভাব কখনো পড়ে নি।

১৭৯৩ অব্দে প্রথম খ্রীষ্টান পাদরি কেরী ভারতে এসে ধর্মপ্রচারে অনেক বাধা পেয়েছিলেন। কিন্তু ১৮১৩ অব্দে বিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাসে এমনই ওলট-পালট হয়ে গেল যে, একটা কোম্পানির মুষ্টিমেয় অংশীদারদের ধনস্বার্থ কায়েম হয়ে থাকা আর সম্ভব হল না। ব্যাবসা-বাণিজ্য সর্বদ্বারী হল; যুগপৎ ধর্ম সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়াতে নানা সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান পাদরি আসতে আরম্ভ করে— তাদের আগমনের পরই শিক্ষা বিস্তার-লাভ করতে থাকে।

ভারতের শিক্ষা-সংস্কারের কথা ১৮১৩ সালের সনন্দ গ্রহণের সময় উঠেছিল। সংস্কৃতজ্ঞ কোলব্রুক সাহেব[১] তৎকালীন বড়োলাট লর্ড মিণ্টোকে অনুরোধ করলেন— বিলাতে ডিরেক্টরদের কাছে এই বলে যেন তিনি সুপারিশ করেন যে এ দেশে স্থানে স্থানে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। ১৭৯৫ সালে মির্জাপুরে অবস্থানকালে কোলব্রুক কাশীর সংস্কৃত কলেজের (১৭৯২) সংস্পর্শে আসেন। তখন থেকেই বাংলাদেশে একটি উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা তাঁর মনে জাগে। কলিকাতায় বদলি হয়ে আসেন প্রধান বিচারালয়ে জজের পদ পেয়ে। তখন ওয়েলেস্‌লি বড়োলাট; তাঁকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দেবার জন্যে কোলব্রুক অনুরোধ জানান, কিন্তু ওয়েলেস্‌লি তখন নানা যুদ্ধে জড়িত, এ দিকে মন দেবার অবসর ছিল কম। যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেছেন সিবিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য, ডিরেক্টররা সে কাজটাকে আদৌ পছন্দ করছেন না— আবার সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের কথা!

অতঃপর ১৮১৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তৃতীয় বার সনন্দ পরিবর্তনের সময় পার্লামেণ্ট ভারত-সরকারকে জানালেন যে, প্রতি বছর ন্যূনপক্ষে একলক্ষ টাকা সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও উন্নতির, ও দেশীয় পণ্ডিতদের উৎসাহ দেবার জন্য এবং ব্রিটিশ এলাকার মধ্যে বিজ্ঞান-বিষয়ে জ্ঞান-প্রচারের জন্য ব্যয়িত হবে: "That a sum of not less than a lakh of rupees in each year shall be set apart, and applied to the revival and improvement of literature, and the encouragement and promotion of a knowledge of the sciences among the British territories of India." কিন্তু বহু বছর এ টাকার কোনো সদ্‌ব্যবহার হয় নি। ১৮২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজ কলকাতায় স্থাপন-কালে এই টাকা ব্যয়িত হল। রামমোহন রায় এই সময়ে ভারতের ভাবী শিক্ষা কী হওয়া বাঞ্ছনীয় সে সম্বন্ধে তৎকালীন বড়োলাট লর্ড আমহার্স্টকে পত্র লিখেছিলেন, তাতে তিনি সংস্কৃত কলেজ

১ দ্রষ্টব্য, "হেনরি টমাস কোলব্রুক", সাহিত্যের খবর, কার্তিক ১৩৬৭, পৃ. ২০-৩১। মুরারি ঘোষ লিখিত প্রবন্ধ।

স্থাপনের যৌক্তিকতা সমর্থন করেন নি। লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত সেই পত্রাংশের বাংলা অনুবাদ আমরা উদ্ধৃত করছি :

"যদি ইংরাজ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ রাখা উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে প্রাচীন স্কুলমেনদিগের অসার বিদ্যার পরিবর্তে বেকনের প্রবর্ত্তিত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত হইতে না দিলেই হইত, কারণ প্রাচীন জ্ঞানই অজ্ঞতাকে বাহাল রাখিত। সেইরূপ এদেশীয়দিগকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখা যদি গবর্নমেণ্টের আকাঙ্ক্ষা ও নীতি হয়, তাহা হইলে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় তাহার উৎকৃষ্টতর উপায় আর নাই। তৎ-পরিবর্তে এদেশীয়দিগের উন্নতিবিধান যখন গবর্নমেণ্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষা বিষয়ে উন্নত ও উদারনীতি অবলম্বন করা আবশ্যক, যদ্দ্বারা অপরাপর বিষয়ের সহিত গণিত, জড় ও জীব বিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীর-স্থানবিদ্যা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যে অর্থ এখন প্রস্তাবিত কার্য্যে ব্যয় করিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে তদ্দ্বারা ইউরোপে-শিক্ষিত কতিপয় প্রতিভাশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে ও ইংরাজি শিক্ষার একটি কলেজ স্থাপন করিলে ও তৎসঙ্গে পুস্তকালয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রাদি, প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল দিলেই পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।"[১]

রামমোহনের ন্যায় সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি কেন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরোধিতা করেছিলেন তার নির্গলিত অর্থ বর্তমানে কোনো কোনো প্রতিক্রিয়াপন্থী লেখক আবিষ্কার করেছেন।

"লর্ড আমহার্স্টের শাসনকালে ইংরাজশাসকগোষ্ঠী যখন প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রচর্চাকে উৎসাহিত করিবার জন্য কলিকাতায় সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্ররূপে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করেন, তখন আমাদের দিক হইতেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা হইয়াছিল। এবং বিরোধিতা করিয়াছিলেন স্বয়ং রাজা রামমোহন রায়।" রামমোহন-লিখিত পত্র থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করে লেখক মন্তব্য করেছেন : "এমন-কি, তিনি এ পর্যন্ত বলিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না যে সংস্কৃতশিক্ষাকে জীয়াইয়া রাখিয়া

১ শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ৮২।

ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসিগণকে চিরকালের জন্য অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতে চান।" লেখক অতঃপর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে লিখছেন, "কিন্তু রামমোহন রায়ের এই বিরোধিতা সত্ত্বেও General Committee of Public Instruction তাঁহার স্মারকলিপি নীরবে উপেক্ষা করিলেন এবং ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি সংস্কৃত কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইল।"[১]

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, একটি কৃত্রিম অতি-ব্যাকরণ-পিষ্ট ও অনিয়ম-বা আর্ষপ্রয়োগ-কণ্টকিত ভাষা কি কখনো দেশব্যাপী হতে পারে? রামমোহনের বাস্তববোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল বলেই, সংস্কৃতজ্ঞ হয়েও তিনি ইংরেজিভাষা প্রচলনের জন্য সুপারিশ করেন। তিনি জানতেন, ভাষার মাধ্যমেই আসবে পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞান-দর্শনের ঐশ্বর্য। আমাদের মনের মুক্তি না হলে দেশের মুক্তি পাওয়া কঠিন। পৃথিবীর সমস্ত পিছিয়ে-পড়া জাতি আজ যে স্বাধীনতা লাভ করছে, তার পিছনে আছে এই য়ুরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা— যা তারা আয়ত্ত করেছে কোনো-একটা য়ুরোপীয় ভাষার মাধ্যমে— তা সে ইংরেজি হোক, ফরাসি হোক, আর রুশীয়ই হোক।

আমরা রামমোহনের রচনা থেকে এ সম্বন্ধে কয়েকটি পংক্তি উদ্‌ধৃত করছি :

"We understand that the Government in England had ordered a considerable sum of money to be annually devoted to the instruction of Indian subjects. We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European Gentlemen of talents and education to instruct the natives of India in Mathematics, Natural Philosophy [Physics], Chemistry, Anatomy and other useful sciences, which the nations of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world." (11 Dec. 1823)

কয়েক মাস পরে য়ুরোপীয় সাহিত্য বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে রেভারেণ্ড Ware-কে যে পত্র লেখেন তার আলোচনা অন্যত্র করেছি।

---

১ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, "সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ", বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭০।

৭

রামমোহন ১৮১৫ সালে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আসেন; তার পূর্বেই শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বেসরকারী ও ব্যক্তিগত প্রয়াস আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। শ্রীরামপুরে মিশনারীরা যে স্কুল স্থাপন করেছিলেন ১৮০০ অব্দে, সে সম্বন্ধে এক পত্রে তাঁরা বিলাতে জানাচ্ছিলেন—"Commerce has raised new thoughts and awakened new energies so that hundreds, if we could skilfully teach them gratis, would crowd to learn the English Language."[১]

১৮১৪ সালে ভূকৈলাসের জয়নারায়ণ ঘোষাল ২০ হাজার টাকা দান করেন ইংরেজি শিক্ষা-প্রচারের জন্য— সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য নয়। এই সময়ে ডেভিড হেয়ার কলকাতায় এসেছেন ও ইংরেজি শিক্ষা-প্রসারের জন্য সহায় ও সম্বল খুঁজছেন। ১৮১৭ অব্দের ২০ জানুয়ারি কলকাতার ধনী ও মধ্যবিত্ত সমাজের মুখ্যব্যক্তিগণ মিলিত হয়ে 'হিন্দু কলেজ' স্থাপন করেন। এই বছরের আর-একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য; কলকাতায় 'স্কুল বুক সোসাইটি' নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। বালকদের জন্য পাঠ্যপুস্তক লিখিয়ে প্রকাশ করা ছিল এই সমিতির প্রধান কাজ। বলা বাহুল্য, শ্রীরামপুরের পাদরিদের এর মধ্যেও নিতে হয়, কারণ বাংলাভাষা সম্বন্ধে তাঁদেরই উৎসাহ বেশি। ১৮১৮ অব্দে খানিকটা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' নামে আর-একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়— বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন ছিল তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ইংরেজি শিখবার জন্য ছাত্রদের সবিশেষ আগ্রহ— হিন্দু কলেজে সকলের স্থান সংকুলান হয় না, তাই কলকাতার নানা পাড়ায় 'ইংরেজি বিদ্যালয়' স্থাপিত হতে চলল। এতৎসত্ত্বেও ইংরেজি স্কুল স্থাপন ও ইংরেজি ভাষা চর্চা ও প্রসার বিষয়ে দেশ-মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল।

ইংরেজি শিক্ষা বনাম সংস্কৃত-আরবি শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশে— আসলে কলকাতায়— দুটো পক্ষ হয়ে যায়। প্রাচীন ভাষা স্থায়ী করে রাখবার পক্ষে নামজাদা সংস্কৃতজ্ঞ সাহেব-পণ্ডিতরা ছিলেন, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সতীদাহ নিবারণ করা সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের মতের বিরোধিতাও করেন। পণ্ডিতদের

---

১ J. C. Marshman, *History of the Serampore Mission*, 1859. Vol. I, p. 131.

মধ্যেও crank থাকে ; এখনো সে শ্রেণীর লোকের অভাব নেই। সাহেব হলেই তাদের সকল মত অভ্রান্ত বলে মানবার দুর্বলতা এখনো দূর হয় নি। আমাদের আলোচ্য পর্বে তরুণ বাংলা এই প্রাচ্য-পণ্ডিতদের মতবাদের ঘোর বিরোধী। সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হবার পর থেকে (ফেব্রুয়ারি ১৮২৪) দুই দলের মসীযুদ্ধ চলে দশ বৎসর কাল।[১]

সাহিত্য ও শিক্ষার খাতে প্রদত্ত টাকার কী অপব্যবহার হত তার একটা উদাহরণ দিই। ১৮১৩ সালের মঞ্জুরী অর্থ থেকে আরবি ভাষার এক কিতাব ছাপা হয় ; মুসলমান ছাত্ররা আরবি ভাষা জানে না, তাই তার তর্জমা উর্দুতে ছাপা হল। কিন্তু বিপদ কাটল না ; পড়াবার সময় জানা গেল যে উর্দুও বাঙালী মুসলমান ছাত্ররা বুঝতে পারছে না। তখন কী করা যায় ? সেই অনুবাদক মৌলবীকেই তিন শো টাকা মাসিক বেতন দিয়ে রাখা হল নিজ তর্জমা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার জন্যে।

বহু বছর ধরে দুইদলের বাক্‌ ও মসী -যুদ্ধ চলে, কিন্তু গবর্মেণ্ট কোনো নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করতে পারেন নি। লর্ড মেকলে ১৮৩৩ সালের নূতন সনন্দ অনুসারে আইন-সদস্য-রূপে ভারতে এলেন। উভয় দলই ১৮৩৫ অব্দের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে নিজ নিজ পক্ষের যুক্তি দিয়ে দরখাস্ত পেশ করলেন। মেকলে Anglicistদের পক্ষে তাঁর মত দিয়ে মন্তব্য লিখে পাঠিয়ে দিলেন ; ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ গবর্মেণ্ট তাঁর মত গ্রহণ করে ইংরেজি ভাষা রাজভাষা হবে বলে ঘোষণা করলেন। রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে যে আবেদন করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর দেড় বছর পর ইংরেজ গবর্মেণ্ট সেটা মেনে নিয়ে চালু করলেন। বলা বাহুল্য, এই বারো বছরের মধ্যে বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা বাঙালীদের নিজ চেষ্টায় বহুলভাবে প্রসার লাভ করেছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা এখন যুবক— তাঁরা উগ্রভাবে 'পাশ্চাত্য' হয়ে উঠেছিলেন, দেশের মধ্যে তাঁরাও এই মত প্রচারে প্রচুর

১ "The Orientalists were for the continuation of the old system of stipends, tenable for twelve or fifteen years, to students of Arabic and Sanskrit, and for liberal expenditure on the publication of works in these languages. The other half, called the 'Anglicists', desired to reduce the expenditure on stipends held by 'lazy and stupid school boys of 30 and 35 years of age', and to cut down the sums lavished on Sanskrit and Arabic printing."

সহায়তা দান করেছেন।

পাঠকদের স্মরণ আছে, ১৮১৭ সালে যখন 'হিন্দু কলেজ' কলকাতায় স্থাপিত হয় তখন হিন্দুরা রামমোহনকে এর সঙ্গে যুক্ত করতে চান নি। যখন তাঁরা খ্রীষ্টান ইংরেজ জজ-সাহেবদের কাছ থেকে চাঁদা চাইতে গিয়েছেন, তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছেন রামমোহন কী দিয়েছেন; উত্তরে হিন্দু কর্মকর্তারা বলেছিলেন, রামমোহন হিন্দুধর্মের নিন্দুক; তাঁর কাছ থেকে দান তাঁরা চান না। রামমোহন নিজেই বিদ্যালয় স্থাপন করে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন; পরে পাদরি আলেকজাণ্ডার ডাফ কলকাতায় এসে স্কুল স্থাপন করতে চাইলে রামমোহনই তাঁকে বাসা ভাড়া পাবার ব্যবস্থা করে দেন এবং ছাত্র-সংগ্রহেও সাহায্য করেন। খ্রীষ্টানী স্কুলে যেতে ও সেখানে গিয়ে বাইবেল পড়তে তখন হিন্দুদের ঘোর আপত্তি ছিল। রামমোহন অভিভাবকদের বললেন যে, তিনিও তো বাইবেল পড়েছেন কিন্তু খ্রীষ্টান তো হন নি। এইভাবে ইংরেজিশিক্ষা-প্রসারে রামমোহন সহায়তা করেছিলেন।

আজ দেড় শো বছর পরে ভারতে ইংরেজি ভাষা শেখা ও না-শেখা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। একদল বলছেন, ইংরেজি ভাষা কিছুতেই রাখা হবে না, ইংরেজ যখন গিয়েছে তখন তার ভাষা ও সাহিত্যকেও দেশ-ছাড়া করতে হবে। অপর দল তেমনি জোর দিয়ে বলছেন, যদি মূঢ়-তার মধ্যে আবার যেতে চাও তা হলে ও-ভাষা ত্যাগ করো! ইংরেজি ভাষা আমাদের কাশ্মীর থেকে কেরল ও সিন্ধু থেকে আসামকে এক করেছে। আজ সেই ভাষা-বরবাদী প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে, বিচ্ছিন্ন জাতি ও ভাষাভাষীদের মধ্যে বিরোধের যে রূপ দেখা দিয়েছে, তার পরিণাম হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মীয় বিবাদ অপেক্ষা কম মারাত্মক নয়, তার প্রমাণ সকল রাষ্ট্রেই স্ফুট হয়েছে। তবে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য -চর্চার সঙ্গে সম্প্রতি যে ইংরেজি তথা ইয়াঙ্কিয়ানা 'সংস্কৃতি'র নামে দেশ-মধ্যে সর্বব্যাপী হতে চলেছে সেটা দুর্লক্ষণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১

আধুনিক বাংলাদেশের জন্ম হয় সেদিন— যেদিন মুদ্রাযন্ত্র আবির্ভূত হল হুগলি শ্রীরামপুরে ও কলকাতায়। আর বাঙালীর নবজন্ম বা দ্বিজত্ব-লাভ হল সেদিন— যেদিন সাময়িক পত্র প্রকাশিত হল, প্রথমে ইংরেজিতে, পরে বাংলাতে। আমরা প্রথমেই কলকাতায় ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশের ইতিহাসটা আলোচনা করব ; কারণ, পত্রিকা-পরিচালনার আদর্শ ও টেক্‌নিক আমরা ব্রিটনদের কাছ থেকেই পাই এবং আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্য আদর্শে পত্রিকা পরিচালনা করছি।

বাংলা সাময়িক পত্র ও পত্রিকা প্রকাশের ৩৮ বৎসর পূর্বে কলকাতায় ১৭৮০ অব্দে প্রথম ইংরেজি পত্রিকার আবির্ভাব হয়। বাংলাদেশের হুগলি শহরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হওয়ার (১৭৭৮) দুবছর পর ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হয় কলকাতায়। প্রথম ইংরেজ এসেছিল এই গ্রামে ১৬৯০ সালে, তার ৯০ বছর পরে প্রথম ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ইংরেজের পরিচালনায়। শতাব্দী পূর্ণ না হতে যুগান্তর এসে গেছে বাংলার জীবনে। সেই টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, দ্রুত যানবাহন -হীন যুগে, সাত সমুদ্দুর পার হয়ে, অর্থের সন্ধানে এসেছিল ব্রিটিশরা ; পরস্পরের মধ্যে যোগস্থাপনের বা সংবাদাদি পাবার কোনো মাধ্যম ছিল না সেদিন। দেশের ও দুনিয়ার চার-পাঁচ মাসের পুরোনো খবরের কাগজ তারা পেত। বিলেত থেকে জাহাজ আসছে খবর পেলে সাহেবরা কী উত্তেজিত হয়ে উঠত! জাহাজে ডাক আসছে! দেশের খবর— তা সে ঘরের পত্র হোক, আর মুদ্রিত পত্রিকাই হোক। সেই-সব পাবার জন্যে সাধারণ লোকের ও পত্রিকাওয়ালাদের কী উৎসাহ! প্রায় নৌকার বাইচ্‌ খেলা শুরু হত— কে আগে জাহাজ থেকে পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করে আনবে। কোনো কোনো নৌকা আরো দক্ষিণে চলে গিয়ে জাহাজ পাকড়াও করে ডাকের কাগজপত্র জোগাড় করে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসত।

কোম্পানির দেওয়ানি পাবার তিন বছর পরে (১৭৬৮) কলকাতায়

কাউন্সিল হাউসের দরজায় একটা বিজ্ঞাপন দেখা গেল। তাতে মি. বোল্‌ট্‌স্[১] লিখেছিলেন যে : এই শহরে কোনো মুদ্রাযন্ত্র নেই; যদি কোনো ব্যক্তি এই কাজ করবার ভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকেন তবে তিনি তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে প্রস্তুত। তখন পর্যন্ত দরজার গায়ে হাতে লিখে 'বিজ্ঞাপন' দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না এবং "not till 1780 did the first city in Asia possess a medium which combined the object of conveying public intelligence in print, with that of promulgating the ordinary business or social wants of its European inhabitants."[২]

১৭৮০ অব্দে কলকাতায় প্রথম ইংরেজি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হবার দু বছর আগে হুগলিতে বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল— সে তথ্য আমরা পূর্বেই পেশ করেছি।

এতকাল কোম্পানির দপ্তরের কাগজপত্র বিলেত থেকে ছাপিয়ে আনা হত। বলা বাহুল্য, বিলেত থেকে আফ্রিকা ঘুরে যেতে আসতে, ছাপা হতে বৎসরাধিক কাল লেগে যেত। অধিকাংশ সরকারী কাগজপত্রের কাপি অনুলেখকরা প্রস্তুত করত; সেই-সব হাতে-লেখা দলিলপত্র (records) লন্‌ডনের ইন্‌ডিয়া অফিসে, দিল্লীর আর্কাইভ্‌সে, আর কলকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজের দপ্তরখানায়— আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। প্রসঙ্গত বলি, সে-সব হস্তলিপি দেখবার মতো।

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালের শেষ ভাগে কলকাতায় কয়েকটি ছাপাখানা এসে গিয়েছিল। ১৭৭৯ অব্দে কোম্পানির সরকারী মুদ্রাযন্ত্র কলকাতায় স্থাপিত হয়।[৩] এ-সবের মধ্যে হিকির নিজস্ব ছাপাখানা বিশেষ-

১ Considerations of Indian affairs ; particularly respecting the present state of Bengal and its dependencies. To which is prefixed a Map of those countries chiefly from actual surveys. The second edition with additions. By William Bolts, merchant and Alderman or Judge of the Honorary Mayors' Court of Calcutta. London. (1772) p. 228, Appendix p. 184.

২ *Echoes form Old Calcutta*, p. 183.

৩ "...no English newspaper had yet been established in India and that the European Community relied entirely on newspapers sent from England—received after nine months or a year after publication. The Company certainly had printing presses. In 1674 Henry Mills was sent to Bombay by the Court of Directors with a printing press, types and a considerable quantity of papers... A printing press was in operation in Madras in 1772 and in 1779 an official printing press was established in Calcutta. The latter was under the direction of Sir Charles Wilkins..."

—Mrs Barnes, *Indian Press.*

ভাবে উল্লেখযোগ্য; কারণ, সেখান থেকে প্রথম ইংরেজি পত্রিকা মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। জেম্‌স্‌ অগস্টাস্‌ হিকি ১৭৮০ অব্দের ২৯ জানুয়ারি 'বেঙ্গল গেজেট' (*Bengal Gazette*) সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। কাগজে লেখা ছিল: "A weekly political and commercial paper open to all parties but influenced by none"। পত্রিকা-পরিচালনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ এ কথাগুলি, কিন্তু কার্যত তা হয় নি। পত্রিকা-প্রকাশের কিছুকালের মধ্যে এর সুর গেল পাল্‌টে। কোম্পানির কর্মচারী ও অন্যান্য সাহেবদের কুৎসা রটানো হল এর প্রধান কাজ— নাটক, কবিতা, চুট্‌কি বের হত তাদের সম্বন্ধে। ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা ছিল এই আক্রমণ ও ব্যঙ্গের প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশে ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরোধী একটা বড়ো দল ছিল। পত্রিকাওয়ালারা জানত সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও তাদের সমর্থনকারী আছে। সেই সাহসে হিকি ও অন্যেরা বেপরোয়াভাবে কলম চালাতে সাহস পেত। এ বিষয়ে Busteed তাঁর *Echoes from Old Calcutta* গ্রন্থে বহুবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, আমাদের সে বিষয়ে কৌতূহল কম। ইংরেজিতে যাকে বলে lampoon এই পত্রিকা ছিল তাই। এক বছর যেতে না যেতেই গবর্মেণ্ট হুকুম দিলেন যে 'বেঙ্গল গেজেট' জেনারেল পোস্টাপিস মারফত বিতরিত হতে পারবে না।

হিকির উপর ওয়ারেন হেস্টিংসের মনোভাবের সুযোগ নিয়ে মেসিংক ও রীড নামে দুই ইংরেজ *India Gazette* নামে পত্রিকা বের করলেন (নভেম্বর ১৭৮০)। হিকির উপর হেস্টিংস এতই বিরক্ত হয়েছিলেন যে, 'ইন্‌ডিয়া গেজেট'কে তিনি বিনা মাশুলে ডাকে বিলি হবার ব্যবস্থা করে দিলেন।[১] মেসিংকদের তোয়াজ করার ফল হল উল্‌টো— হিকি বেপরোয়াভাবে লেখনী চালাতে শুরু করে দিলেন— একেবারে খিস্তি! শেষ কালে তাঁর জেল হল,

১ ডিসেম্বর ১৭৮৪, *Calcutta Gazette*-এ General Post Office-এর বিজ্ঞাপন বের হল, বারাকপুর থেকে বারাণসী পর্যন্ত ও দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত ডাক যেত। মাশুল ছিল আড়াই শিক্কা ওজনের চিঠির ৵০, সাড়ে পাঁচ শিক্কা ওজনের ।।৵০ আনা। বারাণসীতে ।৶০ আনা থেকে ওজন-মতে ২ টাকা ৶০ আনা ছিল।— *Selection from Calcutta Gazette*, Vol. I, p. 9.

আর যে মুদ্রাযন্ত্রে 'গেজেট' ছাপা হত তা বাজেয়াপ্ত করে নিলেন গবর্মেণ্ট। ১৭৮২ অব্দের মার্চ মাসে, অর্থাৎ প্রায় আড়াই বছর চলার পরে, ইংরেজের প্রথম পত্রিকার অপমৃত্যু ঘটল এইভাবে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে আরো কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়— ফেব্রুয়ারি ১৭৮৪ 'ক্যালকাটা গেজেট', ফেব্রুয়ারি ১৭৮৫ 'বেঙ্গল জর্নাল', এপ্রিল ১৭৮৫ 'ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিন' বা 'ক্যালকাটা অ্যামুজমেণ্ট' (মাসিক), জানুয়ারি ১৭৮৬ 'ক্যালকাটা ক্রনিকল' ইত্যাদি।

২

ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮৫ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি ভারত ত্যাগ করে দেশে ফিরে যান। ম্যাক্‌ফার্সন অস্থায়ী গবর্নর-জেনারেল পদ পেয়ে পত্রিকা-ওয়ালাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করতে পারলেন না। কারণ একদল ইংরেজ কুৎসা বা খিস্তি খুবই উপভোগ করত; তাই বেপরোয়াভাবে লেখকরা কলম চালাতে সাহসও পেতেন। এই যুগের একখানি পত্রিকা এখনো আছে, সেটি হচ্ছে *Calcutta Gazette*। আজকাল সকলেই জানেন যে এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র। গবর্মেণ্টের যাবতীয় সংবাদ, ঘোষণা, ইস্তাহার, বাজারদর, বিজ্ঞাপন, আইনের খসড়া বা বিল প্রভৃতি বহু তথ্য এতে প্রকাশিত হয়। ১৭৮৫ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি এই কাগজেই মুদ্রিত হত— সরকারের নিজস্ব পত্রিকা তখন ছিল না। ১৮১৫ সালের ২৫ মে এক বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে, অতঃপর 'গবর্মেণ্ট গেজেট' মিলিটারি অর্ফান সোসাইটির প্রেস হতে ছাপা হবে জুন মাস থেকে।[১] অবশ্য ক্যালকাটা গেজেট আগের

১ ১৮১৫ অব্দের ২৫ মে তারিখে ক্যালকাটা গেজেটে একটা বিজ্ঞাপন বের হয়—"The Printing business of Government shall be transferred from the Calcutta Gazette Press to the Press established at the Military Orphan Society" and that weekly paper will be published at the society press [Orphan Press] from the commencement of the ensuing month (1815 June) to be styled the *Government Gazette*. The *Calcutta Gazette* which had been established in 1784, still continued to be printed.—W. H. Carey, *The Good Old Days of Honourable John Company*, Vol. I, p. 288.

মতোই প্রকাশিত হয়ে চলল। সতেরো বছর পরে ১৮৩২ সালে এই গবর্মেণ্ট গেজেট বন্ধ হয় এবং ক্যালকাটা গেজেট সরকারী মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৩২ সালের মার্চ (?) মাস থেকে G. A. Prinsep সম্পাদক হলেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ক্যালকাটা গেজেট সরকারী প্রচার-পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

১৭৮৬ অব্দের গোড়ায় কর্নওয়ালিস বড়োলাট হয়ে এসেই স্থানীয় কর্মচারীদের মুখে হিকির পত্রিকা সম্বন্ধে সকল কথা শুনে মনকে কঠোর করে ফেলেন। কিন্তু পত্রিকা নিয়ন্ত্রণাদি কিছুই করতে দেখা গেল না তাঁকে। কিন্তু সার জন্ শোর গবর্নর-জেনারেল হবার পর পট-পরিবর্তন হতে সময় লাগল না। শোর কৈশোর হতে বাংলাদেশে লালিত, তিনি এ দেশকে ভালো করেই চেনেন— ফাঁকা আদর্শবাদ থেকে কড়া বাস্তববোধ ছিল তাঁর; তাই প্রেসকে অযথা স্বাধীনতা দিতে তিনি নারাজ। উইলিয়াম ডুয়ানি নামে এক আইরিশ-আমেরিকান কলকাতায় এসে *Bengal Journal* নামে এক পত্রিকা বের করেছিলেন ১৭৯১ অব্দে। লোকটা পাকা সাহসিক, সৈনিকের কাজ নিয়ে এসে পত্রিকার ব্যবসায়ে হাত দেয়। কিন্তু এ কাগজ ডুয়ানিকে ছাড়তে হয় মিথ্যা এক খবর সরবরাহের জন্যে। এর পর *Indian World and Tradesmen* (১৭৯৪) নামে এক সাপ্তাহিক প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। এ পত্রিকাও বন্ধ হয় তাঁর সবর্ণ লোকদের অনুগ্রহে। গভর্নর-জেনারেল সার জন্ শোর— চিরদিন চাকরি করেছেন, উপরের আদেশ মেনে চলেছেন, তাঁর ভয় খুব বেশি। আর দুর্বল মনিবকে ধূর্ত পার্শ্বচররা সহজেই করায়ত্ত করতে পারে। ডুয়ানির উপর চোখ গেল ইংরেজ কর্মচারীদের। একদিন তাঁকে লাটভবনে ডেকে আনা হয় এবং সেখানেই বন্দী করা হয়। ডুয়ানিকে কী অপরাধে নির্বাসিত করা হয় তা তিনি জানতে পারেন নি এবং তাঁর লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তিই বা কেন বাজেয়াপ্ত করা হয় তাও তাঁর অজ্ঞাত থেকে যায়। এইভাবে অষ্টাদশ শতকে কোম্পানির শাসনের গোড়ার দিকে পত্রিকা-শাসন কাজ চলত।

সার জন্ শোরের পর লর্ড ওয়েলেস্‌লি এলেন বড়োলাট হয়ে। বোর্ড অব্ কন্‌ট্রোলের কর্তা Dundas চেয়েছিলেন সৈনিক-শাসক। ভারতের ইতিহাস-পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে ওয়েলেস্‌লি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা

সম্পূর্ণভাবে হরণ করেন। যুদ্ধে হারিয়ে অথবা বিবিধ কূটনৈতিক জালে বেঁধে দেশীয় রাজাদের বিষদাঁত তিনি চিরকালের মতো ভেঙে দিলেন। এই অব্যবস্থিত অবস্থায় যদি পত্রিকাগুলো বেফাঁস উক্তি বা মন্তব্য করে তবে তাতে করে শাসনকার্য ব্যাহত হতে পারে এই আশঙ্কায় ১৭৯৯ অব্দে তিনি সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করেন। পত্রিকায় মুদ্রিতব্য বিষয়ের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার ব্যবস্থা এই আইনের প্রধানতম শর্ত। এ ছাড়া প্রিণ্টার বা মুদ্রাকরের নাম পত্রিকার নীচে দেওয়া, সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীদের নাম ঠিকানা প্রভৃতি ছাপা আবশ্যিক করা হয়। আর খ্রীষ্টানী ধর্মের নিয়মানুসারে রবিবারে পত্রিকা বের করা নিষিদ্ধ হয়। এই আইনের শর্ত মেনে পত্রিকা চালানো শক্ত হয়ে পড়ল। পত্রিকা ছাপার আগে পাণ্ডুলিপি বা প্রুফ সেন্সরের জন্য পাঠানোর পর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পেলে কাগজ ছাপা হত। এ সম্বন্ধে মার্শম্যান সাহেব লিখেছিলেন, "সম্পাদকীয় মন্তব্যের স্থলে সংবাদপত্রের অনেক স্তম্ভই তারকাচিহ্নিত হইয়া বাহির হইত ; কেননা সে-সকল অংশে 'সেন্সর' তাহার সাংঘাতিক কলম চালাইতেন। শেষ মুহূর্তে শূন্য অংশগুলি পূরণ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইত না।"

এই অদ্ভুত অবস্থা চলেছিল বিশ বৎসর— ১৭৯৯ থেকে ১৮১৮ পর্যন্ত। সে কথা আসছে এবার। একটি কথা বলা দরকার, তখন ভারতীয়রা সংবাদপত্র বা পত্রিকা পরিচালনে কেউ নামেন নি। সকলেই ব্রিটিশ নাগরিক। এই আইন চালু হলে অনেকেই কাগজ বন্ধ করে দিলেন। স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অধিকার— ব্রিটিশ জনগণের মুলগত দাবি— ক্ষুণ্ণ করে পত্রিকা-চালনার প্রয়োজন নিরর্থক। তবে বেঙ্গল হরকরা, ক্যালকাটা মর্নিং পোস্ট, ক্যালকাটা ক্যুরিয়ার, টেলিগ্রাফ, ওরিয়েণ্টাল স্টার প্রভৃতির মালিকরা ওয়েলেস্‌লির আইন মেনে পত্রিকা চালাবার অঙ্গীকার-পত্রে সহি করে এলেন। ১৮১৩ অব্দে কোম্পানির সনন্দ নূতন করে গ্রহণ করার পর প্রেস-আইন আরো কড়া হল। এতকাল মুদ্রাকরের নাম প্রত্যেক পত্রিকায় ছাপা হয়ে আসছিল ; এবার আইন হল, প্রেসে যা-কিছু ছাপা হবে, তা সে হ্যাণ্ডবিল হোক আর বিজ্ঞাপনই হোক, সবই চীফ-সেক্রেটারির দপ্তরে পাঠাতে হবে।

আমরা পূর্বেই বলেছি, ওয়েলেস্‌লি প্রেস সম্বন্ধে যে আইন করেন তাতে আইন-ভঙ্গকারীর লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করার শাসানি ছিল। লাইসেন্স

বাজেয়াপ্ত হলে কোনো য়ুরোপীয়ের পক্ষে এ দেশে আর থাকাই সম্ভব হত না। তাকে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে স্বদেশে বা বিলাতে ফিরে যেতে হত। কিন্তু ১৮১৮ সালের মধ্যে কয়েকজন ভারতীয় ও কয়েকজন ইউরেশীয় বা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকা পরিচালনার কাজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মুশকিল হল, এই শ্রেণীর অপরাধীকে তো আর বিলাতে নির্বাসনে পাঠানো যায় না। সুতরাং আইন সংশোধনেরও প্রয়োজন হল। তেমনি ঘটনা একটি ঘটল মর্নিং পোস্ট নামে এক পত্রিকার সম্পাদক হিট্‌লি সাহেবকে নিয়ে। হিট্‌লি সেন্সরের আপিসে জানিয়েছিলেন যে, "বঙ্গদেশে তাঁহার জন্ম, তাঁহার মাতা এদেশবাসিনী ; এ অবস্থায় সেন্সরের আদেশ অমান্য করিলেও তাঁহার কোনো শাস্তি হইতে পারে না, যেহেতু এরূপ অপরাধে কেবলমাত্র ইউরোপীয় সম্পাদকগণেরই শাস্তির বিধান আছে।" সত্যই তো হিট্‌লির বাড়ি কলকাতায়, তাঁকে বিলাতে পাঠানো যাবে কেমন করে? এই ব্যাপারে সংবাদপত্র-পরীক্ষক পদের অসারতা উপলব্ধি করে লর্ড হেস্টিংস বিশেষ বিবেচনার পর সেন্সরের পদ রহিত করে দিলেন ও তার পরিবর্তে সম্পাদকদের নির্দেশের জন্যে কতকগুলো সাধারণ নিয়ম প্রবর্তন করলেন (১৯ অগস্ট ১৮১৮)।[১]

এই সময়ে বাংলাভাষায় মাত্র তিনখানি পত্রিকা ছিল— সবগুলি ১৮১৮ অব্দের এপ্রিল-মে মাসে প্রকাশিত হয় ; এই পত্রিকাগুলির নাম— দিগ্‌দর্শন (মাসিক), সমাচার দর্পণ (সাপ্তাহিক) ও বাঙ্গাল গেজেট (মাসিক)। এ-সম্বন্ধে আলোচনা অন্যত্র করব।

সংবাদপত্র পরীক্ষার রীতি রদ হবার পূর্বেই (৩০ এপ্রিল ১৮১৮) 'ফ্রেন্ড অব্ ইন্ডিয়া'[২] শ্রীরামপুর থেকে, আর পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার আইন রদ হবার পর 'ক্যালকাটা জর্নাল' (২ অক্টোবর ১৮১৮) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ফ্রেন্ড অব্ ইন্ডিয়ার সম্পাদক ছিলেন শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারী মার্শম্যান সাহেব। এঁর পত্রিকা হেস্টিংসের আইনের আওতায় পড়তে পারে

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র, পৃ. ৩-৪।
২ ১৮৭৫ অব্দে রবার্ট নাইট 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র স্বত্ব কিনে নিয়ে তা বর্তমান *Statesman*-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেন।

না, কারণ ইনি বাস করতেন দিনেমারদের শ্রীরামপুরে। ইনি সমাচার দর্পণেরও সম্পাদক ছিলেন। এই দুটি খ্রীষ্টানী পত্রিকার সঙ্গে রামমোহনকে মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়, সে কথা যথাস্থানে আসবে।

আমরা অন্যত্র বলেছি, ১৮১৩ সালের *সনন্দ* গ্রহণের সময়ে কোম্পানিকে অনেক একচেটিয়া অধিকার ত্যাগ করতে হয়। কোম্পানির ছাড়পত্র ছাড়া কোনো লোক ভারতে আসতে পেত না বা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে পেত না। ১৮১৩ সালে সে আইন রদ হয়ে গেলে নানা সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টীয় পাদরিরা এ দেশে আসতে শুরু করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন স্কচ্ প্রেস্‌বিটেরিয়ান চার্চের পাদরি স্যামুয়েল ব্রুস্ (Bruce)। তিনি এ দেশে এসে 'এসিয়াটিক জর্নাল' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে ইংরেজ বণিকদের নিন্দাবাদে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। নূতন সনন্দ-মতে বহু ইংরেজ এসেছে নানা রকমের ব্যবসায় নিয়ে। তাদের মধ্যে বহু ধনী লোকও আছেন। এই বেসরকারী সাহেব মহলে পামার সাহেব নামকরা শক্তিশালী পুরুষ। প্রেস্‌বিটেরিয়ান[১] পাদরি -সম্পাদিত 'এসিয়াটিক জর্নাল'এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্যে তাঁরা এক পত্রিকা প্রকাশ করলেন, এবং সৌভাগ্যক্রমে এই পত্রিকার জন্যে এক অসামান্য প্রতিভাশালী সম্পাদকও পেয়ে গেলেন— বাকিংহাম নামে এক ইংরেজকে। James Silk Buckingham মুক্ত নাবিক ও পাদরি রূপে অনেক দেশ দেখেছেন; শেষ দিকে আরাবিয়া-মস্‌কটের ইমামের নৌবহরে কাজ করতেন; কিন্তু আরবদের দাস-ব্যবসায়ে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃত হয়ে কাজ ছেড়ে দিয়ে ভারতে আসেন ও ২ অক্টোবর ১৮১৮ *The Calcutta Chronicle of Political, Commercial and Literary Gazette* সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনে ব্রতী হন। এই পত্রিকার সংক্ষিপ্ত নাম হল *Calcutta Journal*।[২]

---

১ প্রেস্‌বিটেরিয়ান (Presbytarian) স্কটল্যান্ডের খ্রীষ্টীয় চার্চ। প্রেসবিটার শব্দের গ্রীক অর্থ 'প্রধান'। জেনেভাতে ধর্মসংস্কারক জন্ ক্যালভিন্ (১৫০৯-৬৪) থেকে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। এরা পোপকে বা ইংলনডের রাজাকে চার্চের কর্তা বলে মানে না। খ্রীষ্টসমাজের প্রবীণরা চালক। অ্যাংলিকান চার্চে বিশপদের মধ্যে উঁচুনিচু স্থান নির্দিষ্ট হয়। প্রেসবিটার-দের মধ্যে সব পাদরি সমশ্রেণীর। উনবিংশ শতকের শুরু হতে এদের মধ্যে প্রচারস্পৃহা দেখা দেয়। আলেকজেনডার ডাফ আসেন এঁদের প্রতিনিধি হয়ে; কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ এঁদের দ্বারা চালিত।

২ Satyajit Das, *Selection from the Indian Journals*, 1963.

বাকিংহাম যথারীতি লাইসেন্স নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। এ দেশে এসে কয়েকটা প্রেস কিনে 'ক্যালকাটা জর্নাল' পত্রিকা প্রথমে সাপ্তাহিক রূপে ও পরে সপ্তাহে দুবার করে প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। তখনকার দিনের ইংরেজ শাসক শ্রেণীর ও অন্যান্য সংস্থার য়ুরোপীয় সদস্যদের অনেকেরই স্বভাবচরিত্র সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না। অল্প কয়েক মাসের মধ্যে বাকিংহামের পত্রিকা সমালোচনা-মুখর হয়ে উঠল। জর্নালের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে সরকারী কয়েকজন কর্মচারীর পৃষ্ঠপোষকতায় বাকিংহামের বিরোধী দল 'জন্ বুল' (*John Bull in the East*) নামে পত্রিকা বের করলেন (২ জুলাই ১৮২১)। চল্লিশ বছর আগে ঠিক যেমন হিকির বিরুদ্ধে মেসিংককে খাড়া করা হয়েছিল— কণ্টক দিয়ে কণ্টক তোলার নীতি। যাই হোক, ক্যালকাটা জর্নাল ও জন্ বুল পত্রিকাদ্বয়ে মসীযুদ্ধ শুরু হল। প্রত্যক্ষ কারণ হল— জন্ বুল বিনা মাশুলে ডাকবিভাগ মারফত পত্রিকা পাঠাবার হুকুম পেয়েছিলেন। বাকিংহামের সমালোচনা ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। তিনি সরকারী কর্মচারীদিগকে 'রাজ্যের পচা ঘা' (gangrene of the State) বলে অভিহিত করেন। এর কিছুকাল পরে সরকারী কর্মচারীরা বাকিংহামের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মামলা রুজু করেন। ইংরেজ রাজপুরুষরা বড়োলাট হেস্টিংসকে ভারতীয় পত্রিকা সম্বন্ধে কঠোরতা অবলম্বনের জন্য পরামর্শ দিলেন। হেস্টিংস কিন্তু এতে অন্তর থেকে কোনো সায় পেলেন না। তিনি খাঁটি ইংরেজ— Freedom of Press -কে ধ্বংস করতে পারেন না। পূর্বতন বড়োলাট ওয়েলেস্‌লির আইন রদ করে হেস্টিংস ভেবেছিলেন যে, স্বাধীন পত্রিকা মারফত সমকালীন জনমত জানা যেতে পারবে এবং ব্রিটিশরা সকল শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবে। কিন্তু সিল্‌ক্ বাকিংহাম সমালোচনা করতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিলাতের ডিরেক্‌টরগণ হেস্টিংসের উপর বিরক্তই হলেন এবং বোর্ড অব্ কন্‌ট্রোলের কাছে তাঁদের কড়া মন্তব্য পাঠিয়ে দিলেন। এ সম্বন্ধে ডিরেক্‌টররা লেখেন :

"Under a free Government the press is at once the organ of expressing and the instrument of enlightening and influencing public opinion. But in India public opinion cannot be said to exist."[১]

---

১ C. H. Philips, *The East India Company* (1784-1834), 1961, pp. 223-24.

ফিলিপ্‌স্‌ মন্তব্য করছেন : "In this matter the Directors were politically wiser than Hastings, who had merely replaced a definite by an indefinite rule. Besides, a free press in a despotically governed state is probably not so much a steam safety-valve as a furnace under the boiler. The Directors were right in observing that their Government in India could only be removed by a revolution and that it was unwise to allow any agitation to extinguish the opinion entertained by the natives of our vast superiority and irresistible power."[১]

ব্রিটিশদের অদম্য শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে দেশীয়দের যে ধারণা আছে তাকে নষ্ট হতে দেওয়া উচিত হবে না। নিরন্তর গভর্মেণ্টের সমালোচনা ও নিন্দা করলে তার অনিবার্য ফল ঘটবেই ; ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার কথা ভাবাই যায় না ; কারণ স্বৈরাচারী শাসনে পত্রিকাসমূহ মনোব্যথা লঘু করবার পথ পাবে না, তারা ইন্ধন জুগিয়ে দেশকে তপ্ত করে তুলবে।

যাই হোক, বিলাত থেকে হুকুম এল যে সেন্সর-ব্যবস্থা পুনরায় বহাল করা হবে।

১৮২৩ সালের জানুয়ারির গোড়াতেই হেস্টিংস বড়োলাটের পদ ত্যাগ করে দেশে রওনা হয়ে গেলেন। কাউন্সিলের সদস্য জন্‌ অ্যাডাম অস্থায়ী গভর্নর-জেনারেলের কর্মভার পেলেন পদাধিকার-বলে, গুণাধিকারে নয়। হেস্টিংসের কাজে ইস্তফা দেবার প্রত্যক্ষ কারণ : হায়দরাবাদের নিজাম ওয়েলেস্‌লির পাল্লায় পড়ে 'বাধ্যতামূলক বশ্যতা' মেনে নিয়েছিলেন ; তার পর সেখানে পামার কোম্পানি জুড়ে বসেন। নিজামকে পামার কোম্পানি বহুলক্ষ টাকা ধার দিয়ে সেই স্টেটের সর্বনাশ করছিলেন। হেস্টিংস সময়-মত সে-সব বন্ধ করতে চেষ্টা করেন নি। এই-সব অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় হেস্টিংসকে ডিরেক্টররা ডেকে পাঠালেন।[২]

জন্‌ অ্যাডাম প্রেসের স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী ; কারণ তিনি এ দেশে বেশিদিন আছেন, এ দেশের হালচাল তাঁর জানা হয়ে গেছে। হেস্টিংসকে তিনি বারবার অনুরোধ করেছিলেন বাকিংহামের সমালোচনা-মুখর

১ C. H. Philips, *The East India Company*, p. 24.
২ *Ibid*, pp. 226-28.

পত্রিকার মুখ বন্ধ করার জন্যে। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর পরামর্শদাতাদের 'সুযুক্তি'তে কর্ণপাত না করেই লর্ড হেস্টিংস সংবাদপত্রের পাণ্ডুলিপি-পরীক্ষকের পদ উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

গভর্নর-জেনারেলের অস্থায়ী পদ পেয়েই জন্ অ্যাডামের দৃষ্টি পড়ল বাকিংহামের পত্রিকার উপরে। প্রত্যক্ষ বিবাদের কারণ হল নিম্নলিখিত ঘটনাটি : "In the beginning of February [1823], the Presbyterian chaplain in Calcutta, who was understood to be connected with the party than in power, was appointed clerk to the Committee of Stationery, and on the eighth of that month an article appeared in the *Calcutta Journal* ridiculing the anomaly of giving such an office to a minister of the Gospel who might thus be employed in counting sticks of sealing-wax and measuring yards of tape when he ought to be in his study composing his sermon."[১] প্রসঙ্গত বলি, ক্রস স্কচ ছিলেন, জন্ অ্যাডামও স্কচ ছিলেন। বোধ হয় সেই সুবাদে পাদরি ক্রসকে সরকারী চাকুরি দেওয়া হয়। বাকিংহামের এই প্রবন্ধ উপলক্ষ্য করে অস্থায়ী গভর্নর-জেনারেল অ্যাডাম সাহেব ক্যালকাটা জর্নালের সম্পাদকের এ দেশে থাকার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে সরাসরি ভারত থেকে নির্বাসনের হুকুম দেন। শুধু এইটুকু করেই অ্যাডাম ক্ষান্ত হলেন না, ১৮২৩ অব্দের ৪ এপ্রিল মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক নূতন আইন জারি করলেন— হেস্টিংস প্রেসের যেটুকু স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তা অপহৃত হল।

রামমোহনের জীবনী-লেখিকা মিস্ কলেট বলেছেন :

"The temporary elevation of an inferior official was marked by characteristically official measures for the restriction of liberty."[২] এ কথা অতি সত্য যে ভারত চিরদিনই ছোটো-ইংরেজের

---

১ J. C. Marshman, *The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward, Embracing the History of the Serampore Mission*. London. 1859. Vol. II, P. 275. অতঃপর *Marshman* বলিয়া উক্ত হইবে।

২ Sophia Dobson Collet, *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, Ed. Dilip Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguli. Sadharan Brahma Samaj, Calcutta. 1962. P. 175.

হাতে অপমানিত হয়েছে ; বড়ো-ইংরেজ যা দিতে চেয়েছে, ছোটো-ইংরেজ তা সংকুচিত করেছে।

নূতন আইন ১৭৯৯ অব্দে ওয়েলেস্‌লি-কৃত প্রেস-আইনেরই পুনরুক্তি ; তবে আরো কড়া ও বিস্তারিত।

অস্থায়ী বড়োলাট জন্ অ্যাডাম মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অপহরণ করতে কৃতসংকল্প। সুপ্রিম-কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য বেইলি (W.B. Bayley) সাহেব কাউন্সিলে দীর্ঘ এক মন্তব্যলিপিতে সমকালীন পত্রিকাগুলির বিশ্লেষণ করে বলেন, ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত শ্রীরামপুরের সংবাদ-পত্রগুলি বুদ্ধিমান সুযুক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে ("regulated and conducted by intelligent and well-intentioned individuals")। ঐ পত্রিকাগুলি জ্ঞান-বিতরণে সহায়তা করছে। কিন্তু দেশীয় পত্রিকার অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা এ দেশের পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নয় ("Unfettered liberty, as it exists in our Native country [England] is totally unsuited to the present state of our dominion in the East.")। এই মন্তব্যলিপির একাংশে বেইলি সাহেব স্বীকার করেছিলেন যে, ভারতের শাসন-ব্যবস্থা স্বৈরাচারী ; কোনো আইন প্রণয়ন-কালে বা চালু করবার সময়ে প্রজার মতামত নেবার কোনো ব্যবস্থা নেই : "The government in its relation to them is in fact, substantially and necessarily despotic.... They [the people] have no voice or participation in framing or administering the Laws (which are enacted or rescinded at mere discretion of the Government), in apportioning the revenue or taxes... in revising the public expenditure or in controlling the administration."

তৎসত্ত্বেও ভারতীয়দের জন্য কিছু করা উচিত নয়, কারণ অপরিণত অবস্থায় তারা রয়েছে—"prematurely to introduce the institutions of a highly civilized, among a less enlightened people"— অতি-সভ্য সমাজের শাসনবিধি প্রবর্তিত হলেই সর্বনাশ হবে! এই-সব কারণ দেখিয়ে রামমোহন রায়ের সম্পাদিত মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার সম্বন্ধে বেইলি সাহেব এই মন্তব্যলিপিতে তাঁর মনের বিষ প্রকাশ করে ফেলেন।

এই স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অধিকার নিয়েই বাকিংহামের সঙ্গে তৎকালীন শাসনসংস্থার বিরোধ। বাকিংহাম খাঁটি ইংরেজের বহু গুণের অধিকারী ; সত্য কথা স্পষ্টভাবে বলবার সৎসাহস সে যুগে অনেক পত্রিকা-সম্পাদকেরই ছিল না। তিনি বললেন, সম্পাদক রূপে তাঁর অধিকার আছে "to admonish Governors of their duties, to warn them furiously of their faults and to tell disagreeable truths." (Barnes, p. 95)। যে দেশে ব্যবস্থাপক সভা (legislature) নেই সেখানে দায়িত্বশূন্য সরকারকে শাসন করবে প্রেস। ক্যালকাটা জর্নালে পত্রপ্রেরকরা নির্ভীকভাবে মতামত পেশ করতেন, এমন-কি সরকারী কর্মচারীরাও তাঁদের অভিযোগ ব্যক্ত করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। সেই-সব সমালোচনা ও অভিযোগপত্র পাঠ করে উর্ধ্বতন কর্মচারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। বাকিংহামের পত্রিকা আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠল, অর্থও যথেষ্ট আসতে লাগল, গ্রাহক-সংখ্যা দাঁড়াল হাজার। বাকিংহাম বিলাত থেকে ভালো মুদ্রাযন্ত্র ও নূতন ইংরেজি গ্রীক হিব্রু ও আরবি টাইপের ছাঁচ আনালেন। দেখতে দেখতে জর্নালের সম্পত্তির মূল্য দাঁড়িয়ে গেল প্রায় ৪০ হাজার পাউণ্ড বা ৪ লক্ষ টাকা— সে যুগের পক্ষে এটা অভাবনীয় সমৃদ্ধি।

বাকিংহাম ছিলেন হুইগ্ অর্থাৎ উদারনীতিক দল-ভুক্ত বা আধুনিক মানুষ। তাই ইংরেজি সাহিত্যের সদ্যঃপ্রকাশিত গ্রন্থ— যেমন বায়্‌রনের 'চাইল্‌ড্ হ্যারল্‌ড্', 'ডন্ জুয়ান্', স্কটের উপন্যাস 'আইভ্যানহো' প্রভৃতি এ দেশে আমদানি করেন— স্থানীয় ইংরেজ এ-সব সাহিত্যের কোনো খবর পেত না অন্য কারও কাছ থেকে। তাঁর কাগজে তিনি তখনকার দিনের পক্ষে কত আজগুবি পরিকল্পনা পেশ করতেন তার দুই-একটা উদাহরণ দিই : য়ুরোপ থেকে উত্তর-পশ্চিম সমুদ্র-পথ দিয়ে ভারতে আসার ও লোহিত সাগর দিয়ে য়ুরোপে যাওয়া-আসার পথ মোচন, বোম্বাই থেকে লণ্ডনে আকাশ-পথে যাবার জন্যে "a gasfilled leather bag stretched over a cane-frame and propelled by oars and bellows" ব্যবস্থা করা! (Barnes, p. 94)

জন্ অ্যাডামের কোপদৃষ্টিতে পড়ে ক্যালকাটা জর্নালের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী বাকিংহাম ধন ও মান হারিয়ে ইংলন্‌ডে পৌঁছলেন। কিন্তু

সেখানেও কোম্পানির শাসনব্যবস্থার সমালোচক-দল ছিল, তাদের চেষ্টায় বাকিংহাম বিলাতে গিয়ে পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হন এবং পার্লামেণ্টের কাছ থেকে একটা পেন্‌সন্ আদায় করে নিতে সক্ষম হন।[১]

বাকিংহাম চলে গেলে মি. আর্নট ক্যালকাটা জর্নাল চালাবার ভার গ্রহণ করলেন। তিনিও গভর্মেণ্টের সমালোচনা-পূর্ণ এক প্রবন্ধ লেখার অপরাধে গভর্মেণ্টের চক্ষুশূল হয়ে উঠলেন। তাঁর উপর ভারত-ত্যাগের হুকুম হল। আর্নট বিলাতে গিয়ে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর কোম্পানির ডিরেক্‌টরদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করেন।[২]

ক্যালকাটা জর্নাল ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর সরকারী হুকুমে প্রকাশ নিষিদ্ধ হল। এই পত্রিকাটির সঙ্গে রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। বাকিংহাম ও আর্নট উভয়েই রামমোহনকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। বিলাতে পুনরায় রামমোহনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আর্নট তাঁর সেক্রেটারির কাজও করেন।

ক্যালকাটা জর্নাল সমসাময়িক পত্রিকাদির চুম্বক ধারাবাহিক প্রকাশ করতেন। রামমোহনের সঙ্গে যে 'সম্বাদ কৌমুদী'র যোগ ছিল, তাতে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও ঘটনাবলীর ইংরেজি চুম্বক অনুবাদ জর্নালে প্রকাশিত হয়। এমন-কি রামমোহন-সম্পাদিত 'মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার' পত্রিকার চুম্বকও পাই। সম্বাদ কৌমুদীর কোনো ফাইল পাওয়া যায় নাই, কেবল জর্নালের চুম্বকটুকু মাত্র ভরসা।[৩]

রামমোহনের জীবনকালে, ১৭৮০ থেকে ১৮৩৩ অব্দের ভিতর, বাংলাদেশে ইংরেজি পত্রিকা ও সংবাদপত্র যত প্রকাশিত হয়েছিল তার সব কয়টার নাম আমরা করি নি, তবে বিশিষ্টগুলির নাম করেছি। এই-সব পত্রিকার মধ্যে ১৮১৮ সালের পর যে-সব পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাদের কয়েকটির

---

১ Mr. Milner Gibson, *Papers relating to the Public Press in India*, May 4, 1858. East India (Press), London—এই রিপোর্টে বাকিংহামের বিরুদ্ধে সরকারী বেসরকারী অভিযোগগুলি প্রদত্ত হয়েছে। বাকিংহামের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও তার বিচার এবং লর্ড হেস্টিংসের তার সম্বন্ধে উদারতা দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

২ দ্রষ্টব্য, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮-৭১।

৩ J. N. Mazumder, *Raja Rammohan Roy and Progressive Movement in India*, pp. 284-314.

সঙ্গে রামমোহনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ হয়। 'ফ্রেন্ড অব্ ইন্ডিয়া', 'জন্ বুল' প্রভৃতি কয়েকটি পত্রিকা রামমোহন ও তাঁর মতামতের তীব্র সমালোচক এবং 'ক্যালকাটা জর্নাল', 'বেঙ্গল হরকরা', 'বেঙ্গল হেরাল্ড', 'ইন্ডিয়া গেজেট' প্রভৃতি তাঁর মতের প্রায়শঃ সমর্থক ছিলেন। মোট কথা, ইংরেজি পত্রিকা মারফত রামমোহনের মতামত, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর কার্যাবলীর পরিচয় ভারতে ও ভারতের বাইরে শিক্ষিত লোক পেয়েছিল।

রামমোহন রায় প্রত্যক্ষভাবে একখানি ইংরেজি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন— সেটি *The Brahmanical Magazine*। একে অবশ্য ঠিক পত্রিকা বলা চলে না— কেবল নাম ছাড়া। এর বাংলা সংস্করণ 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামে পরিচিত। আমরা এই পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

রামমোহন রায়ের নামের সঙ্গে যুক্ত আর-একটি সাপ্তাহিক পত্র *Bengal Herald* প্রকাশিত হয় ১৮২৯ অব্দের ৭মে তারিখে। ঐদিন পত্রিকার যে প্রস্পেক্টাস বাহির হয় তার প্রারম্ভে motto বা মন্ত্ররূপে রোমান লেখক সিসিরো থেকে এই বাক্যটি উদ্ধৃত ছিল— "Liberty consists in the power of doing that which is permitted by Justice."

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য, প্রধানত ভারতের চলমান ঘটনারাজি সংগ্রহ করা হলেও পাশ্চাত্য পৃথিবীর ঘটনাপুঞ্জের জন্য অনুরূপ স্থান পত্রিকায় নির্দিষ্ট থাকবে। "The Asiatic Department of the Herald will be kept distinct"— এই মন্তব্যটি ভাববার মতো। Asia is One ভাবনার অগ্রদূত মণ্টগোমারি মার্টিন উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু তিনি ১৬ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশ করে দেশে ফিরে যান ১৮২৯-এর শেষ দিকে। বেঙ্গল হেরাল্ডের সহচর 'বঙ্গদূত' এই সংবাদটি প্রকাশ করেন সেপ্টেম্বর মাসে। তাঁর স্থলে ডি. এল. রিচার্ড্‌সন্ সম্পাদক নিযুক্ত হন।

মণ্টগোমারি মার্টিন দেশে প্রত্যাবর্তন করে *Alexander's East Indian Magazine* সম্পাদনের কার্য গ্রহণ করেন— এই কাগজ "was both radical and anti-company in sympathy." ১

---

১ C. H. Philips, *The East India Company*, p. 289.

নূতন সম্পাদক রিচার্ড্‌সন বাংলাদেশে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক রূপে যে খ্যাতি অর্জন করেন্‌ সে বিষয়ে আলোচনা আমাদের পর্বের বাহিরের বিষয় বলে নিবৃত্ত হলাম। রিচার্ড্‌সনের পিতা বাংলার সৈন্যবিভাগের কর্নেল ছিলেন, পুত্রও সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করে ক্যাপ্টেন হন (১৮১৯)। স্বাস্থ্যের জন্য চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে বিলাত যান। ১৮২৯-এ ফিরে আসেন ও *Bengal Herald* -এ সম্পাদকের কার্য গ্রহণ করেন। ১৮৩৬ সালে তিনি হিন্দু কলেজের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন।[১]

'সমাচার দর্পণ' লিখছেন (২৩ মে ১৮২৯)—"মোং বাঁশতলার গলির মধ্যে হিন্দু [বেঙ্গল ?] হরল্ড অর্থাৎ বঙ্গদূত প্রেষ নামক এক নূতন ইংরেজী ও বাঙ্গলা ও পারসী এবং নাগরী সমাচার গত রবিবারাবধি প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইহার সম্পাদক শ্রীযুত আর এম মার্টিন সাহেব ও শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় ও শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত দেওয়ান প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু রাধানাথ মিত্র এই কএকজনে একত্র হইয়াছেন এই কাগজ প্রতি রবিবারে প্রকাশ হইতেছে…।"[২] তবে এই *Bengal Herald*-এর সঙ্গে রামমোহনের দীর্ঘকাল সম্বন্ধ ছিল না, কারণ ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে তিনি য়ুরোপ যাত্রা করেন।[৩]

ক্যালকাটা জর্নালের শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হল ৩০ অক্টোবর ১৮২৩; দশ দিন পরে গভর্মেণ্টের হুকুমে ঐ কাগজ প্রকাশ বন্ধ হল চিরকালের মতো। আমরা আগেই বলেছি, রামমোহনের সঙ্গে বাকিংহাম ও আর্নটের সম্বন্ধ বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল; ১৮১৯ অব্দের এপ্রিল মাসে হরিহরানন্দ স্বামীর নামে সতীদাহের বিরুদ্ধে পত্র এই নূতন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ক্যালকাটা জর্নালের অপমৃত্যুর পর সরকারী মেডিক্যাল বোর্ডের অন্যতম সদস্য ডাক্তার মেস্টন 'এই জর্নালের যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ভাড়া নিয়ে একটা

---

১ শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ১৮৬।

২ দ্রষ্টব্য, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১০৩।

৩ "This journalistic venture, it seems, did not prosper. Rammohun, as proprietor, was obliged to plead guilty in the Supreme Court of Calcutta to a libel on an attorney, and the paper soon afterwards ceased to appear." —S. D. Collet, *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, p. 283.

পত্রিকা প্রকাশ করবেন ভেবেছিলেন। গভর্মেণ্টের ভয় পাছে 'জর্নালের' ভূত মেস্টনের ঘাড়ে চাপে, তাই তাঁরা ঐ নামে পত্রিকা প্রকাশে অনুমতিই দিলেন না। পরে মেস্টন 'জর্নালে'র সম্পত্তি কিনে নিয়ে *The Scotsman in the East* নামে পত্রিকা মাস সাত চালিয়েছিলেন। শেষকালে 'বেঙ্গল হরকরা'র মালিক সব কিনে নিয়ে নিজ আপিসের সঙ্গে মিশিয়ে ফেললেন। বাকিংহামের ক্যালকাটা জর্নালের শেষাগ্নি নির্বাপিত হল। তবে জর্নালের মুদ্রাকর De Rozario নিতান্ত জীবিকা-সংস্থানের জন্য একটা ক্ষুদ্র পত্রিকা বের করলেন— নাম *Columbian Press Gazette* (16 Cossitollah) ।[১] পর বৎসর এই পত্রিকার নাম হয় *Bengal Chronicle*; সম্পাদক পূর্বের ন্যায় সাদারল্যানড্ই ছিলেন; কিন্তু গভর্মেণ্টের মনোভাব এখনো পরিবর্তিত হয় নি, তাঁরা আগের মতোই সমালোচনা-অসহিষ্ণু। তাই সামান্য অপরাধের জন্য সাদারল্যানড্ কাগজ বন্ধ করার আদেশ পেলেন ১৮২৭ অব্দের ২১ মার্চ। সম্পাদক পদত্যাগ করলেন, স্বত্বাধিকারী রোজারিও ক্ষমাভিক্ষা করে ত্রাণ পেলেন। তখন এর সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলেন ইউনিটেরিয়ান পাদরি উইলিয়াম অ্যাডাম। কিন্তু ছাপাখানার মালিক ও সম্পাদকে মিল হল না— কাগজ উঠে গেল। তখন 'বেঙ্গল হরকরা'র মালিক স্যামুয়েল স্মিথ ক্রনিক্‌লের সম্পত্তি নিজে কিনে নিলেন। এইভাবে একটার পর একটা কাগজ কিনে নিয়ে নিয়ে হরকরা প্রবল হয়ে উঠতে থাকল।

'বেঙ্গল ক্রনিক্‌ল্' উঠে গেলে পাদরি অ্যাডাম 'ক্যালকাটা ক্রনিক্‌ল্' নামে পত্রিকা কিছুকাল প্রকাশ করেন, কিন্তু গভর্মেণ্টের স্ট্যাম্প্ আইনের বিরুদ্ধ সমালোচনা কাগজে প্রকাশিত হওয়ার অপরাধে লর্ড আমহার্স্ট-সরকারের এক কলমের খোঁচায় কাগজ বন্ধ করতে হল। লর্ড আমহার্স্ট কট্টর বুরো-ক্র্যাট— সমালোচনা নিন্দা সইতে পারতেন না; যাবার আগে 'বেঙ্গল হরকরা'কে উঠিয়ে দেবার হুমকি দিয়েছিলেন। বেণ্টিংক গভর্নর-জেনারেল হয়ে আসার পর (৪ জুলাই ১৮২৮) থেকে ভারতের শুভদিনের অভ্যুদয়ের

১ *The Columbian Press Gazette*, September 15, 1825 : "After being established three months, the C. P. G. has now 520 subscribers..."—*The Good Old Days of Honourable John Company*, p. 110.

আশা দেখা দিল সর্ব ক্ষেত্রে। বেন্টিংক সকলপ্রকার উদারনীতিক মতের সমর্থনে সহায়ক পেলেন সুপ্রীম কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যর চার্লস্ মেটকাফকে। কিন্তু সমকালীন ইংরেজ সমাজের নিরন্তর চাপ চলেছিল প্রেসের স্বাধীনতা হরণ করবার জন্য।

বড়োলাট হয়ে আসার ছ মাসের মধ্যে বেন্টিংক মেটকাফের সঙ্গে পরামর্শ করে 'ইন্ডিয়া গেজেটে' কোম্পানির এক কর্মচারী ডা. জন্ গ্রান্ট্‌কে সম্পাদক করে দিলেন। পাঠকের মনে আছে, এই 'ইন্ডিয়া গেজেট' ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে হিকির জর্নালকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয়। এই সময় থেকেই চার্লস্ মেটকাফ প্রেসের স্বাধীনতা দানের সুপারিশ করতে আরম্ভ করেন।

'জন্ বুল' সরকারী কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু কালে সেই কর্মচারীরাই গভর্মেন্টের Bata বা Half-Bata নিয়মের বলি হয়েছিল। ফলে কাগজের সুর গিয়েছিল পালটে। এখন সে কাগজ বেশ সমালোচনা-মুখর হয়েছে ; সরকারী, বেসরকারী নানা বিষয়ে নির্ভীক মতামত প্রকাশ করছে। সেইজন্য বিলাত থেকে ডিরেক্টররা বেন্টিংকের মৃদু ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে কঠোর হতে বললেন। অর্ধ-বাট্টা (half-Bata) নিয়ে তখন জোর আন্দোলন চলছিল সৈনিক বিভাগের লোকদের মধ্যে ; ডিরেক্টরদের ইচ্ছে নয় যে, এই বিষয় নিয়ে পত্রিকাওয়ালারা আলোচনা করে, তদনুযায়ী ইংরেজি কাগজের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীদের কাছে ডিরেক্টরদের ইচ্ছা জ্ঞাপন করে পত্র গেল। কিন্তু মেটকাফ তাঁর মন্তব্যে লিখলেন (৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩০) : "সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ দ্বারা নূতন অসন্তোষের বীজ বপন করবার চেষ্টা না করে প্রাচীন অসন্তোষেরই একটা শেষ হতে দেওয়া ভালো। যদি সংবাদপত্রের দ্বারা আমাদের সাম্রাজ্যের কোনো অনিষ্ট হয় তবে পাণ্ডুলিপি-পরীক্ষকের পদ স্থাপন করে অথবা যথোচিত আইন প্রবর্তন করে সাম্রাজ্য নিরাপদে রাখবার ব্যবস্থা করা হোক। একেবারে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করে দেবার আমি বিরোধী।"[১]

---

১ কেদারনাথ মজুমদার, বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড।

বেণ্টিংক কিন্তু মেটকাফের মতের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না— ইংরেজি-পত্রিকাওয়ালাদের উপর পূর্বোল্লিখিত ফতোয়া জারি করা হল— তাঁরা ডিরেক্টরদের 'অর্ধ-বাট্টা' সম্বন্ধে মতামত কাগজে ছাপাতে পারবেন না।

১৮৩২ সালে লর্ড বেণ্টিংক কার্য-উপলক্ষে উত্তর-ভারতে আছেন— রাজধানী কলকাতায় স্যর চার্ল্‌স্ মেটকাফ প্রতিনিধি-গভর্নর রূপে কাজ করছেন। এই সময়ে কলকাতার কোনো ইংরেজি কাগজে বোম্বাই-এর গভর্নরের বিরুদ্ধে প্রেরিত এক পত্র প্রকাশিত হয়। বোম্বাই-এর গভর্নর লর্ড ক্লেয়ার বড়োলাটের কাছে অভিযোগ করে অনুরোধ করলেন যেন সম্পাদকের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয়। মেটকাফ বোম্বাই-এর গভর্নরকে যে উত্তর পাঠিয়েছিলেন তার অনুবাদ নীচে দেওয়া হল—

"গভর্নমেণ্ট কয়েক বছর যাবৎ মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করেন নি। সুতরাং আপনার লিখিত প্রণালী অনুসারে এখন গভর্নমেণ্ট এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। আমার হাতে শাসনকার্যের ভার ন্যস্ত হবার পর আমি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় একবারও হস্তক্ষেপ করি নি। আমার অবলম্বিত এই প্রণালী আমার কাছে এরকম উৎকৃষ্ট বলে মনে হচ্ছে যে, যতদিন আমার হাতে শাসন-বিভাগের (Law and Order) ভার থাকবে আমি ইহার অন্যথা আচরণ করব না।... আপনি মনে করেছেন যে, কেবল মাদ্রাজ ও বোম্বাই গভর্নরের বিরুদ্ধে কলকাতার সংবাদপত্রে নিন্দার কথা প্রকাশিত হয়, কিন্তু তা নয়। আপনি যদি কিঞ্চিৎ কষ্ট করে সমুদয় সংবাদপত্র পাঠ করেন তবে দেখতে পাবেন, স্বয়ং গভর্নর-জেনারেলের বিরুদ্ধে কতপ্রকার অপবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। এমনকি অদ্যকার কাগজেও গভর্নর-জেনারেল নিজের লোকদিগকে চাকুরি দেন বলে তাঁর নামে দোষারোপ করা হয়েছে। আমি ক্ষুদ্র লোক। আমার ক্ষুদ্রতাই আমাকে রক্ষা করে। তথাপিও সময় সময় আমার বিরুদ্ধেও নিজের লোক নিয়োগের অপবাদ এই-সকল পত্রে লিখিত হয়। এই-সকল মন্তব্য সম্বন্ধে আমি উদাসীনতাই প্রকাশ করে থাকি।... আপনার লিখিত বিষয়ের প্রতিকার করতে হলে আমাকে আপনার পক্ষে সম্পাদকের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করতে হয়। আমার নিজের বিরুদ্ধে যদি এরূপ কিছু লিখিত হত, আমি নিতান্ত অনিচ্ছার

সহিত এই পথ অবলম্বন করতাম। কেননা, মোকদ্দমা করলেই অপমানিত হতে হয়।"[১]

১৮৩৫ সালে বেন্টিংকের কার্যকাল শেষ হয়; মেটকাফ অস্থায়ী গভর্নর-জেনারেলের পদ পান। তিনি এই পদ প্রাপ্ত হয়েই ভারতের প্রথম আইন-মন্ত্রী লর্ড মেকলেকে মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক নূতন আইনের খসড়া প্রস্তুত করতে বললেন। ১৮৩৫ অব্দের ১৮ই মে প্রেস-সংক্রান্ত আইনের খসড়া সুপ্রীম কাউন্সিলে পেশ করা হল। মেটকাফ খসড়াটি অনুমোদনের জন্য বিলাতে ডিরেক্টরদের কাছে পাঠালেন। কিন্তু বিলাত থেকে অনুমোদন আসবার আগেই মেটকাফ জানতে পারলেন যে, তাঁর গভর্নর-জেনারেলের কাজ শেষ হবে; তাই ৩রা অগস্ট কাউন্সিলের সভায় এই নূতন আইন বিধিবদ্ধ করে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিলেন। ১৮২৩ অব্দের এপ্রিল মাসে এক অস্থায়ী লাট ভারতের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেছিলেন, ১৮৩৫ অব্দের অগস্ট মাসে আর-একজন অস্থায়ী বড়োলাট প্রেসের স্বাধীনতা দান ক'রে অমরকীর্তি অর্জন করলেন। রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে পত্র পেশ করেছিলেন ১৮২৩ সালে। ১৮৩৩ সালে তিনি বিলাতে। তিনি বুঝেছিলেন, প্রেসের স্বাধীনতা নূতন সনন্দ প্রাপ্তির পর নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু তিনি তা দেখে যেতে পারলেন না— ১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৮১৩ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে বাংলা তথা ভারতে যে-সব যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে তার মধ্যে বাংলা পত্রিকা ও সংবাদপত্রের আবির্ভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২] প্রথম বাংলা মাসিক পত্রিকা 'দিগ্‌দর্শন' শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে; বলা বাহুল্য, গত বিশ বছরের মধ্যে পাদরিদের ও বাঙালীদের নিজের উৎসাহে পড়াশুনার চর্চা কলকাতায় কতকটা অগ্রসর হয়েছিল; তাই দিগ্‌দর্শনের মতো পত্রিকার পাঠক কিছু জুটেছিল। এই পত্রিকার বর্ণনাত্মক নাম ছিল 'যুবলোকের কারণ

---

১ কেদারনাথ মজুমদার, বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড।

২ মুহম্মদ সিদ্দিক খান, বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা। বাঙ্‌লা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৭১। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৬। এই বইটি তথ্যসমৃদ্ধ ও বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে লিখিত।

সংগৃহীত নানা উপদেশ'। প্রসঙ্গত বলি, ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। 'দিগ্‌দর্শন'-এর প্রকাশকরা ভেবেছিলেন, হয়তো হিন্দু কলেজের 'হিন্দু' ছাত্রদের এই পত্রিকা কাজে লাগবে। 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশের মাস খানেকের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন থেকে 'সমাচার দর্পণ' নামে সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয় (২৩ মে ১৮১৮)। এই সংবাদপত্র প্রকাশ নিয়ে পাদরিদের মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈধ ছিল। কয়েক বছর আগে মিশনের নবীন পাদরিরা প্রবীণদের চলন-বলন, কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সমালোচনা-মুখর হয়েছিলেন বলে অনুমান হয়। প্রাচীনতম কর্মী কেরী সাহেব— তাঁর ভয় পাছে কোম্পানির বড়োকর্তারা ক্রুদ্ধ হন, পাছে মার্শম্যান প্রমুখ উৎসাহীরা রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে লেখালেখি করেন। শেষ পর্যন্ত মার্শম্যান প্রমুখদের মতই প্রবল হল —তাঁদের প্রচেষ্টায় পত্রিকা বের হল। পত্রিকার একটা করে কপি তাঁরা কলকাতার বড়োকর্তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, এমন-কি উত্তর-ভারতে বড়োলাট হেস্টিংসের কাছেও— সেখানে তিনি তখন পিণ্ডারি-নিধনে ব্যস্ত। 'সমাচার দর্পণ' প'ড়ে সব কর্তাই খুশি। বড়োলাট খুশি হয়ে এই পত্রিকা যাতে ডাকবিভাগ থেকে স্বল্প মাশুলে প্রেরিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা আজ যে পোস্টাল বিভাগ দেখছি তখন তা অজ্ঞাত, তবু ডাকবিলির ব্যবস্থা ছিল ; সে সম্বন্ধে আমরা পরে কিছু আলোচনা করব।

মার্শম্যান নামে সম্পাদক, কার্যত পত্রিকার লেখালেখি, বিশেষ করে তর্জমাদির কাজ করতেন পণ্ডিতরা। পরে আমরা দেখব, রামমোহনের ধর্মমত সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করে 'সমাচার দর্পণ'-এ যে আলোচনা হত তা পাকা হাতের লেখা— হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে অতিঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে সে-সব প্রশ্ন কারো কলম থেকে নির্গত হত কি না সন্দেহ। খ্রীষ্টান পাদরিদের অর্থদাস হিন্দু পণ্ডিতরাই এ-সব করতেন অকুণ্ঠচিত্তে। অবশ্য হিন্দুধর্মদ্বেষী (?) রামমোহনের সমালোচনা করতে পণ্ডিতদের যথেষ্ট আনন্দ ছিল।

'সমাচার দর্পণ' ও 'বাঙ্গাল গেজেটি'র (১৮১৮) পর 'ব্রাহ্মণ সেবধি'নামে একটা পত্রিকা রামমোহনকে সম্পাদন করে প্রকাশ করতে দেখি। এটা বাংলা ও ইংরেজিতে মুদ্রিত হত, মাত্র তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। খ্রীষ্টান পাদরিদের সঙ্গে বিতর্ক ছিল এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য, আমরা

সেইজন্য অন্যত্র এর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছি। বাংলা 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র ইংরেজিতে নাম ছিল *The Brahmanical Magazine* ; 'ম্যাগাজিন' নাম প্রদত্ত হলেও পত্রিকাত্ব এর মধ্যে কিছু ছিল না, বরং একে প্রচারপত্র বলতে পারা যায়। তবে এই পুস্তিকা-ত্রয় রামমোহনের নামে প্রকাশিত হয় নি, লেখকের নামের স্থলে আছে 'শিবপ্রসাদ শর্মা'—তাঁর জনৈক পণ্ডিত। রামমোহনের অনেক রচনাই বেনামে প্রকাশিত হত। কেন যে তিনি এটি করতেন জানি না ; সহকর্মীদের মান দেবার জন্যে বোধ হয়। অথবা তাঁর নাম দেখলেই বিরোধীরা অবজ্ঞাভরে হয়তো স্পর্শ করবেন না, তাই বন্ধুদের নামে, অনামে, বেনামে পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করতেন।

গত আঠারো বছরের মধ্যে পঞ্চানন কর্মকার ও মনোহর -প্রবর্তিত বাংলা-হরফ-ঢালাই বিদ্যা বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। বিলেত থেকে মুদ্রাযন্ত্র এনে অনেকেই নূতন নূতন ছাপাখানা স্থাপন করছেন, এ কথা আগেই বলেছি। আত্মীয়সভার অন্যতম সদস্য হরচন্দ্র রায় ১৪৫ নম্বর চোরবাগান স্ট্রীটে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন ১৮১৮ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে। এই মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রাকর গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ছাপার কাজে ওস্তাদ ছিলেন। প্রথমে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ও পরে কলকাতায় ফেরিস্ কোম্পানির ছাপাখানায় কাজ করে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। হরচন্দ্র তাই গঙ্গাকিশোরকে মুদ্রাকর নিযুক্ত করেন। হরচন্দ্র রায় ১৫ই মে 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, গঙ্গাকিশোর ছিলেন তার মুদ্রাকর ও প্রকাশক— সম্পাদকও নন, প্রেসের মালিকও নন। বাংলা-দেশের বাঙালী-পরিচালিত এই সাপ্তাহিক পত্রিকার কোনো সংখ্যা পাওয়া যায় নি, তাই এর প্রকাশের কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কলহের নিবৃত্তি এখনো হয় নি। এই পত্রিকা সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ এই কারণে যে, রামমোহন-লিখিত সতীদাহ-সম্বন্ধীয় একটি নিবন্ধ এই পত্রিকার এক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

'বাঙ্গাল গেজেটি'র মূল মালিক তথা সম্পাদক ছিলেন হরচন্দ্র রায়। ৯ জুলাই ১৮১৮ তারিখে গভর্মেণ্ট গেজেটে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তাতে স্পষ্ট লেখা ছিল: "No publication of this nature having

hitherto been before the Public, Hurrochunder Roy trusts that the community in general will encourage and support his exertions in the attempt which he has made, and afford him a small share of their Patronage." এই বিজ্ঞাপনের ভাষা পথিকৃতের বলেই মনে হয়।[১] এই পত্রিকার নামকরণের মধ্যেও ইংরেজি প্রথম পত্রিকা হিকির 'বেঙ্গল গেজেটে'র প্রতিধ্বনি পাচ্ছি।

১৮১৮ থেকে ১৮৩৫-এর মধ্যে বাংলাদেশে যে ক'টি বাংলা পত্রিকা ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল তার তালিকা আমরা অন্যত্র দিয়েছি; এর মধ্যে 'সমাচার দর্পণ' সমধিক খ্যাত। আমরা অন্যত্র বলেছি, ১৭৯৯ থেকে, অর্থাৎ ওয়েলেস্‌লির সময় থেকে ১৮১৮ পর্যন্ত, সংবাদপত্র প্রকাশের উপর আইনের জগদ্দল পাথর গভর্মেণ্ট চাপিয়ে রেখেছিলেন। ১৮১৮ অব্দে লর্ড হেস্টিংস এই আইন রদ করায় কলকাতায় অনেকগুলো ইংরেজি পত্রিকা ও 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয় (৪ ডিসেম্বর ১৮২১)।

'বাঙ্গাল গেজেটি' এক বছর চলেছিল, অর্থাৎ ১৮১৯-এর মাঝামাঝি সেটি লুপ্ত হয়। একমাত্র বাংলা পত্রিকা ছিল 'সমাচার দর্পণ'— মার্শম্যান-কর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত। কোম্পানির দখলী-ভারতের আইন দিনেমার-অধিকৃত শ্রীরামপুরে প্রযুক্ত হত না। হেস্টিংসের আইন পাস হবার আগেই 'সমাচার দর্পণ' ছাপা শুরু হয়।

বাঙালীর দ্বারা সম্পাদিত এবং বাঙালীর নিজস্ব প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র 'সম্বাদ কৌমুদী'। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় স্পষ্ট করেই জানানো হয় "ধর্ম্ম নীতি ও রাষ্ট্র-বিষয়ক আলোচনা, আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী, দেশ-বিদেশের সংবাদ ও জ্ঞাতব্য তথ্য-সম্বলিত প্রেরিত পত্রাবলী প্রকাশ— এক কথায় লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র প্রচারের প্রধান লক্ষ্য।"[২] তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকা পরিচালনার গোড়ার দিকে ছিলেন। "যিনিই সম্পাদক থাকুন... সম্পাদন ব্যাপারে যে রামমোহন রায়ের যথেষ্ট হাত ছিল এবং তিনি যে পত্রিকাখানির সহিত ঘনিষ্টভাবে

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১-১৫।
২ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ১৭।

সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না।"[১] সে যুগে পত্রিকা চালানো ছিল 'ঘরের অন্ন খেয়ে বনের মোষ চরানো'র মতন কাজ— যার থেকে পয়সা অর্জন হত কমই। অবশ্য মুদ্রাযন্ত্র থাকলে, সেখানে মুদ্রণ-কার্য করে কিছু পয়সা আসত— কিন্তু পত্রিকা চালানো লাভের ব্যাপার হয়ে ওঠে নি তখনও।

'সমাচার দর্পণ' খ্রীষ্টান পাদরিদের পত্রিকা। তাঁরা ভারতীয় ধর্ম এবং সমাজ সম্বন্ধে আপনাদের মত তাতে ব্যক্ত করতে পারতেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সপক্ষে মত ব্যক্ত করার মতো কোনো মাধ্যম ছিল না। সেই অভাব দূরীকরণের জন্যে 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশের আয়োজন হয়। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার আশায় সর্বশ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দু এতে যোগদান করেন। বলতে পারা যায়, বাঙালীর স্বাদেশিক জাতীয়তার প্রথম বিকাশ হয় এই পত্রিকা প্রকাশে। রামমোহন ছিলেন এর মধ্যমণি। ভবানীচরণের মতো শিক্ষিত, সুলেখক এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন ; হিন্দুদের *status quo* যাতে পুরোপুরি বজায় থাকে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে বিধর্মীদের সঙ্গে যুঝতে হবে এই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু বিরোধ বাধল অচিরেই— আদর্শের সংঘাত। রামমোহন প্রমুখ একদল ব্যক্তি সতীদাহ নিবারণের পক্ষপাতী ; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াপন্থী হিন্দুরা সতীদাহ হিন্দুধর্মের অবশ্যপালনীয় আচার বলে বিশ্বাসী।[২] ভবানীচরণ এই পত্রিকার সংসর্গ ত্যাগ করে 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকা প্রকাশ করলেন (ফাল্গুন ১২২৮)।

'সম্বাদ কৌমুদী' সতীদাহ-বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করায় হিন্দুসমাজের সহায়তা ও সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় ; 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মুখপত্র হওয়াতে তার শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকল। রামমোহন, ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজের সকলপ্রকার মতামত ও কর্মাদির সমালোচনা ও বিরোধিতা এবং হিন্দুদের সর্বাধিক গোঁড়ামির সমর্থন করায় 'চন্দ্রিকা' জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[৩]

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৮।

২ "Opposed to each other as these papers were, on the Sati and other questions of their own separation, they both professed to adore the Vedas and assumed an offensive attitude towards all other forms of faith. For the first time— Christianity now began to be vigorously assailed from the national Press."— *Calcutta Review*, January 1911, p. 27.

৩ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র অনেক রচনার নিদর্শন প্রদত্ত হয়েছে।

'সম্বাদ কৌমুদী'র কোনো ফাইল এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি, তবে সমসাময়িক বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার উদ্‌ধৃতি ও অনুবাদ থেকে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়। যতীন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত *Rammohan Roy and Progressive Movement in India* গ্রন্থে সাময়িক ইংরেজি পত্রিকাতে প্রকাশিত 'সম্বাদ কৌমুদী'র কয়েকটি সংখ্যায় মুদ্রিত রচনার চুম্বক প্রদত্ত হয়েছে এবং কয়েকটি অনুবাদও সাময়িক পত্রিকা থেকে উদ্‌ধৃত হয়েছে।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের জীবনী গ্রন্থে 'সম্বাদ কৌমুদী'তে প্রকাশিত কয়েকটি রচনার কথা বলেছেন (পৃ.৪০৫)। স্কুল বুক সোসাইটি ১৮৫৪ সালে 'বঙ্গীয় পাঠাবলী' নামে একটি পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে 'সম্বাদ কৌমুদী'র কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্‌ধৃত করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু -সম্পাদিত 'রামমোহন গ্রন্থাবলী'তে (১৮৮০) 'কৌমুদী'র কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্‌ধৃত দেখা যায়; অর্থাৎ তখনও এই পত্রিকার ফাইল কোথাও ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৭৪ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য বাংলা পুস্তকে 'সম্বাদ কৌমুদী'র কয়েকটি প্রবন্ধ ছিল।

'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় কী সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত সূচী প্রদত্ত হল :

১. দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত হিন্দু ছাত্রদের বিনা বেতনে বিদ্যাদানের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন।

২. মফঃস্বল, জিলা ও প্রাদেশিক আদালতে 'জুরি' প্রথা প্রবর্তনের জন্য বিনীত প্রার্থনা।

৩. হিন্দুদের জন্য নদীতীরে একটিমাত্র শ্মশান থাকায় অসুবিধা; অথচ খ্রীষ্টানদের কবরের জন্য বহুল পরিমাণে জমি প্রদত্ত হয়েছে।

প্রথম তিনটি সংখ্যায় এইগুলি আলোচিত হয়েছিল। এ ছাড়া অন্যান্য সংখ্যায় বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হয়, যেমন : ১. বাংলাদেশ থেকে বিদেশের বন্দরে শস্য রপ্তানি বন্ধ করবার জন্য আবেদন; ২. বাঙালী মধ্যবিত্তদের পক্ষে য়ুরোপীয় ডাক্তারদের চিকিৎসা পাবার জন্য আবেদন; ৩. কলকাতার রাজপথে ইংরেজ ভদ্রলোকেরা তাঁদের বগিগাড়ি করে যাবার সময়ে দু পাশের লোকের উপর চাবুক মারেন, চিৎপুর রাস্তার উপর জনতা ঠাকুর দেখবার জন্য যখন ভিড় করে তখন তাদের উপর

নির্মমভাবে চাবুক চালানো হয়— কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই-সব নিবারণের জন্য আবেদন।[১]

সরকার যে নূতন প্রেস আইন বলবৎ করলেন তা প্রধানত ইংরেজি পত্রিকা 'ক্যালকাটা জর্নাল'কে মনে রেখে; কিন্তু রামমোহন-সম্পাদিত ফার্সি পত্রিকা 'মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার' সম্বন্ধেও সরকারী পক্ষে স্বস্তি ছিল না। বড়োলাটের মন্ত্রণাসভার অন্যতম সদস্য ও প্রধান সেক্রেটারি বেইলি সাহেব তাঁর মন্তব্যলিপিতে (১০ অক্টোবর ১৮২২) স্পষ্টই কথাটা বলে ফেলেন, "বর্তমানে চারিখানি দেশীয় সংবাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হয়; দুইখানি বাংলায় [সম্বাদ কৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকা] এবং দুইখানি ফার্সীতে। চারিখানিই সাপ্তাহিক।... ফার্সী কাগজগুলির নাম 'জাম-ই-জাহান-নুমা' এবং 'মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার'।... দ্বিতীয়খানি সুপরিচিত রামমোহন রায়ের। ধর্ম-সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্কে সম্পাদকের প্রবণতা আছে— ইহা জানা কথা, এবং সেই প্রবণতার বশে একটি সুযোগ পাইয়া খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে তিনি যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রচ্ছন্ন হইলেও অনিষ্টকারক।"[২]

রামমোহন রায় মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার বন্ধ করে দেবার সংকল্প নিয়ে ১৮২৩ অব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে ঐ পত্রিকা বন্ধ করে দেবার কৈফিয়ত পেশ করলেন। ক্যালকাটা জর্নালের ১০ই এপ্রিলের সংখ্যায় ওই ফার্সি লেখাটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বারে প্রকাশিত রামমোহনের কৈফিয়তটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্‌ধৃত হল।[৩]

মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার: শুক্রবার, ৪ এপ্রিল ১৮২৩ (অতিরিক্ত সংখ্যা):

"পূর্ব্বেই জানান হইয়াছিল যে, সকৌন্সিল মহামান্য গবর্ণর-জেনারেল কর্ত্তৃক একটি আইন ও নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যাহার ফলে অতঃপর এই নগরে পুলিস আপিসে স্বত্বাধিকারীর দ্বারা হলফ না করাইয়া ও গবর্মেণ্টের প্রধান সেক্রেটরির নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক বা সাময়িক পত্র প্রকাশ করা যাইবে না এবং ইহার পরও

---

১ দ্রষ্টব্য, *English Works* (1905), p. xxii.

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬।

৩ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ২৭-২৮।

পত্রিকা সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইলে গবর্ণর-জেনারেল এই লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। এখন জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ৩১-এ মার্চ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় স্যর ফ্রান্সিস ম্যাকনটেন এই আইন ও নিয়ম অনুমোদন করিয়াছেন। এই অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য মনুষ্য-সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য হইলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সহিত এই পত্রিকা ('মীরাৎ-উল্-আখ্বার') বন্ধ করিলাম। বাধাগুলি এই :

"প্রথমতঃ প্রধান সেক্রেটরির সহিত যে-সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে, তাঁহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হইলেও আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দ্বারবান্ ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়া এইরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ; এবং আমার বিবেচনায় যাহা নিষ্প্রয়োজন, সেই কাজের জন্য নানা জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিস আদালতের দ্বার পার হওয়াও কঠিন। কথা আছে—

আব্রু কে বা-সদ্ খুন ই জিগর দস্ত্ দিহদ্
বা-উমেদ্-ই করম-এ, খাজা, বা-দ্বারবান্ মা-ফরোশ।

অর্থাৎ— যে সম্মান হৃদয়ের শতরক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।

"দ্বিতীয়তঃ প্রকাশ্য আদালতে সম্ভ্রান্ত বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ[১] করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া সংবাদপত্র-প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই, যাহার জন্য কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করিবার মত বেআইনী ও গর্হিত কাজ করিতে হইবে।

"তৃতীয়তঃ অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাতি ও হলফ করিবার অসম্মানভাজন হইবার পরও গবর্মেণ্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হইতে পারে, এই আশঙ্কার জন্য সেই ব্যক্তিকে লোকসমাজে অপদস্থ হইতে হইবে এবং এই ভয়ে তাহার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইবে। কারণ, মানুষ স্বভাবতই ভ্রমশীল ; সত্য কথা

১ "The great prevalence of perjury, arising partly from the frequency with which oaths are administered in the courts..." ইত্যাদি। Questions and Answers on the Judicial System of India (Before the Parliament, London, September 19th, 1831)— *English Works*, p. 241.

বলিতে গিয়া তাহাকে হয়ত এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহা গবর্মেণ্টের নিকট অপ্রীতিকর বিবেচিত হইতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম।—

গদা-এ গোশা-নশিনি! হাফিজা! মাখরোশ্
রুমুজ্-ই-মস্লিহৎ-ই খেশ্ খুস্রোয়ান্ দানন্দ্।

—হাফিজ! তুমি কোণঘেঁষা ভিখারী মাত্র, চুপ করিয়া থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন।"

আমরা ইংরেজি ও বাংলা সাময়িক পত্রের কথা সামান্যত বলেছি; কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ফার্সি ছিল রাজভাষা। শিক্ষিত ভদ্রলোক বললেই ফার্সি-ভাষা-অভিজ্ঞ বোঝাত— যেমন আজকাল ইংরেজি-জানা লোকই 'ভদ্র' নামে পরিচিত। অতীত কালে সংস্কৃতজ্ঞ লোকই ছিলেন সমাজের শীর্ষে আসীন ব্রাহ্মণ। আমাদের আলোচ্য পর্বে ফার্সি প্রত্যেককেই শিখতে হত। প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বে ফার্সি ভাষায় এক প্রকার সমাচার প্রকাশিত হত— হাতে লেখা; শহরের ধনী যাঁরা পড়তে পারতেন, সেই-সমস্ত "ভাগ্যবান লোক ব্যতিরেকে অন্য কেহ ঐ সমাচার পত্র পাঠ করিতে পারিত না।" শ্রীরামপুরের পাদরিদের কাছে আবেদন আসতে থাকে ফার্সি ভাষায় পত্রিকা প্রকাশের জন্য। ১৮২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ থেকে এ বিষয়ে আলোচনাদির সূত্রপাত হয়। অতঃপর ১৮২৬ অব্দের ৬ই মে "গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সর্ব্বলোক হিতার্থে পারসী ভাষাতে এই সমাচার দর্পণের তর্জ্জমা করিয়া প্রকাশ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। এবং আমরা অদ্যাবধি আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসী কাগজ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।" কিন্তু ইতিমধ্যে রামমোহন ১৮২২ অব্দের ১২ই এপ্রিল 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার' নামে ফার্সি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশে ফার্সিভাষায় ইতিপূর্বে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয় নাই— রামমোহনই প্রথম প্রবর্তক।[১]

প্রসঙ্গত বলি, 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার' প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিন

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— সম্পাদিত, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯৯-১০০।

পূর্বে (২২ মার্চ ১৮২২) কলকাতা থেকে প্রথম উর্দু সাপ্তাহিক 'জাম্-ই-জাহান-নুমা' প্রকাশিত হয়; 'সম্বাদ কৌমুদী'র এককালীন সম্পাদক হরিহর দত্ত এই উর্দু পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু উর্দু গদ্যের পাঠক তখন মুষ্টিমেয় আর উর্দু গদ্যের আদর্শও তখন প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তাই অষ্টম সংখ্যাতে জাম-ই-জাহান-নুমা উর্দু-ফার্সি দ্বিভাষিক পত্র রূপে বের হল। দেখা গেল উর্দু একেবারেই অচল— তখন ফার্সি ভাষাতেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকল।

'সমস্‌উল-আখ্‌বার' নামে আর-একটি ফার্সি-উর্দু পত্রিকা ১৮২৩ সালের মে মাস থেকে প্রকাশিত হয়; এই পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী বাঙালি হিন্দু— যথাক্রমে মণিরাম ঠাকুর ও মথুরামোহন মিত্র। পাঁচ বছর এই পত্রিকা চলেছিল, কিন্তু পাঠকসমাজ বোধ হয় শেষ পর্যন্ত উৎসাহিত ছিলেন না; সম্পাদক বিদায় নেবার সময় যা লিখেছিলেন তাতে একটি বয়েত উদ্‌ধৃত ছিল, তার ইংরেজি তর্জমা হচ্ছে—

'I have consumed and my flames
have not been seen :
Like lamps in a moonlight night,
I have burnt away unheeded.'[১]

আমাদের আলোচ্য পর্বে আর চারখানি ফার্সি পত্রিকা প্রকাশিত হয়: 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' (৭ মার্চ ১৮৩১) ফার্সি ও বাংলা ভাষায় মুসলমান-সম্পাদিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। শেখ আলীমুল্লা এর সম্পাদক ছিলেন মনে হয়, কারণ পত্রিকার লাইসেন্স তাঁরই নামে মঞ্জুর হয়। সম্পাদক প্রাচীন-পন্থী ছিলেন; 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখেন যে, সভারাজেন্দ্রের সম্পাদক "যদ্যপিও মুসলমান বটেন কিন্তু আমরা তাঁহাকে দরাপ খাঁ প্রভৃতির ন্যায় জবন জ্ঞান করিতে পারি যেহেতুক স্বধর্মনাশেচ্ছুক হিন্দুসন্তানের প্রতি তাঁহার নিতান্ত দ্বেষিতা।"[২] বোধ হয় রামমোহন-শিষ্যদের ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের প্রতি শেখ সাহেবের দরদ ছিল না।

অস্থায়ী লাটসাহেব জন্ অ্যাডাম-কৃত কণ্ঠরোধ-আইনের বিরুদ্ধে

---

১ বাংলা সাময়িক পত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭১।
২ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৩৯।

কেবল 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার' প্রকাশ বন্ধ করেই রামমোহন প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন তা নয়, তিনি সুপ্রীম কোর্টের কাছে এবং বিলাতে ইংলন্‌ডেশ্বরের কাছে এই কণ্ঠরোধ-আইন চালু করার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। সে যুগে গভর্নর-জেনারেলকে সকৌন্সিল সব আদেশ বা আইন প্রবর্তন করতে হত, অর্থাৎ পারিষদদের মত নিতে হত। কিন্তু আদেশ তা দ্বারা আইনসিদ্ধ হত না; সকৌন্সিল গভর্নর-জেনারেলের প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নিকট আপীল চলতে পারত। সেই নিয়মানুসারে রামমোহন প্রমুখ ছয়জন-ভদ্র (চন্দ্রকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর) প্রধান বিচারপতির নিকট কণ্ঠরোধ-আইনের বৈধতা বিষয়ে বিচারপ্রার্থী হন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ম্যাকনটেন সাহেব যে খুব আইনসংগতভাবে আবেদন অগ্রাহ্য করেছিলেন তা সমকালীন প্রতিবাদাদি পড়লে মনে হয় না। তিনি পত্রিকার স্বাধীনতা বন্ধ করার জন্য কৃতসংকল্পই ছিলেন, তাই রামমোহন প্রমুখ আবেদনকারীদের পক্ষ নিয়ে যে কৌঁসুলি বক্তৃতা করেন তা বিচারপতির কর্ণে প্রবেশ করে নি। যাই হোক, এ দেশে বিচার না পেয়ে অবশেষে বিলাতে রাজা চতুর্থ জর্জের কাছে আবেদন করা হল। এই আবেদনে ৫৫টি অনুচ্ছেদ : মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা কিভাবে অপহৃত হল তার আনুপূর্বিক ইতিহাস দিয়ে, এই বিধি রাজাপ্রজার মধ্যে কতটা দূরত্ব সৃষ্টি করবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা আছে। মোট কথা, সুপ্রীম কোর্টের সম্মুখে ও বিলাতে রাজার কাছে যে আবেদন পেশ করা হয়েছিল সেগুলিকে মিল্‌টনের প্রেসের স্বাধীনতার সপক্ষে লিখিত 'এরিওপেজিটিকা'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

আমরা সুপ্রীম কোর্টের অস্থায়ী জজ সার ফ্রান্সিস ম্যাকনটেনকে লিখিত মেমোরিয়ালের একটি অনুচ্ছেদ নিয়ে উদ্ধৃত করছি :

"While your Memorialists were indulging the hope that Government, from a conviction of the manifold advantages of being put in possession of full and impartial information regarding what is passing in all parts of the country, would encourage the establishment of newspapers in the cities and districts under the special patronage and protection of Government, that they

might furnish the Supreme Authorities in Calcutta with an accurate account of local occurrences and reports of Judicial proceedings,— they have the misfortune to observe, that on the contrary, his Excellency the Governor-General in Council has lately promulgated a Rule and Ordinance imposing severe restraints on the press and prohibiting all periodical publications even at the Presidency and in the Native Languages, unless sanctioned by a license from Government, which is to be revocable at pleasure whenever it shall appear to Government that a publication has contained anything of an unsuitable character." এই আবেদনের মধ্যে আরো আছে যে "a complete stop... to the diffusion of knowledge and the consequent mental improvement now going on, either by translations into the popular dialect ... or by the circulation of literary intelligence drawn from foreign publications.... Another evil... that it will... preclude the Natives from making the Government readily acquainted with the errors and injustice that may be committed by its executive officers in the various parts of this extensive country."[১]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব কলকাতার বাঙালী-সমাজের উপর পড়েছিল বলে মনে হয় না ; কারণ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি ছিল যুবক ইংরেজ সিভিলিয়ানদের শিক্ষার দিকে। এই কলেজের প্রায়-প্রতিদ্বন্দ্বী মহাবিদ্যালয় ইংলন্ডে হেলিবেরিতে স্থাপিত হবার পর এখানকার খরচপত্রে টান পড়তে থাকে। তাই দেখা যায় ১৮০১ থেকে ১৮০৫-এর মধ্যে যতগুলি বাংলা বই প্রকাশিত হয়— ১৮০৬-এ বিলেতে কলেজ হবার পর আর সে উৎসাহে এখানকার বই ছাপা হয় নি। কেরীর তত্ত্বাবধানে যে-সব বই রচিত ও মুদ্রিত হয় তার উদ্দেশ্য ছিল ভাষাশিক্ষাদান, জ্ঞানবিতরণ নয়— ইংরেজ সিভিলিয়ানরা বাংলা তর্জমা পড়ে জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করবে না নিশ্চয়ই। কিন্তু বাঙালী সাধারণ পাঠক? তাদের শিক্ষার জন্য ১৮১৭ সালে 'হিন্দু কলেজ' স্থাপিত হয়। কিন্তু উদ্যোক্তারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তা সিদ্ধ হয় নি, কারণ ছাত্ররা নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়ে বের হয় নি—

১ *English Works*, Ed. Nag and Burman, Part IV, pp. 6-7.

হয়েছিলেন সব কালাপাহাড়— এ তথ্য সুবিদিত। ১৮১৭ সালের ৪ঠা জুলাই 'কলকাতা স্কুলবুক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা হিন্দু কলেজ স্থাপনের প্রায় সমকালীন ঘটনা। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজি ও দেশীয় ভাষায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন প্রকাশ ও সুলভে বা বিনামূল্যে বিতরণ। ধর্মপুস্তক-মুদ্রণ ইহার বিধিবহির্ভূত ছিল। সরকারী, বেসরকারী সাহেব ছাড়া রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, তারিণীচরণ মিত্র প্রভৃতি ছিলেন উদ্যোক্তা; রামমোহন রায়কে তাঁরা এড়িয়ে চলেছেন, যেমন 'হিন্দু কলেজ' সম্পর্কে করেছিলেন। যে কয়জন বাঙালীর নাম করা গেল এঁরা সকলেই প্রতিক্রিয়াপন্থী, সতীদাহের সমর্থক, রামমোহনের প্রতিপক্ষ। অথচ, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান বাংলার মাধ্যমে প্রচারিত হোক সেটি তাঁরা চাইছিলেন। সমকালীন আর-একটি ঘটনাও স্মরণীয়; স্কুলবুক সোসাইটি স্থাপনার বৎসর-কাল পরে (১ সেপ্টেম্বর ১৮১৮) কলকাতা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে বিদ্যালয়-স্থাপনে সহায়তা দানের জন্য। বলা বাহুল্য, এ-সবই বেসরকারী প্রচেষ্টায় হচ্ছে— অবশ্য কয়েকজন সহৃদয় ইংরেজ এ সবেরই সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে— তিনি মহামতি ডেভিড হেয়ার। দেশের মধ্যে ইংরেজি-স্কুল স্থাপন করবার তখন দারুণ উৎসাহ ও চাহিদা: "ইতিপূর্বে সরকার-পরিচালিত এডুকেশন কমিটি ইংরাজী, সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় অনেক গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত কমিটি প্রকাশিত ইংরাজী পুস্তকের ৩১ হাজার কপি মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে বিক্রয় হইয়া গেলেও, সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থ বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে কার্য পরিচালকের বেতনও উঠে নাই।"[১]

১৮১৮ সাল থেকে ১৮৩৫ সালের মধ্যে বাংলায় যে-সব পুস্তক লিখিত হয় তাদের মধ্যে কতকগুলির লেখক বাঙালী, কতকগুলির লেখক ইংরেজ পাদরি। বাঙালী লেখকদের মধ্যে তারিণীচরণ মিত্রের 'নীতিকথা' (১৮১৮), তারাচাঁদ দত্তের 'মনোরঞ্জনেতিহাস' (১৮১৯), রামকমল সেনের 'হিতোপদেশ' (ঈশপের গল্পের অনুবাদ, ১৮২০), 'ঔষধসার সংগ্রহ' (১৮১৯), প্রভৃতি গ্রন্থ সকলেরই পাঠ্য ছিল— কারণ আর বই কোথায়?

---

১ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১২৮।

শ্রীরামপুরের মিশনারীরা কেবল বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন, এ কথা ঠিক নয়; তাঁরাই সব-প্রথম লোকশিক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং বিবিধ বিষয়ে গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হন। পিয়ার্সের ভূগোলবৃত্তান্ত (১৮১৮) বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ যাতে পৃথিবীর দেশ-মহাদেশের কথা প্রকাশিত হয়। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮১৯) বোধ হয় এই সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল। ফেলিক্স কেরী-কৃত 'ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' (১৮২০) ও তাঁর 'বিদ্যাহারাবলী' (১৮২০) বাংলাভাষার প্রথম 'বিশ্বকোষ'। জন লসন-লিখিত 'পশ্বাবলী' (১৮২২), 'রবিন্সন ক্রুশোর জীবনচরিত', ইয়েট্সের 'পদার্থবিদ্যা' (১৮২৪), 'পদার্থ বিদ্যাসার' (১৮২৫), মার্শম্যানের 'সদ্‌গুণ ও বীর্যের ইতিহাস' (১৮২৯), 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৩১), 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ' (১৮৩৩), জন ম্যাক্-কৃত 'কিমিয়া বিদ্যাসার' (১৮৩৪)— বাঙালীর বুদ্ধিমুক্তির পক্ষে এই গ্রন্থগুলি বিশেষ সহায় হয়।

কিন্তু এটাই সম্যক্ রূপ নয়। ১৮০১ হইতে ১৮৩৫-এর মধ্যে কলকাতা ও কলকাতার বাইরে অনেকগুলি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। মুদ্রাযন্ত্রের মালিকরা বাঙালীর মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞান বিতরণের জন্য যে সকলেই উৎসুক তা ভাববার কারণ নেই; কোন্ শ্রেণীর বই বাজারে কাটবে তা আজকালকার ব্যবসায়ী প্রকাশনীরা যেমন বোঝেন, তাঁদের পূর্বপুরুষরাও তেমনি বুঝতেন। তাই তাঁরা এমন-সব 'তন্ত্র' গ্রন্থ মুদ্রিত করতে থাকলেন যা উচ্চৈঃস্বরে বন্ধু-মহলেও পাঠ করা যায় না। এ ছাড়া আদিরসাত্মক 'রতি মঞ্জরী' (১৮২৫), 'চৌরপঞ্চাশিকা' (১৮২৬), 'শৃঙ্গার তিলক' (১৮২৬), 'রসমঞ্জরী' (১৮৩০), 'পদাঙ্কদূত' (১৮৩০), 'বিদ্যাসুন্দর' (১৮৩০) প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকা তেমনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে— যেমন আজকাল 'ক্রাইম' ও 'সেক্স' সাহিত্য হয়েছে।

মুদ্রাযন্ত্র সুলভ হয়েছে, বালিতে কাগজ তৈরি হচ্ছে, বিলেত থেকেও আসছে, দেশীয় 'তুলোট কাগজ' তখনও দুষ্প্রাপ্য হয় নি। ব্যবসায়ী ও পণ্ডিতে মিলিত হয়ে বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষানুবাদ— প্রায়শই পয়ার ছন্দে লিখিত— মুদ্রিত করতে আরম্ভ করেছেন। শাস্ত্রগ্রন্থ বাংলায় ভাষান্তরিত করার কাজ আরম্ভ করেন রামমোহন। তিনি তাঁর নিজ ধর্ম ও বিশ্বাস-মতে শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করেন; কিন্তু বৃহত্তর হিন্দুসমাজের পণ্ডিতগণ প্রথমে

রামমোহনের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন, পরে শাস্ত্রীয় গ্রন্থের মূল ও তর্জমা ছাপতে প্রবৃত্ত হন। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় যে বিরাট সংস্কৃতসাহিত্য অনূদিত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে সে ইতিহাস নিয়ে কেউ গবেষণা করেন নি, কিন্তু যদি কেউ করেন তো দেখবেন বাঙালী ভারতের মধ্যে শাস্ত্রের ভাষান্তর-করণের পথিকৃৎ, আর রামমোহনের নাম সর্বোপরি স্থানে লিখিত রয়েছে।

কিন্তু শিক্ষা এত ব্যাপক হয় নি বা হঠাৎ-ধনীদের মন এতটা শিক্ষিত ও মার্জিত হয় নি, যাতে করে তারা নিজেদের ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও আস্থাবান হয়। আবার 'হিন্দু কলেজে' যারা শিক্ষিত হয়ে কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত হয়েছেন তাঁদের মধ্যেও অধিকাংশই হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন। তাঁদেরই একজন লিখেছিলেন যে যদি কোনো জিনিসকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করেন তা হচ্ছে 'হিন্দুধর্ম'। হঠাৎ-ধনী হিন্দুদের হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি কিরূপ অবজ্ঞা ছিল তার একটি সমকালীন দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি :

বাঙালীর যে-মন কবিগান-খেউড়গানের ধুল্যবলুণ্ঠিত ধুলোট উৎসবে মত্ত হত, সেই মনই আদিরসাত্মক শ্লোক পাঠে জান্তব উত্তেজনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। সাধারণ বাঙালীর উগ্র আদিরস-প্রীতির উদাহরণ দিতে গিয়ে 'সমাচার দর্পণে'র এক পত্রপ্রেরক দুঃখ করে বলেছিলেন—"সংপ্রতি এই কলিকাতা মহানগরে বিদ্যাসুন্দর ও রতিমঞ্জরী ও রসমঞ্জরী প্রভৃতি আদিরসঘটিত যে২ গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে তাহা বাবুরদিগের নিকটে আগতমাত্র সমাদর পুরঃসরে মূল্য প্রদানপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া দিবারাত্রি তদামোদে আমোদিত হইয়া থাকেন কিন্তু এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তিথিতত্ত্বের অন্তর্ভূত কর্ম্মলোচন নামক এক গ্রন্থ অতিযত্নে ভাষাতে পয়ার করিয়া সংস্কৃত সমেত ৫০০ শত গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন অনেক চেষ্টাতে শতাবধি গ্রন্থ শিষ্টবিশিষ্ট লোকদ্বারা আদৃত হওয়াতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ঋণ শোধমাত্র হইয়াছে সে গ্রন্থের মূল্য ॥০ আধ টাকার উর্দ্ধ নহে। এই গ্রন্থ আধুনিক বাবুজী মহাশয়েরদিগের নিকটে লইয়া গেলে প্রথমতঃ আদিরস জ্ঞানে হস্তে করেন পরে কিঞ্চিৎ দর্শনে রজ্জুজ্ঞানে সর্পধারণ জ্ঞান করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন তাঁহার ব্যস্ততা দেখিয়া নিকটস্থ লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলে কহেন যে বাহাত্তুরে বেটারদিগের অন্য কোন কর্ম্ম নাই যে গ্রন্থ করিয়াছে ইহা পড়া ভাল নহে যেহেতুক না জানিয়া কর্ম্ম

করা ভাল জানিয়া করিলে দোষ হয় অতএব এ গ্রন্থ ভাল মানুষে পড়ে না।"[১]

দেড় শো বছর আগে বাংলা ছাপাখানা স্থাপিত হবার পর বাংলাভাষায় যে-সব গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল তার অধিকাংশই এখন দুষ্প্রাপ্য— সাহিত্য হিসাবে পাঠোপযোগী গ্রন্থের সংখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। এর প্রধান কারণ, মানুষের রুচির পরিবর্তন হয়েই চলেছে; তাই এক যুগের গ্রন্থ অন্য যুগের পাঠকদের রুচিরোচন হয় না।

'সমাচার দর্পণ' ১৮১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় লিখেছিলেন: "যে দেশে ছাপার কর্ম্ম চলিত না হইয়াছে সে-দেশকে প্রকৃতরূপে সভ্য বলা যায় না।" ঐ সংখ্যা থেকেই জানা যায় যে "গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ-হাজার পুস্তক [কপি] ছাপা হইয়াছে, কিন্তু সকল পুস্তক এক স্থানে নাই, নানা লোকের ঘরে বিলি হইয়াছে।"

দশ বছর পরে 'সমাচার দর্পণ' ১৮২৯ সালের প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তার থেকে জানতে পারি যে ঐ বছর বাংলাভাষায় ছোটো-বড়ো ৩৭ খানি বই মুদ্রিত হয়: "এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে ইহা দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এত অল্পকালের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ছাপার কর্ম্মের এমত উন্নতি হইয়াছে।"[২]

১৮১৮ সালে প্রথম সাময়িক-পত্র প্রকাশের পর বারো বছরের মধ্যে গ্রাহক-সংখ্যা বেশ বেড়েছে— এক বছরেই দ্বিগুণ। লোকের জ্ঞানতৃষ্ণাও বাড়ছে। স্কুল সোসাইটির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্কুলে যারা লেখাপড়া আরম্ভ করেছিল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেশ-বিদেশের তথ্য জানবার আগ্রহ বেড়েই চলেছিল। পত্রিকাগুলিকে বিদেশের সংবাদ পরিবেশনে মনোযোগী দেখা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, বিদেশের সংবাদ সরবরাহের একমাত্র মাধ্যম ছিল বিদেশ থেকে আগত ইংরেজি পত্রিকা।

---

১ সমাচার দর্পণ, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩; সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৭-৫৮।
২ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯৬।

আমাদের আলোচ্য পর্বের শেষ পাদে, অর্থাৎ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ আইন ১৮২৩ সালে বলবতী হবার পর থেকে, রামমোহনের এ দেশ ত্যাগ (নভেম্বর ১৮৩০) ও বিদেশে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত সময়ের (সেপ্টেম্বর ১৮৩৩) মধ্যে যে ক'টি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে অধিকাংশই রামমোহনের মতের বিরোধী। পাঠকের স্মরণ আছে, রামমোহনের সপক্ষের কাগজ 'বঙ্গদূত' 'বেঙ্গল হেরাল্ড' (মে ১৮২৯) নামে পত্রিকার বাংলা সংস্করণ।[১] আমরা অন্যত্র বলেছি, ছয়জনে মিলে যৌথ কারবার জাতীয় একটি সংঘ গড়েন, তার মধ্যে ছিলেন মণ্টগোমারী মার্টিন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামমোহন রায়, নীলরত্ন হালদার ও রাজকৃষ্ণ সিংহ। এঁদের ইচ্ছা ছিল 'বেঙ্গল হেরাল্ড'-এর সহচর রূপে বাংলা, ফার্সি ও নাগরী লিপিতে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ, যুগপৎ বাংলা তথা উত্তর-ভারতের প্রধান ভাষাগুলির মাধ্যমে এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে। বাংলা-সংস্করণ 'বঙ্গদূত' নামে প্রকাশিত হয়েছিল, অন্য ভাষায় আর হয়ে ওঠে নি। 'বঙ্গদূত'-এর প্রথম সম্পাদক হন নীলরত্ন হালদার— স্বত্বাধিকারীদের অন্যতম। রামমোহনের সঙ্গে যুক্ত হবার আগে নীলরত্ন কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন : 'কবিতা-রত্নাকর'— (১৮২৫) সংস্কৃতে প্রচলিত শ্লোক, যা প্রায় প্রবাদ-বচনের মতো— কবিতা-কণার সংগ্রহ ও বাংলা অনুবাদ। দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৩০) জন্য মার্শম্যান সাহেব সেগুলির ইংরেজি তর্জমা করে দেন। এ ছাড়া 'জ্যোতিষ' (১৮২৫), 'পরমায়ু প্রকাশ' (১৮২৬), 'অদৃষ্টপ্রকাশ' (১৮২৬) ও 'বহুদর্শন' (১৮২৬) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসংগীতের মধ্যে তাঁর একটি গান সংকলিত আছে। তাঁর বিশিষ্ট বই 'সর্ব্বামোদতরঙ্গিনী' আমাদের আলোচনা-পর্বের বহু পরে প্রকাশিত হয় (১৮৫১)। সর্বধর্মকে সমভাবে দেখবার শিক্ষাগুরু রামমোহন। নীলরত্ন

১ ইংরেজি *Bengal Herald* পত্রিকার প্রথম দিনে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তার এক স্থানে আছে : "The extension and freedom of the press... one of Britain's greatest senators... the surest bulwork of liberty" ইত্যাদি। "We are the advocates of good government, the uncompromising co-operators for the ends of justice— opposed equally to anarchy as to despotism."— *Raja Rammohun Roy and Progressive Movement in India,* p. 308.

সেই পথেই চলেন, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তকে স্পষ্ট করে শক্ত করে খাড়া করতে পারেন নি।

'সর্ব্বামোদতরঙ্গিনী' গ্রন্থে "হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্টান এই চারি জাতির স্ব স্ব ধর্ম্ম বিচারস্থলে সর্ব্বধর্ম্মের মর্ম্ম এক পরমেশ্বরোপাসনা, ইহাই শাস্ত্রোক্তি ও সদ্যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইল।··· এতদ্গ্রন্থে নির্ম্মৎসর ধর্ম্মকথনপূর্ব্বক সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বির প্রতি স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দেওয়াতে, সর্ব্বজনের আমোদ বিস্তার করা গেল, এজন্য এ গ্রন্থের নাম সর্ব্বামোদতরঙ্গিণী হইল [১২৫৮ সাল]।"

নীলরত্ন হালদারের সঙ্গে 'বঙ্গদূত'-এর সম্বন্ধ এক বছর কাল ছিল; সম্পাদনা-কার্য তিনি অতি যোগ্যতার সঙ্গে নিষ্পন্ন করেন। কিন্তু কী কারণে পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন তা স্পষ্ট নয়। প্রগতিবাদের বিরোধী পত্রিকা 'সম্বাদ তিমিরনাশক' লেখেন—

"...সন ১২৩৬ সালে [১৮২৯] বঙ্গদূত শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় তাহার প্রকাশক হইয়াছিলেন কিন্তু শেষরক্ষা হইল না কেননা সুপ্রীম কোর্টে কাগজের দায়ে দোষী হইয়াও তথাচ কাগজ করিতেছিলেন শেষে সতী-দ্বেষী হইতে আদেশ হয় তাহাতেই ত্যক্ত হইয়া ত্যাগ করিলেন শ্রীযুত ভোলানাথ সেন সতী বিপক্ষহইতে মহানন্দে মগ্ন হইয়া বঙ্গদূতের এডিটর নাম প্রকাশ করিলেন শেষে বঙ্গ ভূতরূপে কাগজ হিন্দুসমাজে খ্যাত হইল তাহার কাহিনী কত লিখিব।"[১] নীলরত্ন কেন সতীদাহ-নিবারণ-পক্ষ ত্যাগ করলেন তার কারণ স্পষ্ট নয়। তাঁর পিতা ধনী 'প্রসিদ্ধ বাবু' নীলমণি হালদার তখন জীবিত— পিতার শাসনে রামমোহন-পক্ষ ত্যাগ করলেন কি না বলা যায় না।

'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা ও ব্যবহার দর্পণ' নামে পুস্তক ১৮২৯ সালের জুলাই মাস হতে দফে দফে প্রকাশিত হতে থাকে; এটি 'তিমিরনাশক' প্রেসেই মুদ্রিত হয়। 'সমাচার দর্পণ' 'সম্বাদ কৌমুদী' ও সদ্যপ্রকাশিত 'বঙ্গদূত' পত্রিকা যে প্রগতিবাদ প্রচার করছিল তা হিন্দুসমাজের ও হিন্দুধর্মের মত ও বিশ্বাসের পরিপন্থী এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা' 'সম্বাদ তিমিরনাশক' প্রভৃতি পত্রিকার মতের

---

১ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৫।

বিরোধী। সর্ব্বতত্ত্বদীপিকার একটি উদ্দেশ্য ছিল : "এই দেশীয় ব্যবহার ও চরিত্র এবং শাস্ত্র যাহা অন্য দেশীয় লোকেরা সবিশেষ না জানিয়া নানাপ্রকার দোষোল্লাস করিয়াছেন তাহা উদ্ধারণার্থে ঐ সকল ব্যবহার প্রচলিত হইবার এবং তাহার তাৎপর্য্যতা জানাইয়া তাহারদিগকে নিষ্কলঙ্ক করিতে চেষ্টা করা যাইবেক।"[১]

'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা'র পরিচালক ও লেখকগণের আক্রমণস্থল ছিল রামমোহনের অনুবর্তীগণ এবং ডিরোজিওর তরুণ চেলার দল। রামমোহন ও তাঁর শিষ্যেরা ভারতীয় অতীত সংস্কৃতিকে বজায় রেখে প্রগতিবাদী, আর নবীনের দল অতীতকে অস্বীকার করে সামনের দিকে এগিয়ে চলার পক্ষপাতী। প্রগতিবাদীরা য়ুরোপীয়দের এদেশে এসে বসবাস করার পক্ষপাতী এবং ফার্সি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা আদালতে প্রচলিত হবার সপক্ষে; আর 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা' ঠিক এই দুটি বিষয়েরই বিরোধী। য়ুরোপীয়দের এদেশে এসে বাস করা নিয়ে যে তর্ক ওঠে রামমোহন তাতে অংশ গ্রহণ করে উপনিবেশের পক্ষেই যুক্তি দিয়ে বলেন যে, য়ুরোপীয় মূলধন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, প্রয়োগশিল্পের যন্ত্রপাতি, এ-সব আমাদের চাই[২]; আর ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে তাঁর মত তো সুবিদিত।

পাঠকের স্মরণ আছে, রামমোহন রায় হিন্দু কলেজের সঙ্গে নিঃসম্পৃক্ত হবার কয়েক বছর পরে কলিকাতায় হেদুয়া পুষ্করিণীর কাছে এক বাড়িতে হিন্দু স্কুল স্থাপন করেন।[৩] এই বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করতেন। বিদ্যালয়টির পঠন-পাঠন খুবই সুখ্যাতি অর্জন করেছিল (১৮২২)।

বিদ্যালয়-স্থাপনার এগারো বছর পরে বিদ্যালয়-গৃহে কয়েকজন তরুণ

---

১ বাংলা সাময়িক পত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩১-৩২।

২ শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,' ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন। এই গ্রন্থে সবিস্তারে এই প্রশ্নের আলোচনা হয়েছে।

৩ An account of the formation of another native literary society at Rammohan Roy's Anglo-Hindu School— 'সম্বাদ কৌমুদী' হইতে 'সমাচার দর্পণ'-এ উদ্ধৃতি— ১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩।

Appreciative remarks of the *India Gazette*, February 22, 1833: "The Principal object of this association is the cultivation of the vernacular dialect of Bengal..."

বাঙালী-কর্তৃক "সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা নাম্নী সভা সংস্থাপিতা হইল।" রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদকে প্রথম সভাপতি ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে (বয়স তখন ষোলো বছর মাত্র) প্রথম মাসের জন্য সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। সভা হয় ১৮৩২ সালের ৩০ ডিসেম্বর— রামমোহন তখন বিলেতে।

"এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ কোন সমাজ সংস্থাপিত নাই অতএব উক্ত ভাষার আলোচনার্থ আমরা এক সভা করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম··· এই সভার অনুষ্ঠানপত্র এই যে 'আমারদের বন্ধুবর্গের নিকটে বিনয়পুরঃসর নিবেদন করিতেছি যে গৌড়ীয় ভাষার উত্তমরূপে অর্চনার্থ এক সভা সংস্থাপিত করিতে আমরা উদ্যোগী হইলাম এই সভাতে সভ্য হইতে যে২ মহাশয়ের অভিপ্রায় হয় তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ১৭ পৌষ রবিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টাসময়ে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুলে উপস্থিত হইয়া স্বস্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন।' "[১] প্রসঙ্গত বলি, তরুণদের এই 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা'র ভাবনা হতেই কালে 'তত্ত্বরঞ্জিনী' ও পরে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' গঠিত হয়; অবশ্য এই সভা স্থাপিত হয় ১৮৩৯ সালের ৬ অক্টোবর,[২] রামমোহনের মৃত্যুর ছয় বৎসর পরে।

আমরা 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা ও ব্যবহার দর্পণ' গ্রন্থের কথাক্রমে 'সর্ব্বতত্ত্ব-দীপিকা' সভার কথায় চলে গিয়েছিলাম; এবার সে-কালের বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য দুটি পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'জ্ঞানান্বেষণ'[৩] সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব। এই দুটি পত্রিকার আরম্ভকালে রামমোহন জীবিত।

'সংবাদ প্রভাকর' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি। রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রার তিন মাস পরে ১৮৩১ সালের জানুয়ারি মাসে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ-প্রভাকর' প্রকাশ করেন, কিন্তু দেড় বছর পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। "প্রভাকর উদয়াবধি··· বিলক্ষণরূপে ধর্ম্মপক্ষ ছিলেন তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ঐ পত্রবর পরিত্যাগ

১ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ১২৪-২৫।

২ দ্রষ্টব্য, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, সংযোজন ২, পৃ. ৪২৬-২৮।

৩ Appreciative remarks of the Gyananveshun (July 1833): "Although the members are young they deserve great applause..."— *Raja Rammohan Roy and Progressive Movement in India*, pp. 273-75.

করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্ম্মদ্বেষী হন নাই কেননা ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"[১]

পাথুরিয়াঘাটার নন্দকুমার ঠাকুর প্রমুখ অনেকেই প্রগতিবাদের বিরূপ ছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকর' তথাকার ধনের আওতায় জন্মলাভ করে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতো মুক্ত মানুষকে বোধ হয় টাকা দিয়ে বেঁধে রাখতে পারা যায় নি। চার বছর পরে ১৮৩৬ সালের অগস্ট মাসে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পুনরাবির্ভাব হয়। তখন নূতন যুগের সন্ধিক্ষণ— আমাদের আলোচ্য পর্বের বাইরে এসে গেছে— ফার্সি আর রাজভাষা নেই, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এসে গিয়েছে।

'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশের পাঁচ মাস পরে 'জ্ঞানান্বেষণ' ইয়ং বেঙ্গল-এর মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয় (১৮ জুন ১৮৩১)। এই পত্রিকার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। পাঠকের স্মরণ আছে নিশ্চয়ই যে ১৮১৭ সালে 'হিন্দু কলেজ' কী উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান বিষয়ে এই বিদ্যালয়ই ছিল অগ্রণী। রামমোহনকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হিন্দুরা যোগযুক্ত হতে দেন নি। হিন্দু কলেজের কর্তারা ভেবেছিলেন যে, বিদ্যালয়ে হিন্দু-বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হবে, কিন্তু তা যে হয় নি সে তথ্য সুবিদিত। বাঙালী হিন্দু ভদ্রেরা এই বিদ্যালয়-স্থাপনায় উৎসাহী ছিলেন। তাঁদের কারও ধনাভাব ছিল না। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র গোপীমোহন ও বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রকে প্রথম 'গভর্নর' নিযুক্ত করা হয়।

এই বিদ্যালয়ের উপর পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবারের একটা স্বত্ব দাঁড়িয়ে যায়, যা নিয়ে পরে কিছু ঝামেলাও হয়েছিল। যাক, সে কথায় আমাদের প্রয়োজন নেই। এই হিন্দু কলেজের 'হিন্দু' ছাত্ররা কালে কিরকম 'কালাপাহাড়' হয়ে উঠেছিল সে বিষয়ের প্রসঙ্গকথাও আমাদের আলোচ্য পর্বের বাইরে পড়ছে। তবে রামমোহনের স্বাধীন চিন্তার ধারাটা তরুণরা পেয়েছিল কালধর্মের অনিবার্য পরিণাম রূপেই; এই বাঙালী তরুণের দল ভারতের ধর্মের প্রতি

---

১ সমাচার দর্পণ, ২ জুন ১৮৩২। দ্রষ্টব্য, বাংলা সাময়িক পত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৪।

আস্থা হারাল পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে। বেকন, লক্, বার্কলে, হিউম, রীড্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের রচনার সঙ্গে গভীর পরিচয়ের প্রতিক্রিয়ায় এটি ঘটে। কারণ এই প্রভাবকে শমিত করবার মতো শক্তি ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে আহরণ করতে পারে নি। রামমোহন হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে বাদ দিয়ে এক-দেবতা-উপাসনার বিধি দিলেন, নবীনের দল সেটাকেও অস্বীকার করে নাস্তিকতা ও hedonismকে অভিনন্দন করলেন। এর প্রধান কারণ, প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের যোগসূত্রের মূলটা গিয়েছিল ঢিলে হয়ে। পাশ্চাত্য দার্শনিক ও লেখকদের রচনার সঙ্গে রামমোহনের যথেষ্ট পরিচয় ছিল, কিন্তু তার মূল ছিল তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহ্-হিদীন ও বেদান্তের উপর সুপ্রতিষ্ঠ। তাই তাঁর জীবনে ভারসাম্য ব্যাহত হয় নি যেমনটি হল 'ইয়ং বেঙ্গল'-দের জীবনে। তারা হল 'না ঘরকা, না ঘাটকা'।

আমি অন্যত্র বলেছি, এরাই সে যুগের angry youngman—যুগে যুগে নানা নামে এরা এসেছে গিয়েছে, সমাজকে সভ্যতাকে নাড়া দিয়েছে, বারে বারে ঠেলে দিয়েছে। সে ঠেলায় সব সময় সব ক্ষেত্রে যে সমাজ সোজা পথে গিয়েছে তা হয় নি। আবার এদের মধ্যে reaction-এর চরম রূপও ফুটে উঠতে দেখেছি। এই তরুণরা যুগপৎ ব্রাহ্ম ও প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু উভয়েরই সমালোচক। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় (১৮৩১) লিখিত হয় যে অনেক বিশিষ্ট-বংশোদ্ভব ব্যক্তি "লোকের প্রপঞ্চ [বঞ্চনা] বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের কোনরূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম যে নানা দেশ প্রচলিত বেদবেদান্ত মনুমিতাক্ষরা-প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনাদ্বারা তাঁহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব। দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্দেশ-নিবাসি অনেকেই আপন ২ জাতিবিহিত ধর্ম্মের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলে যথা-শাস্ত্রানুসারে কহিয়া থাকেন কিন্তু সেই মহাশয়েরা এমত কর্ম্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্টলোকেরই কর্ত্তব্য নহে ইহার কারণ কি তাহাও বিবেচনা করিতে হইবেক।"[১]

---

১ জ্ঞানান্বেষণ। শনিবার, ১৮ জুন [১৮৩১]। ২ জুলাই ১৮৩১ তারিখের সমাচার দর্পণে উদ্ধৃত। দ্রষ্টব্য, বাংলা সাময়িক পত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪০।

'জ্ঞানান্বেষণ'-এর নবীন লেখকরা মনে করতেন যে, বেদ-বেদান্তের গৌরব যা ব্রাহ্মরা প্রচার করছেন তার বৈশিষ্ট্য কিছু নেই— সর্ব দেশে সর্ব কালেই সে ধরণের সত্য প্রচারিত হয়েছে, সুতরাং তা নিয়ে গর্ব করারও কিছু নেই। ব্রাহ্মরা 'বিশিষ্ট-বংশোদ্ভব' মহাশয়দের বঞ্চনা করছেন, যেমন প্রসন্ন-কুমার ঠাকুর রামমোহনের মতের দ্বারা বঞ্চিত হয়েছেন। রামমোহনের কয়েকটি রচনা প্রসন্নকুমারের নামে প্রচারিত হয়। মোট কথা, নবীনরা ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে যেমন ক্রিটিক্যাল, হিন্দুদের সম্বন্ধেও তেমনি শ্রদ্ধাহীন।

জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ইনি গোপী-মোহনের পুত্র সূর্যমোহনের দৌহিত্র— হিন্দু কলেজের ছাত্র। পত্রিকার সম্পাদক তিনি, কিন্তু বেশির ভাগ কাজ করতেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ওরফে গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য (১৭৯৯-১৮৫৯)। অবশ্য সম্পাদক ও তাঁর বন্ধু-বর্গের ফরমাশে তাঁকে লেখালেখি করতে হত— সে লেখা জীবিকার জন্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এঁর সম্বন্ধে বলেছেন : "কিছুদিন রামমোহন রায়ের সঙ্গে থাকিয়া অনেক বিষয়েই তাঁহাকে সাহায্য করিয়া তিনি উঁহাকে ত্যাগ করেন ও ব্রহ্মসভার বিরোধী যে ধর্ম্মসভা ছিল, তাহাতেই উপস্থিত হন ও তাহার কর্ত্তা নন্দলাল ঠাকুরের দক্ষিণহস্ত হইয়া উঠেন।"[১]

'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশিত হলে 'সম্বাদতিমির নাশক' লেখেন যে সম্পাদক দক্ষিণানন্দন "বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গলা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ঐ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন একজন নাটুকে ভাট মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দু-

---

১ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, ১৫শ অধিবেশন, রাধানগর। কার্যবিবরণ, পৃ. ২৬। দ্রষ্টব্য, সাহিত্য-সাধক-চরিত মালা ৮।

ধর্মসভার নেতা নন্দলাল ঠাকুরের (উমানন্দ) জ্যেষ্ঠভ্রাতা সূর্যমোহনের দৌহিত্র দক্ষিণানন্দন (পরে দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায়ের অত্যাধুনিক মতবাদ প্রচারী পত্রিকা "জ্ঞানান্বেষণ"-এ যোগদান করেন। বিধাতা বোধহয় পরিহাসপ্রিয়— তা না হলে যে নন্দলালের নির্দেশে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রামমোহনের মতের বিরুদ্ধে 'পাষণ্ডপীড়ন' গ্রন্থ লিখলেন, তাঁরই দৌহিত্র দক্ষিণারঞ্জন ক্ষণকালের জন্য কালাপাহাড় হলেন, এবং তাঁরই কনিষ্ঠ প্রসন্নকুমার হলেন রামমোহনের গুণগ্রাহী।

দ্বেষী কাগজ আরম্ভাবধি কেবল ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়কে [ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়] কটু কহে আর হিন্দুশাস্ত্র ভাল নহে তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোকমাত্র কেহ ঐ কাগজ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটীতে পাঠাইয়া দেন।"[১]

'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা সতীদাহ প্রভৃতি বিষয়ে রামমোহন ও উদারনীতিক দলের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু হিন্দুধর্মের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মানতে তাঁরা পারেন নি।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর উদারধর্মীয় সামাজিক রাজনীতিক এবং অর্থনীতিক মতবাদ প্রচারকল্পে *Reformer* নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৩১); বাঙালী-সম্পাদিত ইংরেজি পত্রিকা এই বোধ হয় প্রথম। অবশ্য পূর্ব বৎসর হিন্দু কলেজের ছাত্ররা *Parthenon* নামে পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তা স্থায়ী হয় নি এবং তার প্রভাব ও প্রচার মুষ্টিমেয় angry youngman -এর মধ্যে সীমিত ছিল।

এই যুগের পত্র-পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমকালীন সংবাদ সরবরাহ, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বাঙালী পাঠককে শোনানো। *Reformer* -এর বক্তব্য বিষয় 'অনুবাদিকা' (অগস্ট ১৮৩১ - ১ এপ্রিল ১৮৩২) নামে সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়।

রামমোহনের জীবনকালে এরূপ আরো কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় —এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল মাসিক পত্রিকা 'বিজ্ঞান সেবধি' (এপ্রিল ১৮৩২ - ১৮৩৪), এর মাত্র বারোটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এটি প্রকাশ করেন Society for Translating European Sciences। 'সমাচার দর্পণ' (৫ মে ১৮৩২) লিখছেন: "অবগত হওয়া গেল যে ইউরোপীয় বিদ্যাগ্রন্থের অনুবাদকারি সোসৈটি ইতিসংজ্ঞক এক সমাজের দ্বারা বঙ্গভাষায় অতিপরোপকারক বিজ্ঞান সেবধি নামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।... ঐ সমাজের অভিপ্রায়... স্বদেশস্থ লোকেরদের উপকারার্থ ইউরোপীয় বিদ্যার গ্রন্থমালা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবেন।"[২] পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের

---

১ সমাচার দর্পণে উদ্‌ধৃত, ২১ জানুয়ারি ১৮৩২। দ্রষ্টব্য, বাংলা সাময়িক পত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪০।

২ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৭।

বই মুদ্রিত হতে শুরু হয় শ্রীরামপুরের পাদরিদের সময় থেকে— স্কুল বুক সোসাইটি যখন হতে পাঠ্য পুস্তক তর্জমায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু 'বিজ্ঞান সেবধি' ধারাবাহিক "প্রসিদ্ধ গ্রন্থসকলের" অনুবাদ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[১]

পাঠকের স্মরণ আছে, আমাদের আলোচ্য পর্বের গোড়ার দিকে ধর্ম ছিল বাগ্‌বিতণ্ডার বিষয়। ১৮২১ অব্দে রামমোহনের দ্বারা 'ব্রাহ্মণ সেবধি' প্রকাশিত হয় ও তার দশ বছর পরে পণ্ডিতপ্রবর উইলসনের প্রচেষ্টায় এবং প্রেরণায় 'বিজ্ঞান সেবধি' প্রকাশিত হল (১৮৩২)। "প্রথমে ধর্মকলহ লইয়া··· স্থচনা, পরে রামমোহন-ডিরোজিওর শিষ্যসম্প্রদায় ও তাঁহাদের দ্বারা স্থাপিত জ্ঞানান্বেষণের (১৮৩১) সাহায্যে জীবন-চেতনার অপার বিস্ময় আবিষ্কার। ধর্ম-সংক্রান্ত আচার-বিচার ও প্রথা-সর্বস্বতা ত্যাগ করিয়া মানব-কল্যাণবোধের দৃষ্টিকোণ হইতে জীবনকে দর্শন করা" এই পর্বের বিশিষ্টতা। 'বিজ্ঞান সেবধি' এই নূতন যুগের প্রতীক।

আমরা মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস আলোচনার সময়ে এসে পৌঁচেছি। ১৮১৩ ও ১৮৩৩ সাল— কালের দিক থেকে মাত্র বিশ বছরের ব্যবধান। কিন্তু এই কয় বছরে শিক্ষা অভাবনীয় ভাবে প্রসার লাভ করেছে। গভর্মেণ্ট শিক্ষাপ্রসারে এখনও মন দেন নি— খ্রীষ্টানী নানা মিশনের পাদরিরা ও ধনী বাঙালী ভদ্রেরা এই শিক্ষাদানে অগ্রণী হয়েছেন। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও মুদ্রণের জন্য মুদ্রণালয় স্থাপন এবং মুদ্রাযন্ত্রের জন্য বিবিধ সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ ও সরবরাহের আয়োজন চাই। মুদ্রাযন্ত্র পরিচালনার জন্য ধনবান্ ব্যবসায়ীর প্রয়োজন; বাংলাদেশে কোনোটির অভাব ছিল না— বহু লোক 'ছাপাখানা' পরিচালনাকে ব্যবসায়রূপে গ্রহণ করেছিল। ১৮৩৩ সালের অক্টোবর মাসে 'সমাচার দর্পণ' লেখেন, "দশ বৎসরাবধি ভারতবর্ষে মুদ্রাঙ্কন-কার্য্যের অপূর্ব্বরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কলিকাতা নগরে ভূরি ২ ঐ যন্ত্রালয় হইয়াছে তদধ্যক্ষেরা এইক্ষণে প্রতিযোগিতারূপে এমত উদ্যোগ করিতেছেন যে কে কত উত্তমরূপ অথচ অল্পমূল্যে গ্রন্থাদি ছাপাইতে পারেন।"[২]

পত্রিকা প্রকাশ বা পুস্তক মুদ্রণের সঙ্গে অনেকগুলো শিল্প ও ব্যবসায়

---

১ দ্রষ্টব্য, বাংলা সাময়িক পত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৫।

২ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৯।

জড়িত। দেড় শো বছর আগে কিভাবে তখনকার সম্পাদকরা তাঁদের পত্রিকা ছাপবার ও প্রচারের ব্যবস্থা করতেন তা জানবার মতো বিষয়। কারণ, তখন না ছিল রেল, বাস, প্লেন, না ছিল সংবাদ-সরবরাহের টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও। ছাপাবার যন্ত্র কিনে আনতে হত বিদেশ থেকে; ছাপার হরপ এদেশে পাওয়া যেত, তবে তা না পর্যাপ্ত, না সুন্দর, না সুলভ। আর পত্রিকা বিলির ব্যবস্থা? সেও কম জটিল নয়। দূরত্ব-অনুসারে ডাক পাঠানোর খরচ দিতে হত। এই-সব বাধা অতিক্রম করে বাঙালীরা কাগজ চালানো শুরু করে। সে ইতিহাস দীর্ঘ করার স্থান এ নিবন্ধে নেই; তবে রামমোহনকে এই-সবের সঙ্গে সংগ্রাম করেই পত্রিকা চালাতে ও পুস্তক-পুস্তিকার মুদ্রণব্যবস্থা করতে হয়েছিল, তাই এ বিষয়ে সামান্য আলোচনার প্রয়োজন আছে।

মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হল, পিতল-ঢালাই অক্ষর তৈরির ব্যবস্থাও হল শ্রীরামপুরে। কিন্তু কাগজ? মুসলমানরা হাতে কাগজ তৈরি করে আসছে বহু শতাব্দী থেকে— ছেঁড়া কাপড় পচিয়ে মাড় দিয়ে শক্ত করে তারা কাগজ তৈরি করত। এই দেশী কাগজে সাধারণত পোকা ধরত; বই ছাপা শেষ না হতেই দেখা যেত, আগের ফর্মাগুলোতে পোকা ধরেছে। কেরী সাহেব আর্সেনিক দিলেন কাগজে— ফলে তা হয়ে গেল হলদেটে। তাও ভালো— এত বছরেও সেগুলো নষ্ট হয় নি।

শ্রীরামপুরের পাদরিদের চেষ্টায় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কাগজের কারখানা স্থাপিত হয়; দক্ষিণ-ভারতে এর আগেই হয়েছিল বলে জানা যায়। শ্রীরামপুরের কারখানায় কুড়িজন লোক পা দিয়ে কল চালাত। পরে কয়লার খাদের এক সাহেব এঁদের বললেন যে তাঁরা খাদের জন্যে স্টীম-ইঞ্জিন ব্যবহার করছেন, সেরকম যন্ত্র কাগজের কলে ব্যবহার করা যেতে পারে। তখন কেরী বিলেত থেকে স্টীম-ইঞ্জিন অর্ডার দিলেন। সেই যন্ত্র এলে কাগজের প্রথম কল শ্রীরামপুরে চালু হল ২৭ মার্চ ১৮২০ তারিখে। কেরী হাতে তৈরি দেশী কাগজ আর বিলেত থেকে আমদানি কাগজ ব্যবহার করছিলেন; এখন থেকে এদেশের কলে তৈরি কাগজ তাঁর পুস্তকাদি মুদ্রণের জন্য ব্যবহার আরম্ভ হল। ১৮৬৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে শ্রীরামপুরের বাইরে কাগজের কল ছিল না— তাই এখনও 'শ্রীরামপুরী' কাগজ শব্দটা চালু

আছে। কিন্তু এই বছর থেকে বিলাতী কাগজ আমদানি প্রশ্রয় পেল এবং বাংলাদেশের কাগজের কলেরও দুর্দিন দেখা দিল। মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনে যেমন খ্রীষ্টান পাদরিদের কৃতিত্ব, কাগজের কল স্থাপনেও অগ্রণীর সম্মান তাঁদেরই প্রাপ্য। প্রসঙ্গত বলি, কোম্পানির দপ্তরে ও ছাপাখানায় ব্যবহৃত কাগজ বিদেশ থেকে আমদানি হত।

সংবাদপত্র বা সাময়িক-পত্র পরিচালনার সঙ্গে ডাক-বিভাগের সম্বন্ধ যেমন অচ্ছেদ্য, ডাক-বিভাগের সঙ্গে পরিবহন-বিভাগের সম্বন্ধও তেমনি যুক্ত। খবরের কাগজ এখন সভ্য মানুষের জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ হয়েছে। একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন যে, এ যেন সকালের এক পেয়ালা চা, না পেলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। খবরের কাগজের জন্যে, কি মহা-নগরীতে, কি মফস্বলে, লোকে উন্মুখ হয়ে থাকে।

ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় বা তারও আগে, যখন কলকাতায় সবে-মাত্র মুদ্রাযন্ত্র ও পত্র-পত্রিকা চালু হয়েছে, তখন লোকে কিভাবে খবরের কাগজ বা পত্রিকা পেত, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রামমোহন ও তাঁর প্রতিপক্ষীয়রা পত্রিকার মাধ্যমে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করতেন, পত্রযোগেও বহু বিষয়ের আলোচনা হত, এমন-কি ইংলন্ডের সঙ্গেও পত্র-বিনিময় চলত।

মুঘল-যুগেও ডাক-হরকরার পদ ছিল; কিন্তু আধুনিক ডাক-বিনিময়ের প্রথা য়ুরোপীয় সভ্যতার দান। মধ্যযুগীয় 'আখবার'-এর সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠি স্থাপিত হবার সময় থেকেই কর্ম-চারীদের মধ্যে ব্যবসায়-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে পত্র লেন-দেন শুরু হয়। এই ব্যবস্থায় কোম্পানির সরকারী চিঠিপত্র যাওয়া-আসা করত, বেসরকারী লোকের ডাক নেওয়া হত না। তখন বণিক-সম্প্রদায় গভর্মেণ্টের অনুকরণে ডাক-চলাচল প্রবর্তন করলেন। মফস্বলের জমিদাররা কলকাতায় তাঁদের প্রতিনিধি বা উকিলের কাছে নিজ নিজ খাতে পত্রাদি পাঠাতেন। কালে গভর্মেণ্ট সেটা বন্ধ করে দেন, বোধ হয় রাজনৈতিক কারণে। ইতিমধ্যে গভর্মেণ্ট বেসরকারী ডাকও নিতে শুরু করলেন; কিন্তু ডাক-মাশুল অত্যন্ত চড়া ছিল। মার্শম্যান ভারত-ইতিহাসে লিখেছেন, "The postage by

the public mail was, for a poor population like that of India, prohibitory and it was felt to be severe tax even by the merchants"। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে পোস্টমাস্টার-জেনারেল কলকাতা থেকে ডাকের চিঠিপত্রের যে চড়া মাশুল নির্ধারিত করে দেন তা আজকার দিনে অভাবনীয়। কয়েকটা উদাহরণ দিলে ধারণাটা পরিষ্কার হবে: বারাকপুর, হুগলি, চন্দননগরে আড়াই তোলা ওজনের পত্রের মাশুল ধার্য ছিল এক আনা; চট্টগ্রাম ও বক্সারে ছ'আনা, কাশীতে সাত আনা। এক-এক তোলা ওজন বাড়লে মাশুলও বেড়ে যেত, সাড়ে-ছ তোলার পত্র বর্ধমানে যেতে দশ আনা লাগত। কলকাতা থেকে বোম্বাই পত্রের মাশুল ছিল ৫৲টাকার উপর।[১]

ডাক চলাচল করত নৌকায়; ডাকের নৌকায় যাত্রীও নেওয়া হত। ডাক পৌঁছতে কাশীতে ৭১ দিন আর ঢাকায় ৩৭ দিন লাগত।

বিলাতে প্রেরিত চিঠিপত্রের মাশুলও এই সময় খুব বেশি ছিল— দু আউন্স পত্রের মাশুল ছিল চার সিক্কা টাকা, চার আউন্সের ষোলো সিক্কা টাকা; এর উপর যত আউন্স ওজন বেশি হত তার চার গুণ সিক্কা টাকা মাশুল চাপানো হত। এ সময়ে বিলাতে যাবার পথ ছিল আফ্রিকা ঘুরে। এ ছাড়া পারস্য-সাগরের বসারা পর্যন্ত জাহাজে গিয়ে স্থলপথে তুর্কী সাম্রাজ্য পার হয়ে যাওয়া যেত। তার পরে মিশরের ভেতর দিয়ে পথ হয়। রামমোহন ১৮৩০ সালে বিলাতে যান আফ্রিকা ঘুরে— পাঁচ মাস লেগেছিল। পনেরো বৎসর পর দ্বারকানাথ ঠাকুর যান মিশরের ভিতর দিয়ে।

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' ১৮১৮ অব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হলে বড়োলাট লর্ড হেস্টিংস উৎসাহ দেবার জন্যে আধা-মাশুলে ডাক বিলি হবার ব্যবস্থা দেন; তখন আর-সব পত্রিকাওয়ালারাও বড়োলাটের কাছে এই অর্ধমূল্য পাবার দাবি জানিয়ে দরখাস্ত পেশ করতে লাগলেন। ১৮২১ সালের গোড়াতেই সেইজন্যে সাধারণ নিয়ম করে কিছুটা রেহাই দেওয়া হয়েছিল।

ডাকটিকিট প্রচলিত হবার পূর্ব পর্যন্ত পত্রাদির প্রাপককে মাশুল দিতে হত; ফলে কলকাতার সংবাদপত্র ও পত্রিকা সহজে মফঃস্বলে চালু হতে

১ From *Selection from the Calcutta Gazette*, Vol. IV, p. 51.

পারত না। কেবল পয়সাওয়ালা পত্রিকার মালিক, যাঁরা আগে থেকেই টাকা জমা দিতেন, তাঁদের কাগজ গ্রাহকদের কাছে সহজেই পৌঁছে যেত। মোট কথা, পত্রিকা পরিচালনা সে যুগে খুবই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। রামমোহন এই-সব বাধার মধ্যেই পত্রিকা চালিয়েছিলেন— অধিকাংশ সময় ব্যয়ভারটা তাঁকেই বহন করতে হত। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আত্মীয়-সভার সদস্যরা সেটা নিজেদের মধ্যে চালিয়ে দিতেন।[১]

১ দ্রষ্টব্য, কেদারনাথ মজুমদার, বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য।

সপ্তম অধ্যায়

রামমোহনের ধর্মভাবনা ও জীবনদর্শনের পটভূমে ছিল শাশ্বত ভারতের সাধনালব্ধ ঐক্যবাণী। সেই হিন্দু অদ্বৈত-ভাবনার উপর এসে পড়ে ইসলাম ধর্মের ও পারসিক-আরবীয় সংস্কৃতির প্রভাব, এবং তারপর সত্যানুসন্ধানের প্রেরণায় আয়ত্ত করেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির সংস্কৃতি— খ্রীষ্টানী তথা য়ুরোপীয়তা— ভারত-ইতিহাসের সর্ব-অর্বাচীন আগন্তুক অতিথি।

ভারতের শাশ্বতবাণী শুব্ধ হয়ে আছে সংস্কৃত পালি প্রাকৃত তথা বহু অপভ্রংশ ভাষার ধর্মসাহিত্যের মধ্যে। রামমোহন সেই ধর্মারণ্যে প্রবেশ করে সত্যফল আহরণের ব্যর্থ চেষ্টা না করে, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মের সত্য-উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হন। ভারতের শাশ্বতবাণী বেদান্তের মধ্যে নিহিত, এই ছিল তাঁর মত ও বিশ্বাস। কিন্তু বাংলাদেশে সে বেদান্তচর্চা কী নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল এবং তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য রামমোহন কী করেছিলেন, তার আলোচনাই হবে আমাদের মুখ্য কৃত্য।

বেদান্তাদির আলোচনা করতে গিয়ে সবার আগে একটা জিনিস চোখে পড়ে— ভারতের হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থ বা সাহিত্য এমন একটা ভাষায় রচিত যা জনতার ভাষা নয়; জনতা কেন, কারও মাতৃভাষাও নয়। সংস্কৃত-ভাষায় বহুসহস্র গ্রন্থ লিখিত হয়েছে এবং এখনও যে দু-দশখানা রচিত না হয় এমন নয়। কিন্তু বিশেষভাবে ঐ ভাষাভিজ্ঞ মুষ্টিমেয় ভদ্র ব্যতীত সে ভাষার রস ও রহস্য কারও বোধগম্য হয় না, যদি তার পটভূমে বহু বছরের ব্যাকরণ-সাধনা না থাকে। ধর্ম ও সাহিত্যের সম্পদরাশি একটা কৃত্রিম বা 'সংস্কৃত' ভাষার মধ্যে আবদ্ধ থাকায়, জনতার সঙ্গে অভিজাত বা শাসক তথা শোষক শ্রেণীর দূরত্বটা খুবই গভীর ও জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সহজ কথা— হিন্দুসমাজের নানা ভাষার নানা জাতির বাসিন্দাদের মধ্যে যোগাযোগের সিঁড়িটা বা আনাগোনার দরজাটা ছিল বন্ধ। পৃথিবীতে কোথাও এমন দুস্তর ভেদ সাহিত্যের রাজ্যে দেখা যায় না। গ্রীক সাহিত্যের ভাষা আপামর গ্রীকই বুঝত— উচ্চবর্ণ গ্রীকদের ধর্ম ও সাহিত্যের

এক ভাষা ও জনতার আর ভাষা, এমনটি ছিল না। আথেন্সের খোলা থিয়েটরে বসে সকলেই সোফক্লেসের বিয়োগান্ত নাটক বা আরিস্ট-ফেনিসের বিদ্রূপাত্মক নাটক অভিনয় উপভোগ করত। শেক্স্‌-পীয়রের নাটক যখন যাত্রার মতো করে অভিনীত হত, তখন সেখানে কেবল উচ্চবর্ণের নরনারীই উপস্থিত থাকত এমন তো নয়— সকল শ্রেণীর লোক একই অভিনয় দেখে আনন্দ পেত; কারণ দু জাতের দুটো আলাদা ভাষা ছিল না। ইংরেজিতে ক্লাসিক্‌স বলা হয় এই-সব সাহিত্যকে; কিন্তু সত্যকথা, ওদের সাহিত্য class-এর জন্য লেখা হত না, ওদের জনতা ও অভিজাতের একটাই ভাষা। সাহিত্যরচনায় কথ্যভাষার কিছুটা সংস্কার করে তার গ্রাম্যতা দূর করে সাহিত্যিকরা তাকে পরিবেশন করতেন জনতার কাছে। আমাদের সাহিত্যই আমার ব্যাখ্যায় সত্যি-কারের ক্লাসিক্‌স— আমি বলব বিশেষ শ্রেণী বা ক্লাসের জন্য লেখা। তাই এদেশে উচ্চনীচে যত দুস্তর ভেদ, অন্যদেশে এতটা তীব্র নয়। জানি এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক উঠবে— য়ুরোপে লাতিন ভাষা ছিল, ইত্যাদি। তার ফল যাই হোক, আমাদের মতো এমন সাংঘাতিক হয় নি। আমাদের দেশে শাস্ত্রগ্রন্থ বহু শতাব্দী এক কৃত্রিম ভাষার দুর্গে বন্দী ছিল— জনতার বিদ্যা ও বুদ্ধির অগম্য— বহুদূরে। য়ুরোপে খ্রীষ্টানদের ধর্মপুস্তক বাইবেল দেশীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে পাঁচ শো বছর আগে; ভারতে কি হিন্দু, কি মুসলমানের ধর্মগ্রন্থ মাতৃভাষায় লোকে পড়তে পায় উনিশ শতকের শেষ পাদে।

১৮১৫ অব্দে রামমোহন বাংলা হরপে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বেদান্তসূত্র ও বাংলায় তার ভাষা-বিবরণ মুদ্রিত করে প্রচার করলেন। রামমোহন শঙ্করাচার্য-কৃত 'ভাষ্যের দ্বারা বেদান্তশাস্ত্রকে পুনরায় লোকশিক্ষার্থে সুগম' করেন।

রামমোহন যে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে বেদান্ত-সূত্রের ভাষা-বিবরণ প্রকাশ করলেন, সেই 'বেদান্ত' শব্দের অর্থ কী সে বিষয়ে একটু আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অবশ্য আমরা বেদান্তের তত্ত্বকথা-ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হব না, কারণ তা নিয়ে অনেক আলো-

চনা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে ; তা ছাড়া সে তত্ত্বকথার মধ্যে প্রবেশাধিকার আমার নেই। তাই আমরা কেবল শব্দগত অর্থের মধ্যে আমাদের আলোচনা সীমিত রাখব।

'বেদান্ত' শব্দের মধ্যে আছে দুটো মাত্র শব্দ 'বেদ' ও অন্ত', অর্থাৎ বেদের শেষে বা অন্তে এই শাস্ত্রের উদয় হয়েছে বলেই এই লৌকিক নাম। আসলে বেদান্ত বলতে 'উপনিষদ' বুঝায়— সে আলোচনায় পরে আসা যাবে। বেদান্ত শব্দের প্রথমার্ধ বা 'বেদ' বলতেই আমরা বুঝি হিন্দুদের আদিগ্রন্থ— ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব। 'বেদ' শব্দের অর্থ জ্ঞান— বিদ্ ধাতু থেকে বিদ্যা, বিদ্বান শব্দের উদ্ভব ; ইংরেজি wit শব্দের অর্থ জ্ঞান— wit ও বিদ্ একই য়ুরোপীয় রুট বা ধাতু থেকে এসেছে। কিন্তু 'বেদ' বলতেই আমরা বুঝি ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' ; তুলনা হতে পারে 'বাইবেল' শব্দের সঙ্গে। এখন আমরা 'বাইবেল'[১] বললে বুঝি খ্রীষ্টানদের ধর্মপুস্তক ; কিন্তু আসলে বাইবেল শব্দে 'বই' বুঝায়— bibliography, bibliotheque, bibliophile প্রভৃতি শব্দের মধ্যে 'বই' আছে, 'ধর্মপুস্তক' নেই। তেমনি 'বেদ' শব্দও। বেদ তো একটা নয়, চতুর্বেদ— শিশুকালে সংখ্যা বা গণনা শিখবার সময় থেকে শিখেছি। তবে সকলে চতুর্বেদ স্বীকার করেন না। মনু-আদি স্মৃতিকারগণ অথর্বকে অপাংক্তেয় মনে করে বলেন, বেদের নাম ত্রয়ী। গীতায় তিন বেদের কথা পাই, আবার মহাভারতকে কেউ কেউ পঞ্চম বেদ বলে থাকেন। গীতায় বেদকে 'ছন্দ'ও বলা হয়েছে (শাঙ্কর ভাষ্য, ১৩।৪)। এখানেই বেদ শেষ নয়। আয়ুর্বেদ তো সুপরিচিত, কিন্তু মানুষ ছাড়া হাতির চিকিৎসার জন্য পালকাপ্য মুনি লিখলেন গজায়ুর্বেদ, অশ্ব-চিকিৎসার জন্য অশ্বায়ুর্বেদ লেখেন শালিহোত্র জয়দ্রথ। ধনুর্বেদ, স্থাপত্যবেদ, প্রভৃতি শব্দও শোনা যায়, তবে সে সম্বন্ধে কোনো পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে বলে জানা নেই। তা হলে দেখা যাচ্ছে, 'বেদ' শব্দের দ্বারা বাইবেল বা কোরানের ন্যায় কোনো Scripture পাচ্ছি নে।

---

১ 'Biblios' was the name given to the inner bark of the papyrus which was used as writing paper. Hence the papyrus when written upon came to be called Biblios, and from the word Biblion, a papyrus roll, comes our *Bible*. — *The Holy Bible* : Cyclopedic Concordance.

বেদ বলতে বোঝায় চার বেদ— ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব। এর অপর নাম শ্রুতি, কারণ সে যুগে জ্ঞানচর্চা মুখে মুখে চলত, শুনে শুনে শিখত। শ্রুতি[১] বলতে যে কেবল বেদই বোঝায় তা নয়, বেদান্ত উপনিষদও বোঝায়। শঙ্করাচার্য আদি ভাষ্যকারগণ যখন 'শ্রুতি'র দোহাই পেড়েছেন authority বলে তখন প্রায়ই উপনিষদের কোনো উদ্‌ধৃতি বা ইশারা করেছেন। বেদ বলতেই হিন্দুরা মনে করেন যে হিন্দুত্বের সমস্ত উৎস ঐ চার বেদের মধ্যে খুঁজলেই পাওয়া যাবে; অবশ্য এ চেষ্টা যে হয় না তা বলতে পারি নে। বেদ থেকে কেমিস্ট্রি, জিওলজির তত্ত্বকথা প্রভৃতি সব প্রমাণিত করেছেন কেউ কেউ। এর কারণ অতি স্পষ্ট— আমরা বেদ পড়ি নি, অনেকে চোখেই দেখি নি; তাই বেদ সম্বন্ধে কেউ কিছু বললেই অবাক হয়ে শুনি ও বিশ্বাস করি।

প্রাচীন ভারতে 'আর্য' নামে যে জাতির কল্পনা করা হয় তাদের আদি যুগের মানুষদের রচিত গান, কবিতা, লোকসংগীত 'ঋক্' নামে এক জায়গায় সংহিত বা সংগৃহীত হয় বলে তার নাম হয় ঋক্‌সংহিতা। সকল দেশেই সকল কালেই পুরোনো গান, গাথা, লোকসংগীত প্রভৃতি সংগ্রহ করার কথা একদল লোক ভেবেছেন। 'ঋক্' যাঁরা সংগ্রহ করতেন তাঁদের বলা হত 'বেদব্যাস'—আজকালকার ভাষায় তাঁদের বলা হতে পারত এডিটর। এডিটর যেমন কারও নাম নয়— বেদব্যাসও তেমনি কারও নাম নয়; এখনও ব্যাস বেদব্যাস উপাধির লোক আছেন, তবে তাঁদের বেশির ভাগ আপিসে, মিলিটারিতে কাজ করেন— বেদচর্চা করেন খুব কম জনেই। পুরাণ-পাঠকদেরও 'ব্যাস' বলে।

পুরোনো কবিতা গান ছড়া হেঁয়ালি প্রবাদবচন যে কেবল ভারতের বেদব্যাসরাই সংগ্রহ করেছিলেন তা নয়। জরথুস্ট্র নামে মহাপুরুষ, যিনি পারসিক ধর্মের সংস্কার করেন, তিনিও প্রাচীন ইরানের গীত ও 'গাথা'[২]

---

১ "প্রথমশ্রবণাচ্ছব্দঃ শ্রূয়তে হ্রস্বমাত্রকঃ। সা শ্রুতিঃ সম্পরিজ্ঞেয়া স্বরাবয়বলক্ষণা॥" (শব্দসার)।

২ The gāthās...are comparatively small collections of metrical compositions, containing short prayers, songs and hymns, which generally express philosophical and abstract thoughts about metaphysical subjects. That they were sung is not to be doubted, their recital is always designated by a separate word— frasrāvayeiti (Avesta Dictionary). Quoted from হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, পৃ. ১০৯৬।

সংগ্রহ করেন। চীনদেশে কুংফুৎসু (Confucius) এই ধরণের কবিতাদি সংগ্রহ করেছিলেন। ইংরেজিতে *Percey's Reliques* (1765) -এর গাথা-সংগ্রহকে যদি বেদ-সংহিতার সঙ্গে তুলনা করি, তবে হয়তো পাঠক-শ্রোতারা sacrelegious মনে করে আমাকে তাড়না করবেন. কিন্তু আমি নিরুপায়। বেদ বলতেই একটা অপ্রাকৃত, অপৌরুষেয়, রহস্যময় গ্রন্থ মনে করবার কোনো কারণ নেই। মানব-ইতিহাসকে যদি সহজ বিবর্তনবাদের দৃষ্টি নিয়ে বিচার করি তবে এ কথা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করতে হবে, এই-সব ঋক্ দীর্ঘকালের, বহুবিস্তৃত স্থানের, বিচিত্র-চরিত্র মানুষের নানা অভিজ্ঞতার অনুভূতির কাব্যময়, কখনও বা গীতময়, কখনও প্রচ্ছন্ন নাট্যরূপ-প্রকাশ। এই-সব ঋক্ যাঁরা সংগ্রহ করতেন তাঁরা সেগুলির চর্চা নিজেদের পরিবারের লোকেদের মধ্যেই সীমিত রাখতেন। বাইরের কাউকে শেখাতেন না, পাছে monopoly নষ্ট হয় ; কারণ যজমানদের ঘরে যাগযজ্ঞের সময় এই-সব মন্ত্র ব্যবহৃত হত এবং এই-সব আউড়িয়ে দক্ষিণা আদায় করতেন। তুলনা হতে পারে আমাদের দেশের বহু ঘরানা গানের সঙ্গে, সেখানেও বিশেষ পরিবারের মধ্যে বা গুরুশিষ্যর মধ্যে সমস্ত বিদ্যাটা একচেটিয়া করে রাখা হত। বৈদিক কালের ঋষিরাও আমাদের মতো মানুষ ছিলেন, এবং অন্ন, বস্ত্র, বাসের প্রয়োজন তাঁদের আমাদের মতোই ছিল ; যজমানদের হাতে না রাখতে পারলে অন্নবস্ত্র জুটবে কোথা থেকে। ঋষিরা আমাদের মতোই সংসারী ও চরিত্রবান ছিলেন. তবে তখনও 'কৌপীনবন্ত খলু ভাগ্যবন্ত'র মতো অলীক আদর্শবাদ সুলভ হয় নি এবং তাঁরা যে কামিনীর প্রতি অনাসক্ত ছিলেন তারও প্রমাণাভাব।

প্রাচীনকালের সব সংগ্রহ আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছয় নি। তার কারণ, অনেক ঋষিবংশ লোপ পেয়ে গেছে, আর তাঁদের বংশলোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশেষ পরিবারের সংগ্রহও লুপ্ত হয়ে যায়, কেননা মন্ত্রগুলি ছিল তাঁদের মস্তিষ্কের মধ্যে আটক। প্রচলিত ঋগ্‌বেদ শাকল শাখার, অর্থাৎ শাকল নামে কোনো বেদব্যাস যে সংগ্রহ করেছিলেন সেটাই টিঁকে আছে।

বেদ যাঁরা চর্চা করতেন এবং বেদমন্ত্র শুনিয়ে যজ্ঞ করে দক্ষিণা আদায় করে জীবিকা অর্জন করতেন, তাঁদের পক্ষে যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানাদি নিখুঁত রাখা একান্তই আবশ্যক ছিল। সেই উদ্দেশ্যে একটা halo বা মহিমান্বিত পটভূমি

গড়ে তুলে বলতেন, বেদ তো মানুষের সৃষ্টি নয়, অপৌরুষেয়। রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের ন্যায় নামজাদা পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতীর 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র ভূমিকায় বেদতত্ত্ব বহুবিস্তারে আলোচনা করে বলেছেন, "বেদের কেহ রচয়িতা নাই ...ইহা অভ্রান্ত এবং স্বতঃপ্রমাণ...ইহা অলৌকিক তত্ত্বেরই প্রতিপাদক।" (প্রথম খণ্ড, পৃ. ১২২)। বলা বাহুল্য, আধুনিক মানুষ এ-সব মতে সায় দিতে পারে না; এমন-কি দুই-বেদ-জানা, তিন-বেদ-জানা, চার-বেদ-জানা বাঘা বাঘা পণ্ডিত বা দ্বিবেদী ত্রিবেদী চতুর্বেদীদের বংশধরগণও আর পিতৃ-পিতামহের বিদ্যাচর্চায় উৎসাহিত হন না। অলৌকিক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বলে কেউ সে-সব আগলে গ্রামের ব্রাহ্মণপল্লী বা অগ্রহারে বসে নেই।

বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। নৈয়ায়িকরা বলেন, বেদ ঈশ্বরের সৃষ্টি; মীমাংসকরা বলেন, বেদসমূহ স্বয়ংপ্রকাশ, কোনো প্রাকৃত বা সাধারণ পুরুষের সৃষ্টি নয়— অর্থাৎ, বেদ অপৌরুষেয়। কিন্তু বেদ খুললেই দেখা যায় মন্ত্র-রচয়িতাদের নাম স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত। ভারতীয় পণ্ডিতরা বলেন যে, তাঁরা 'মন্ত্রদ্রষ্টা', রচয়িতা নন। সর্বধর্মেই এটি দাবি করা হয়— এই অনুভূতিকে বলা হয় revelation। পৃথিবীর ধর্মের ইতিহাসের পাতা ওল্‌টালে বহু মানুষের নাম পাওয়া যাবে— যাঁরা দৈব প্রেরণার দাবি করে 'বাণী' বিলি করেছেন। এ ধরণের যুক্তি মানতে গেলে দুনিয়ায় যত কবি হয়েছেন এবং এখনও নিত্য হচ্ছেন তাঁদের রচনাকেও 'রেভেলেশন' বলে স্বীকার করতে হবে। কারণ, বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ উক্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি 'ব্যাঙের গান', জুয়াড়ির কান্না, অন্যের গোরুর বাঁটে দুধ শুকিয়ে যাবার জন্যে দেবতার কাছে প্রার্থনা, প্রভৃতিকে অপৌরুষেয় দৈব আধ্যাত্মিক বলে মানতে হয়, তবে আধুনিক কবিরা কী অপরাধ করেছেন? বেদের মধ্যে সাধারণ মানুষের দুর্বল মনের বহু চিহ্ন রয়ে গেছে— সুতরাং সে-সবে রাহস্যিক দৈবতা (divinity) আরোপ করতে বর্তমান যুগের বিজ্ঞানী মানুষের মন কি বাধা পায় না?

তবে কচিৎ কখনও কোনো বিশেষ মানুষ অনুভব করে, তার অন্তর থেকে বাণী বা কবিতা উৎসরিত হয়ে আসছে— সে তখন আপনাকে Aeolian harp মনে করে— বলে 'বাজাও আমারে বাজাও'। তাই বলে এই ধ্যানলব্ধ অনুভূতি, যা বাণীরূপে উদ্‌গীত হয়, তা চিরস্থায়ী হয় না কারও

জীবনেই। সুতরাং কোনো কবির সকল বাণীই যে রেভেলেশন বা দৈব-প্রেরণা-সঞ্জাত এ-কথা তো মানা যায় না। সেইজন্যই বলছি— বেদের মধ্যে বহুমানবের বিচিত্র অনুভূতি নানা ছন্দে উচ্চারিত হতে দেখেছি। বেদাদি গ্রন্থকে স্বাভাবিকভাবে বহু মানুষের সৃষ্টি রূপে দেখলে তাদের মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব অনেক বেশি করে ফুটে ওঠে— তাদের উপর দৈবের চাপ ছাড়াই তারা মহান সৃষ্টি।[১]

বেদ তো চারখানা। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য অতি বিরাট। সাধারণ বৈদিক সাহিত্য তিন প্রকারের রচনা-সংগ্রহ : ১. সংহিতা বা মন্ত্র অংশ— এর মধ্যে স্তোত্র ও প্রার্থনা আছে; ২. ব্রাহ্মণ— গদ্যাংশ, এতে যজ্ঞ ও যজ্ঞীয় আচার-ব্যবহারের কথা আছে, মন্ত্রের ব্যাখ্যাও আছে ; ৩. আরণ্যক ও উপনিষদ— এদের কতক অংশ ব্রাহ্মণের মধ্যে মধ্যে আর কতক অংশ ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুক্ত। এই উপনিষদ অংশই সাধারণত বেদান্ত নামে পরিচিত।

এ ছাড়া বেদাঙ্গ বলে ছ'রকম বিদ্যা আছে— বেদ বুঝতে সে-সব বিদ্যার প্রয়োজন হয়— শিক্ষা ছন্দ ব্যাকরণ নিরুক্ত কল্প জ্যোতিষ। এ ছাড়াও আছে প্রাতিশাখ্য। ছয় বেদাঙ্গর মধ্যে কল্পসূত্র বহুবিস্তারিত। প্রত্যেকটি বেদের তিনটে ভাগ— ১. শ্রৌতসূত্র বা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম, ২. গৃহ্যসূত্র বা গৃহস্থধর্মের নিয়ম ও ৩. ধর্মসূত্র বা সমাজব্যবহার-নিয়ম। প্রত্যেক বেদের কল্পসূত্র পৃথক— অর্থাৎ ঋগ্‌বেদীয় শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্রের পৃথক পৃথক গ্রন্থ যেমন আছে, তেমনি যজুর্বেদীয় কল্পসূত্রের অন্তর্গত শ্রৌতাদি সূত্রগ্রন্থ আছে। এ-সব গ্রন্থ ছাড়া আর-একটি বিদ্যার চর্চা করতে হত বৈদিকদের ; যাগযজ্ঞের বেদী নির্মাণ করবার সময় নানা রেখা চক্র প্রভৃতি তৈরি করতে হত, সেই বিদ্যাকে বলে শুল্ব শাস্ত্র— একে বলা যেতে পারে একরকমের জ্যামিতি।

সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা[২] দিতে গেলে অনেকখানি স্থান জুড়বে, তাই সংক্ষেপে বৈদিক সাহিত্য বললাম।

বৈদিক সাহিত্যের মূল গ্রন্থ বেদ সংহিতা। চতুর্বেদ বললেই যে

---

১ দ্রষ্টব্য, ড. তারাপদ চৌধুরী -লিখিত 'বেদ' প্রবন্ধ; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড।

২ দ্রষ্টব্য, অনির্বাণ, বেদমীমাংসা। সংস্কৃত কলেজ।

প্রত্যেকটি বেদ এক-একখানি গ্রন্থ বুঝতে হবে তা কিন্তু নয়। শাখাভেদে পাঠান্তর ও মন্ত্রবিন্যাসের যথেষ্ট পার্থক্য রয়ে গেছে। চার শো বছর আগে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক লেখা হয়— ছাপাখানা আবিষ্কারের প্রায় দু শো বছর পরে। তৎসত্ত্বেও একবার ফার্নিভালের সম্পাদিত শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকগুলি দেখবেন তো— কী পাঠভেদ! আর বংশপরম্পরায় বা গুরুশিষ্য-পরম্পরায় শোনা মন্ত্র মনে রাখা কি সহজ ব্যাপার ছিল? কেউ ভোলে কিছুটা, কেউ ভোলে বেশিটা— কেউ ভোলে সবটা। মোট কথা, এই ভুলে যাওয়া ও মনে রাখা নিয়ে মতভেদ এবং তার থেকে শাখাভেদ হবে— তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

ঋগ্‌বেদ সংহিতার তিনটি শাখা— শাকল, সাংখ্যায়ন ও বাস্কল; মন্ত্র-বিন্যাসে ও অন্যান্য ছোটোখাটো বিষয়েও ভেদ ছিল। শাকল শাখাই আজকাল চালু সর্বত্র।

ঋগ্‌বেদের দশটি মণ্ডল বা ভাগ। এক-এক ঋষি বা ঋষি-পরিবারের রচনা এক-এক মণ্ডলে সংহিত আছে। দশটি মণ্ডলের প্রথমটিতে ১৯১টি সূক্ত। এই মণ্ডল বহু ঋষির রচনা-সমৃদ্ধ; মনে হয় সংগ্রহকর্তা বেদব্যাস প্রাচীন খুচরা লেখকদের ঋক্‌সমূহ এখানে সংগ্রহ করে রাখেন। দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪৩টি সূক্ত— এগুলি গৃৎসমদ্‌বংশীয় ও ভৃগুবংশীয় ঋষিগণের রচনা। তৃতীয় মণ্ডলে ৬২টি সূক্ত— এদের রচয়িতারা বিশ্বামিত্র-বংশীয় ঋষি। চতুর্থ মণ্ডলের সূক্ত-সংখ্যা ৫৮ ও রচয়িতারা হচ্ছেন বামদেব-বংশীয়। পঞ্চম মণ্ডলের সূক্ত-সংখ্যা ৮৭, অত্রিবংশীয়দের রচনা এগুলি। ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৫টি সূক্ত আছে, এগুলি ভরদ্বাজ-বংশীয়দের রচিত সূক্ত। সপ্তম মণ্ডলের সূক্ত-সংখ্যা ১০৪, এই মণ্ডলের মন্ত্ররচয়িতারা বশিষ্ঠ-বংশীয়। অষ্টম মণ্ডলে সূক্ত আছে ১০৩টি, এ-সবের দ্রষ্টা কণ্ব-বংশীয় ঋষিরা। নবম মণ্ডলে ১১৪টি সূক্ত, অঙ্গিরা-বংশীয় ঋষিরা এগুলির রচয়িতা। শেষ বা দশম মণ্ডলে সূক্ত আছে ১৯১টি এবং এগুলি নানা ঋষির রচনা, যেমন প্রথম মণ্ডলে (সম্পাদক প্রথম ও দশম মণ্ডলের সূক্ত-সংখ্যা একই রেখেছেন— ১৯১; এটা অর্থপূর্ণ)। ঋগ্‌বেদে মোট সূক্ত-সংখ্যা ১০২৮, এর মধ্যে ১১টিকে (অষ্টম মণ্ডলের) বলা হয় বালখিল্য অর্থাৎ apocrypha— পরবর্তী কালের রচনা; এদের বাদ দিলে সূক্ত হয় ১০১৭টি।

এই ঋক্ থেকে গানের উপযুক্ত সূক্তগুলি বেছে নিয়ে সামবেদের মধ্যে, এবং যজ্ঞের উপযুক্ত সূক্তগুলি চয়ন করে যজুর্বেদের মধ্যে নেওয়া হয়েছে।

ঋগ্‌বেদের দুই থেকে নয় মণ্ডল পর্যন্ত সূক্তগুলি তো এক-এক পরিবারের রচনা বলেই সুপরিচিত। খুচরা লেখকও অনেক— তাঁদের নামও জানা যায়; যেমন মনু, ভৃগু, বিশ্বামিত্র, কাক্ষীবণ, শুনঃশেপ, কুৎস, পুরুকুৎস, গোতম, চ্যবন, উশনা, অগস্ত্য, এসদস্যু, অথর্বা, দধীচি, কৃষ্ণ, দীর্ঘতমা, প্রভৃতি। নারী-রচয়িতার নাম পাওয়া যায় বেদে— কাক্ষীবনের কন্যা ঘোষা, অত্রির মেয়ে আপালা, অত্রিবংশীয় এক কন্যা বিশ্ববারা, সূর্যর কন্যা সূর্যা, বিবস্বানের কন্যা যমী, বসুত্রপত্নী, প্রভৃতি।

আমরা পূর্বেই বলেছি, নানা কালের ও নানা পরিবারের রচিত বা সঞ্চিত মন্ত্র গান স্তোত্র কবিতা কথোপকথন, যা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল, তা বেদব্যাসরা সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেছিলেন; এবং সেগুলি শিষ্য-সন্তান-পরম্পরায় চলে আসছিল শুনে শুনে (শ্রুতি)। যাতে নির্ভুল হয় তার জন্য নানা ভাবে পাঠ বা আবৃত্তি করতে হত— ক্রমপাঠ, জটাপাঠ, ঘনপাঠ, ইত্যাদি। যজ্ঞস্থলে মন্ত্রগুলি নির্ভুল বলতে হত। এইভাবে বহুকাল চলে— তার পর সে-সব লিপিবদ্ধ হয়। গুরু-পরম্পরা ধরে বেদের ভাষ্য লেখেন সায়নাচার্য চতুর্দশ শতকে বিজয়নগরের স্বর্ণযুগে। বেদের মধ্যে দন্তস্ফুট করা যেত না, যদি সায়ন ভাষ্যগুলি না লিখে যেতেন। যাস্ক'র 'নিরুক্তি' কিছুটা সহায় ছিল।

ঋগ্‌বেদ মুদ্রিত হয় ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বিলাতে— সম্পাদন করেন ম্যাক্সমুলার। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজ সংস্কৃত-পণ্ডিত কোলব্রুক বেদের পুঁথি সংগ্রহ করে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদরি-কর্তাদের এই গ্রন্থ ছাপাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন; কেরী সাহেবের ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য ছিল না বলে পিছিয়ে গেলেন। বেদ ও বৈদিক সাহিত্য নিয়ে য়ুরোপে ও আমেরিকায় ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে বহু গবেষণা হয়েছে। সে আলোচনার ক্ষেত্র এ গ্রন্থ নয়।

আজকাল শিক্ষিত লোকের মধ্যে বেদকে অভ্রান্ত, অপৌরুষেয় বা revealed বলে বিশ্বাসের আন্তরিকতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

রামমোহনের রচনার মধ্যে বেদ-বেদান্ত অভ্রান্ত, অপৌরুষেয়, ইত্যাদি মত কোথাও পাওয়া যায় না। কট্টর অদ্বৈতবাদীরা তো পাকা সন্ন্যাসী, মায়াবাদী— জগৎ মিথ্যা অনিত্য বলে ঘোষণা করেন ; তাঁদের পক্ষে একটা বিশেষ গ্রন্থকে নিত্য বলে স্বীকার করা কী করে যুক্তিযুক্ত হয়? রামমোহন নিজেকে বেদান্তবিশ্বাসী ও অদ্বৈতবাদী বলেই মনে করতেন এবং সেই ভাবেই মতামত ব্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু কর্মকে অবজ্ঞা করে তুরীয় ভাবেও তিনি থাকতেন না এবং সেভাবে উপদেশও করতেন না। সেখানে তিনি গীতাবাদী— কর্ম করলেই কর্মের বন্ধন শিথিল হয়, এ বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় ছিল— তিনি escapist হন নি একেবারেই।

সে যুগের লোকে রামমোহনকে 'বৈদান্তিক' বলে মনেই করত না। কারণ সর্ববিধ ভেদজ্ঞান লোপ হওয়াটাই নাকি বৈদান্তিকের চিহ্ন! রামমোহনের ধর্মমত বেদান্ত বা অদ্বৈতবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই অদ্বৈতবোধে 'ব্রহ্মোপাসনা' অবাস্তব আচরণ নয় ; তিনি বিশ্বাস করতেন আধ্যাত্মিক জীবনে ধ্যান তথা উপাসনা সাধনসাপেক্ষ এবং তার প্রয়োজনও আছে।

রামমোহনের বিলাত-যাত্রার পর (১৮৩০) ব্রাহ্মসমাজের ভার কার্যত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপর গিয়ে পড়ে। তাঁর হাতে পড়ে রামমোহনের 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম' আর সার্বভৌমিক বা বিশ্বজনীন রইল না, কালে তা 'বেদান্তধর্মে'ই পরিণত হল। বিদ্যাবাগীশ প্রচার করতেন বেদ অপৌরুষেয়, অতএব নিত্য এবং অভ্রান্ত ; আর বলতেন, বেদান্ত অনুসরণ করে পরমাত্মা এবং জীবাত্মার অভেদ-চিন্তনই মুখ্য উপাসনা। রামমোহনের সমসাময়িক শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ বেদান্তকে অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করতেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের রচিত ব্রহ্মসংগীতে আছে—

অভ্রান্ত বেদান্ত সান্ত, কহে না পাইয়া অন্ত—
'এ নহে,' 'এ নহে', হয় এই নিরূপণ।

কাশীনাথ রায় লেখেন—

ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল, ভাবিয়ে না পায় স্থল,
অভ্রান্ত বেদান্ত অন্ত না জানে তাহার ;
মীমাংসা সংশয়াপন্ন হয়ে করে তন্ন তন্ন,
বাক্য মনোনীত তিনি সকল-কারণ।

রামমোহনের মৃত্যুর দশ বছর পরে ১৮৪৩ সালে যখন দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বিশজন বন্ধু নিয়ে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন ও সমাজের মধ্যে নবপ্রাণ সঞ্চারিত করবার জন্যে চেষ্টান্বিত হলেন, তখন বেদান্ত-বিরোধীদের দৃষ্টি আবার এই সমাজের প্রতি নিবদ্ধ হয়েছিল। হিন্দু সমাজের কথা বাদ দিলাম, কারণ সেখান থেকে যে ধরণের প্রতিরোধ আসছিল তা কখনও যুক্তি-আশ্রয়ী হয় নি— হত শাস্ত্র-আশ্রয়ী পরম্পরাগত মতের পুনরাবৃত্তি মাত্র। আসল আক্রমণ এল খ্রীষ্টান পাদরি ডাফ্-এর কাছ থেকে, পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের খ্রীষ্টধর্মানুরাগী পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনের লেখনী থেকে; এ-সবই ইংরেজিতে লিখিত হয়েছিল। বাংলায় প্রতিবাদ এল হিন্দু কলেজের এককালীন কৃতী ছাত্রদের প্রকাশিত 'জগদ্বন্ধু' পত্রিকা থেকে। সীতানাথ ঘোষ,[১] ব্রজলাল কারফরমা, উমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি সুশিক্ষিত যুবকদের চেষ্টায় ১৮৪৬ অব্দে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের তর্কযুদ্ধ হয়। এই পত্রিকা বলেন, বেদ অভ্রান্ত ধর্মশাস্ত্র হতে পারে না। দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্তকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (যা ১৮৪৩ অব্দের অগস্ট মাস থেকে বের হচ্ছে) এই কথার প্রতিবাদ করতে বললেন, কিন্তু অক্ষয়কুমার তাতে রাজী হলেন না। অক্ষয়কুমারের বিচারবুদ্ধিতে বেদ অভ্রান্ত হতে পারে না, অপৌরুষেয় তো নয়ই। দেবেন্দ্রনাথ বেদ-বেদান্ত সম্বন্ধে চিরাচরিত মতই পোষণ করতেন; ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হেতু পরম্পরাগত বিশ্বাসের বশীভূত হয়েই ভাবতেন, বেদবাক্য মান্য ও প্রামাণিক। ইংরেজিতে যে তর্ক চলছিল তাতে তিনি বেদান্তকে revelation বা ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ বলে দাবি করেন। "'জগদ্বন্ধু' পত্রিকার সহিত বাদানুবাদের ফলে দেবেন্দ্রনাথ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া স্বয়ং কাশীধামে যাইয়া বেদবেদান্ত আলোচনা করিয়া আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশকে লইয়া প্রত্যাগত হইলেন। এই আলোচনার ফলে এই বৎসরের প্রথমেই ব্রাহ্মসমাজ বেদের অভ্রান্ততা ও নিত্যতায় বিশ্বাস হইতে মুক্ত হইলেন। তাই ১৭৬৯ শকের বৈশাখ [এপ্রিল ১৮৪৭] মাসের

---

১ রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে ইনি ভ্রমক্রমে সীতানাথ দত্ত লিখতি হয়েছেন। দ্র. জীবনস্মৃতি গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ১৬৩।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র শিরোদেশে সেই সুপ্রসিদ্ধ [মুণ্ডক] উপনিষৎ-মন্ত্র শোভিত দেখিতে পাই—'অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরায়া তদক্ষয়মধিগম্যতে।'

"এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে কি দুর্দ্ধর্ষ মানসিক বলের পরিচয়, তাহা আমরা এখন কল্পনাতেও আনিতে পারি না।··· এই স্বাধীনতা ভাগীরথী আনয়ন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ যে অক্ষয়কুমারের নিকটে সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি কখনও অস্বীকার করিতেন না।"[১]

বেদ অপৌরুষেয় নয়, বেদ অভ্রান্ত নয়, এই তত্ত্ব উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঘোষিত হল, এবং বাংলার নবজন্মের সেই প্রথম স্পন্দন—সে স্পন্দনের যে নামই দেওয়া হোক— নবজাগরণ, নবজন্ম, রেনাসাঁ, বা আপনাকে পাওয়া ও জানা।

আর্যরা যে বেদকে তাঁদের ধর্মগ্রন্থ বলে মনে করতেন তা অনার্য বা শূদ্রদের পক্ষে পাঠ নিষিদ্ধ, এমন-কি শোনাও পাপ। আদর্শচরিত্র রামচন্দ্র শূদ্র শম্বুকের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন যখন ব্রাহ্মণরা এসে অভিযোগ করল যে শূদ্র হয়ে লোকটা বেদপাঠের স্পর্ধা রাখে। ঘটনাটি সত্য কি না জানি না; হতে পারে রামচন্দ্রের দেবদ্বিজে ভক্তির উৎকর্ষ প্রমাণের জন্য কাহিনীটি সৃষ্ট হয়েছিল। মনুসংহিতার মধ্যে কোনো উৎসাহী বেদবাদী ব্রাহ্মণ একটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করেন— বেদ যে শূদ্রে শুনবে তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দিতে হবে। জীব শিবের শ্রেষ্ঠ আদর্শ! বেদান্তসূত্রকার এবং ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য কিভাবে শূদ্রের বিদ্যাচর্চার বিরোধিতা করেছিলেন তার কথায় আমরা পরে আসব। মোট কথা, শূদ্র ও জনতাকে যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বর দেখিয়ে অভিভূত করাই ছিল মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণের stock-in-trade। আজকালকার protocol-পাগল রাষ্ট্রকর্মচারীদের অপব্যয় ও হাস্যকর ceremonies-এর সঙ্গে তুলনা হতে পারে ঐ-সব যাগযজ্ঞের। এক-একটা বৈদিক যজ্ঞে কত পুরোহিত লাগত! প্রত্যেকের পৃথক নাম,

১ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৯: অপিচ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, সংযোজন, পৃ. ৩৭৭-৭৮।

পৃথক কর্তব্য— hierarchy of priests -এর তালিকা দেখলে অবাক হয়ে ভাবি, মুষ্টিমেয়ের ধার্মিকতার আড়ম্বরকে পোষণ করবার জন্যে জনতাকে কী বিপুল মহার্ঘ রসদ যোগাতে হত! শুধু ব্রাহ্মণের বারো মাসে তেরো পার্বণ তো ছিল না, ক্ষত্রিয় রাজারাও যাগযজ্ঞ করবার জন্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন— রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতির জাঁক-জমক ও অপব্যয় দরদী মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছিল। Church ও State সমভাবে পেষণ ও শোষণ করত জনতাকে, ধর্মের নামে, পরলোকে সুখ-সম্ভোগের ভরসা দিয়ে, লোকস্থিতির দোহাই পেড়ে। যখন আমরা কোনো বইয়ে পড়ি যে বিশেষ এক ধর্মের পুরোহিত গ্রামের নিরক্ষর বিধবার কাছে গিয়ে বলে যে তার স্বামী নরকাগ্নিতে দাঁড়াতে পারছে না, তার পা পুড়ে যাচ্ছে, তার জন্যে জুতো পাঠাতে হবে— তখন আমরা বিদ্রূপ করি। কিন্তু হিন্দুদের শ্রাদ্ধের সময়ে যে কাণ্ডটা হয় তার কী নাম দেওয়া যাবে?

যাগযজ্ঞের বাহুল্য নিয়ে কালে প্রতিবাদ শুরু হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় মৃদুভাবে তার নিন্দাও করেন— জোর গলায় প্রতিবাদ করতে পারেন নি কেন সে আলোচনায় পরে আসছি। প্রথম বিদ্রোহী হলেন গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর জিন ও আরও অনেকে।

বেদের rituals বা যাগযজ্ঞ কালক্রমে এমন জটিল হয়ে ওঠে যে সে-সবের খুঁটিনাটি মনে রাখা শক্ত হয়ে উঠল যজ্ঞকর্তাদের। জীবিকার দিক থেকে এই-সব পেশা সকল ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিতেও আর পারছে না। তা না হলে ব্রাহ্মণের ছেলে দ্রোণকে জীবিকার জন্য শাস্ত্র ছেড়ে শস্ত্র চর্চা করতে হবে কেন? মোট কথা, বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপের জটিলতা হেতু সে-সব জানা ও চর্চা করা সকল ব্রাহ্মণের পক্ষে সম্ভব হত না। যাই হোক, কালে ঐ-সব বিস্তারিত পদ্ধতির বর্ণনা ও ব্যাখ্যান লিখিত হতে থাকলে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সুবিধা হল।

এই-সব গ্রন্থ অধিকাংশই সংস্কৃত গদ্যে লিখিত, এই গ্রন্থপুঞ্জকে বলে 'ব্রাহ্মণ'। এই ব্রাহ্মণ শব্দের সঙ্গে বর্ণগত ব্রাহ্মণের কোনো সম্বন্ধ নেই। বেদের প্রাচীনতম স্তোত্র ও মন্ত্রগুলিকে দেবতাদের মতোই অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন মনে করে তাদের নাম দেওয়া হয় 'ব্রহ্ম,' সেই মন্ত্র বা ব্রহ্মের ব্যাখ্যানের নাম হয় 'ব্রাহ্মণ'। "ঋগ্‌বেদী, যজুর্বেদী এবং সামবেদী এই

তিন শ্রেণীর ঋত্বিকের কর্মপরিদর্শনার্থ একজন প্রধান ঋত্বিক থাকিতেন, তাঁহার নাম 'ব্রহ্ম'। ব্রহ্মবাক্যের তাৎপর্য যাহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বেদের এই অংশের নাম 'ব্রাহ্মণ'। যাঁহারা ব্রহ্মবাক্যের তাৎপর্য বুঝাইতেন তাঁহারা ব্রহ্মবাদী। বেদপন্থী সমাজে যে বর্ণের উপর এই ব্রহ্মবাক্য রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল, সেই বর্ণের নামও ব্রাহ্মণ।"[১]

দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দগুলিও পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমার মনে হয়, এখানে ব্রহ্ম ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ একটু পরিষ্কার করে বললে ভালো হয়। 'ব্রহ্মণ' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ; এর ধাতুগত অর্থ বৃন্হ, যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ব্রহ্মাণ্ডকে বলা যেতে পারে expanding universe, আধুনিকতম ভাষায় বলব expanding multiverse— অনন্ত আকাশে বহু-বিশ্বের অস্তিত্ব মানুষের উপলব্ধি হচ্ছে। এই বৃন্হ— ব্রহ্মই— মননের ও ধ্যানের বিষয়। 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই— কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।' অদ্বৈতবাদীরা এই 'ব্রহ্মণ'-এর কথাই বলেছেন। 'বেদান্ত গ্রন্থ' আলোচনা-কালে এই 'ব্রহ্মণ'-এর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হবে।

'ব্রহ্মা' শব্দের উৎপত্তি সম্পূর্ণ পৃথক বলেই মনে হয়। প্রশ্ন উপনিষদে ঋষি পিপ্পলাদ সত্যকামকে যা বলেছিলেন তা শোনবার মতো: "সত্যকাম, এই যে ওঁকার, ইহাই পর ও অপর [নির্গুণ ও সগুণ] ব্রহ্ম। এই উপায় দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি এই দুয়ের একেকে প্রাপ্ত হন।" দুটি শব্দ লক্ষণীয়, 'পর' ব্রহ্ম ও 'অপর' ব্রহ্ম। অপর-ব্রহ্ম সগুণ, ইনিই হিরণ্যগর্ভ,[২] প্রাণ, বিরাট, ব্রহ্মা ইত্যাদি। এই অপর-ব্রহ্ম বিনশ্বর, কল্পস্থায়ী, সৃষ্টিকর্তা, পুরাণের পিতামহ। এই অপর-ব্রহ্ম নিকৃষ্ট ব্রহ্ম; আর পরব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম।

---

১ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যজ্ঞকথা, পৃ. ১৭-১৮।

২ অপর-ব্রহ্মকে হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি প্রভৃতি নামকরণ করতে দেখি উপনিষদে; শব্দগুলি নিরর্থক নয়। হিরণ্যগর্ভর অর্থ— প্রকৃতির মধ্যে বহু সুপ্ত শক্তি ও ঐশ্বর্য রয়েছে, সেগুলির দ্বারা নির্গুণ-ব্রহ্ম কোনোভাবে প্রভাবান্বিত হন না; অথচ সেই সব 'ভগ' বা ঐশ্বর্য ব্রহ্মের মধ্যে রয়েছে, তিনি ভগবান। বৈজ্ঞানিকভাবেও শব্দটি নিরর্থক নয়। সমস্ত পার্থিব খনিজ ধাতু তেজস্ক্রিয় পদার্থ— হিরণ্যগর্ভ-ভুক্ত। সেই-সব শক্তি released হয় অর্থাৎ গর্ভ থেকে নির্গত হয়। প্রজাপতি শব্দ যাবতীয় জৈব সৃষ্টির দ্যোতক। অপর-ব্রহ্মের এই সৃজ্যমান জগৎ বা জীবলোককে 'প্রজা' বলা হয়েছে— যারা বংশপরম্পরায় জন্মে চলেছে সেই প্রজননশীল জীবলোকের পতিই 'প্রজাপতি'। স্বয়ম্ভু অব্যয় অক্ষর অজ বিরাট প্রভৃতি শব্দ বিশেষণ বা গুণ-বাচক।

এই অপর-ব্রহ্ম হিন্দু ত্রিত্ববাদের প্রথম। পুরাণ-মতে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালন-কর্তা ও শিব সংহার-কর্তা রূপে কল্পিত হয়েছে। ব্রহ্মা প্রজাপতি (তুলনীয় : *L. progenies*, progeny)— অর্থাৎ প্র+জন্, যারা জন্মগ্রহণ করছে, তাদের ঈশ্বর।[১] কালে 'প্রজাপতি' কিভাবে butterfly রূপ গ্রহণ ক'রে বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রের শোভা হল বলতে পারি নে।

পৌরাণিকযুগে যখন ধর্ম ও সমাজে নারীশক্তির আবির্ভাব হল, তখন থেকে এই ত্রিমূর্তির প্রত্যেকের সঙ্গে একটি করে শক্তি যুক্ত করে দেওয়া হয়। প্রাক্-আর্যদের কোনো কোনো শাখার মধ্যে matriarchy বা মাতৃ-কেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ছিল এবং তার থেকে বিশ্বের মূলাধার নারীশক্তির ভাবনা উদ্‌ভূত হয়। সেইজন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের শক্তিরা হলেন সরস্বতী লক্ষ্মী ও দুর্গা। ব্রহ্মা দেবতাদের অন্যতম— ইনিই অপর-ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মা অগ্নির দেবতা— বৈদিক ধর্মের মধ্যে অগ্নির স্থান সুপরিচিত— বেদের প্রথম সূক্ত আরম্ভ হয়েছে অগ্নিমন্ত্র দিয়ে।

'অগ্নি' অর্থে 'ব্রহ্মা'র লাতিন রূপ flamma [ফ্লাম্‌ম = ব্রাম্‌ম], ইংরেজিতে flame। তবে এই পাশ্চাত্যমত সমর্থন করবেন না প্রাচীনপন্থীরা।

ড. কুনহনরাজ লিখেছেন, "বেদের দেবতাদের ব্যক্তিত্ব খুবই কম এবং তাঁহারা স্পষ্ট আকারও ধারণ করেন নাই। কিন্তু পরবর্তী হিন্দুচিন্তাধারায় ঈশ্বরের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহার আকার আরও স্পষ্ট হইয়াছে এবং বিভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও কার্যাবলী নির্দিষ্ট হইয়াছে। জগৎ-সৃষ্টির কর্তৃত্ব ব্রহ্মার উপর অর্পিত হইয়াছে, কিন্তু জগৎ-স্রষ্টার ধারণাটি অস্পষ্ট এবং সূক্ষ্ম বলিয়া ধর্মে ইহার মাহাত্ম্য কমিয়া আসিল। অবশ্য

---

১ 'ঈশ্বর' শব্দ বলতে বিশ্বের বিচিত্র শক্তিভূত সত্তাকে বোঝায়। জল বায়ু মেঘ বিদ্যুৎ এবং অসংখ্য ওষধি বনস্পতি ও অগণিত প্রাণীর মধ্যে যে পৃথক পৃথক শক্তি নিজ নিজ ধারায় প্রবাহিত— তাদের সবকেই 'ঈশ্বর' বলা যায়। প্রত্যেক species-এর মধ্যে পৃথক পৃথক vital force কাজ করে চলেছে যুগযুগান্তর থেকে। শঙ্করাচার্য 'ঈশ্বর' শব্দের অর্থ করেছেন, 'নিয়মকারী'; প্রত্যেক পদার্থ— জড় বা জৈব— যা নিজ নিজ নিয়মে চলছে। এই অসংখ্য 'ঈশ্বর' বা শক্তিকে [ঈশ্, ঈশ, ঈশান, ঐশ্বর্য] যে মহাশক্তি চালনা করছে বলে লোকবিশ্বাস বা অনুভূতি তাকে বলা হয় 'পরমেশ্বর'। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বিখ্যাত শ্রুতি (৬।৭) 'তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং— সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর— স্মরণীয়। 'ঈশ্বর' শব্দের বহুবচনের দ্বারাই আমার যুক্তি সমর্থিত হচ্ছে বলে অনুমান করে নিতে পারি। তবে 'ঈশ্বর' শব্দ সাধারণত পরমেশ্বর অর্থেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

পৌরাণিক কাহিনীতে ব্রহ্মার স্থান রহিয়া গেল। পক্ষান্তরে শিব ও বিষ্ণুর ধারণা ক্রমশ স্পষ্ট মূর্ত এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হওয়ার ফলে ইঁহারা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন।"[১]

অখণ্ড ভারতে কত সহস্র তীর্থস্থান ও কত লক্ষ মন্দির আছে, তার সঠিক সংখ্যা দেওয়া কঠিন। সবই বিষ্ণু ও শিব এবং তাঁদের শক্তি ও সন্তানদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ব্রহ্মার মন্দির আছে একটি— পুষ্করতীর্থে— বালিয়াড়ি পার হয়ে যেতে হয়। এ মন্দিরে 'ব্রহ্মণ' -এর পূজা হয় না, 'ব্রহ্মা'র পূজা হয়। আধুনিক যুগে রামমোহন 'ব্রহ্ম'র উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং তদবধি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত লোকে এই নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন। শব্দকল্পদ্রুম কোষগ্রন্থে পুংলিঙ্গ ব্রহ্মা শব্দের ৫৮টি প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। এর মধ্যে অমরকোষ রচনার সময়ে ২০টি সংজ্ঞা ছিল ব্রহ্মার ; শব্দরত্নাবলীতে আরো ৩৩টি এবং অন্যান্য গ্রন্থে আরো ৫টি আছে। ব্রহ্মার বিবর্তন হতে হতে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্রহ্মা হলেন "গোলোকে দ্বিভুজোঽহং গোপীভিঃ সহ রাধয়া।"

---

১ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯।

অষ্টম অধ্যায়

আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি, বৈদিক যাগযজ্ঞ কিভাবে করতে হয়, কেন করতে হয়, কখন করতে হয়, ইত্যাদি। কালান্তরে যজ্ঞীয় নানা বিষয় সম্বন্ধে পুরোহিত ও যজমানের স্পষ্ট জ্ঞান ঝাপসা হয়ে আসে। 'নানা মুনির নানা মত' দেখা দেয় এক-একটি সমস্যা সম্পর্কে— যেমন একটা বিষয় নিয়ে আদালতের জজদের নানা মতের অরণ্যে দিশাহারা হন উকিল-ব্যারিস্টাররা! তেমনি যাগযজ্ঞের দশা। প্রয়োজনের তাগিদে 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থগুলি একে একে রচিত হয়— এগুলোকে বলা যেতে পারে পুরোহিত-দর্পণ বা handbook, catechism। 'ব্রাহ্মণ'গুলি বেশির ভাগ গদ্যে লেখা। এই ব্রাহ্মণের কোনো কোনো অংশকে বলে 'আরণ্যক'। 'ব্রাহ্মণ'সমূহে আবার অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত বিধি-নির্দেশ আছে, 'আরণ্যক'এ ক্রিয়াকাণ্ডের রূপকাকারে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং এমন কতকগুলি ধ্যানের বিধি আছে যাতে উপনিষদের তত্ত্ববিচারের সূচনা পাওয়া যায়। উপনিষদগুলি বেশির ভাগ 'ব্রাহ্মণ'এর শেষাংশ এবং কখনো-বা 'আরণ্যক'-এর অন্তর্গত।

আরণ্যক থেকে তপোবনের কল্পনা জাগে কবি-সাহিত্যিকদের মনে— প্রাচীনকালে কালিদাস ও আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ তপোবনকে romantic বা স্বপ্নের স্বর্গ করে তুলেছেন। 'তপোবন' প্রবন্ধের একস্থলে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"অরণ্যের নির্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করে নি, বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে, সেই অরণ্য-বাস-নিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় নি।"[১]

বাস্তবের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, অরণ্যের আশ্রমে বা তপোবনে ঋষিরা বাস করতেন সপরিবারে, এখানে তাঁদের কাছে আর্যধর্ম বা বৈদিক বিদ্যা আহরণ করবার জন্য ছাত্ররা আসত— 'বেদ' শুনে শুনে

---

১ শিক্ষা।

মুখস্থ করত। এই বেদের অর্থ বুঝবার জন্য তার ভাষা, ব্যাকরণ, ছন্দ ইত্যাদি চর্চা করতে হত। আজকালকার বিদ্যালয়ে বা কলেজে ছাত্ররা ভর্তি হলে তাদের uniform badge ধারণ করতে হয়। তেমনি সে-যুগে চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, উপনয়ন, অর্থাৎ মাথা কামানো, কানফোঁড়া, গলায় উপবীত ধারণ, ইত্যাদি করতে হত। যজ্ঞের অধিকারভেদে যজ্ঞসূত্রের দৈর্ঘ্য-হ্রস্বতা হত ; উপবীত বা যজ্ঞসূত্র, শিখা, প্রভৃতি দেখে বোঝা যেত ছাত্র কোন্ কোন্ বেদ অধ্যয়ন করেছে বা কোন্ সম্প্রদায় বা স্কুলের শিষ্য। যজ্ঞসূত্র নাম থেকেই বোঝা যায়, যজ্ঞের সময় সূত্র ধারণ করা হত, সব সময়ের জন্য নয়।

গুরুর 'আশ্রমে' শিষ্যদের 'শ্রম' করে থাকতে হত ; বেতন দিয়ে, হস্টেলে থেকে অধ্যয়নরীতি তখন অজ্ঞাত। এইসব আশ্রমে 'উপনীত' হয়ে ছাত্ররা গুরুর কাছ হতে ব্রহ্মবিদ্যা আহরণ করত। এই ব্রহ্মবিদ্যার একাংশ কর্মকাণ্ড, অপরাংশ জ্ঞানকাণ্ড। যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান 'কর্মকাণ্ড' নামেই পরিচিত, আর 'জ্ঞানকাণ্ড' বিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা। প্রথমটি অপরা ও দ্বিতীয়টি পরাবিদ্যা। কর্মকাণ্ডের একাংশ সত্যই কর্ম ছিল. অর্থাৎ যজ্ঞের সমিধ আহরণ ছাড়া রন্ধনের কাষ্ঠসংগ্রহ, গোপালন, ক্ষেতের আইল বাঁধা, কুশ সংগ্রহ করে বসবার ও শোবার জন্য আসন বোনা, প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কর্ম আশ্রমে করতেই হত। সবই যজ্ঞ। অসংখ্য যাগযজ্ঞ হত যজমানের ঘরে—সেখানে গুরু সশিষ্য উপস্থিত হতেন ; শিষ্যরা যাগযজ্ঞের কাজে গুরুকে সহায়তা করত, এতে তাদের হাতে-কলমে কাজ শেখা হত। যজ্ঞশেষে প্রাপ্যসামগ্রী আনতে হত শিষ্যদেরই বহন করে। দানে পাওয়া গোরু তাড়িয়ে আনতে হত আশ্রমে।

'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থ বলতে কী বোঝায় তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। ইতিপূর্বে বলেছি, প্রত্যেক বেদের জন্য পৃথক ব্যাখ্যান-গ্রন্থ বা 'ব্রাহ্মণ' রচিত হয়েছিল। এখন আমরা পৃথক পৃথক বেদের সংশ্লিষ্ট 'ব্রাহ্মণ'এর আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। 'ব্রাহ্মণ' সম্বন্ধে কেন এত বিশদ আলোচনা করছি, তা এখনই স্পষ্ট হবে।

ঋগ্‌বেদের দুখানি 'ব্রাহ্মণ'—ঐতরেয় ও কৌশতকী। আর-একটা শাখার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু পুঁথি এখনও পর্যন্ত অপ্রাপ্ত। ঐতরেয়

ব্রাহ্মণের আর-একটি নাম বহ্বৃচ্ ব্রাহ্মণ—বিরাট গ্রন্থ। এর বাংলা অনুবাদ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বহুকাল আগে। বইটার পাতা উল্‌টে পাল্‌টে দেখলেই বোঝা যাবে, যে-কালে ঐ ব্রাহ্মণ সংস্কৃতে রচিত হয়েছিল, তার থেকে আমাদের কাল কতদূরে এসে গিয়েছে!

ভাঙা দেউল নিয়ে কাব্য লেখা চলে, কিন্তু সেই দেবতাহীন জীর্ণ মন্দিরে মানুষ এক রাত্রের জন্য নিরাপদে থাকতে পারে না। অতীতকাল সম্বন্ধে রোমান্টিক রচনা লিখতে পারি, কিন্তু তাকে ফিরিয়ে এনে তার মধ্যে আর বাস করতে পারা যাবে না। বৈদিক যাগযজ্ঞ অচলিত (obsolete) হয়ে গিয়েছে—তর্কের খাতিরে তাদের টিকিয়ে রাখা যাবে, বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করা আর যাবে না।

আমরা ব্রাহ্মণ-আরণ্যক সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের আরণ্যক-অন্তর্গত ঐতরেয় উপনিষদ—বেদান্তের অন্যতম গ্রন্থ। উপনিষদ-আলোচনা-কালে পুনরায় এ বিষয়ে আমাদের ফিরে আসতে হবে।

সায়নাচার্য পনেরো শতকে ঋগ্‌বেদ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্য লিখে-ছিলেন, আর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে শঙ্করাচার্য ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন। এই 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের রচয়িতা ঐতরেয় মহীদাস, খুব সম্ভব নিম্নশ্রেণীর নারীর সন্তান—ইতরের পুত্র থেকে ঐতরেয়।[১]

ঋগ্‌বেদের পরেই যজুর্বেদ। ঋগ্‌বেদের অনেকগুলি সূক্ত, যা যজ্ঞে ব্যবহারের উপযোগী, তা আমরা যজুর্বেদের মধ্যে পাই। তবে উভয় বেদের পাঠের মধ্যে (text) কিছুটা বদল কোনো কোনো স্থানে দেখা যায়। তবে এ পরিবর্তন যজুর্বেদের বেদব্যাস করেছিলেন, না ঋগ্‌-বেদের বেদব্যাস ঘটিয়েছিলেন—তার হদিশ কেউ দিতে পারবে না। যজুর্বেদ যাগযজ্ঞপূর্ণ, তাই পুরোহিতরা এইসব মন্ত্রগুলিকে খুব ভালো করে আয়ত্ত করতেন, ব্যবহারিকতার দিক থেকে নির্ভুলভাবে পেশ করবার জন্য। তবে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক তুরীয়তা থেকে যজ্ঞাদি নিষ্পন্ন হত, এ কথা

---

১ ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতের সংস্কৃতি : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৩, ১৩৫০। পৃ. ১২-১৩।

বিশ্বাস করবার কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত; কারণ যাগযজ্ঞের জন্য যজমানের কাছ থেকে, ঠিক আজকালকার মতোই, মোটা দক্ষিণা আদায় করতেন—আহার্য, বস্ত্র, গোধন। দক্ষিণার দান নিয়ে দলাদলি ও সোনা-দিয়ে-শিং-বাঁধানো গাভীর অধিকার নিয়ে দড়ি ধরে টানাটানিও হয়ে থাকবে—বিষ্ণু ও বায়ু পুরাণের গল্প থেকে এসব পরিস্থিতির আন্দাজ করতে পারা যায়। মনে হয় দলাদলি থেকেই যজুর্বেদের দুটো দল হয়ে যায়—শুক্ল ও কৃষ্ণ— যেমনটি হয় বৌদ্ধদের মধ্যে। প্রবল পক্ষ বা নবীন দল বললে, তাদের 'যান' বা পথ মহাসংঘর (majority) সমর্থন পাচ্ছে—তাদের পথই 'মহাযান'। অপর পক্ষে আছেন পুরাতনপন্থী 'স্থবির'রা— কোণঠাসা করে নবীনরা তাদের নাম দিল 'হীনযান'। অবশ্য স্থবির অর্থাৎ বৃদ্ধের দল নিজেদের কখনও হীনযানীয় বলতেন না, কিন্তু কালে তারা স্থবির বা থেরো নামে পরিচিত থাকলেন। যজুর্বেদের দলাদলির মধ্যে প্রবল পক্ষ 'শুক্ল' ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল পক্ষ 'কৃষ্ণ' নামে পরিচিত হয়ে থাকবে। কৃষ্ণ-যজুর্বেদকে তৈত্তিরীয় বলত— বেদপণ্ডিত যাস্কের তিত্তিরী নামে এক শিষ্যের নাম থেকে। আর বাজসনেয়ী বা শুক্ল-যজুর্বেদ নাম হয় বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য থেকে। যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম দিকে (কৃষ্ণ) যজুর্বেদীয় বৈশম্পায়নের শিষ্য ছিলেন। পরে বোধহয় গুরুর সঙ্গে মতভেদ হয় এবং ginger group-এর নেতা গুরু উদ্দালক-আরুণির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই নূতন দল 'শুক্ল' নামে পরিচিত হয়, অথবা লোকে তাদের এই নাম দেয়। (আধুনিক কালের একটা উদাহরণ মনে পড়ছে— সাঁওতালদের মধ্যে একদল মাংস খাওয়া ছেড়ে, মাথায় শিখা রেখে ও নানা সদাচার পালন করে, নাম নিয়েছে 'সাফাহোড়' বা পবিত্র মানুষ)।

অপর যজুর্বেদীয় দলের মন্ত্র ও মন্ত্রের ব্যাখ্যা বা ব্রাহ্মণ এমন মিশিয়ে যজ্ঞের সময় ব্যবহৃত হত যে, কোন্‌টা মন্ত্র ও কোন্‌টুকু ব্যাখ্যান তা স্পষ্ট বোঝা যেত না। এই অস্পষ্টতার জন্য তাদের নাম হয় 'কৃষ্ণ' বা অস্পষ্ট। এইভাবে দুটো সম্প্রদায় বা school একই বেদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। দুটো নাম কেন হল তা নিয়ে কি প্রাচীনকালের পণ্ডিত, কি আধুনিক কালের দেশী-বিদেশী অধ্যাপকমণ্ডলী, সকলেই অনেক গবেষণা করেছেন। বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য বলেন যে, পুরোহিতদের কাজে-কর্মে

এলোমেলো নির্দেশ থাকাতে তাদের বুদ্ধি হয়ে যায় কৃষ্ণবর্ণ। তিত্তিরপক্ষীর গায়ের ছিট্‌ফিটে দাগের মতো এলোমেলো করে গ্রন্থ সাজানো বলে হয়তো প্রতিপক্ষীয়রা ঐ নাম দিয়ে থাকবেন। বলা বাহুল্য, এই সবই কল্পনা; আসলে দলাদলি থেকেই দুটো পৃথক ধারার উৎপত্তি।

যাজ্ঞবল্ক্য বিরোধীদলের পক্ষ গ্রহণ করায় শুক্লপক্ষীয় দল শক্তিশালী হয়ে ওঠে; তাঁর মতো মহাজ্ঞানী ও জবরদস্ত ঋষির আনুকূল্য লাভ করায় শুক্ল-যজুঃ বা বাজসনেয়রা ভাষ্যকারদের মধ্যেও সমাদর লাভ করেছে। শুক্ল-যজুঃর প্রশংসা সকলেই করে আসছেন; তাই দেখা যায় এই যজুঃর ১৫টি শাখা নানা দিকে পল্লবিত ও বিস্তারিত হয়ে পড়ে। এইসব শাখার মধ্যে মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব শাখাই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে। সায়নাচার্য কাণ্বশাখার পাঠ অবলম্বন করে ভাষ্য লেখেন প্রথম ২০ অধ্যায়ের, অর্থাৎ অর্ধেকটার। কৃষ্ণযজুঃর পক্ষেরও লোক ছিল, এবং তাদের ২৭টি শাখা ছড়িয়ে পড়ে। একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা শাখা গড়ে ওঠে স্বাভাবিক ভাবেই। আজও নানা মঠের মধ্যে ঐ ভেদনীতিই দেখা যায়।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদ সংহিতার সঙ্গে সঙ্গেই 'ব্রাহ্মণ' আছে মিশিয়ে ব্যাখ্যানরূপে। আবার পৃথক ব্রাহ্মণ, আরণ্যকও আছে। এই আরণ্যক-অন্তর্গত উপনিষদও আছে। সবারই নাম তৈত্তিরীয়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ৭-৯ প্রপাটক হচ্ছে তৈত্তিরীয় উপনিষদ। শেষ বা ১০ম প্রপাটকে নারায়ণী-উপনিষদ নামে এক সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ কিভাবে প্রবেশ করল জানা যায় না। এই শেষোক্ত উপনিষদের ভাষ্য লেখেন মাধবাচার্য আনন্দতীর্থ দ্বৈতভাব থেকে। শঙ্করাচার্য তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্য লিখেছিলেন অদ্বৈত-দৃষ্টিতেই। প্রস্থানত্রয়ের দ্বাদশ উপনিষদ -অন্তর্গত এ গ্রন্থ।

শুক্ল-যজুর্বেদের শেষ ভাগে আছে 'ঈশোপনিষদ'। এই উপনিষদের প্রথম শব্দ 'ঈশ' থেকে গ্রন্থের নাম হয়েছে। এই উপনিষদ সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থের নাম 'শতপথ'। যজুর্বেদের 'শুক্ল' বা "বাজ-সনেয় সংহিতার আবার অবান্তর কাণ্ব বা মাধ্যন্দিন নামক শাখা বা উপ-শাখাভেদে দুইখানি সংহিতা— কাণ্ব সংহিতা ও মাধ্যন্দিন সংহিতা। এই

উভয় সংহিতারই এক-একখানি পৃথক ব্রাহ্মণ আছে। কাণ্ব-সংহিতার ব্রাহ্মণের নাম কাণ্ব-শতপথ, এবং মাধ্যন্দিন সংহিতার ব্রাহ্মণের নাম মাধ্যন্দিন-শতপথ। এই উভয় শতপথ-ব্রাহ্মণের সাধারণ নাম 'বাজসনেয় ব্রাহ্মণ'।...

"বৈদিক সাহিত্যে আর যত ব্রাহ্মণ আছে তাহাদের সকলের অপেক্ষা শতপথ ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্ট এবং আকারেও শ্রেষ্ঠ। ইহাতে একশত পথ অর্থাৎ অধ্যায় [বা পাঠ] আছে বলিয়া ইহার নাম শতপথ।"

এই শতপথ ব্রাহ্মণ বাংলায় অনুবাদ করে বিধুশেখর শাস্ত্রী ভূমিকায় লিখেছিলেন, "এ গ্রন্থখানি যে সাধারণ পাঠকের হৃদয়াকর্ষক হইবে, তাহা আশা করা যায় না। নিতান্ত ধৈর্য না থাকিলে, মূল বা অনুবাদ হউক, এ জাতীয় গ্রন্থ সমগ্র অধ্যয়ন করিতে অনেকেই পারিবেন না! প্রাচীন যাগ-যজ্ঞের প্রণালী, প্রাচীন আচার ব্যবহার পদ্ধতি, ও প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রভৃতি জানিবার জন্য যাঁহারা বিশেষরূপে উৎসাহসম্পন্ন, তাঁহারা ভিন্ন কাহারো নিকটে ইহা ভাল লাগিবে বলিয়া মনে হয় না।"

বিধুশেখর শাস্ত্রী অর্ধশতাব্দীরও পূর্বে যে-কথা অত্যন্ত বাস্তববোধ থেকে লিখেছিলেন, তা বর্তমানে বহুগুণিত হয়ে সত্য হয়েছে; নিতান্ত academic interest ছাড়া এ-সব সাহিত্য এখন কেউ পড়বে না, এমনকি যাঁরা প্রাচীন সংস্কারের মধ্যে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত তাঁরাও এর চর্চা করবেন না, এবং তাঁদের ভাবী বংশধরগণ এ সবের ধারকিনারা দিয়েও যাবেন না। কালান্তরে এ-সবই অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

দুই 'শতপথ ব্রাহ্মণ' যে সর্বাংশে একই পুঁথি থেকে নকল করা হয়েছিল তা মনে হয় না। পাঠে ভেদ আছে। সে পার্থক্য হবার কারণও অবশ্য আছে; যে শিষ্য যতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, তিনি সেইটুকুই নিজ নিজ দেশে প্রচার করে শাখা স্থাপন করেছিলেন। সেইজন্য শতপথ ব্রাহ্মণের দুই শাখায় পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। মাধ্যন্দিন শাখার পাঠই বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন পণ্ডিত বিধুশেখর। এ গ্রন্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়;[১] এখন দুষ্প্রাপ্য, কারণ এ শ্রেণীর গ্রন্থে হিন্দুর আর আকর্ষণ নেই—কালান্তরে এদের মূল্য ও মান দুইই কমে

---

১ মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ, প্রথম খণ্ড। অনুবাদক শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য। সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাবলী, ২৮।

গিয়েছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, একমাত্র শতপথ ব্রাহ্মণে মহাপ্লাবনের কথা আমরা পাই, যা বাবিলনীয় সাহিত্যের মধ্যে সুপরিচিত। Deluge সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতরা।

কাণ্ব-শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে ১৭টি কাণ্ড; শেষ কাণ্ড হচ্ছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ। মাধ্যন্দিন শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ' সবটাই আছে; কিন্তু একত্র সন্নিবেশিত নয়, গ্রন্থ-মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো। দুই শাখার পাঠভেদ আছে। এই উপনিষদের নামেই সূচিত হচ্ছে যে এটি আরণ্যক-অন্তর্গত একখানি বৃহৎ গ্রন্থ।

উপনিষদ-সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণানুসারে আমরা উপনিষদ-গ্রন্থে ব্রহ্মজ্ঞানই অন্বেষণ করি। বৃহদারণ্যকে গভীর ব্রহ্মজ্ঞান আছে; কিন্তু ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বলে এর মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা শুদ্ধমাত্র যাগযজ্ঞাদির ব্যাখ্যা। তা ছাড়া এই উপনিষদ নানা ঋষির রচনা বলেও মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। রচয়িতাদের মধ্যে কেউকেউ গভীর চিন্তাশীল ছিলেন; তাঁরা যে-সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়ে গেছেন এই বিজ্ঞান-যুগেও সে-সবের বিচার নিঃশেষিত হয় নি।[১]

যজুর্বেদের অন্তর্গত যাগযজ্ঞ নিয়ে মতভেদ সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত চলে আসছে; এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সর্বধর্মে সর্বকালে ritual নিয়ে যথেষ্ট অশান্তি হয়েছে বিশ্বাসীদের মধ্যে। বর্তমানকালে যজ্ঞাদি নিয়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিরকমের দলাদলি ছিল, তার অতিবিস্তারিত বর্ণনা পাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে। পাঠকদের স্মরণ আছে, বেদ অভ্রান্ত, অপৌরুষেয়, ইত্যাদি ধারণা ধিক্কৃত করে যখন সাহেব খ্রীষ্টান ও শিক্ষিত বাঙালী যুবকরা দেবেন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন, তখন বেদ কী তা জানবার জন্য তাঁর খুব কৌতূহল হয়, বেদ অধ্যয়নের জন্য কাশীতে ছাত্র পাঠান এবং কিছুকাল পরে স্বয়ং সেখানে যান বেদচর্চা দেখবার জন্য। ১৮৪৭ অব্দে সেখানে দেবেন্দ্রনাথের যে অভিজ্ঞতা হয়, তাঁর নিজের ভাষায় তা উদ্ধৃত করছি :

"মানমন্দিরের প্রশস্ত গৃহ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহাদের

১ সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ, মুখবন্ধ।

সকলকে চারি পংক্তিতে বসাইলাম। ঋগ্বেদের এক পংক্তি, যজুর্ব্বেদের দুই পংক্তি, এবং অথর্ব্ববেদের এক পংক্তি। সামবেদী দুইটি মাত্র বালক; তাহা-দিগকে আমার পার্শ্বে বসাইলাম।...

"ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণেরা সকলে মিলিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে উৎসাহ সহকারে 'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং' পাঠ করিলেন।[১] তাহার পরে যজুর্ব্বেদীরা যজুর্ব্বেদ আরম্ভ করিলেন। যেই তাঁহারা 'ঈষে ত্বা উর্জ্জে ত্বা' পাঠ ধরিলেন, অমনি একজন ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'যজমান হম্‌কো অপমান কিয়া।' [যজমান অর্থে দেবেন্দ্রনাথ]। আমি বলিলাম, 'কিসের অপমান?' তিনি বলিলেন, 'কৃষ্ণযজু প্রাচীন যজু হ্যায়, ... উস্‌কা পাঠ আগে নহী হুয়া, হম্ লোগোঁকা অপমান হুয়া।' আমি বলিলাম, 'তোমরা আপসে এ বিষয়ে মিটমাট করিয়া লও।' এখন এই দুই দলে বিবাদ বাধিয়া গেল, কে আগে পড়িবে। আমি যখন দেখিলাম তাঁহাদের বিবাদ আর কোনমতে মিটে না, তখন আমি তাঁহাদের দুই দলকেই [কৃষ্ণ ও শুক্ল যজু] একত্র পড়িতে বলিলাম। এই কথায় তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া দুই দলেই উচ্চৈঃস্বরে গোলমালে পড়িতে লাগিলেন; কিছুই বুঝা যায় না।...

"একজন ব্রাহ্মণ আমাকে বলিলেন, 'আমাদের এখানে শীঘ্র একটা যজ্ঞ হইবে।'... আমি বলিলাম, 'আমি তো ইহারই জন্য এখানে আসিয়াছি।' তিনি বলিলেন, 'হম্‌লোগোঁকে যজ্ঞমে পশুবধ নহীঁ হোতা হ্যায়। পিঠালী মেঁ পশু নির্ম্মাণ কর্‌কে হম্‌লোগ্ যজ্ঞ করতে হ্যাঁয়।' আর দিক হইতে কতক-গুলি ব্রাহ্মণ উঠিলেন, 'জিস যজ্ঞমেঁ পশুবধ নহীঁ, ওহ যজ্ঞ ক্যা যজ্ঞ হ্যায়?

---

১ ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্রপাঠ কত রকমের— পদপাঠ, ক্রমপাঠ জটাপাঠ, ধনপাঠ। মুখস্থ করবার জন্য এই বিধির দৃষ্টান্তস্বরূপ ঋগ্‌বেদের প্রথম ঋক্‌টি নেওয়া যাক—

পদপাঠ— অগ্নিম্/ইলে/পুরোহিতম্/যজ্ঞস্য/দেবম্/ঋত্বিজম্।

ক্রমপাঠ— অগ্নিম্ ইলে/ইলে পুরোহিতম্/পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য/যজ্ঞস্য দেবম্/দেবম্ ঋত্বিজম্।

জটাপাঠ— অগ্নিম্ ইলে/ইলে অগ্নিম্/অগ্নিম্ ইলে পুরোহিতম্/পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য/যজ্ঞস্য পুরোহিতম্/পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য/যজ্ঞস্য দেবম্/দেবম্ যজ্ঞস্য/যজ্ঞস্য দেবম্/দেবম্ ঋত্বিজম্/ঋত্বিজম্ দেবম্/দেবম্ ঋত্বিজম্।

ধনপাঠ— অগ্নিম্ ইলে/ইলে অগ্নিম্/অগ্নিম্ ইলে পুরোহিতম্/পুরোহিতম্ ইলে অগ্নিম্/... ইত্যাদি।

এইভাবে বার বার বলে বলে তারা মুখস্থ করত; শ্রুতি— তাই শুনে শুনে আয়ত্ত করতে হত।

বেদমেঁ হ্যায় শ্বেতমালভেত, শ্বেত ছাগলকো বধ করেগা।' আমি দেখিলাম যজ্ঞেতেও দলাদলি আছে।"[১]

শতাব্দীপূর্বের বেদাধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞের যে দশা দেখতে পাওয়া গেল, তা পূর্বকালেরই প্রতিধ্বনি। বর্তমানে কী দাঁড়িয়েছে জানি নে।

•

সামবেদ-সংহিতায় দেড় হাজারের উপর সূক্ত, অধিকাংশই ঋগ্‌বেদ থেকে বাছাই। অর্থাৎ যেগুলি সুর দিয়ে গান করার মতো সেইগুলিকে সামবেদ সংহিতার অন্তর্গত করা হয়েছিল, অবশ্য নূতন গানও কিছু কিছু সংগৃহীত হয়। সামবেদের সূক্তগুলি ঋগ্‌বেদের ৮ম ও ৯ম মণ্ডল থেকে সংগৃহীত,[২] কিন্তু উভয়ের মধ্যে পাঠান্তর দেখা যায়। যজুর্বেদেও এরকম পাঠান্তর আছে বলে আমরা যে কথা সেখানে বলেছিলাম এখানেও তা প্রযোজ্য বলে মনে হয়— সামবেদের পাঠ প্রাচীন না ঋগ্‌বেদের ভাষা প্রাচীন।

মানুষের কণ্ঠে গান কতকাল থেকে উদ্‌গীত হচ্ছে তা কেউ বলতে পারে না। সে সুখে গান করেছে, দুঃখে গান করেছে, ব্যর্থ প্রেমে গান গেয়েছে, সার্থক প্রেমে গান রচেছে, কিছু চাইবার জন্যে দেবতার উদ্দেশ্যে গান করেছে, কিছু পেয়ে গান গেয়েছে, কিছুই না পেয়েও গান শুনিয়েছে।[৩] মানুষের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রকাশ সামবেদের মধ্যে সংহিত হয়েছে।

সামবেদের ব্রাহ্মণ ৮ খানা। এর মধ্যে তলবকার বা জৈমিনীয় শাখার ব্রাহ্মণের চতুর্থ অধ্যায় হচ্ছে তলবকার উপনিষদ— যা 'কেন উপনিষদ' নামে সর্বজনবিদিত। অপর উপনিষদ 'ছান্দোগ্য', মন্ত্র-ব্রাহ্মণ-এর শেষ আটটি প্রপাটক নিয়ে হয়েছে। সামবেদীয় আর-একটি উপনিষদের নাম 'বজ্রসূচী'।

---

১ দ্রষ্টব্য, আত্মজীবনী, পৃ. ৯০-৯৩।

২ সামবেদ-সংহিতায় ১৮১০টি ঋক্ আছে; এর মধ্যে ২৬১টি একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে বলে আসল সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৪৯; এই সংখ্যার মধ্যে মাত্র ৭২টি ছাড়া অবশিষ্ট ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত (Weber, *Indian Literature*)।

৩ সামবেদের অনেকগুলি গানের খণ্ড আছে: 'গ্রামগেয় গান', 'আরণ্যগেয় গান', 'উহ গান', 'উহ্য গান' প্রভৃতি। গান বর্তমানকালে স্বরলিপির মত, অর্থাৎ সামযোনি— ঋক্ মন্ত্রের সংগ্রহকে বলে আর্চিক, আর গান হল তার স্বরলিপি। দ্রষ্টব্য, অনির্বাণ, বেদমীমাংসা।

এই নামে যে এক পুস্তিকা রামমোহন বাংলাভাষায় অনুবাদ করেন, তা এই উপনিষদ নয়। আবার বৌদ্ধদের মধ্যে 'বজ্রস্থচী' নামে আর-একটি বই চলিত আছে— তাও পৃথক। 'বজ্রস্থচী' সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

অথর্ববেদ চতুর্থবেদ। কিন্তু মনু এবং আরও কেউ কেউ তিনটি মাত্র বেদের আভিজাত্য মেনে বেদকে বলেন 'ত্রয়ী' অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজুঃ। গীতায় 'ত্রয়ীধর্ম'[১] বলা হয়েছে। স্থতরাং অথর্বকে এক দল অপাংক্তেয় বেদ করে রেখেছিলেন। এই বেদের এক-পঞ্চমাংশ ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত।

অথর্ববেদে লোকসংস্কৃতির অনেক কিছুই পাই। আদিমযুগে মানুষের কতরকমের ভয়-ভাবনা ছিল, তার নমুনা পাই এই বেদ থেকে। এই-সব মন্ত্র, তুক্তাক্ পড়তে পড়তে বাবিলনীয়দের মন্ত্রের কথা মনে হয়। কিন্তু কয়লার মধ্যে হীরক থাকে, কর্কশ তুষের ভিতর থাকে স্থখাদ্য তণ্ডুল; সাধারণ মানুষের অতিতুচ্ছ কথার মধ্যে মাঝে মাঝে যে-সব বাণী শোনা যায় তাদের আবেদন এখনও শিক্ষিত sophisticatedদেরও মুগ্ধ করে। আজও আমরা এই-সব অচ্ছুৎ ব্রাত্য আউল-বাউল সাই-দরবেশ ফকির-বৈরাগীর মধ্যে অধ্যাত্মতত্ত্বের উচ্চতম কথা শুনে আশ্চর্য হই। রবীন্দ্রনাথ দর্শন-কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে এই অজ্ঞাত জনতার ধর্মকথার ব্যাখ্যান করেছিলেন। অথর্ববেদে এই মূক মূঢ় জনতার ধর্মবিশ্বাস কুসংস্কার প্রভৃতি সমস্তেরই ছবি পাই।

অথর্ববেদের ব্রাহ্মণের নাম 'গোপথ'। এই বেদের অন্তর্গত উপনিষদের সংখ্যা অনেক। কয়েকখানি উপনিষদ বেদান্তের প্রামাণিক শ্রুতিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে— প্রশ্ন, মুণ্ডক্য, মাণ্ডুক্য। এই অথর্ববেদীয় মুণ্ডক-উপনিষদ থেকে দেবেন্দ্রনাথ শ্রুতি উদ্‌ধৃত করে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র motto বা মন্ত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন (১৮৪৭ অব্দে); সেই মন্ত্রটির তাৎপর্য— বেদ ও ছয় বেদাঙ্গ সবই অপরা বিদ্যা। আর যার দ্বারা অক্ষর-পুরুষকে বা ব্রহ্মকে জানা যায় তাই পরাবিদ্যা। সমস্ত বেদবেদাঙ্গকে অগ্রাহ্য

---

১ আনন্দগিরি তাঁর টীকায় 'ত্রয়ীধর্ম' শব্দের অর্থ করেছেন 'বেদত্রয়বিহিত'। ৯/২১

করে এ কথা অথর্ববেদীয় সাধকরাই বলতে পেরেছিলেন ; মধ্যযুগের সন্তদের মুখ থেকেও এই শ্রেণীর বাণী শোনা গিয়েছিল।

প্রথম তিন বেদ— ঋক্, যজুঃ, সাম -এর বেশির ভাগ ব্যবহার শ্রৌতকর্মে অর্থাৎ শ্রৌতসূত্রের অনুজ্ঞা-পালনে—সোমযাগ অর্থাৎ সোমরস চোলাই করে, পান করে, দেবতার সঙ্গে সাযুজ্যের দ্বারা অমৃতত্বলাভ। আর অথর্ববেদের প্রধান ব্যবহারিক দিক হল গৃহ্যকর্ম— নানা শান্তিক এবং পৌষ্টিক ক্রিয়ায় —যার লক্ষ্য হল দেবশক্তি সহায়ে অভ্যুদয়-লাভ।[১]

আমরা এতক্ষণ মূল ভাষণের ভূমিকা রূপে বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের বা শ্রুতির মোটামুটি একটা রেখাচিত্র টানলাম। বৈদিক যাগযজ্ঞ কালে কী বিপুল ও জটিল আকার ধারণ করে তা ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুষ্ঠিত 'বারো মাসে তেরো পার্বন'-এর ফর্দটা দেখলেই বোঝা যাবে। ভেবে পাই নে এদের এ ছাড়া যেন আর কাজই ছিল না! কর্মত্যাগ নিয়ে উপদেশের তো ছড়াছড়ি। বোধ হয় এই-সব কর্মকাণ্ডর বাড়াবাড়ি দেখেই দার্শনিকগণ বহুল যাগযজ্ঞের নিন্দা করেছিলেন। ব্রাহ্মণ বা তথাকথিত intellectual section এমনভাবে কর্মজালে বাঁধা পড়লেন যে, যাগযজ্ঞ কেন অনুষ্ঠান করছেন, বিচারহীন আচার কেন পালন করছেন, সে-সব প্রশ্ন আর উদিত হয় না। এ যেন জলযন্ত্রে চালিত 'ওঁ মণিপদ্মে হুং' মন্ত্রের পুনরাবৃত্তির দ্বারা পুণ্য অর্জন হওয়ার মতো। এই বিচারহীন অভ্যাসী আচার মানার প্রতিক্রিয়া আজ সর্বত্র অত্যন্ত স্পষ্ট। আজ ভারতীয় হিন্দুদের দিকে তাকিয়ে কাউকে জনক যাজ্ঞবল্ক্য বা যুধিষ্ঠির রামচন্দ্র বলে মনে হয় না। আসল কথা, কালান্তরে মানুষের দেহের শুচিতা-বোধ ও মনের রুচি-বোধ সম্বন্ধে মত ও বিশ্বাসের এমন পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে ও এখনও নিত্য হচ্ছে যে, তাকে তথ্য বলে মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ম হবে। শশকবৃত্তি অবলম্বন করে, চোখ বুজে বালির মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে থেকে কিছুই হয় নি, সনাতনী সব ঠিক আছে বললেই নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। কালান্তরের অনিবার্য বিপ্লবের কথা মেনে নিয়েও 'বেদান্ত'র মধ্যে যে অক্ষয় সত্য নিহিত রয়েছে

১ অনির্বাণ, বেদমীমাংসা।

তার মূল্য যে শাশ্বত, তা কেমন করে অস্বীকার করা যাবে? তবে সঙ্গে সঙ্গেই এ কথা বলে রাখি যে, উপনিষদ বা বেদান্তর মধ্যে বহু ভাবনা ও মতামত আছে, বর্তমান যুগে যার সবটাই পরমসত্য বলে মেনে নেওয়া যাবে না। সব ধর্মের মধ্যে সত্য আছে, কিন্তু সব ধর্মের সবটাই সত্য নয়—এই তত্ত্বটি মেনে নিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হতে হবে।

বুদ্ধিমান মানুষের intellect নামে যে শানিত অস্ত্রটা আছে তার সাহায্যে প্রাচীন শাস্ত্র থেকে অবৈজ্ঞানিক মতামতগুলোকে কেউ যদি কেটেছেঁটে বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ একটা শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পাদন করতে পারেন, তবেই হিন্দুধর্মের মধ্যে যে বিশ্বধর্মবোধ আছে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে—অর্থাৎ হিন্দু-ধর্ম ও বিশ্বধর্মের মধ্যে ভেদচিহ্ন লোপ পাবে। দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে হিন্দুধর্মের বিশ্বধর্মীয়তা প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টা।

নবম অধ্যায়

বেদান্তর অর্থ বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ। বেদের মন্ত্র ব্রাহ্মণ অংশ স্তব, স্তুতি, যাগ-যজ্ঞাদির আলোচনা—সে-সব কর্মকাণ্ড। সেই-সব কর্মকাণ্ডের পরে আত্মা, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম, সৃষ্টি, পরলোক, ইত্যাদির বিচার হয়েছে উপনিষদের মধ্যে। সুতরাং বেদান্তশব্দের মূল অর্থ হচ্ছে উপনিষদ—কারণ উপনিষদগুলি বেদের শেষভাগেই আছে। কিন্তু উপনিষদ নাম থাকলেই তাকে বেদান্ত বলা যায় না; কারণ নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে মুদ্রিত 'উপনিষদ সংগ্রহ' গ্রন্থে দেড়শত উপনিষদ সংগৃহীত হয়েছে, তার অধিকাংশই spurious বা সাম্প্রদায়িক এবং অর্বাচীন।

"উপনিষদ যখন বেদান্ত, বেদের অংশ, তখন উপনিষদ-নাম-ধারী কোনো গ্রন্থের উপনিষদত্ব স্বীকার করিবার পূর্বে অনুসন্ধান করা আবশ্যক কোনো মন্ত্র, ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকে ইহার স্থান আছে কিনা।" পরম্পরামতে ঋগ্‌বেদের চারটি উপনিষদ, কৃষ্ণযজুর্বেদের একুশটি, শুক্লযজুর্বেদের দশটি, সামবেদের নয়টি ও অথর্ববেদের কুড়িটি। এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। সাম্প্রদায়িক উপনিষদের সংখ্যা শতাধিক। সুতরাং 'উপনিষদ' এই শব্দ গ্রন্থশেষে থাকলেই তাকে বেদান্ত বলে মেনে নিতে হবে তার কোনো অর্থ নেই। অধিকাংশের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের কোনো সম্বন্ধই নেই, বৈদিক মতের বিরুদ্ধ মত পোষণ করে, এমন উপনিষদের সংখ্যা কম নয়।

এখন প্রশ্ন, এই উপনিষদ-অরণ্য মধ্যে কোন্‌গুলি প্রামাণিক? চারবেদের প্রবাদগত চৌষট্টিখানি উপনিষদ; এর মধ্যে দশ, এগারো, কেউ বলেন বারোখানি, প্রামাণিক। শঙ্কর বা তাঁর সমতুল্য কোনো দার্শনিক কোনো উপনিষদের ভাষ্য লিখেছেন কি না, অথবা তা হতে বাক্য উদ্‌ধৃত করেছেন কি না, তাই হল সেই উপনিষদের প্রামাণিকতার মাপকাঠি। এই মাপকাঠি-মতে ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌষিতকী, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক সেই স্থান অধিকার করে, এদের বলা হয় বৈদিক উপনিষদ। প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর, মৈত্র, প্রভৃতি উপনিষদের ভাবানুযায়ী

এবং প্রসিদ্ধ ঋষি-প্রণীত বলে এদের বলা হয় 'আর্য-উপনিষদ'। জাবাল, রামতাপনী, নৃসিংহতাপনী প্রভৃতি উপনিষদ, যা বেদের ভাবাহুযায়ী নয়, যাতে কোনো দেবতা বা পৌরাণিক পুরুষকে ব্রহ্মের অবতাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সগুণ ব্রহ্ম সমর্থনে সাকার পূজার অনুমোদন করেছে— এরূপ গ্রন্থকে বলা হয় সাম্প্রদায়িক উপনিষদ। 'গোপাল-তাপনী' নামে এক উপনিষদে পরমাত্মার স্থান শ্রীকৃষ্ণ অধিকার করেছেন, মথুরাকে ব্রহ্মপুর বলা হয়েছে। 'গোপীচন্দ্রন উপনিষদে' কেমন করে তিলক কাটতে হয়, তার উপদেশ আছে। বৈষ্ণবরা এইভাবে আপনাদের দেবতার মহিমা ঘোষণা করেছেন। আবার শৈবরা 'স্কন্দোপনিষদ' নাম দিয়ে এক গ্রন্থে শিবের মহিমা কীর্তন করেছেন। 'সুন্দরতাপনী উপনিষদ', 'দেবী-উপনিষদ', 'কৌলোপনিষদ' প্রভৃতিতে কেবল শক্তির মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। সম্রাট আকবরের সময়ে 'আল্লোপনিষদ' রচিত হয়। এ শ্রেণীর উপনিষদকে কৃত্রিম উপনিষদ বলা হয়। শঙ্করাচার্য বলেছেন : 'নাস্তিকাঃ পাপকারিণঃ অসুরানামুপনিষৎ দেহমাত্রআত্মদর্শনমেব প্রতিপন্না অসুতৃপঃ পুরুষাঃ'—"যাহারা নাস্তিক, পাপকারী, অসুরগণের উপনিষদ অর্থাৎ দেহমাত্রেই আত্মদর্শনকে যথার্থ বলিয়া মানিয়া লয়।"[১]

বৈদিক, আর্য, সাম্প্রদায়িক ও কৃত্রিম—এই চার শ্রেণীর গ্রন্থ প্রচলিত আছে। এর মধ্যে প্রথম দুই শ্রেণীর উপনিষদই গ্রহণযোগ্য।[২]

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনে যখন হিন্দুশাস্ত্র থেকে বচন সংগ্রহ করে গ্রন্থ প্রস্তুত করলেন, ভেবেছিলেন তার নাম দেবেন 'ব্রাহ্মীউপনিষদ'। পরে সেই সংকলনের নাম দেন 'ব্রাহ্মধর্মঃ'। নববিধান সমাজ থেকে ব্রহ্মগীতোপনিষদ নামে গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল।

উপনিষদের সংখ্যা কত? আজ পর্যন্ত দুই শতের বেশি গ্রন্থ উপনিষদ-নাম-যুক্ত দেখা গিয়েছে। মুক্তিকোপনিষদে ১০৮খানি উপনিষদের নামের

---

১ গীতা ৯.৩। দ্র. গীতা, প্রমথনাথ তর্কভূষণ সম্পাদিত, পৃ. ৪৯৯।

"গীতা-পাঠক মাত্র নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতার প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে গীতাকে উপনিষদ বলা হয়েছে। "ইতি লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতাচার্য্য ব্যাসকৃত সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্‌ভগবদ গীতানামক উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যারূপ যোগশাস্ত্রে।" ইত্যাদি। (গীতারহস্য, বাল-গঙ্গাধর তিলক, অনুবাদ : বিষয় প্রবেশ, পৃ. ২-৩।)

২ দ্র. সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, উপনিষদ, ভূমিকা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী পৃ. ১২২।

তালিকা প্রদত্ত আছে ; ঐ উপনিষদের লেখক কী প্রমাণে এই সংখ্যা দিয়েছিলেন বলেন নি। জাপানী ভাষায় প্রায় দেড়শত উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

এখন প্রামাণিক উপনিষদের সংখ্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীর একস্থলে লিখেছেন, "আমি···জানিতাম যে মোট ১১ খানি উপনিষদ আছে এবং তাহা শঙ্করাচার্য ভাষ্য করিয়াছেন।" (পৃ. ১২২) নানা মতে প্রামাণিক উপনিষদের সংখ্যা ১০, ১১ ও ১২। সমস্যার শেষ হয় নি। কৌষিতকীর ভাষ্য শঙ্কর-প্রণীত কি না সে-বিষয়ে মতভেদ আছে। তা হলে কৌষিতকী বাদে সংখ্যা দাঁড়ায় ৯, ও বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য যোগ দিলে ১১টি হয়।

উপনিষদের কতকগুলি হচ্ছে আরণ্যকের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত। কতকগুলি ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুক্ত। সব উপনিষদের মধ্যে ঈশোপনিষদ স্বতন্ত্র ; এটি কোনো ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত নয়, সোজাসুজি সংহিতারই পরিশেষ।[১]

অনির্বাণ 'বেদমীমাংসা'য় বলেছেন যে ১৩টি উপনিষদকে সম্প্রদায়গত বৈদিক তত্ত্ব-ভাবনার বাহন বলা যেতে পারে। ঐতরেয়, কৌষিতকী, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, কেন, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মৈত্রায়নীয়, মাণ্ডুক্য ও ঈশ।

বেদোত্তর উপনিষদগুলিকে আধুনিককালের পণ্ডিতরা ছ'টা ভাগে বিভক্ত করেছেন, সেগুলি প্রকাশ করেছেন আদৈরের থিওজফিক্যাল সোসাইটি। তাদের ভাগ এইরকম : ১. সামান্য বেদান্ত উপনিষদ, ২. যোগ উপনিষদ, ৩. সন্ন্যাস উপনিষদ, ৪. বৈষ্ণব উপনিষদ, ৫. শৈব উপনিষদ ও ৬. শক্তি উপনিষদ।

ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে-সব উপনিষদকে প্রামাণিক (authority) বলে মানা হয় তারা হচ্ছে :

ঋগ্‌বেদীয়— ঐতরেয়, কৌষিতকী।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়— তৈত্তিরীয়, কঠ, শ্বেতাশ্বতর।

---

১ অনির্ব্বাণ, পৃ. ১০২।

শুক্লযজুর্বেদীয়— ঈশ, বৃহদারণ্যক।
সামবেদীয়— কেন বা তলবকার, ছান্দোগ্য।
অথর্ববেদীয়— প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য।

এই বারোখানি উপনিষদকে শ্রুতির সম্মান দিয়েছেন শঙ্করাদি ভাষ্যকার। তা ছাড়া বাদরায়ণ বেদব্যাস 'ব্রহ্মসূত্রে' রচনাকালে এই উপনিষদগুলির প্রমাণ অবলম্বন করেছিলেন, অর্থাৎ এই-সব গ্রন্থের ভাষা ও ভাব ইঙ্গিতে উল্লেখ করেছেন সংক্ষিপ্ত সূত্রমধ্যে। এই বারোটি উপনিষদের মধ্যে অথর্ববেদীয় উপনিষদত্রয় এবং যজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর ছাড়া অন্যগুলিতে বৈদিকত্ব নিঃসন্দিগ্ধ; অপর আটটি উপনিষদ বেদ বা ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত। যে অথর্ববেদ সংহিতা আর্যদের মধ্যে ঋগ্‌বেদাদির সঙ্গে সমান পংক্তির আসন পায় নি, তার তিনটি উপনিষদ হিন্দুধর্মের প্রামাণিক গ্রন্থ রূপে স্বীকৃত হল। বৈদিক যুগ থেকে শঙ্কর কর্তৃক প্রস্থানত্রয়-মধ্যে অথর্ববেদীয় উপনিষদত্রয়ের স্বীকৃতি-দান পর্যন্ত প্রায় দুই সহস্র বৎসরের ব্যবধান। কালান্তরের এই অনিবার্য পরিণাম।

এই-সব উপনিষদ নানা আশ্রমে গুরুরা শিষ্যদের শোনাতেন। নানা স্থানে নানা সম্প্রদায়ের গুরুরা আশ্রম খুলে বসে থাকতেন। বিদ্যাদানের জন্য গুরুদের ঔৎসুক্য স্বাভাবিক; কিন্তু জীবিকার জন্য ছাত্র-পালনটাও তেমনিই আবশ্যিক। কারণ ছাত্র থাকলেই পুণ্যলোভে ধনীরা আশ্রমে দান করতেন, যজ্ঞে যজ্‌মানরা ডেকে পাঠাতেন। সকল গুরুই বলতেন, আমার আশ্রমে বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গাদির চর্চা হয়। উপ-নি-ষদ — নিকটে এসে বোসো। কাছে এলে বলতেন, আসন করে বোসো— উপ-আসন। আজকেও তার প্রতিচ্ছবি সংবাদপত্র খুললেই চোখে পড়ে— নানা মহা-বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞাপন করছেন: এখানে প্রবেশ করো, অনেক বিদ্যা শিখিয়ে দেব, এতগুলো বৃত্তি আছে, একটা বা পেতেও পার, ইত্যাদি।

ভাবি, অতীতের মানুষগুলো কি আমাদের থেকে খুবই ভিন্ন ছিল? তাদেরও অভাব-অভিযোগ ছিল, সে-সব বেদনাবার্তা আমাদের কাছ পর্যন্ত এসে পৌঁছয় নি। তাঁরা আমাদের কাছে আদর্শায়িত মুনিঋষিযোগী হয়ে আছেন। কালিদাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি চোদ্দ পংক্তির কবিতা স্মরণ হচ্ছে।

আজকালকার মতোই সে যুগেও নানা গুরু নানা মত প্রচার করতেন উপনিষদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। কর্মকাণ্ড বা যাগযজ্ঞ নিয়ে মতভেদের মীমাংসা-প্রচেষ্টা চলছে; বুদ্ধ ও মহাবীরের শিষ্যরা জোর প্রতিবাদ চালাচ্ছেন।

কর্মকাণ্ডর পাশাপাশি জ্ঞানকাণ্ড, অর্থাৎ আত্মা, পরমাত্মা, প্রভৃতির সম্বন্ধ নিয়ে নানা মত— তারও মীমাংসার জন্যে মনীষীরা ভাবছেন।

কর্মকাণ্ডর নানা মতের অরণ্য-মধ্যে পথনির্দেশের জন্য আচার্য জৈমিনী সূত্র খুঁজে বের করেছেন। জৈমিনীর জিজ্ঞাসা 'ধর্ম' কী— সেটার আগে মীমাংসা হোক; মানুষের সমাজকে কিসে 'ধরে' রেখেছে সেই ধর্মটা সম্বন্ধে অনুসন্ধান আগে করো। আমাদের চারি দিকে তাকালেই তো কর্মনিরত জনতাকে দেখতে পাই। তার কাণ্ড-কারখানাই তো তাকে ধরে রেখেছে। এই কর্মকাণ্ডর মীমাংসা হোক সর্বাগ্রে। আর বাদরায়ণের জিজ্ঞাসা—'ব্রহ্ম' কী, জ্ঞান কী, তার মীমাংসা করো: তবে সেটা আসছে পরে বা উত্তর-মীমাংসা। আসলে জীবন-জিজ্ঞাসাই মূল কথা; মানুষের অস্তিত্বের প্রকাশ ও প্রমাণ তার 'কর্মকাণ্ড' দিয়ে; আর তার আস্তিক্যের অনুভূতি এবং ব্রহ্মণ-এর সঙ্গে পরিচয়ের প্রমাণ তার 'জ্ঞানকাণ্ডে'। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডর যথাক্রমে নাম পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা। কর্ম না করলে কর্মের বন্ধন শিথিল হয় না, তাই পূর্বে তার মীমাংসা করে জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হবে— সেটা পরে মীমাংসা হবে উত্তর-মীমাংসা।

উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্তর অপর নাম শারীরক মীমাংসা। যে জীবাত্মা শরীররূপ আশ্রয়ে অবস্থিত [ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধ, গীতা ১৩।১] তাঁর সম্বন্ধে (ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর অভেদ কল্পনা বিষয়ে) আলোচনা যে গ্রন্থে হয়, তাই শারীরক মীমাংসা। শঙ্করাচার্যের ভাষ্য 'শারীরক' নামেই খ্যাত।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ছাড়া যাদববংশীয় শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব ভক্তিমার্গ বলে একটা মত ব্যাখ্যা করতেন। গীতা গ্রন্থে তার প্রথম আভাস পাওয়া গেল, ও কালে ভাগবতপুরাণ, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই মত বহুবিস্তারে ব্যাখ্যাত হয়। সব ধর্মের মতই কালক্রমে পরিবর্তিত হয়। তবে পরিবর্তন হলেই যে সব সময় 'উন্নতি', তার কোনো মানে নেই— demotion ও promotion দুইই হতে পারে।

এত মীমাংসা-প্রয়াসের মধ্যেও একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। শাস্ত্রের উপদেশ— বেদান্তর সর্বেশ্বরবাদ বা সোহংবাদ— সাধারণ মানুষের কাছে কতখানি পৌঁচেছিল? আর যদি-বা কিছুটা মুখে মুখে লোকভাষায় প্রচারিত হয়েই থাকে, তা মানুষের দুঃখ-অপনোদনে কতখানি সহায়তা করেছিল? ক্ষত্রিয় রাজাদের অত্যাচারে, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের উৎপীড়নে জনতা জেরবার হয়ে যাচ্ছিল। দুঃখে-দারিদ্র্যে ক্লান্ত মানুষ দেবতার কাছে আশ্রয় খোঁজে। আর্য-বৈদিক দেবতা ছাড়াও বহু প্রাক্-আর্য দেবতার পূজা বহুবিভক্ত জনতা নিজ নিজ উপজাতীয় (tribal) রীতি অনুসারে নিষ্পন্ন করে আসছিল। গীতায় 'অন্যদেবতা'-ভক্তদের অবিধিপূর্বক পূজা শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে করার কথা আছে (৯।২১), অর্থাৎ তারা বৈদিকমতে দেবতার অর্চনা করত না বলে, বলা হয়েছে 'অবিধিপূর্বক'।

দ্বিজ ও শূদ্রের মধ্যে যে ভেদ, যা আমাদের ভাষার মধ্যে বহুকাল 'ভদ্রলোক' ও 'ছোটলোক' শব্দ দ্বারা প্রকট হত, তা কোনো কালেই ব্রাহ্মণরা স্ব-ইচ্ছায় অপনোদনের চেষ্টা করেন নি। উপরতলার মানুষ অর্থাৎ দ্বিজের সঙ্গে শূদ্রের কোনো সংযোগ ছিল না— শোষণ ও পেষণ ছাড়া। শূদ্রকে 'উপবীত' বা উপনয়ন অর্থাৎ যজ্ঞসূত্র দান করা হত না। এই-সব দেখেশুনে একদল চিন্তাশীলের মনে প্রশ্ন জাগে, এই যে যাগযজ্ঞের বাহুল্য ধর্মকে আচ্ছন্ন করেছে, এর পরিণাম কি শুভপ্রদ হতে পারে? নানা দেবতার তুষ্টির জন্য জীবহত্যাদি ব্যাপারে আর্যদের মনে কোনো করুণার উদ্রেক হয় না। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে একদল সাম্রাজ্য-স্থাপনার বাসনা নিয়ে বহু-ব্যয়সাধ্য অশ্বমেধ-রাজসূয়াদি যজ্ঞ নিষ্পন্ন করতেন— ইহলোকে প্রতিপত্তি ও পরলোকে সুখসম্ভোগের আশায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কে জনতার উপর আধিপত্য করবে অর্থাৎ যুগপৎ শাসন ও শোষণ করবেন তা নিয়ে বহুকাল সংগ্রাম চলে। তার অবসান হল একটা রফা করে— ব্রাহ্মণ হলেন ভূদেব, ক্ষত্রিয় হলেন নরদেব। এই ভূদেব ও নরদেবের অসংখ্য যজ্ঞের ইন্ধন জোগাতে জোগাতে বৈশ্য ও শূদ্রসমাজ ভিতরে ভিতরে মুক্তির প্রার্থনা করছিল। কিন্তু নিরক্ষর জনতার মধ্যে যে শক্তি দেখা দিল, তা এল অ-ব্রাহ্মণ অভিজাত ধনী যুবকদের কাছ থেকেই। উপনিষদের জনকাদি রাজারা পূর্বভারতের ক্ষত্রিয়; শ্রীকৃষ্ণ যাদববংশীয় হীন-ক্ষত্রিয় হলেও

রাজবংশে জন্ম ; গৌতম সিদ্ধার্থ শকজাতীয় অবর ক্ষত্রিয়, ধনীগৃহের সন্তান তিনি। মহাবীর লিচ্ছবি-বংশীয় মহাশ্রেষ্ঠীর সন্তান। পার্থিব দিক হতে কারও কোনো অভাব ছিল না ; সমকালীন জনতার বেদনার্ত নির্বাক চাহনি তাঁদের অন্তরকে স্পর্শ করেছিল বলেই পরম্পরাগত ধর্মবিশ্বাসে বিদ্রোহী হন তাঁরা। আধুনিক যুগেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছে—মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবক স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপন করেও একদিন সর্বহারাদের দুঃখ দূর করবার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

বাদরায়ণ-বেদব্যাসের মতো লোক বেদান্তসূত্রে ইঙ্গিত করেছেন যে, শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নেই (১-৩-৩৪)। বলা বাহুল্য, সে যুগের একটা অংশের orthodox মতকেই তিনি সমর্থন করতেন কি না জানি না, তবে সেই ভাবটাই তিনি সূত্রাকারে ব্যক্ত করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব শূদ্রনিন্দা করতে পারেন না, কারণ তিনি মৎস্যগন্ধা বা মেছুনীর গর্ভজাত সন্তান। তবে মনে হয়, বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে সে যুগের সকল প্রকার মত বিবৃত করে সূত্র রচিত হয়েছিল ; আচার্য সকল মতই ব্যক্ত করতেন শিষ্যদের কাছে।

যাই হোক, বেদান্তের শূদ্র-সম্বন্ধীয় সূত্রটিকে কেন্দ্র করে শঙ্করাচার্য এই বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। বেশ বোঝা যায় যে, শূদ্রকে ব্রহ্মবিদ্যা দান বিষয়ে দুটো মত দেশে ছিল। থাকা খুবই সম্ভব ; কারণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের বাইরে যে-সব ধর্ম তথা দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল, তাদের তো ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে, এমন-কি শূদ্রকে, ব্রহ্মবিদ্যাদানে বা সন্ন্যাসগ্রহণে (ভিক্ষু-ধর্মে দীক্ষাদানে) আপত্তি ছিল না— বৌদ্ধরা ছিল এ বিষয়ে অগ্রণী। জৈনরাও বৈশ্যদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করতেন। বৈদিকদের মধ্যেও একদল কর্তৃক এ মত সমর্থিত হত ; তাঁরা বলতেন, শ্রুতিতে শূদ্রাধিকারবোধক কথাও আছে। ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণে সম্বর্গ বিদ্যা [উপাসনা বিশেষ] -প্রকরণে [জানশ্রুতিং পৌত্রায়ণং শুশ্রূষুং শূদ্রশব্দেন পরামৃশতি] শূদ্র শব্দের উল্লেখ আছে। মহাভারতে শূদ্র-যোনি-প্রভব বিদুর প্রভৃতি বিশিষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই-সব কারণে বা যুক্তিতে শূদ্রের বিদ্যাধিকার পাওয়া যায়।

শঙ্কর পূর্বপক্ষের এই যুক্তির উল্লেখ করে বলেছেন, 'আমরা বলব

শূদ্রের বিত্তাধিকার নাই।' শঙ্করের যুক্তি, বেদাধ্যয়নের অভাবহেতু শূদ্রের ব্রহ্মবিত্তায় অধিকার হয় না— 'ন শূদ্রস্য অধিকারো বেদাধ্যয়নাভাবাৎ।' যে বেদ অধ্যয়ন করে সেই বেদার্থ জানে এবং যে বেদার্থ জানে সেই যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের অধিকারী হয়। শূদ্রের বেদাধ্যয়ন নাই, কারণ উপনয়ন না হলে তো বেদ অধ্যয়নের অধিকার জন্মে না। আবার শূদ্রকে ব্রাহ্মণ গুরুরা উপনীত করতেন না; ফলে একটা অশুভচক্রে—vicious circle-এ যুক্তিটা ঘুরতে থাকে। এইভাবে যুক্তি দেখিয়ে শঙ্কর প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বিত্তাধিকারেও শূদ্রের নিষেধ। এ যেন head you lose, tail I win -এর যুক্তি। ছান্দোগ্যব্রাহ্মণে সম্বর্গ-বিত্তায় শূদ্রাধিকার আছে এই ধরণের আভাস থাকার জন্য শঙ্কর এই 'শূদ্র' শব্দের উৎপত্তি নিয়ে প্রমাণ করেছেন যে ওখানে শূদ্র শব্দের অর্থ অন্য।[১]

শঙ্করাচার্যের 'বেদান্তদর্শনম্'-ভাষ্যের অনুবাদ উদ্‌ধৃত করছি :

শূদ্রের বেদাধ্যয়ন নাই। যে বেদ অধ্যয়ন করে সেই বেদার্থ জানে, এবং যে বেদার্থ জানে সে-ই অনুষ্ঠানে অধিকারী হয়। শূদ্রের বেদাধ্যয়ন নাই, নাই কেন? তাহা বলিতেছি। (ন চ শূদ্রস্য বেদাধ্যয়নমস্তি)। পূর্বে উপনয়ন, পরে বেদাধ্যয়ন। উপনয়নবিধি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতিরই আছে, শূদ্রের নাই। তাহাদের অর্থিত্ব অর্থাৎ শেষ কামনা আছে সত্য; কিন্তু সামর্থ্য না থাকায় তাহা অধিকারের কারণ নহে। লৌকিক সামর্থ্য (শক্তি বা ক্ষমতা) অ-লৌকিক তত্ত্বে অধিকার জন্মাইতে পারে না। কেননা, শাস্ত্রীয় বিষয়ের অধিকার শাস্ত্রীয় সামর্থ্যেরই অপেক্ষিত। শাস্ত্রীয় সামর্থ্য না থাকিলে শাস্ত্রীয় তত্ত্বে অধিকার জন্মে না। অধ্যয়ন নিষেধ থাকায় শূদ্রের শাস্ত্রীয় সামর্থ্য নিবারিত আছে। শূদ্রের যজ্ঞাধিকার-নিষেধ যুক্তিপূর্বক নিষেধ। সে যুক্তি বিত্তাপক্ষেও সমান। যে যুক্তিতে যজ্ঞাধিকারের নিষেধ, সেই যুক্তিতেই বিত্তাধিকারেরও নিষেধ।[২]

শঙ্কর ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ও বৌদ্ধমত বিতাড়নে ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সহানুভূতি ও সহায়তা লাভের আশায় এইভাবে

---

১ বেদান্তদর্শনম্ ১.৩.৩৪। ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৪।

২ ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭২।

শূদ্রকে অবহেলা করার চেষ্টা করেছেন। শুধু status quo নয়, ব্রাহ্মণ্যধর্মকে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন করে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য শঙ্কর শূদ্রকে সম্মান দিতে সংকুচিত হন। কারণ বৌদ্ধরা এই শূদ্রদের সমানাধিকার দিয়ে বর্ণাশ্রমধর্মের সর্বনাশ করেছিলেন।

শঙ্কর ভেবেছিলেন, ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংস্কার করে অদ্বৈতবাদের উপর হিন্দু-ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন। হিন্দুধর্মকে একটা system বা সম্প্রদায়ের কাঠামোর মধ্যে আনবার চেষ্টা তিনিই প্রথম করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু-সংঘের অনুকরণে শঙ্কর তাঁর সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গড়েছিলেন। কিন্তু সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষকে নিয়ে একটা সার্বিক বিপ্লব-ভাবনা উদ্‌বোধিত করতে তিনি পারলেন না; যা করলেন, তাতে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যন্ত্র অধিকতর শক্তিশালী হল। আজকালকার ভাষায় শঙ্করকে বলব revisionist, বা orthodox-এর status quo বজায় রাখবার পরিপোষক ও প্রচারক। Hindu revivalism -এর প্রধান গুরু।

রামমোহন উপবীত ধারণ করতেন বলে, অতি আধুনিক সমালোচক বলেন যে, রামমোহন জাতিভেদ মেনেই চলতেন; বর্ণভেদ স্বীকার করার অর্থই জাতিভেদ মানা। রামমোহন বেদান্ত গ্রন্থের 'অনুষ্ঠানে' (ভূমিকা) যা লিখেছিলেন তার কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করলেই এ বিষয়ে তাঁর মত পরিস্ফুট হবে:

"কেহো কেহো···কহেন যে বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে এবং শূদ্রের এ ভাষা শুনিলে পাতক হয়। তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে, যখন তাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি, জৈমিনিসূত্র, গীতা, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান তখন [বাংলা] ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কি না, আর ছাত্রেরা সেই বিবরণকে শুনেন কি না; আর মহাভারত, যাহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায়, তাহার শ্লোক সকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেন কি না, শূদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস পরস্পর আলাপেতে কহিয়া থাকেন কি না, আর শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্রনিকটে ঐ সকল উচ্চারণ করেন কি না; যদি এইরূপ সর্ব্বদা করিয়া থাকেন তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের উল্লেখ কিরূপে করিতে পারেন।"—এই উদ্‌ধৃতি নিশ্চয়ই শঙ্করাচার্যের শূদ্র সম্বন্ধে মতের বিরোধী এবং জাতিভেদের সমর্থক নয়।

বেদের যাগ-যজ্ঞ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য এক সম্প্রদায়ের অদম্য উৎসাহ— তাঁদের মতে কর্মকাণ্ড ছাড়া ধর্ম নিরর্থক। তার ধারা এখনকার কাল পর্যন্ত অনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলে আসছে। প্রাচীন ভারতে বৈদিকের পাশাপাশি অবৈদিক নানা ভাবনার উদ্‌ভব হয়েছিল। কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনী, বাদরায়ণ, গৌতমবুদ্ধ, মহাবীর জিন; এ ছাড়া বেদান্তবাদী, বৈষ্ণব, শৈব, পঞ্চরাত্রি, একান্তী, ভাগবৎ পাশুপত, যোগী, শব্দব্রহ্মবাদী এবং আরও বহু সম্প্রদায় ছিল। ব্রহ্মজালসূত্রে বুদ্ধের সমসাময়িক ২৪টি সম্প্রদায়ের কথা আছে। জৈনগ্রন্থেও নানা সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

সে যুগের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে ভক্তিবাদ। বেদের দেবতাদের স্থান দখল করেছে মানুষ—অবতারবাদের নূতন মত দেখা দিচ্ছে গীতার মধ্যে। এখন প্রশ্ন, দেবতা কারা? এমন মত আছে যে, বেদের দেবতারা আদিকালে মানুষই ছিলেন। প্রাক্-বৈদিক যুগের করিৎকর্মা পুরুষ বা বীর (hero), জবরদস্ত নেতা, অগ্নি প্রভৃতির আবিষ্কর্তা, ব্যাধিসমূহের চিকিৎসক, যোদ্ধা—এঁরা 'দেবতা'রূপে স্তবস্তুতি পেতেন।[১] আজকালও চোখের সামনে সামান্য মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করা হচ্ছে।

আদিম অবস্থায় মানুষের জ্ঞান যখন খুবই সীমিত ছিল, বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে পাঁচমিশালি আজগুবি বিষয়ে বিশ্বাস করার মধ্যে যে কোনো অসংগতি বা বুদ্ধিহীনতা আছে তা যখন অনুভবই করতে পারত না, সেই কালে প্রাকৃত থেকে কিছু অসামান্যতা দেখলেই তারা 'দৈব' বলে মনে করত। ভাবেএই সাধারণ মানুষ তাদের থেকে শক্তিশালী মানুষকে ঈশ্বরের অবতার-

১ The deities of all nations were either ancient heroes renowned for noble exploits and worthy deeds, or kings and generals who had founded empires or women who had become illustrious by remarkable actions or useful inventions ; the merit of these distinguished and eminent persons, contemplated by their posterity with an enthusiastic gratitude, was the reason of their being exalted into celestial honours.

—Extract from Mosheim, *Ecclesiastical History*, Vol. I. p. 25— quoted by Ram mohun Roy in his Second Appeal to the Christian Public, 1822. *English Works* (Panini Ed.), pp. 629-30.

Sir James Frazer তাঁর *The Golden Bough*-এ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর ঐ বিরাট গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে Incarnate Human Gods নিয়ে আলোচনা করেছেন।

জ্ঞানে পূজা করতে আরম্ভ করে ; রাজাদের দৈব অধিকার (divine right of king) প্রভৃতি মতের উদ্ভব এইভাবেই হয়।

প্রাচীন ভারতে ব্যক্তিকেন্দ্রিত ধর্মমত (personality cult) প্রসার লাভ করে নি। তার পর সাধারণ মানুষের দুঃখদারিদ্র্য যখন চরমে উঠল তখনই তারা নিরুপায় হয়ে দেবতা থেকে আরও concrete বাস্তবের সন্ধান পেল নূতন অবতারদের মধ্যে। এই গুরু বা অবতারদের মধ্যে সেরা হলেন শ্রীকৃষ্ণ। পাণিনীর সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের পূজা সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছিল। কালে 'ভগবদ্‌গীতা'র রচয়িতা (?) শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্মরূপে বর্ণিত হলেন, অবতারবাদের সূত্রপাত তাঁকে দিয়ে স্পষ্ট হল। গীতায় কখনো শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ করছেন, কখনো ভগবানরূপে কথা বলছেন— কখনো শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের মিশ্ররূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। মোট কথা, অবতারবাদ গীতায় দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছে।

শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ণব্রহ্মত্বের ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা হয় গোঁসাই তুলসীদাসের রামচরিতমানসে। গোঁসাই'-এর গ্রন্থ অপ্রাকৃত ঘটনার বর্ণনায় পূর্ণ হলেও তাতে কোনোপ্রকার অশালীন কাজকে আধ্যাত্মিক প্রতীক বলে ব্যাখ্যানের প্রয়োজন হয় নি, যা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের পৌরাণিক জীবনকাহিনীকে কেন্দ্র করে। এ কথা truism— শব্দ বাক্য মাত্রই symbol, এমন-কি অবচেতন থেকে যে ভাবনা মনের মধ্যে চিন্তা রূপে দেখা দেয় তাও একপ্রকারের symbol। দুনিয়ার সব কিছুই symbol। কিন্তু সব জিনিসের একটা সীমা আছে— ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাবার জন্য বাক্যের ও ব্যবহারের যে-সব প্রতীক কল্পিত হয় তা সকল সময় শুভপ্রদ হয় না। আমাদের দর্শন-শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার অবশেষে এমন স্থানে গিয়ে পৌঁছয় যে তা আর মানুষের কোনো কাজে লাগে না। ধর্মের প্রতীক ও মূর্তি কোথায় গিয়ে পৌচেছে তা তিব্বতের বৌদ্ধ য়াব্‌যুম (yabyum) মূর্তিগুলি দেখলেই স্পষ্ট হবে।

শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে ভক্তিবাদের দুটো রূপ দেখা দিল উত্তর-ভারতে। বেদান্তবাদী শ্রীকৃষ্ণ, গীতায় ধর্মদর্শনের ব্যাখ্যাতা বলে লোক-বিশ্বাস জন্মাল। কালে মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত-

পুরাণ এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দে ও বাংলা পদাবলীর কবি ও কীর্তনীয়াদের করস্পর্শে ধাপে ধাপে শ্রীকৃষ্ণের রূপ নিয়ত রূপান্তরিত হয়ে চলে। বাংলা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এই শ্রেণীর রচনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, যা অপাঠ্য ও অশ্রাব্য বলে সম্প্রদায়ের লোকই বাতিল করে দিয়েছিল। সেই বাতিল-হওয়া অচল বইকে window-dressing করে ভদ্রস্থ করা হয়েছে। কিন্তু সম্প্রদায় সে গ্রন্থ গ্রহণ করে নি।

বাংলাদেশ শক্তিসাধনার দেশ, তাই কি 'রাধা' নামে কোনো গোপিনী পরব্রহ্মের প্রকৃতিরূপে গৃহীত হল? ভাগবতে যার নাম নেই, সেই গোপিনী ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণাদির কৃপায় একটা cult-এর কেন্দ্র হয়ে উঠলেন! 'সীতা-রাম' এর 'সীতা' ও 'রাধা-কৃষ্ণে'র 'রাধা' সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র উভয়েই বিষ্ণুর অবতার— তাই এঁদের মতকে সাধারণ ভাষায় 'বৈষ্ণব'ই বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে যে বৈষ্ণবমত প্রচারিত হয়েছে তাও বিচিত্র। উড়িষ্যার পুরীতে কৃষ্ণ-বলরাম-সুভদ্রার ত্রিমূর্তি পূজিত হয়— এখানে 'রাধা' নেই, অথচ যে চৈতন্যমহাপ্রভু বাংলাদেশে রাধাতত্ত্ব প্রচার করেন, তাঁর জীবনের বারো বছর কেটে যায় পুরীর মন্দিরে। সেখানে তো রাধা নেই, রাধা ছিলেন তাঁর ধ্যানের মধ্যে। ধর্মের ইতিহাসে এ শ্রেণীর বহু জটিল প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না।[১]

শ্রীকৃষ্ণ একটি অদ্ভুত চরিত্র। গীতায় যাগযজ্ঞ-বাহুল্যের জন্য মন্তব্য সামান্যত করেছেন সত্য, কিন্তু যৌবনে মতামত ও ব্যবহার খুবই উগ্র ছিল। গোকুলে নন্দ প্রভৃতি আভীর বৃদ্ধেরা ইন্দ্রপূজার আয়োজন করেছেন। তরুণ কৃষ্ণ পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই-সব বৈদিক দেবতাদের পূজার অর্থ কী?" নন্দ বললেন, "জলের দ্বারাই কৃষি, কৃষি বিনা অন্ন নেই। জল থেকে জীব বাঁচে, প্রাণীদের প্রাণ হল জল; ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করলে জলের উপায় হয়, বারিবর্ষণ হয়।" শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "প্রকৃতির কর্মের স্বভাবেই এই-সব সিদ্ধ হয়। যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন (অস্তিচেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ) তিনিও প্রকৃতির

১ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' ও ভাণ্ডারকরের *Vaishnavism* ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে লিখিত। সীতানাথ তত্ত্বভূষণ-প্রণীত *Krishna and the Gita* ও *Krishna and the Puranas* গ্রন্থদ্বয় অবশ্যপাঠ্য। নরেন্দ্রনাথ লাহা-লিখিত *Sri Krishna and Sri Chaitanya* (1949) তত্ত্বের সমর্থনে লিখিত। বাংলায় অসংখ্য গ্রন্থ আছে এ বিষয়ে।

ও জীবের কর্মানুসারেই ফল দিতে বাধ্য। প্রকৃতির স্বভাবেই মেঘ হয় এবং মেঘ সর্বত্র বারিবর্ষণ করে, তাতেই জীব বাঁচে। মহেন্দ্র আবার করবেন কী।"

রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষত্যম্বুনি সর্বতঃ।
প্রজাস্তৈরেব সিদ্ধন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি॥

—ভাগবত, ১০, ২৪, ২৩।

তাই তরুণদলের নেতা শ্রীকৃষ্ণের আপত্তিতে ইন্দ্রপূজা নিষিদ্ধ হল, দেবকোপ গোকুলের কোনো ক্ষতি করতে পারল না।[১]

মহাভারতীয় ঘটনার (?) বহু শতাব্দী পরে মহাভারত ও গীতা লিখিত হয়। বৌদ্ধযুগের অবসানে ভারতে যে হিন্দু-পুনরুত্থানের আয়োজন হয়, তার দার্শনিক তথা ধর্মীয় তত্ত্ব গীতার মধ্যে রূপ পায়। এ ছাড়া সাংখ্য-বৌদ্ধবাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সেটাও 'গীতা'র মধ্যে ভাষা পায় শ্রীকৃষ্ণের জবানিতে। অবশ্য আমরা গীতার আধ্যাত্মিক গভীরতার কথা আলোচনা করছি নে এখানে। সেখানে সে গ্রন্থ অতুলনীয়।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো কথা না তুলে গৌতমবুদ্ধ বিশুদ্ধ জ্ঞান-আহরণ, আত্মচিন্তা প্রভৃতির বার্তা প্রচার করে গেলেন। কিন্তু এমনই মানুষের দুর্বল মন যে, সেই মানুষটাকে নিয়েই তারা পুজো শুরু করে দিল। পৃথিবীতে বুদ্ধের যত কোটি মূর্তি এ পর্যন্ত খোদিত হয়েছে, এমন আর কারও হয় নি। কত লক্ষ কারিগরের জীবিকা হত এই মূর্তি করে! আর হজরত মহম্মদের নাম নিয়েছেন যে কত কোটি মানুষ তারও ইয়ত্তা নেই। জৈনরা ঈশ্বর মানে না, তাদের ২৮জন তীর্থঙ্করের মূর্তি যে ভাবে সাড়ম্বরে পূজিত হয় তা দেখে বিস্ময় লাগে। মানুষের মধ্যে কোথায় একটা irrational knot আছে— খুলতে গেলে যেন আরও জট পাকিয়ে যায়। তাই মনটাতে সর্বদা শান দিতে হয়, পাছে ঝিমিয়ে পড়ে।

ভারতের এই ধর্মারণ্যে সর্বশ্রেণীর পক্ষে গ্রহণীয় মতবাদ 'বেদান্ত' —শঙ্করাচার্য প্রচার করলেন 'প্রস্থানত্রয়'-এর মাধ্যমে। উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র

---

১ ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতের সংস্কৃতি : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৩।

ও গীতা— এই তিনটি গ্রন্থকে সাধারণভাবে 'প্রস্থানত্রয়' বলা হয়। আমরা পূর্বেই বলেছি, বেদান্ত বলতে উপনিষদ বোঝায়— যে বারোখানি উপনিষদ শঙ্করাদি পণ্ডিতগণ গ্রহণযোগ্য মনে করেছিলেন, সেগুলিই বেদান্তের প্রামাণিক গ্রন্থ। এই 'প্রস্থানত্রয়'-এর মধ্যে কোনো দেবদেবীর পূজা, কোনো স্থান-মাহাত্ম্যকীর্তন, কোনো মনুষ্যস্তুতি নেই— আছে এক পরব্রহ্মের উপাসনাবিধি। সেজন্য এগুলি সর্বজনগ্রাহ্য হবার গুণযুক্ত গ্রন্থ। কালে 'প্রস্থানত্রয়' সকল শ্রেণীর ভারতীয় দার্শনিকদের পক্ষে ব্যাখ্যা করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে উঠে।

'প্রস্থানত্রয়' শব্দ কেন এই কটি গ্রন্থ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়, তার কারণ-ব্যাখ্যা অবান্তর হবে না। 'প্রস্থান' শব্দ ন্যায়দর্শনের ভাষ্যমধ্যে পাওয়া যায়, অর্থ করা হয় 'অসাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয়'। বাচস্পতিমিশ্র ও উদয়নাচার্যের মতে প্রস্থানের অর্থ 'ব্যাপার'। ব্যাপারের বিষয়— বিদ্যা বা শাস্ত্রের অসাধারণ প্রতিপাদ্যতা বা সমঝৌতা। প্রস্থান বা প্রতিপাদ্যর ভেদেই শাস্ত্র বিভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— বেদবিদ্যার প্রস্থান বা ব্যাপার হচ্ছে যাগযজ্ঞাদি; বার্তাবিদ্যার প্রস্থান বা প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে হল-শকটাদি; দণ্ডনীতির প্রস্থান— রাজা, অমাত্য প্রভৃতি; আর ন্যায়শাস্ত্রের প্রস্থান— সংশয়াদি পদার্থ। বলা বাহুল্য, এই সংশয় বা জিজ্ঞাসা থেকেই সর্বজ্ঞানের উদয়।

আমরা বেদান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে 'প্রস্থান'-এর যে উল্লেখ পাই তাতে তিনটি 'প্রস্থান' আছে— শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়। শ্রুতি-প্রস্থান— বেদ ও উপনিষদাদি; স্মৃতি-প্রস্থান— রামায়ণ, মহাভারতাদি; সেইজন্য ভগবদ্‌-গীতা, যা মহাভারতের অন্তর্গত অংশ, তাকেও স্মৃতির অন্তর্গত করা হয়। ন্যায়-প্রস্থান— বুদ্ধিগম্য বিচারমূলক গ্রন্থ; ব্রহ্মসূত্রাদি এই ন্যায়-প্রস্থানের অন্তর্গত করা হয়।

বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই তিনপ্রকার প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। শংকরাচার্য যে তিনটিকে 'প্রস্থান' বলে স্বীকৃতি দিলেন— উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা, এগুলি কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মপুস্তক নয়; এগুলিতে বিশেষ কোনো দেবদেবীর উদ্দেশে উপাসনা-বিধি বা প্রশস্তি নেই— ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য বিষয়; সেইজন্য এই 'প্রস্থানত্রয়'-এর নির্গলিত ধর্মের নামকরণ হয় 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম', যা কালে ব্রাহ্মধর্ম নামে প্রচারিত হয়।

শঙ্করাচার্যের পথ ধরে নানা সম্প্রদায়ের প্রবর্তকগণ নিজ নিজ মতের সমর্থনে 'প্রস্থানত্রয়'কে কেন্দ্র করে ভাষ্যাদি প্রণয়ন করেছেন— বিশেষ করে 'ব্রহ্মসূত্র'-এর আশ্রয় নিয়েছেন। শঙ্করাচার্য অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠিত করেন এই 'প্রস্থানত্রয়' অবলম্বনে ; রামানুজ সেই পথে চলে গড়ে তুললেন বিশিষ্টাদ্বৈত মত। তার পর একে একে মধ্বাচার্য, আনন্দতীর্থ, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য, বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীকণ্ঠ, প্রভৃতি সম্প্রদায়-প্রবর্তকগণ এই বেদান্ত গ্রন্থ নিয়ে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, প্রভৃতি নানা মতবাদ খাড়া করে তোলেন। বিংশ শতকে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ব্রহ্মসূত্রের ভাগবতী ব্যাখ্যা ও পঞ্চানন তর্করত্ন শক্তি-ভাষ্য লেখেন (১৯৩৭-৩৯)।[১]

রামমোহনের জনৈক প্রতিপক্ষ 'বৈষ্ণব গোস্বামী' প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে ভাগবত পুরাণ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য।[২] রামমোহন ভারতীয় ঐতিহ্যধারা অনুসরণ করে 'প্রস্থানত্রয়' অবলম্বনে বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হলেন, যার উদ্দেশ্য হিন্দুধর্ম ও বিশ্বধর্ম একপর্যায়ভুক্ত সত্য— The Universa Religion— এ কথা প্রমাণ করা।

প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম গ্রন্থ বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে উপনিষদের বহু সূত্র আভাসে ইঙ্গিতে উল্লিখিত আছে— সে কথা আমরা আগেই বলেছি। উপনিষদ বেদের অন্তগ্রন্থ বলে তাকে 'বেদান্ত' বলা হয় এবং সূত্রাকারে গ্রথিত ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম বেদান্তগ্রন্থ। গীতাকেও উপনিষদ বলা হয়েছে—

১ গোপীনাথ কবিরাজ মন্তব্য করেছেন যে শক্তিভাষ্যে "ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে তিনি [তর্করত্ন] যাহাকে শাক্ত দৃষ্টিভঙ্গী বলিয়া মনে করিতেন তাহাকে প্রকট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা প্রশংসনীয়, কিন্তু শাক্ত-সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীসমূহের কোনটিই ইহাতে যথার্থ ভাবে প্রতিফলিত হয় নাই।" —প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ ৫৭০।

২ "ব্যাসদেব বেদ ও উপনিষদের তাৎপর্য জ্ঞাপন করিবার জন্য যে ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছিলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে শঙ্করাচার্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ সেই ব্রহ্মসূত্রের মর্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মসূত্রের মর্মোদ্ঘাটন করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা-বর্ণনাত্মক শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। ইহা সর্বপ্রমাণচক্রবর্তী। ইহার প্রামাণ্যই চরম প্রামাণ্য।"—সুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ", ভারতকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ ১৯।

"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

"অর্থাৎ, সমস্ত উপনিষদ গাভীস্বরূপ; গোপালনন্দন স্বয়ং দোগ্ধাস্বরূপ, সুধী পার্থ অর্জুন ভোক্তা-বৎস-স্বরূপ এবং মহৎগীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ—গীতাধ্যানে এই স্মৃতিকালীন গ্রন্থের এইরূপ অলংকারযুক্ত বর্ণনা হইলেও যথার্থ বর্ণন করা হইয়াছে।"

"সমস্ত উপনিষদের সার এই গ্রন্থে আছে শুধু তাহা নহে, ইহার পুরানামও—'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা উপনিষৎ'।" এখানে একটি প্রশ্ন জাগে—'গীতা' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ কেন ব্যবহৃত হল—'গীতম্‌' বললেই তো চলত। কিন্তু তা হল না, গীতাকে উপনিষদ্‌ বলা হয়েছে বলে; 'উপনিষদ' শব্দ সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ—সেইজন্য গীতার পরিচ্ছেদ-শেষে লিখিত হয় 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসু-উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে' ইত্যাদি। কালে 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-উপনিষৎ' সংক্ষেপিত হয়ে 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা' ও আরও পরে কেবল 'গীতা' এই স্ত্রীলিঙ্গী অতিসংক্ষিপ্ত নাম প্রচলিত হয় (তিলক, গীতারহস্য, বিষয়-প্রবেশ)। তবে 'উপনিষদ' যে কেন স্ত্রীলিঙ্গ হল সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করা কঠিন। তবে মনে হয় উপনিষদের অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা বলেই এতে স্ত্রীত্ব আরোপিত হয়েছিল। শঙ্কর বলেছিলেন—

সা ইয়ং ব্রহ্মবিদ্যোপনিষদ-শব্দবাচ্যা।

'প্রস্থানত্রয়'-এর মধ্যে 'গীতা'র যত ভাষ্য এপর্যন্ত রচিত হয়েছে, বোধ হয় পৃথিবীর কোনো ধর্মগ্রন্থের তা হয় নি। প্রাচীন বা মধ্যযুগে সাম্প্রদায়িক মতামতের সমর্থনে তো ভাষ্য অনেকেই লিখেছিলেন। বিংশ শতকে রাজনীতি কর্মনীতি সন্ত্রাসবাদ সমাজনীতির ধর্মীয় সমর্থনের জন্য গীতার বহুব্যবহার হয়েছে, সে তথ্য আলোচনা করতে গেলে একটা পুরো 'থীসিস' তৈরি হয়ে যাবে।

আধুনিক একটি বইয়ের উল্লেখ করব—সেটি বেদান্তের বিশেষ কোনো মত ব্যাখ্যার জন্য লিখিত হয় নি, বা বেদান্তসূত্র অবলম্বন করেও ব্যাখ্যান প্রদত্ত হয় নি; উপনিষদ থেকে উদ্‌ধৃত করে ভাষ্য লিখিত হয়—এর নাম 'বেদান্তসমন্বয়'। নববিধান সমাজের অন্যতম আচার্য গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় কেশবচন্দ্র সেনের অনুপ্রেরণায় হিন্দু দর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন

করেন ; অতঃপর তিনি "নববিধানের আলোকে বেদান্ত ভাষ্যে সর্ব্বপক্ষের সমন্বয় দর্শন করিয়া··· বেদান্ত সমন্বয় ভাষ্য" নামে গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লেখেন ; পরে উহার বঙ্গানুবাদ হয়। অনামা অনুবাদক লিখছেন, "যাহারা কোনও বিশেষ পক্ষাশ্রিত, তাঁহাদের নিকট এ সমন্বয় অনায়াসে বোধগম্য হওয়া কঠিন হইলেও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে ও স্থানে স্থানে সকল পক্ষের যেসব বিশেষত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা হইতে সর্বপক্ষ-সমন্বয়-দর্শনও সুলভ হইয়াছে। কোনও একটি পক্ষ অবলম্বনেই বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। যে ভূমিতে সর্বপক্ষের অবিরোধ, তাহা নববিধানে ভগবৎকৃপায় প্রকাশিত হইয়াছে। এ যুগের বিশেষ ভাব উদার সার্বভৌমিকত্ব। আংশিক ভাব লইয়া এ যুগে কেহ পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না।"[১]

বাংলা ভাষায় অগণিত গীতার ব্যাখ্যান হয়েছে ; বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রই তার পথিকৃৎ। Historical Jesus কে সৃষ্টি করবার জন্য য়ুরোপে যে চেষ্টা চলছিল তারই প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনার প্রয়াসে। আরও পরে শ্রীকৃষ্ণকে, লর্ড কৃষ্ণ ও চৈতন্যমহাপ্রভুকে লর্ড গৌরাঙ্গ করা হয় ; অর্থাৎ খ্রীষ্টানরা যেমন জীসাস্ ক্রাইস্টকে 'লর্ড' বলেন, আমরাও আমাদের মহাপুরুষদের সম্বন্ধে সেই বিশেষণই প্রয়োগ করে বললাম 'লর্ড গৌরাঙ্গ'। বিংশ শতকে দেখা গেল মানুষকে আবার ঠাকুর দেবতা অবতার পূর্ণব্রহ্ম করার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। চার শো বছর আগে শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার পূর্ণব্রহ্মই করা হয়।

এইমত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম প্রবর্তন নহে তাঁর কাম ॥
নন্দসুত বলি যারে ভাগবত গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই ॥

---

১ বেদান্তসমন্বয়। /মূল সংস্কৃতের/অনুবাদ ও অনুব্যাখ্যা/ভাষাতে প্রেসিতেনয়ং/মহন্নিশ্বসি-তাত্মনা। /অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা/কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। /অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। ১/৬। /কলিকাতা। /৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট্। /নববিধান মণ্ডলীর উপাধ্যায় কর্ত্তৃক উদ্ভাসিত। /'মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে' /কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। কে, সি, মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৮৩৪ শক [১৯১২] পৃষ্ঠা [৩৫]+৮৮৮+[৭৩০ ক,খ]+Appendix I [৭৮২ পৃ]+উপনিষৎ-সূচিপত্র [২৭ পৃষ্ঠা] [ঈশকেনাদি ১১টি উপনিষৎ হইতে উদ্‌ধৃত সূত্র ও শ্লোক]

সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোঁসাই।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্র কুমার।
আপনি চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥
ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্য কৃষ্ণ অবতার প্রকট প্রমাণ॥[১]

বুদ্ধদেব বলেছিলেন দুঃখ থেকে ত্রাণ পাবার উপায় সমস্ত আকাঙ্ক্ষার জলাঞ্জলি— সোজা কথায় সংসার-ধর্ম পালন করলেই দুঃখ অনিবার্য। তাই বললেন, সদ্‌ধর্ম পালন করো— সেটা ব্রাহ্মণধর্ম, ক্ষত্রিয়ধর্ম, বৈশ্যধর্ম, শূদ্রধর্ম নয়, বর্ণাশ্রমধর্ম পালনও নয়, সেটা মানুষের শাশ্বত ধর্ম,— সদ্‌ধর্ম নিত্য চিরস্থায়ী ধর্ম। বুদ্ধের মতে মানবসমাজ একটা একক, তার বর্ণ নেই, জাত নেই, ভেদাভেদের চিহ্ন নেই।

মোট কথা, বুদ্ধদেব ও তৎকালের অন্যান্য পরিব্রাজকদের প্রচারের ফলে বর্ণাশ্রমধর্ম ও যাগযজ্ঞের বাহুল্যের প্রতি মানুষের নিষ্ঠা ও বিশ্বাস সর্বত্র শিথিল হয়ে এসেছিল, যেমন ঘটেছিল গ্রীসে সোফিস্ট ও সক্রেতিসের আবির্ভাবের সময়ে। গীতায় সাংখ্যমত প্রভৃতির সমালোচনা আছে; মৃদুভাবে গীতাকার বলেছেন, যাগযজ্ঞবাহুল্য ভালো নয়। কিন্তু যাগযজ্ঞ নিষ্ফল, বুদ্ধাদির মতো এ কথা তো শ্রীকৃষ্ণ বলেন নি; বরং বর্ণাশ্রমকে সুপ্রতিষ্ঠ করবার জন্য বলেছেন 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ',— অন্যের পেশা গ্রহণ কোরো না, নিজের পেশা ছেড়ে। ব্যক্তিগত শক্তি, বুদ্ধি ও রুচি-মত বৃত্তি বাছা হবে না; *laissez-faire* নয়; সম্পূর্ণ ভাবে regimented হয়ে চলতে হবে। যে বর্ণে জন্মেছ সেখানকার জন্মগত কাজের মধ্যে পড়ে থাকতে হবে, 'সুখদুঃখ-সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ' ভাববে। বেশ বোঝা যায়, গীতার রচয়িতার বাস্তবতা-বোধ খুবই ছিল। তিনি জানতেন, দুঃখ থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে সকলেই যদি বুদ্ধদেবের উপদেশ-মত সংসারবিমুখ হয় তবে দুনিয়াটা তো জনশূন্য হয়ে যাবে। বুদ্ধদেবের কথার একেবারে উলটো আদেশ। বুদ্ধদেবের উপদেশ— কামিনীকাঞ্চন

[১] চৈতন্যচরিতামৃত। Narendranath Law, *Sri Krishna and Sri Chaitanya*, দ্র p. 44.

ত্যাগ নির্বাণের প্রথম সোপান; কথাটা শুনতে ভালো, বলতে ভালো, কিন্তু পৃথিবীর সব সুস্থ মানুষ যদি সে উপদেশটাকে কাজে রূপ দিতে চেষ্টা করত তবে দুনিয়ার অবস্থাটা কী হত তা কল্পনা করা যায় কি? দেখা যেত, জনশূন্য পৃথিবী মরুভূমি হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু সেটা তো হতে পারে না। তাই গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের মুখে এমন কথা বসালেন যেটা মানুষ সহজেই বুঝতে পারে— কর্ম করবে বৈকি; কর্ম করলেই তো কর্মের শেষ হবে; তবে ফলের জন্য উদ্‌গ্রীব হবে না; আর নিজের কর্ম ছাড়া অন্যের কর্মের মধ্যে বা পেশার মধ্যে প্রবেশ করতে যেয়ো না, সেটা হবে অধর্ম। লোকে শুনে আসছে যাগযজ্ঞ করলে দেবতারা তুষ্ট হয়ে বর দেন— দুঃখী মানুষ তাই এখনও ঘটিবাটি বেচে পূজা-পার্বণ করে, গুরুপদে ধনসম্পত্তি সমর্পণ করে, তীর্থে যায়— ভাবীকালের পুণ্য সঞ্চয়ের আশায়। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কাজের philosophy আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত করেছি। আজ দুনিয়া-ভর জনতা এই ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কাজই করছে— কারণ সে জানে না কেন এবং কিসের জন্য সে অন্যের রাজ্যে হানা দেবে!

গীতাকার বৌদ্ধপ্রভাব থেকে মানুষকে মুক্ত করবার জন্য সমকালীন সকল ভাবনাগুলির এক সংশ্লেষণ করে এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মতবাদ বজায় রেখে সংস্কার যতদূর করা যায় সেইরকম উপদেশ দিলেন। পরে বৌদ্ধযুগে কোনো প্রতিভাশালী লেখক অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে মহাভারতের আখ্যায়িকাকে কেন্দ্র করে, সকল সম্প্রদায়ের মত সংশ্লিষ্ট করে একটি বই লিখে থাকবেন। গীতার কথা শ্রীকৃষ্ণের মত হতেও বা পারে— পরম্পরায় চলে আসছিল কথাটা। কিন্তু সেটা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সঞ্জয় শর্টহ্যান্‌ডে তুলে নিয়েছিলেন এটা বিশ্বাস করা কঠিন। তা হলে প্লেটো সোক্রাতিস্ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তাকেও প্রেস-কন্‌ফারেন্সের বা মোলাকাতের সময় রিপোর্টের মতো প্রামাণিক বলে গ্রহণ করতে হয়। প্লেটো স্রষ্টা, সোক্রাতিস উপলক্ষ মাত্র। উপনিষদের রচয়িতাদের নাম যেমন অজ্ঞাত, গীতা-উপনিষদের ব্যাখ্যাতাও অজ্ঞাত।

বুদ্ধদেব হিংসা-বিরোধী, জৈনরাও অহিংসা পরমধর্মের প্রচারক। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের মূলে হচ্ছে, দেবতাদের তুষ্ট করতে হলে যজ্ঞে পশুহত্যা অনিবার্য। বৌদ্ধ ও জৈনরা ঠিক উলটো কথা প্রচার করে আসছেন বহুকাল হতে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের শেষ অধ্যায়ে সাধুজীবনের যে সংক্ষিপ্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার মধ্যে বলা হয়েছে যে 'তীর্থ ভিন্ন অন্যত্র যিনি অহিংসা না করেন' তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন। অর্থাৎ নিছক অহিংসাবাদ উপনিষদকারগণ প্রচার করেন নি।[১]

অহিংসা যখন ধর্ম বা fettish হয়ে ওঠে, সেটা জাতীয়তার পক্ষে তখন মারাত্মক হয়। সমস্ত জাতি 'অহিংসাতত্ত্বে'র আবরণে ক্লৈবত্ব প্রাপ্ত হয়। চীনদেশের এক সম্রাট বৌদ্ধ হয়ে ঘোষণা করেন যে কাপড়ের মধ্যে কেহ জীব-জন্তুর কল্‌কা তুলতে পারবে না; কারণ সেগুলি কাটবার সময় জীবজন্তুগুলি কাটা পড়বে, এতে মানুষের মনে হিংসার উদয় হবে! গীতাকার অহিংসার অবাস্তবতা মহা-দার্শনিক আড়ম্বরে প্রচার করেছেন। শঙ্করাচার্য বলেছেন, "হিংসাদি দোষের যোগ আছে বলিয়া, বেদবিহিত কর্ম অধর্মের কারণ হয়, এইপ্রকার আশঙ্কা করা উচিত নহে কেন? (তাহা বলি) যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম …ক্ষত্রিয় জাতির স্বধর্ম— এই কারণেই ইহা অধর্মের হেতু নহে। এই যুদ্ধরূপ বিহিত কর্মের অকরণে 'ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি' (তাহা হইলে নিজধর্ম ও কীর্তি পরিত্যাগ করিয়া পাপভাগী হইবে) এই প্রকার বলিয়া (ভগবান) প্রথমেই যে যাবজ্জীব-বিহিত পশু প্রভৃতির হিংসারূপ বৈদিক যাগ প্রভৃতির অধর্মরূপতা নাই, তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলিয়া দিয়াছেন। জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়বাদিগণের যে মত প্রদর্শিত হইল তাহা ঠিক নহে।"[২]

ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যে-সব শাস্ত্রীয় অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হয়েছিল, গীতা তার অন্যতমরূপে শঙ্কর কর্তৃক ব্যবহৃত হল। "শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মানুষ্ঠানের সহিত আত্মজ্ঞান কৈবল্যলাভের কারণ: ইহাই সকল গীতাশাস্ত্রের নির্ণীত অর্থ" (সর্বাসু গীতাসু নিশ্চিতোঽর্থ)।[৩] অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি যে-সব কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন সে-সব অবশ্যপালনীয়, অর্থাৎ শাস্ত্রীয় *status quo* বজায় রাখতে পারলেই মোক্ষলাভ হবে।

---

১ দ্র ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮।১৫।
২ গীতা, শঙ্করভাষ্য: অনুবাদ, পৃ. ৫৭।
৩ গীতার ভাষ্য, পৃ. ৫৮।

বৌদ্ধরা শূদ্রাদি বর্ণের সম অধিকার দান করেছিলেন ; এ ছাড়া অহিংসা প্রচার, ও যাগযজ্ঞ নিষিদ্ধ করেন। এ-সমস্ত কারণে বর্ণাশ্রমের বুনিয়াদ ধ্বসে যাচ্ছিল ও ব্রাহ্মণ্যধর্মই লুপ্তপ্রায় হয়েছিল। সেই ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠ করবার জন্য শঙ্কর প্রস্থানত্রয়ের মাধ্যমে আপন দৃঢ় মত ব্যক্ত করেন— বর্ণাশ্রম, শ্রৌত ও স্মার্ত শাস্ত্রর নূতনভাবে ব্যাখ্যা হতে চলল।

রামমোহনের দ্বারা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্তনের প্রচেষ্টাকে বা সতীদাহাদি নিবারণ প্রয়াসকে হিন্দুরা 'বর্ণাশ্রম' ধর্মের বা সনাতনী ধর্মের উপর আক্রমণ বলে মনে করেছিলেন। ভবানীচরণ, রাধাকান্ত দেব, প্রমুখদের ধর্মসভা আন্দোলন থেকে বর্তমান কালের 'বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘ' পর্যন্ত নানা গুরুর আশ্রম হিন্দু revivalism-এর প্রতিপোষক রূপে কাজ করে আসছে। তাঁরা চান পুরাতন মদকে নূতন বোতলে ভরতে ; তাঁরা নূতন বোতলও ভাঙবেন না, পুরাতন মদকেও ছাড়বেন না— কিন্তু আধুনিক ও আদিমের সংমিশ্রণে সমন্বয় হয় না।

প্রস্থানত্রয় হিন্দুদের সে শ্রেণীর ধর্মগ্রন্থ নয়— ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের বাইবেল, মুসলমানদের কোরান, শিখদের 'আদিগ্রন্থ' যে স্থান অধিকার করে আছে সেই-সব ধর্মে। হিন্দুদের শ্রুতি ও স্মৃতি হচ্ছে ধর্মগ্রন্থ— শুনে শুনে যা চলে আসছে গুরুশিষ্যপরম্পরায়। সেমেটিক জাতির ইহুদি ও আরবীয়দের ধর্মগ্রন্থ লিখিত কিতাব— Scripture।

সেমেটিকদের ধর্মগ্রন্থ লিখিত বলে তার মধ্যে নড়চড়, অদলবদল হতে পারে না, এ কথা খুবই ভুল। আবার হিন্দুদের প্রস্থানত্রয়ই কেবলমাত্র শাস্ত্রগ্রন্থ নয় ; শ্রুতি স্মৃতি ছাড়াও পুরাণ, উপপুরাণ, আগম, তন্ত্র, প্রভৃতি অনেক গ্রন্থই শাস্ত্র আখ্যা পেয়ে থাকে ; এমন-কি দেবভাষা-সংস্কৃতে রচিত কোনো শ্লোককে যদি বলা হয় যে, সেটা 'শাস্ত্র' থেকে বলা হচ্ছে, তবে সাধারণ লোকের বিশ্বাস করতে তিলমাত্র দ্বিধা হয় না। বহু অর্বাচীন শ্লোক প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে এ কথা সুবিদিত। সাধারণ হিন্দুর কাছে বেদও যেমন অপরিচিত, অর্বাচীন উদ্‌ভট শ্লোকাদির অর্থও তেমনি অজ্ঞাত— একটা কৃত্রিম ভাষার মধ্যে, একটা Sacerdotal caste-এর হেপাজতে, সমস্ত জ্ঞানকে আটকে রাখার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

কিন্তু লিখিত ধর্মগ্রন্থ পেয়েই কি মানুষ নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে? বাইবেলকে কেন্দ্র করে কত শত সম্প্রদায়[১] হয়েছে এ পর্যন্ত— তাদের মধ্যে কত লোপও পেয়েছে। মুসলমানদের কোরানও revealed— ঈশ্বরের বাণী— দেবদূত জিবরাইল কর্তৃক হজরত মহম্মদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। "কোরানের মতে ইসলাম মহম্মদ-উদ্‌ভাবিত ধর্ম নয়, মহম্মদ শুধু প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ। কোরানের মতে মহম্মদের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই পৃথিবীর সকল দেশের পয়গম্বরগণ এই ধর্মমার্গ অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলেন। মহম্মদ কেবল যন্ত্রী, তাঁহার মাধ্যমে ঈশ্বর ইহাকে [ইসলামকে] নিঁখুত করিয়াছেন। কোরাণ বলিয়াছেন, আজ ইসলামকে নিখুঁত করিয়া আমার পূর্ণ আশীর্বাদসহ আমি তোমার ধর্ম হিসাবে তাহা মনোনীত করিলাম।"[২] হজরত মহম্মদ তার বাণী শুনিয়ে সম্পাদন করে দেন বলে কিম্বদন্তী। কিন্তু সেই পবিত্র গ্রন্থের অর্থ নিয়ে কি মতভেদ হয় নি? আরবী-শাস্ত্র-মতে ৭২টি সম্প্রদায়[৩] স্বীকার করা হয়েছে; কিন্তু তার বাইরেও তো কত মত! কেন সংঘভেদ হয়, কেন নবীনের দল প্রবীণের ব্যাখ্যা মানতে চায় না, কেন তারা scripture-এ নূতন অর্থ খোঁজে? এর একটা বড়ো কারণ— মানুষই একমাত্র জীব যে অতীতের পুনরুক্তি মাত্র নয়; গুহাবাসী মানুষ আজ ব্যোমচারী। তাই শাস্ত্র বললেই তাকে শাশ্বত বলে মানুষই মানতে চায় না।

---

১ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৩ অব্দে ২৫৮টি খ্রীষ্ট সম্প্রদায় ছিল; একটি সম্প্রদায়ের সদস্য-সংখ্যা মাত্র ২২৩ জন।

২ আবুল হায়াত, 'ইসলাম', ভারতকোষ, প্রথম খণ্ড, পৃ ৫৩৪।

৩ হজরত মহম্মদ ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গিয়েছিলেন যে, তাঁর ধর্মের লোকেরাও ইহুদিদের মতো ৭২টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তারা সকলেই নরকে যাবে; কেবল একটি সম্প্রদায় নাজিয়া— বা নিষ্ঠাবান সুন্নিরা— উদ্ধার পাবে। এই বাহাত্তর সম্প্রদায় ৬টি ভাগে বিভক্ত, যথা—

১. রাখিজিয়া বা Separatists। এদের থেকে শিয়াদের উৎপত্তি।

২. খারিজিয়াদের বলা হত শত্রু, Aliens। এরা অনেক কিছু বিশ্বাস করত না। এদের একটি শাখা 'মুতাজিলা'।

৩. জবরীয়া। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এরা মানত না।

৪. কদরীয়া। এরা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে মানত।

৫. জহিমীয়া। এরাও নানারকম মত পোষণ করত।

৬. মুরজীয়া। এরা বিশ্বাস ছাড়া কিছু মানে না— সবই আপনা-আপনি ধীরে ধীরে হবে। এই সম্বন্ধে *Hughe's Dictionary of Islam*, pp. 567-69 দ্রষ্টব্য।

পরবর্তী যুগে যে-সব সম্প্রদায় হয়েছে তাদের কথা এখানে নেই।

এই-সব দেখলে ও শুনলে প্রশ্ন জাগে, ধ্রুবসত্য বলে কি কিছুই নেই? কেবলই ঢেউ আর স্রোত— ওঠাপড়া আর চলা— এরাই সত্য? পরিবর্তন ব্যক্তি-জীবনের ধর্ম, সমাজ-জীবনেরও ধর্ম; যে মানুষের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দেহের বদল হল না তাকে বলি বামন, আর যে মানুষের মনের বিকাশ হল না তাকে বলি 'জড়'— imbecile! যে সমাজে ও যে ধর্মে পরিবর্তন ঘটে নি তাদের মৃত্যু হয়েছে, তারা জাগতিক গতির সঙ্গে ছন্দ রেখে চলতে পারে নি, তাই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; আর যারা আধমরা হয়ে কালাতিক্রম করে টিকে এখনও আছে, তাদের আয়ু ততদিন, যতদিন কোনো প্রবল প্রতিপক্ষ মত এসে তাদের স্থানচ্যুত না করে। দুনিয়ার ইতিহাসে অগণিত রাজবংশ যেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, দর্শন ও ধর্মের ইতিহাসও তেমনি অসংখ্য মতের কঙ্কালে আকীর্ণ হয়ে রয়েছে। সব মত সত্য নয়, সব পথ গম্যস্থলে উপনীত করে না— এই তত্ত্বটা আমরা স্বীকার না করে শিথিলভাবে বলি সব সত্য।

মানুষের জ্ঞান— পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা— যতই বিস্তৃত ও গভীর হচ্ছে, ততই দেবতা, আত্মা, পরমাত্মা, ইহলোক, পরলোক, প্রভৃতি বহু বিষয় সম্বন্ধে বহুযুগের সযত্নে লালিত মনোহর কবি-কল্পনার তিরোভাব হচ্ছে। বিচিত্র মতামত বিচার করে মনে হয়, শঙ্কর-উদ্‌ভাবিত অদ্বৈত-বেদান্তবাদের মধ্যে মানুষ তার জিজ্ঞাসার উত্তর কথঞ্চিৎ পেয়েছিল। রামমোহন রায় আমাদের যুগে সেই বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্মকে ভারতীয় হিন্দুর পক্ষে গ্রহণীয় হবে বলে আশা করেছিলেন এবং সেইজন্য বাংলাভাষা-বিবরণে সেগুলি প্রকাশ করেন। রামমোহনের বিশ্বাস ছিল, বেদান্তের মধ্যে যে সত্য নিহিত রয়েছে তার সাহায্যে হিন্দুধর্ম বিশ্বধর্মের শক্তি অর্জন করতে পারবে। এই বিশ্বধর্মবোধ কিভাবে উদ্রিক্ত হতে পারে সে বিষয়ে রামমোহন কী করেছিলেন তারই আলোচনা হবে পরবর্তী ভাষণগুলির বিষয়বস্তু।

এখানে একটা প্রশ্ন— রামমোহন কি শঙ্করের বাণী ও মত নিছক বহন করে আনলেন? তা যদি হত তবে তাঁর স্থান হত 'অনুবাদ' সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে। কিন্তু তা তো নয়। তিনি তাঁর নিজের মতো করেই বেদান্তমত ব্যক্ত করেছেন, যেমন ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করে অন্যান্য সম্প্রদায়ের

গুরুরা ভাষ্য লিখেছিলেন। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ধারায় শিষ্যপরম্পরায় বেদান্তের ব্যাখ্যা হয়েছে— নূতন যুগের নূতন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে এ-সব লিখিত হয়। রামমোহনও সেইরূপ নূতন করে বেদান্তকে ব্যাখ্যা করেছিলেন নিজের মতো করে; সে অধিকার তাঁর ছিল এবং এখনও সে পথ মুক্ত ভাবীকালের ব্যাখ্যাতাদের জন্য। এবং নূতন নূতন ভাষ্য লিখে নূতন নূতন মত এখনও প্রচারিত হচ্ছে।

বেদান্তগ্রন্থ ও বেদান্তসার নামে দুটি গ্রন্থ রামমোহন ১৮১৫ অব্দে প্রকাশ করেন।

বেদান্ত সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে কিছুটা ঐতিহাসিক আলোচনা করেছি। পরম্পরাগত বিশ্বাসমতে বাদরায়ণ বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রর রচয়িতা। এই বাদরায়ণকে তো আমরা জানি না। রামমোহন তাঁর 'বেদান্তগ্রন্থ'র শেষে লিখেছিলেন—

শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষি বেদব্যাস
প্রোক্ত জয়াখ্য ব্রহ্মসূত্রস্য বিবরণং সমাপ্তং।

এখন প্রশ্ন এই, যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদান্তগ্রন্থর রচয়িতা বা সংকলয়িতা, তিনিই তো মহাভারতের রচয়িতা, সুতরাং ভগবদ্‌গীতারও লেখক। এ ছাড়া তিনি তো বেদের বিভাগকর্তা বলেও সুপরিচিত। পুরাণাদিও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কীর্তি এরকম জনশ্রুতি। নিরাকার নির্বিকল্প ব্রহ্মবাদকে যিনি ব্রহ্মসূত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি কী করে পুরাণের অসংখ্য দেবদেবীর স্তুতিবন্দনা করতে পারলেন—বোধ হয় তাঁকে এ প্রশ্ন কেউ করেছিল। তাই দুটি শ্লোক লিখে ভগবানের কাছে তিনি ক্ষমা চাইছেন—

রূপংরূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্‌বর্ণিতং,
স্তুত্যা নির্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া,
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যৎতীর্থযাত্রাদিনা,
ক্ষন্তব্যং, জগদীশ, তদ্‌বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতং ॥

'হে অখিলগুরো! তুমি রূপবিবর্জিত, অথচ ধ্যানের দ্বারা আমি তোমার রূপ যে বর্ণন করিয়াছি, এবং স্তুতির দ্বারা তোমার যে অনির্বচনীয়তা দূর করিয়াছি, ও তীর্থযাত্রাদির দ্বারা তোমার ব্যাপিত্বকে যে বিনাশ

করিয়াছি— হে জগদীশ! চিত্তবিকলতা হেতু আমি যে এই তিন দোষ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর।'[১]

একই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে বেদ, ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত-পুরাণাদির রচয়িতা বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা করুন, আমরা করি না। কারণ 'বেদব্যাস' উপাধি, নাম নয়। বহু বেদব্যাসের নাম পুরাণে পাওয়া যায়।

বাদরায়ণ বেদব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থে ৫৫০টি সূত্র আছে। এই সূত্রগুলি— আমরা পূর্বেই বলেছি— বহুকালের গুরুশিষ্যপরম্পরায় তত্ত্বকথা আলোচনার নির্গলিত বাণী। এই সূত্রমধ্যে সর্বপ্রথম নানা দার্শনিক মত আলোচিত হয়েছে। সে আলোচনা যে খুব প্রণালীবদ্ধ বা systematic তা মনে হয় না, তবে এভাবে গ্রথিত গ্রন্থ পৃথিবীতে ইতিপূর্বে আর কোনো ভাষায় রচিত হয়েছিল বলে জানা নেই।

ব্রহ্মসূত্রের চারটি অধ্যায় : প্রথম অধ্যায়কে 'সমন্বয়', দ্বিতীয় অধ্যায়কে 'অবিরোধ', তৃতীয় অধ্যায়কে 'সাধন' ও চতুর্থ অধ্যায়কে 'ফল' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

"প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য স্পষ্টভাবে ব্রহ্মনির্দেশ করেন, তাহাদের আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে ব্রহ্ম-বোধক অস্পষ্ট বাক্য-সকল এবং উপাস্য ও জ্ঞেয় ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য-সমূহের বিচার করা হইয়াছে। চতুর্থ পাদে সন্দিগ্ধ বাক্যসমূহের বিচার আছে। এইরূপে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মকারণতা সম্বন্ধে সাংখ্যাদি স্মৃতির ও যুক্তির বিরোধ পরিহার, সাংখ্যাদিমতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন, পঞ্চমহাভূত, জীব ও লিঙ্গ-শরীর সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যের বিচার করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জীবের পরলোকগমন-প্রণালী, জীবব্রহ্মের সম্বন্ধ, বিবিধ উপাসনা-প্রণালী এবং সাধনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বিচারিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সাধনপ্রণালী, দেহত্যাগপ্রণালী, দেবযান পথ ও মুক্তিস্বরূপ মীমাংসিত হইয়াছে।··· এই বিভাগ শঙ্করমতানুযায়ী। অন্যান্য আচার্যগণ স্বীয় মতানুসারে ব্রহ্মসূত্রের অন্যরূপ বিভাগ স্বীকার করেন···।"[২]

---

১ রামমোহন-কৃত অনুবাদ। ব্যাসকৃত প্রণব-প্রকল্পের শ্লোক। রামমোহন রায়ের 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' নামক গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত আছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত আত্মজীবনী গ্রন্থের পৃ. ২৭ থেকে উদ্ধৃত।

২ দ্র. সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বেদান্তদর্শন, অবতরণিকা।

ব্রহ্মসূত্রের সূত্রসংখ্যা সব ভাষ্যগ্রন্থে সমান নয়। সাম্প্রদায়িক ভাষ্যকার-গণ কখনো একটা সূত্রকে দুটো, অথবা দুটো সূত্রকে একটায় গেঁথেছেন; তাই সূত্রসংখ্যা ৫৫০ থেকে ৫৫৫এর মধ্যে দেখা যায়। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক কপিলেশ্বর মিশ্র ব্রহ্মসূত্রের সকল ভাষ্য বিশ্লেষণ করে এই তত্ত্বটি উদ্‌ঘাটিত করলে, বিধুশেখর ভট্টাচার্য যে ভূমিকা লেখেন, তার থেকে কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করছি—

"...according to different commentators there were various divergencies of the readings of the sutras. Some taking one sutra as two, or two as one, or adding the last word of a sutra to the beginning of the following one, or adding some new sutras or substituting one letter or word for another in them, thus making rooms for divergent interpretations."

এখানে একটি কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এত শতাব্দীর মধ্যে এই সূত্রগুলির যে পরিবর্তনাদি হয়েছে তা নগণ্য। শিষ্যপরম্পরায় সূত্র-গুলি কণ্ঠস্থ হয়ে এসেছিল। অবশ্য সূত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ থেকে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

দশম অধ্যায়

অদ্বৈতবাদ শঙ্করাচার্যের সৃষ্ট মত নয়। উপনিষদে নানা স্তরের চিন্তাধারা দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাতে দুটি চিন্তাধারা প্রধান। একটির উপদেষ্টা যাজ্ঞবল্ক্য, অপরটির প্রধান উপদেষ্টাদ্বয় প্রজাপতি ও ইন্দ্র। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যর মত ব্যক্ত হয়েছে; সেখানে তিনি পরমাত্মার আশ্রয়ে জগৎ ও জীবের চিরস্থায়িত্ব স্বীকার করেন নি। বিষয়-বিষয়ীর ভেদ এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ীর ভেদকে তিনি অস্থায়ী এবং প্রকারান্তরে মিথ্যা বলেছেন। তিনি বলেন অভেদই আত্মার মূলস্বরূপ এবং বাসনা সমূলে ক্ষয় হয়ে দেহান্ত হলে আত্মা এই অভেদভাবই প্রাপ্ত হবে। এই অভেদভাবকে তিনি 'অমৃত' বলেছেন।

যাজ্ঞবল্ক্যর মত হতেই যে গৌড়পাদ এবং শঙ্করাচার্য প্রভৃতি পরবর্তী দার্শনিকগণের নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ এবং লয়বাদ বিকশিত হয়েছে, তা সহজেই বোঝা যায়। প্রজাপতি ও ইন্দ্র এই অভেদবাদী মত পোষণ করতেন না; প্রজাপতি-পরিকল্পিত ব্রহ্মলোকে মুক্ত আত্মার ভোগ ও বিশেষ বিজ্ঞান সমস্তই অব্যাহত থাকে এবং পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর উপাস্য-উপাসক-ভেদও থাকে, অভেদজ্ঞানের কথা পাওয়া যায় না।

ইন্দ্র স্পষ্টরূপেই ভেদাভেদবাদী, অদ্বৈতবাদের বিরোধী। ব্রহ্মের প্রশ্নের উত্তরে জীবাত্মা বলছেন, "তুমি যাহা আমিও তাহা।" মূল অভেদ মানিয়াও 'তুমি'-'আমি'র ভেদ স্বীকার করা হয়েছে, লয়ের কথা কিছুই নেই।[১]

রামমোহন ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রের আলোচনাকালে উহাকে অদ্বৈতবাদ-পক্ষে কেন গ্রহণ করলেন, এ বিষয়ের সন্ধান একটু করা যেতে পারে। রামমোহন বেদান্তসূত্রের আরম্ভে যা লিখেছিলেন সেটাকেই কারণ বলে ধরে নিতে পারি; তিনি লিখছেন: "কোন কোন শ্রুতির অর্থের এবং তাৎপর্য্যের হঠাৎ অনৈক্য বুঝায় যেমন এক শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি আর এক শ্রুতি আকাশ হইতে বিশ্বের জন্ম কহেন আর যেমন এক শ্রুতি

১ দ্র. সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, ছান্দোগ্য উপনিষদের ভূমিকা। ব্রহ্মবাদের দুই ধারা।

ব্রহ্মের উপাসনাতে প্রবর্ত্ত করেন অন্য শ্রুতি সূর্য্যের কিংবা বায়ুর উপাসনার জ্ঞাপক হয়েন…এই নিমিত্ত পরমকারুণিক ভগবান্ বেদব্যাস পাঁচ শত ও পঞ্চাশত অধিক সূত্রঘটিত বেদান্তশাস্ত্রের দ্বারা সকল শ্রুতির সমন্বয় অর্থাৎ অর্থ ও তাৎপর্য্যের ঐক্য এবং বিশেষ বিবরণ করিয়া কেবল ব্রহ্ম সমুদায় বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন, ইহা স্পষ্ট করিলেন। … বেদান্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন মোক্ষ হয় আর ইহার বিষয় অর্থাৎ তাৎপর্য্য বিশ্ব এবং ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান অতএব এ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম আর এ শাস্ত্র ব্রহ্মের প্রতিপাদক হয়েন।"[১] এইজন্যই 'ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থকে তিনি বেছে নিলেন বাংলাভাষায় রূপদানের জন্য ; সমগ্র হিন্দু দর্শন ও ধর্মের নির্গলিত বাণী সূত্রাকারে বহন করছে এই গ্রন্থেরই সাড়ে-পাঁচশো সূত্র।

রামমোহন যখন বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম-ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হন তখনকার কলকাতা ও বাংলাদেশের ধর্মের অবস্থাটার উপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলাদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ছিল প্রবল, আর ছিল শাক্ততান্ত্রিক ধর্ম। বৈষ্ণবরা দ্বৈতবাদী, প্রীতিমার্গের বিচিত্র সাধনার পন্থী। কিন্তু এই বৈষ্ণব বলতে কেবল ধর্ম বোঝাত না, বৈষ্ণবসমাজও বোঝাত। বৈষ্ণবরা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ; তারা সংসারী ও বিষয়ভোগী। যারা বৈরাগী 'বোষ্টম' তারাও সংসারী, অর্থাৎ 'বোষ্টমী' বা শক্তি না পেলে তাদের সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। এই নারীই তার শক্তি, প্রকৃতি, রাধা, হ্লাদিনী। উপরের স্তরে 'গোস্বামী'রা অদ্বৈত আচার্যের বংশধররূপে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে আছেন। মোট কথা, সমস্ত হিন্দুসমাজ থেকে বৈষ্ণবদের পৃথক করে চেনা যায়। মাথায় হাতে ছাপছোপ ও বসনভূষণ দেখে তো বটেই, ধর্মতত্ত্বের দিক থেকেও তাদের বৈশিষ্ট্য চোখে না পড়ে যায় না; কারণ রাধা কন্‌সেপ্‌শন, গোপীভাব ও নানা রসের মধ্য দিয়ে ভগবৎ-সাধনা হিন্দুদের মধ্যে নূতন অভিজ্ঞতা। বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্রে ব্রহ্মকে 'রসোবৈসঃ' বলা হয়েছে ; কিন্তু বৈষ্ণবদের রসসাধনা কী চরমে উঠেছে তা গোস্বামীদের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলি দেখলেই জানা যায়— উজ্জ্বলনীলমণি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু আমাদের আলোচ্য-

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ), প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩।

পর্বে অর্থাৎ উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণবধর্মচর্চা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। শাক্তদের সম্বন্ধেও আংশিকভাবে এই কথা খাটে, তবে তাদেরকে পৃথক সমাজ-মধ্যে দেখা যায় না। অবশ্য অবধূত, অঘোরপন্থীদের কথা বাদ দিতে হবে ; কারণ তারা সংসারী নয়।

কিন্তু বৈদান্তিক-অদ্বৈতবাদী বলে কোনো সম্প্রদায় বা সমাজ গড়ে ওঠে নি হিন্দুদের মধ্যে। এর কারণ, শঙ্করাচার্য ছিলেন সন্ন্যাসী এবং তিনি নূতন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের স্রষ্টা। এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনা হতে পারে প্রাচীনকালের বুদ্ধের ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সংঘের ও আধুনিককালে স্বামী বিবেকানন্দ-স্থাপিত বেলুড়ের নূতন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের। বুদ্ধদেবের ভিক্ষুণীরা সংঘের বহু জটিল সমস্যা সৃষ্টি করেন ; শঙ্করাচার্য প্রথম থেকেই বললেন 'কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ'। এ কথা সন্ন্যাসীরা তো বলবেনই। তাঁরা থাকতেন অবিবাহিত। সংসার করতেন না বলে নূতন নাম গ্রহণ করতেন, পূর্বাশ্রমের নাম পর্যন্ত লোপ পেত। এইরকম নির্বিকারত্বর জন্য অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীরা সমাজের বাইরেই রয়ে গেলেন, কিন্তু সংসারের বাইরে নয় ; মোহান্তদের জমিদারি ও বৈষয়িকতা সুপরিচিত।

অদ্বৈতবাদের অবচ্ছিন্ন মতবাদ দর্শনশাস্ত্রের পুঁথির পাতার মধ্যে আবদ্ধ থেকে গেল— মানুষের জীবনপ্রবাহে বা সমাজ-সংসারের ব্যবহারিকতায় তারা রূপ পরিগ্রহ করতে পারলে না ; রামমোহন শঙ্কর-শিষ্য ও অদ্বৈতবাদী হয়েও সংসারবিমুখ হলেন না এইটিই হল নবমতের বৈশিষ্ট্য। রামমোহন জানতেন অদ্বৈতবেদান্তের ব্রহ্ম নির্গুণ ; সেই নির্গুণ নিরাকার নির্বিকল্প ব্রহ্ম নেতিধর্মী, অর্থাৎ ব্রহ্মকে নেতি নেতি অসংখ্যবার বলেও তাঁকে ইতিবাচক করা যায় না। সুতরাং তাঁকে সগুণরূপে উপাসনা করতে হবে। তবে সগুণ ও সাকার প্রতিশব্দবাচক নয়।

"ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ বলা হয়। সগুণ ব্রহ্মকে সাকার, নিরাকার এবং উভয়রূপও বলা হয়। ইহারই নাম ঈশ্বর···। নির্গুণ ব্রহ্মকে নির্বিশেষ নিরাকার ... পরব্রহ্ম বলা হয়। নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞেয় বা উপাস্য হন না। সগুণ ব্রহ্ম জ্ঞেয় বা উপাস্য হন। সগুণ ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ হয়। নির্গুণ ব্রহ্ম অসঙ্গ, তাহার সহিত সম্বন্ধও সম্ভব হয় না। এজন্য তাহাকে অদ্বৈতবস্তু বলা হয়।

নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য ; সগুণ ব্রহ্ম জীবজগতের ন্যায়ই মিথ্যা। শ্রুতিমধ্যে সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে। তবে তাহা কখনো বা পৃথকভাবে, কখনো বা মিশ্রিতভাবে বলা হইয়াছে।"[১]

নির্গুণবোধক শ্রুতি ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ছান্দোগ্য, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ১১টি উদ্ধৃত করা যায়। সগুণ ব্রহ্ম-বোধক পক্ষেও সেই সংখ্যাই পাওয়া যায়।

"অদ্বৈতবাদী নির্গুণকেই সত্য বলেন, এবং সগুণকে উপাসনাদির নিমিত্ত আবশ্যক, কিন্তু বস্তুতঃ মিথ্যা বলেন।"[১]

প্রাচীন ভারতে যে-সব মনীষী ধর্মকে ব্যক্তিগত অনুভূতির পর্যায় থেকে বুদ্ধির ক্ষেত্রে এনে বিচার বা যুক্তির ভাষায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তাঁদের মধ্যে শঙ্করাচার্য অগ্রণী। শঙ্করের পথ ধরে পরবর্তী যুগে বহু মনীষী নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রস্থানত্রয়ের শরণাপন্ন হয়ে এসেছেন। এই-সব গুরু তথা পণ্ডিতদের দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়— একটা শ্রেণীকে বলা হয় বৈদিক বা শ্রুতির উপর নির্ভরশীল ; আর বেশির ভাগ সম্প্রদায় পৌরাণিক ধর্মের উপর আস্থাবান। এই দিক থেকে শঙ্করীয় বেদান্তকে বৈদিক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বেদান্ত-ব্যাখ্যাকে পৌরাণিক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। শঙ্করীয় অদ্বৈত মতে জীবজগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ স্বীকৃত হয় নি ; এই মত সুপরিচিত জ্ঞানে তার ব্যাখ্যানের প্রয়োজন নেই। অন্যান্য সম্প্রদায় আধা-অদ্বৈতবাদী, নাহয় নিছক দ্বৈতবাদী। শঙ্করের ব্রহ্ম নির্গুণ (abstract), অর্থাৎ এ ব্রহ্ম জীবের কোনো কাজে আসে না। সকলসম্বন্ধরহিত, ধ্যানের অগম্য এই ব্রহ্মণ। কট্টর অদ্বৈতবাদীরা তর্কের খাতিরে বলবেন যে, যে মুহূর্তে ব্রহ্মকে ধ্যানের মধ্যে ধরতে চেষ্টা করা হল, সেইখানেই তো দ্বৈতবোধ এসে গেল— সুতরাং ধ্যানও অসিদ্ধ। ব্যবহারিকতার জন্য ব্রহ্মকে সগুণ কল্পনা করা হয়।

বাক্য সাকার নয়, শ্রবণ সাকার নয় ; অথচ এই গুণগুলি আছে বলেই আমরা চিন্তা করতে পারি। কিন্তু সে চিন্তার তো রূপ নেই। সগুণ হলেই সাকার হতে হবে, এমন তো প্রমাণ হয় না। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার

১ বিশ্বকোষ (২য় সং), প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭২৮-২৯।

কথা উপনিষদকারগণ নির্গুণ ব্রহ্মবাদের সঙ্গেই যুগপৎ বলেছেন; উপনিষদ-গুলি সামান্যভাবে পড়লেই এই তথ্য জানা যাবে। তবে ভারতে বহু সাকারবাদী— প্রতিমা, প্রতীক, প্রস্তরাদির পূজক— ছিলেন; শঙ্কর তাঁদের নিকৃষ্ট উপাসক বলেছেন।

শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে জনশ্রুতি যে তিনি শিবলিঙ্গ, শালগ্রামাদি প্রতীক-পূজার সমর্থন করতেন এবং তার সমর্থক গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন। শঙ্করের জীবন সম্বন্ধে তথ্য এত অল্প জানা যে আমরা ঠিক করে বলতে পারি নে এই-সকল রচনা অদ্বৈতবাদ-স্বীকৃতি ও সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে না পরে রচিত। কোনো মহাপুরুষের সকল বাণী ও রচনা একই সুরে গাঁথা হবে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত, তা গুরুর পরম ভক্তও আশা করি বলবেন না। কারণ বয়ো-ভেদে মনের পরিণতির উপর রচনার গুণাগুণ ও মতেরও বিবর্তন নির্ভর করে। সুতরাং শঙ্করকে সগুণ উপাসনা ও সাকার পূজার সমর্থক বলে মনে করা যায় কি না তা বিচার্য। তবে সাকার পূজার যে সমর্থন করতে তাঁকে দেখি তা নিকৃষ্ট উপাসনাবোধেই করেছিলেন। রামমোহনও ঠিক সেই কথা বহু স্থলে বলেছিলেন।

শঙ্করাচার্য নানা সম্প্রদায়ের অনুকূলে গ্রন্থাদি লিখেছেন— এমন দাবি সম্প্রদায়ীরা করে থাকেন। 'কবিতাকার' নামে কোনো বিদ্বান পণ্ডিত রামমোহনের ব্রহ্মবাদ আক্রমণ করে যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাতে লিখে-ছিলেন যে, বেদান্তের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য সাকার ব্রহ্ম মেনে 'আনন্দলহরী স্তব' করেছেন। রামমোহন তদুত্তরে লেখেন যে, "আনন্দলহরী…গঙ্গার স্তব। নমঃ শঙ্কটা কষ্টহরিণী ভবানী ইত্যাদি অনেক ২ স্তবকে এবং একখান সত্যপীরের পুস্তককেও শঙ্করাচার্য্যের রচিত কহিয়া সেই ২ দেবতার পূজকেরা প্রসিদ্ধ করিয়াছেন এ সকল স্তব বেদান্তের ভাষ্যকার আচার্য্যকৃত ইহাতে প্রমাণ কিছু নাই প্রধান লোকের নামে আপন ২ কবিতা বিখ্যাত করিলে চলিত হইবেক এই নিমিত্ত আচার্য্যের নামে এই সকল স্তবস্তুতি প্রসিদ্ধ করিয়াছেন আর যদ্যপিও তাঁহার কৃত এ সকল হয় তথাপি হানি নাই যেহেতু ব্রহ্মের আরোপে জগতের তাবৎ বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া বর্ণন করা যায়।"[১]

---

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৯।

এইভাবে কোনো কোনো মহাপুরুষের মুখে সকল প্রকার সদ্‌বাক্য, উপদেশামৃত আরোপ করার রীতি আধুনিক কালেও একেবারে অজ্ঞাত নয়।

রামমোহনের রচনা থেকে অসংলগ্ন উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে বিপরীত ভাব সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে— অর্থাৎ তিনি যেটি বলেন নি, সেটিই তাঁর মত বলে প্রচার করা হয়েছে। রামমোহনের রচনা থেকে, তিনি যে প্রতীক-প্রতিমাদি পূজার সমর্থক ছিলেন, এই প্রমাণ করতে চেষ্টা পেয়েছেন কোনো কোনো অতিমনস্বী লেখক।[১] কিন্তু সেই-সব স্থানগুলি সমগ্রর মধ্যে পড়ে দেখলে বুঝতে পারা যাবে যে, রামমোহন বলেছিলেন, যারা স্বল্পবুদ্ধি, নিরাকার ধ্যানে অসমর্থ, নাস্তিকতা থেকে তারা যদি নিকৃষ্ট পূজা করে, সেও ভালো। কিন্তু তিনি জানতেন, যে মুহূর্তে সেই মূঢ় জনতা উৎকৃষ্ট জ্ঞান শিক্ষা পাবে তখনই সে নিকৃষ্ট উপাসনা ত্যাগ করবে— এ বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় ছিল। সগুণ উপাসনা ও সাকার পূজা যে একার্থক নয়, তা শিখসম্প্রদায়ের ও মুসলমানদের ধর্মসাধনা ও ক্যাথলিক ছাড়া অন্য খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর-ভাবনার দ্বারা প্রমাণিত হয়। দেখা যায়, যে হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে সে আর কখনও তার পুরানো ধর্মসমাজে ফিরতে চায় না; যে দেবদেবীর পূজা সে ত্যাগ করেছে তাদের দিকে আর ফিরে চাইতে দেখি না। সুতরাং সাকার পূজা ছাড়া ঈশ্বর-ভাবনা হয় না এই যে লৌকিক কথা হিন্দু শিক্ষিতদের মুখে শোনা যায় তাহা তথ্যের দ্বারা সমর্থিত হয় না।

আমরা উপাসনা ও পূজা শব্দ পৃথকভাবে ব্যবহার করছি। হিন্দুদের মধ্যে যে পূজাবিধি দেখা যায় তার বুনিয়াদ হচ্ছে তন্ত্রাচারে; বৈদিকতা তার উপর সাজানো। যাগযজ্ঞ বৈদিক ও আর্য শব্দ; কিন্তু পূজা ও পুষ্প শব্দ

---

১ S. K. Dey, *Bengali Liiterature* (1962 Ed.), p. 517 : "It is curious that idolatry was the *betenoire* of Rammohan as well as of the later Brahmo Samaj, yet Rammohan did not restrain Iswarchandra Nyayaratna of the Samaj from proclaiming Ramchandra of ancient Ajodhya as an Avatara, nor was he averse to the setting up of a statue of Ramchandra...." ১৮৪২ সালে দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রহ্মমন্দিরে যান তখন এইটি ঘটে। রামমোহন তার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে মারা গিয়েছেন, সুতরাং রামমোহন কী করে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্নকে restrain করবেন? দ্র. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর -প্রণীত আত্মজীবনী, পৃ. ৪১।

দুটিই দ্রবিড়ভাষা-উদ্ভূত। প্রাক্-আর্য ও দ্রবিড় এবং সিন্ধু-হারাপ্পার অসুর-সংস্কৃতির পুষ্প দিয়ে পূজা, তন্ত্র-মতে যন্ত্র নির্মাণ করে হোম- আদি অনুষ্ঠান এবং বৈদিক যাগযজ্ঞাদি— সবের উপর সুপারস্ট্রাকচার— এই-সব মিশিয়ে যে নবপূজা-পদ্ধতি চালু হয় তাকেই বলা হয় 'হিন্দুধর্ম'। আসল বুনিয়াদ দ্রবিড় ও প্রাক্-দ্রবিড় অসুর সংস্কৃতি। বৈদিকতা basical নয়। রামমোহন ব্রহ্ম-উপাসনা প্রবর্তন করেন, পূজা নয়। কারণ পূজার সঙ্গে পার্সোনাল গড্-এর সম্বন্ধ জড়িত। সগুণ-সাকার দেবতার পূজা বা ম্যান-গড্ বা মানুষ-দেবতা বা অবতারের পূজা কঠোর অদ্বৈতবাদের সঙ্গে খাপ খায় না। রামমোহন যে ধর্মকে সর্বমানবের জন্য মুক্ত করতে চেয়েছিলেন তার বুনিয়াদি মনঃশিক্ষার পটভূমে আছে ইস্‌লামধর্ম ও মুসলমান সমাজের আদর্শবাদ। এটি তিনি পেয়েছিলেন বাল্যে ও কৈশোরে ফার্সি ও আরবি ভাষা অধ্যয়ন-কালে; এই শিক্ষা ও সংস্কৃতির রূপ দেখা দেয় তাঁর প্রথম রচনা তুহ্‌ফাৎ-উল্-মুয়াহ্‌হিদীনের মধ্যে। পরিপক্ক বয়সে তিনি খ্রীষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য মনীষীদের গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হন। য়ুরোপের হিউম্যানিজ্‌ম্ নিয়ে যাঁরা চর্চা করছিলেন তাঁদের গ্রন্থ থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন; এই-সবের সমবেত মতবাদ তাঁর মনকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর রচনা থেকে। প্রসঙ্গত বলি, তন্ত্র থেকে রামমোহন প্রেরণা পেয়েছিলেন; সে-সম্বন্ধে আলোচনা যথাস্থানে আসবে।

রামমোহনের জীবনী অংশে আমরা বলেছি, কলকাতায় যে বৎসর এসে তিনি বসবাস করতে আরম্ভ করেন সেই সালেই (১৮১৫) বেদান্তসূত্র ও বেদান্তসার গ্রন্থদ্বয় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কলকাতা ফেরিস্ কোম্পানির ছাপাখানায় এগুলি ছাপা হয়। বলা বাহুল্য, ১৮১৫ সালে কলকাতায় আসার পূর্বেই বই-দুখানির খসড়া রংপুর-বাস-কালে প্রস্তুত হয়েছিল। রংপুরে সর্বপ্রথম তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে ভদ্রমহলে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছিল। তখন রংপুরের জজকোর্টে গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য নামে এক পণ্ডিত কাজ করতেন; এঁর আদি বাস যশোহরে। গৌরীকান্তর সহিত রামমোহনের বিতর্ক হত, এবং তারই প্রকাশ হয় তাঁর 'জ্ঞানাঞ্জন' নামে পুস্তিকায়— ১৭৪৩ শক বা ১৮২১ সালে প্রথম সংস্করণ বের হয়। এ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৩৮) এক স্থানে আছে: "মহাবিজ্ঞ [রামমোহন]…

বেদান্তের বঙ্গভাষারচিত গ্রন্থের প্রথমে উক্ত প্রকার অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং পারসী ভাষাতে অর্ব্বদেশীয় [আরবি] ভাষা সংসৃষ্টে অনেক প্রকার ঐমত কথা লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন।"

এই শেষোক্ত বইটি 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহ্হিদীন' মনে হয়, কারণ উহাতে আরবি ভাষায় ভূমিকা আর ফার্সি ভাষায় মূলগ্রন্থ রচিত।[১] রংপুরে তিনি ফার্সি পুস্তিকা লিখে প্রচার করেন এ কথার কোনো প্রমাণ নেই।

হিন্দুশাস্ত্রের এত শাস্ত্রগ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও রামমোহন বেদান্তসূত্রের ভাষা-বিবরণ প্রকাশের জন্য কেন উদ্যোগী হলেন? তার কারণ নিশ্চয়ই আছে। 'বেদান্তগ্রন্থে'র ভূমিকায় সে কারণ কিছুটা ব্যক্তও করেছেন:

"...কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে সকলে অনায়াসে নিশ্চয় করিবেন যে যদি রূপগুণবিশিষ্ট কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্য বেদান্তশাস্ত্রের বক্তব্য হইতেন তবে বেদান্ত পঞ্চাশদধিক পাঁচ শত সূত্রে কোন স্থানে সে দেবতার কিম্বা মনুষ্যের প্রসিদ্ধ নামের কিম্বা রূপের বর্ণন অবশ্য হইত কিন্তু ওই সকল সূত্রে ব্রহ্মবাচক শব্দ বিনা দেবতা কিম্বা মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের চর্চ্চার লেশ নাই।"[২]

সমসাময়িক পণ্ডিত-অপণ্ডিতরা নানা রকমের কূট প্রশ্ন তুলে বলতে চেয়েছিলেন যে, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা সম্ভব নয় এবং হিন্দুধর্ম প্রতিমা প্রতীক ও মনুষ্যকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজার সমর্থন করে। প্রতিপক্ষীরা আরও বলতেন যে, ব্রহ্মোপাসনা করলে লৌকিক ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান প্রভৃতি অন্তর্হিত হয়। এই শ্রেণীর আলোচনা রংপুর-বাস-কালেই হত, এবং কলকাতায় এসেও এ ধরনের কথাবার্তা নিশ্চয়ই শুনতেন। তাই বোধ হয় বেদান্তগ্রন্থে ভূমিকায় রামমোহন অতি দুঃখে লেখেন— "উত্তরের লাঘব গৌরব প্রশ্নের লঘুতা গুরুতার অনুসারে হয় অতএব পূর্ব্বলিখিত উত্তর সকলের গুরুত্ব লঘুত্ব তাহার প্রশ্নের গৌরব লাঘবের অনুসারে জানিবেন ওই সকল প্রশ্ন সর্ব্বদা শ্রবণে আইসে এ নিমিত্ত এমত অযুক্ত প্রশ্ন সকলেরো উত্তর অনিশ্চিত হইয়াও লিখা গেল...।"[৩]

---

১ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭০, ৭৩৮।
২ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, বেদান্ত গ্রন্থ, 'ভূমিকা'। পৃ. ৩।
৩ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৭-৮।

'অনুষ্ঠান' নামে দ্বিতীয় ভূমিকায় এই কথাই লেখেন, "এমত সকল প্রশ্নের শ্রবণে কেবল মানস দুঃখ জন্মে তত্রাপি কার্য্যানুরোধে উত্তর দিয়া যাইতেছি।" সর্বশেষে যে কথাটি বলেছেন সেটিই আসল— "আমাদিগ্যের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহলোকে পরলোকে কৃতার্থ হই।" শাস্ত্র ও বুদ্ধি দিয়ে সত্যকে জানতে ও উপলব্ধি করতে হবে— এই তত্ত্বটি রামমোহনের সমস্ত রচনার কেন্দ্রগত ভাব। বিদ্যা দ্বারা জানা ও বুদ্ধি দ্বারা মানা হচ্ছে সত্যনির্ধারণের পথ। বিদ্যা হচ্ছে অতীত কালের সঞ্চিত জ্ঞান, মানুষের অভিজ্ঞতা-আহরিত মানস-সম্পদ— এক্সপিরিয়েন্স। আধুনিকতার দোহাই দিয়ে এটাকে উড়িয়ে দিলে পায়ের তলার মাটি যাবে খসে। 'শাস্ত্র' বলতে আমরা বুঝি অতীতের লেখকদের গ্রন্থ। সে-সব গ্রন্থ নিশ্চয়ই অধীতব্য, কিন্তু বিচার দ্বারা গ্রহণ বা বর্জন করাই বুদ্ধিমান মানুষের লক্ষণ বলে স্বীকৃত হবে।

প্রাচীনের সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নাই— এ কথা বাতুল-উক্তি। আমার ভাষা যেমন অতীতের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা, আমার জ্ঞানভাণ্ডার তেমনি বহু শতাব্দীর বহু দেশের অসংখ্য জ্ঞানতপস্বীর সাধনালব্ধ বিদ্যা দ্বারা সমৃদ্ধ। সুতরাং অতীতের কোনো মনীষীর রচনা থেকে যদি আমার মতের সমর্থন পাই, তবে তার সত্যতা সম্বন্ধে আমি কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারি, বলও পাই এই ভেবে যে আমার মতো করে পূর্বের লোকেরাও ভেবেছিলেন। কখনো আমার অনুকূলে, কখনো প্রতিকূলে পূর্বসূরীদের মত দেখতে পাই। তবে সব মতকেই কি অভ্রান্ত বলতে পারা যায়? এমন-কি বেদবেদান্তর সব তথ্য ও তত্ত্ব নির্বিচারে মানা আজও যায় না; পূর্বেও যায় নি। সবটাই নির্ভুল বলে মানা যদি হত, তবে শাস্ত্রগ্রন্থের একটিমাত্র ব্যাখ্যান হত। তা তো হয় নি— একই শ্লোকের বহু ব্যাখ্যা দেখা যায় কেন? কত দেবদেবী, গুরু-সন্ন্যাসী এককালে পূজা পেয়েছেন, কিন্তু তাঁদের কজনকে আজ আমরা স্মরণ করে পুজো দিই। প্রাকৃতিক নির্বাচনে একদল মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়ছে, গভীরও হচ্ছে, এবং যুগপৎ নব নব অভিজ্ঞতার মধ্যে তার বিবর্তন হয়ে চলেছে। মানুষের এই স্বাভাবিক বিবর্তন বা প্রগতির পথে অনেক

আবর্জনা বা মূঢ়মতের পুঞ্জ আপনা থেকেই খসে পড়ে। আবার কতকগুলিকে আমরা বুদ্ধি ও বিদ্যা-সম্মার্জনীর সাহায্যে বিদূরিত করি। কিন্তু সমাজে এক-শ্রেণীর rag pickers বা কানিকুড়নি থাকে, যারা আবর্জনা হাৎড়ে বেড়ায়; তেমনি জ্ঞানভাণ্ডারের পরিত্যক্ত মতামতের মধ্যে একদল পণ্ডিতকে ঘুরে বেড়াতে দেখি। মহাকাল যাদের ত্যাগ করেছেন তাদের এঁরা আঁকড়ে ধরে থাকবার জন্যে সুপারিশ করেন। যে-সব অচল মতামত, যা কালাতিক্রম ক'রে টিঁকে আছে, কিন্তু বেঁচে নেই—সে-সব মৃত 'মমি'কে জিইয়ে তুলতে চায়। মুশকিল হয়েছে—আমাদের কেন, দুনিয়ার সকল দেশে, সকল ধর্মসাহিত্যে এই জীর্ণপুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকবার প্রবৃত্তি এখনও বিলুপ্ত হয় নি; সেইজন্যই প্রাচীনে-নবীনে বিরোধ।

আধুনিক বা অতি-আধুনিকরা ঠিক এর উল্টো পথের পথিক—তারা সব-কিছু অতীতকে দূর করতে চায়। কিন্তু অতীতের সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা মানুষ নিত্যনবীন হয়ে চলছে, এটা অতি বাস্তব সত্য। একে বলা যেতে পারে creative unity—অর্থাৎ নদীর প্রবাহের মতো তার গতি। অসংখ্য বন্ধন-মাঝেই তার মুক্তি।

একাদশ অধ্যায়

রামমোহন ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ, গায়ত্রী, আত্মানাত্মবিবেক, প্রভৃতি গ্রন্থ দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করলেন ও ছাপালেন একের পর এক। হিন্দুসমাজে মাত্র তিন শতাংশ বা মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণের বাস; এই নিতান্ত সংখ্যালঘু বর্ণ ছিল হিন্দুধর্মের রক্ষক ও অধ্যাত্মবিদ্যার পরিবেশক। হিন্দুর অধ্যাত্মসম্পদ সংস্কৃতভাষার মধ্যে বন্দী। ব্রাহ্মণসমাজের বাইরে যে বিরাট শূদ্র সমাজ বিদ্যমান তারা সকলপ্রকার ধর্মের উৎস সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ, তাই ধর্মকর্মের জন্য ব্রাহ্মণদের উপর নির্ভরশীল। রামমোহন সেই ভাষার বাধা ভেঙে দিয়ে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যকে সকলের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন— এই ঘটনাকে বিপ্লবই বলব। বহু শতাব্দী পূর্বে চৈতন্য মহাপ্রভু-প্রণোদিত হয়ে বাঙালি কবিরা বাংলার মাধ্যমে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। বর্তমান যুগে এই প্রথম, যখন বাংলা ভাষার মাধ্যমে বেদান্তাদি গ্রন্থ বাঙালি পড়বার সুযোগ লাভ করল, ভাষার বাঁধ ভাঙবার সঙ্গে মানুষের মুক্তির নানা পথ মুক্ত হয়ে গেল।

বেদান্ত গ্রন্থ বা ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ ও যুগপৎ শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতভাষ্যের ভাবার্থ বাংলায় প্রকাশ করে রামমোহন নিবৃত্ত হলেন না; তিনি আরও সহজ করে ও সংক্ষেপে বহু অবান্তর বিষয় বাদ দিয়ে 'বেদান্তসার' লিখলেন বাংলায়। সে গ্রন্থও ছাপা হয় ১৮১৫ সালে; অর্থাৎ দুটি বই একই বৎসরে প্রকাশিত হয়। 'বেদান্তসার' ক্ষুদ্র গ্রন্থ হলেও বেদান্ততত্ত্ব বুঝবার পক্ষে আদর্শ গ্রন্থ বলতে পারি। মূল বেদান্তগ্রন্থের সূত্রগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং শঙ্করাচার্য সেই-সব সূত্র ব্যাখ্যা করার সময় বহু শ্রুতি বা উপনিষদের বচন উদ্‌ধৃত করেছেন। কোনো সূত্রের মধ্যে শ্রুতির বচন ইঙ্গিতে আভাসে দেওয়া আছে, তার অর্থ গুরুশিষ্য-পরম্পরায় ব্যাখ্যান ব্যতীত বোঝাই কঠিন। শঙ্কর তাঁর গুরু গোবিন্দ ভগবৎপাদের নিকট থেকে সম্প্রদায়-ধারায় যে শিক্ষা পেয়েছিলেন ও শ্রুতিবাক্য শুনেছিলেন— ভাষ্য লেখবার সময়ে সে-সব উদ্‌ধৃতি স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন। কোনো সূত্রের মধ্যে শ্রুতির বচন ইঙ্গিতে আভাসে দেওয়া আছে, ভাষ্য লেখবার সময় সে-সব

উদ্ধৃতি স্পষ্ট করেছেন। ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে উদ্ধৃত শ্রুতিবচনগুলি এমনই প্রচ্ছন্ন যে সম্প্রদায়ের বাইরে কারও তার মধ্যে প্রবেশ করা অসম্ভব। এগুলি শিষ্যদের মনে রাখবার জন্য বা সূত্র ধরিয়ে দেবার জন্য রচিত হয়।

বেদান্তসার গ্রন্থে রামমোহন সেই-সব উপনিষদ বা শ্রুতিবচনগুলি সুন্দর-ভাবে সাজিয়ে ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই এই বইটার একটা বিশেষ স্থান আছে বেদান্ততত্ত্ব বোঝাবার জন্য। বাংলাভাষায় বেদান্তকে সহজ করে প্রকাশের এই প্রথম চেষ্টা।

রামমোহনের রচনাবলী প্রথম গ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশিত হয় রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সম্পাদনায় ১৮৮০ অব্দে। প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে লিখিত হয় —

"বেদান্তসূত্র অতিবিস্তৃত এবং কঠিন গ্রন্থ। যদিও রামমোহন রায় স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিপ্রভাবে সংক্ষেপে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু ততখানিও অধ্যয়ন করা এবং তাহার মর্ম্ম ও মীমাংসা অবধারণ করা সকলের পক্ষে সহজ হইবে না। এ জন্য তিনি উহার তাৎপর্য্য অর্থাৎ সার সঙ্কলনপূর্ব্বক 'বেদান্ত সার' নামে…গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার প্রকাশের শক লিখিত নাই, কিন্তু বোধহয় বেদান্ত গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গেই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। যে হেতু ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে (১৭৩৮শকে) এই গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ দেখিয়া খৃষ্টীয় মিশনারীগণ চমৎকৃত হইয়া প্রণেতার পরিচয় ইউরোপে প্রচার করিয়াছিলেন।"

আমরা পূর্বে বলেছি, বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের সূত্রসংখ্যা ৫৫৫টি। রামমোহন মাত্র ৩৪টি সূত্র নির্বাচন করে বেদান্তদর্শনের মূলকথা ব্যক্ত করেছেন।

রামমোহনের এই 'বেদান্তসার' ব্যতীত আরও দুইখানি প্রাচীন গ্রন্থ ঐ নামে প্রচলিত আছে; একখানির লেখক রামানুজ (১০১৭-১১৩৭?); আর দ্বিতীয় গ্রন্থের লেখক 'পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ সদানন্দ যোগীন্দ্র (ষোড়শ শক)।' এই বইখানি বেদান্ত-পাঠার্থীদের পক্ষে প্রথম সোপানরূপে পড়ানো হয়।

আমরা 'বেদান্তসার' থেকে কয়েকটি পংক্তি রামমোহনের ভাষায় উদ্ধৃত করছি —

"অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে আশ্রমী জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ হয়েন...। ব্রহ্মজ্ঞানী সমুদায় বস্তু খাইবেন অর্থাৎ কি অন্ন কাহার অন্ন এমৎ বিচার করিবেন না...।

"সর্ব্বপ্রকার অন্নাহারের বিধি জ্ঞানীকে আপৎকালে আছে যেহেতু চাক্রায়ণ ঋষি দুর্ভিক্ষেতে হস্তিপালকের অন্ন খাইয়াছেন এমত বেদে [ছান্দোগ্য] দেখিতেছি।

"যেখানে চিত্তের স্থৈর্য্য হয় সেই স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক।"[১]

এখানে একটা কৌতুকপ্রদ ঘটনা না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে চাক্রায়ণ-কাহিনী বহু বিস্তারে বর্ণিত আছে। চাক্রায়ণ হস্তিপালকের অন্ন গ্রহণ করেন, কিন্তু জলপান করেন নি। দোষ অজাতের জলগ্রহণে, সাধারণ খাদ্যভক্ষণে বাধা নাই তো দেখছি। এখনও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণরা শূদ্রের ঘরে ভাত ছাড়া ঘিয়ে ভাজা খাদ্য খান।

'বেদান্তসার' বাংলায় মুদ্রিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হল। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভভাগে কয়জন হিন্দু ইংরেজি জানত বা ইংরেজি পড়তে পারত! "...গত দশ বৎসরের মধ্যে... কলিকাতা নগরে স্বীয় ভাষার তুল্য ইঙ্গরেজী ভাষাভিজ্ঞ শতাবধি দুই শত যুবা মহাশয়েরদিগকে দর্শায়ন যায়।"[২]

তাই প্রশ্ন, রামমোহন ইংরেজিতে কেন অনুবাদ করতে গেলেন এই কঠিন বিষয়ের বই।[৩]

সে যুগের সাধারণ ইংরেজের ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অত্যন্ত হীন ধারণা ছিল। প্রথমত যে ইংরেজরা এ দেশে আসত তাদের অধিকাংশই সাহসিক (adventurer), বণিক, ব্যাঙ্কার, ব্যারিস্টার, সৈনিক বা কেরানি।

---

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১২৫।

২ সমাচার দর্পণ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। সংবাদপত্রে সেকালের কথা। দ্র. প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৪।

৩ গ্রন্থের ইংরেজি নামটার মধ্যে বিষয়বস্তুর বর্ণনা পাওয়া যায়—Translation of an abridgment of the Vedanta or the Resolution of all Vedas ; the most celebrated and revered work of Brahmanical theology, establishing the unity of the Supreme Being and that He alone is the object of propitiation and worship. বইটি ছাপা হয় ১৮১৬ সালের গোড়ায়।

অর্থার্জনই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় দল খ্রীষ্টান পাদরি। ১৮১৩ সাল থেকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের বাধা দূর হয়ে যাওয়াতে তাঁরা স্বচ্ছন্দে হিন্দু-ধর্ম আক্রমণ করছেন। এ সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। মোট কথা, হিন্দু ভারতের অন্ধকার দিকটার প্রতি খ্রীষ্টানদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এবং সেই-সবকে অতিরঞ্জিতভাবে প্রকাশ করাই ধর্মপ্রচারের অনুকূল হবে বলে মনে করতেন। কিন্তু হিন্দুর সবটাই সতীদাহ, চড়কপূজা, গঙ্গাজলে শিশুকন্যা বিসর্জন, প্রভৃতি বর্বর প্রথায় সীমিত নয়। তার ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ আদর্শ যে নিহিত আছে, রামমোহন সেই দিকটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই ইংরেজিতে 'বেদান্তসার' প্রকাশ করলেন। ইতিপূর্বে সংস্কৃত থেকে যা ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে তার সংখ্যা খুবই কম। ১৭৮৯ অব্দে স্যার উইলিয়ম জোন্স্ অভিজ্ঞানশকুন্তলের ইংরেজি অনুবাদ করেন; তারপর উল্লেখযোগ্য অনুবাদ উইলসন-কৃত 'মেঘদূত' (১৮১৩)। সংস্কৃত সাহিত্যের টুকরা নমুনা বিদেশীরা পেয়েছিল, কিন্তু হিন্দু ভারতের আত্মার অরূপমূর্তি এখনও পশ্চিমের দৃষ্টিভূত হয় নি। রামমোহনের বেদান্তসূত্রের অনুবাদ প্রথম গ্রন্থ— যাতে ভারতের একেশ্বরবাদ ব্যাখ্যাত হল।

অনুবাদের ভূমিকার শীর্ষদেশে লিখিত আছে: To the Believers of the only true God। বলা যেতে পারে এটাই উৎসর্গপত্র। বাংলার এরূপ উৎসর্গ বা ভূমিকা নেই। ইংরেজি ভূমিকায় লিখেছেন —

"The greater part of Brahmanas, as well as of other sects of Hindoos, are quite incapable of justifying that idolatry which they continue to practise. When questioned on the subject, in place of adducing reasonable arguments in support of their conduct, they conceive it fully sufficient to quote their ancestors as positive authorities. And some of them became very ill-disposed towards me, because I have forsaken idolatry for the worship of the true and eternal God." যুক্তিতে পরাস্ত হলে লোকে প্রশ্ন করে— বাপ-পিতামহের সময় থেকে যা মেনে আসছে তা কি অসত্য হতে পারে?

ইংরেজিতে অনুবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বললেন: "to prove to my European friends that the superstitious practices which

deform the Hindoo religion have nothing to do with the pure spirit of its dictates."

এই ভূমিকা থেকে জানতে পারি, এই গ্রন্থের বাংলা ও হিন্দুস্থানী সংস্করণ বিনামূল্যে বিতরিত হয়। কেরী-সাহেব বাংলা বাইবেল এই সময়ে হিন্দু-মুসলমান জনতার মধ্যে বিলি করছিলেন; আমাদের মনে হয় সেই দৃষ্টান্তেই রামমোহন হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিতরণের ব্যবস্থা করেন। রামমোহনের আশা ছিল correct reasoning and dictates of common sense হলে মানুষের ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান স্বতই উদ্ভাসিত হবে। কিন্তু মুশকিল সেখানেই; সাধারণ মানুষ যুক্তির চর্চা করতে নারাজ। রামমোহন শাস্ত্রকে মানতেন, কিন্তু সহজ বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের সাহায্যে শাস্ত্রের বক্তব্যর যাচাই করতেন। তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন এর যুক্তিবাদ তিনি কি ভাষ্য রচনায়, কি প্রবন্ধ লেখায় ত্যাগ করেন নি। ব্রহ্মসূত্র ও যে পাঁচটা উপনিষদের ভাষা-বিবরণ করেছিলেন— তারা যেমন যুক্তিবাদের উপর, তেমনি ধ্যানলব্ধ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে রামমোহন-কৃত বেদান্তসারের ইংরেজি অনুবাদ বিলাতেও প্রচারিত হয় এই সময়েই। তাঁর বন্ধু জন ডিগ্‌বী মুখবন্ধ লিখে ইংলণ্ডে সেটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। সেই বৎসরই (১৮১৭) জারমেনির বিশ্ববিদ্যালয় Jena থেকে এই বইয়ের জারমান অনুবাদ *Anflosing des Wedant* নামে প্রকাশিত হয়।

বেদান্তসার গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের পূর্বে যে ভূমিকা আছে তা বাংলা গ্রন্থে নেই। আমরা রামমোহনের এই ইংরেজি ভূমিকার এক বাংলা অনুবাদ সম্পূর্ণ উদ্‌ধৃত করছি —

"একমাত্র অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরে-বিশ্বাসীদিগের নিকট নিবেদন—

"ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের এবং হিন্দুসমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়েরও অধিকাংশ ব্যক্তিই, আজ পর্যন্ত যে পৌত্তলিক পূজার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, সেই পৌত্তলিকতাকে যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক সমর্থন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। এই বিষয়ে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা তাঁহাদের আচরণ সমর্থন করিবার জন্য যুক্তিপূর্ণ বিচার পরিদর্শনের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ তাঁহাদের পূর্বপুরুষের দোহাই দেওয়াই যথেষ্ট মনে করেন। এবং

আমি একমাত্র নিত্যসত্য ঈশ্বরের পূজার জন্য পৌত্তলিকতাকে পরিহার করিয়াছি বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। সুতরাং আমার নিজের এবং আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদিগের ধর্মবিশ্বাসের যাথার্থ্য প্রতিপাদনকল্পে কিছুকাল যাবৎ আমি আমাদের ধর্মশাস্ত্র সমূহের যথার্থ অর্থটিতে আমার স্বদেশবাসীকে বিশ্বাস করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। এবং গতানুগতিক পথ পরিহার করিয়া আমার ভিন্নরূপে চলিবার জন্য কতকগুলি অবিবেচক লোক আমার উপর যে অপযশ ও লাঞ্ছনা বর্ষণ করিতেছেন, আমি যে সেই-সকল লাঞ্ছনা অপযশের ভাজন হইবার যোগ্য নই, তাহাও প্রমাণ করিবার জন্য যত্ন করিতেছি।

"হিন্দু যে বেদসমূহকে বিশ্বসৃষ্টির সহিত সমকালীন বলিয়া বিশ্বাস করেন, হিন্দুর সমগ্র তত্ত্বশাস্ত্র, ব্যবহারিক ধর্মশাস্ত্র এবং সাহিত্য— সমুদায়ই সেই বেদসমূহের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই বৈদিক গ্রন্থগুলি অতীব বৃহৎকায় এবং অতিশয় দুরূহ ও আলংকারিক বা রূপকাচ্ছন্ন রীতিতে লিখিত হওয়ায় তাহার ফলও সহজেই অনুমেয়— অনেক স্থলেই আপাত-বিভ্রমজনক এবং পরস্পরবিরোধী।

"দুই সহস্র বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে মহামতি বেদব্যাস এই সকল মৌলিক শাস্ত্রসমূহ হইতে নিরন্তর যে বৈষম্য বা বুদ্ধিব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছিল তাহা চিন্তা করিয়া অতিশয় বিচারপূর্বক (উপাসনাকাণ্ড, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে বিভক্ত) সমগ্র বেদগ্রন্থরাজির একখানি পরিপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত সার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং বেদের মধ্যে যে সকল স্থান আপাতবিরুদ্ধার্থক ছিল, তাহাদেরও সামঞ্জস্যময় মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন।

"বেদ এবং অন্ত—'এই দুইটি সংস্কৃত শব্দের সমবায়ে তিনি তাঁহার গ্রন্থের নামকরণ করেন বেদান্ত— অর্থাৎ সমগ্র বেদসমূহের মীমাংসা বা সন্দিগ্ধার্থ নিরসন। আজ পর্যন্ত (১৮১৬ খৃঃ অঃ) এই গ্রন্থ (বেদান্ত) সমগ্র হিন্দু-জাতির প্রগাঢ় শ্রদ্ধা লাভ করিয়া আসিয়াছে এবং বেদসমূহের অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিকীর্ণার্থের পরিবর্তে এই গ্রন্থখানিই তাহাদের সমপ্রমাণরূপে আশ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু সংস্কৃতভাষারূপ অন্ধকারময় যবনিকায়

অন্তরালে ইহা লুক্কায়িত থাকায় ('concealed within the dark curtain of the Sanskrit language'), এবং কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকেই এই গ্রন্থের ব্যাখ্যায়, এমন-কি এতাদৃশ পুস্তকের স্পর্শে অধিকারী করিয়া রাখায়, এই বেদান্ত গ্রন্থ, যদিও ইহা নিরন্তর প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়া থাকে, তথাপি সাধারণের নিকট অল্পই পরিচিত, এবং বাস্তবিক অতিশয় অল্পসংখ্যক হিন্দুরই আচরণ ইহার উপদেশের কথঞ্চিৎ অনুযায়ী।

"আমার মত সমর্থনের জন্য আজ পর্যন্ত সাধারণের নিকট অপরিচিত এই বেদান্ত গ্রন্থের তথা ইহার সার ভাগের, হিন্দী ও বাংলা অনুবাদ আমার সাধ্যানুসারে করিয়া বিনামূল্যে আমার স্বদেশবাসীদিগের মধ্যে যতদূর ব্যাপক-ভাবে বিতরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব, ততদূর বিতরণ করিয়াছি। বেদান্তের সংক্ষিপ্ত সারভাগের বর্তমান ইংরাজি অনুবাদের দ্বারা আমি আশা করি যে, আমি আমার ইউরোপীয় বন্ধুগণের নিকট প্রমাণ করিতে পারিব যে, কুসংস্কারপূর্ণ যে সমুদায় আচরণ বা অনুষ্ঠান আমাদের হিন্দুধর্মকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার সহিত এই ধর্মের পবিত্র উপদেশাবলীর মর্মগত কোনও সম্পর্ক নাই।

"আমি বহু য়ুরোপীয় ব্যক্তির লেখায় এবং তাঁহাদের সহিত কথোপকথন-কালে দেখিয়াছি যে তাঁহারা হিন্দুর পৌত্তলিকতা রূপটিকে লঘু ও প্রচ্ছন্ন করিয়া এইরূপ উপদেশ দানের অভিলাষী হন যে, পূজার সকল বস্তুই পূজকেরা সেই পরমপুরুষের লাক্ষণিক প্রতিভূরূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন। যদি বিষয়টি বস্তুতই এইরূপ হইত, তাহা হইলে বোধ হয় এই বিষয়ের তত্ত্বনিরূপণে আমি প্রবর্তিত হইতে পারিতাম, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, ইদানীন্তনকালের হিন্দুগণের এ বিষয়ে এরূপ কোন ধারণা নাই; পরন্তু আপন আপন অধিকারক্ষেত্রে পূর্ণ ও স্বাধীন বা স্বতন্ত্র শক্তিবিশিষ্ট অসংখ্য দেবদেবীর বাস্তব সত্তায় তাঁহারা দৃঢ়বিশ্বাসী; এবং তাঁহাদেরই— পরন্তু সত্যরূপ পরমেশ্বরের নহে— তুষ্টিবিধানের জন্য মন্দিরসমূহ নির্মিত এবং বিবিধ পূজোৎসবাদির অনুষ্ঠান সংঘটিত হইতেছে। যাহা হউক, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং আমিও সর্বান্তঃকরণে প্রমাণ করাইয়া দেখাইতে চাই যে, আমাদের (হিন্দুদের) পূজার প্রত্যেক অনুষ্ঠানটি এক অদ্বিতীয় সত্যদেবতার রূপকাবৃত বা লাক্ষণিক পূজাপদ্ধতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

কিন্তু বর্তমান সময়ে এই তথ্যটির বিস্মৃতি ঘটিয়াছে এবং অনেকের নিকট এই বিষয়ের উল্লেখ পর্যন্ত নাস্তিকতা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

"আমি আশা করি, আমার এই সকল উক্তি হইতে কাহারও এইরূপ ধারণা হইবে না যে, অন্যান্য ব্যক্তিগণের ধর্মবিশ্বাসের অপেক্ষা আমার ধর্ম-বিশ্বাসের প্রাধান্য বা অধিকপ্রেয়তা স্থাপনে আমি অভিলাষী। এই বিষয়ের তর্ক-বিতর্কের মাত্রা যতগুণ বর্ধিতই হউক না কেন, ইহার ফল চিরদিন অসন্তোষজনকই থাকিবে ; কারণ, মানুষের যে বিচারশক্তি মানুষকে তাহার বিচারগ্রাহ্য বিষয়ের নিঃসংশয়তায় উপনীত করাইয়া দেয়, তাহা তাহার বিচারশক্তির অতীত বিষয়ের সমস্যার সমাধানে কোনরূপে ফলোৎ-পাদক হয় না। আমি শুধু এই কথাটিই বলিতে চাই যে, যদি অভ্রান্ত যুক্তি ও সাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রেরণা একমাত্র সর্বজ্ঞ অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের শাস্তা, পাতা ও অনাদিপুরুষের বিশ্বাস উৎপাদন করে, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে আমাদের বুদ্ধিবচনের অতীত সর্বশক্তিমান পরমসত্তা বলিয়াও জ্ঞান করিব ; এবং যদিও অশিক্ষিতচিত্ত ব্যক্তিগণ এবং এমন-কি কতিপয় বিজ্ঞ (পরন্তু এই একটি বিষয়ে সংস্কারান্ধ) ব্যক্তিও নির্বিচারে, সর্বদা তাঁহাদের চক্ষুগ্রাহ্য এবং তাঁহাদের স্পর্শাদির গম্যরূপে প্রতীয়মান যে কোনও বস্তুকে উপাস্যরূপে নির্বাচিত করিয়া লন, তথাপি তাঁহাদের এইরূপ আচরণের অসঙ্গতির মাত্রা কিয়ৎ পরিমাণেও হ্রাস পায় না।··· ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া বিবেক ও সরলতার দ্বারা প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে যাইয়া আমি আমার প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও পার্থিব সুখ-সুবিধার জন্য বর্তমান সামাজিক ধর্মপ্রথার উপর নির্ভরশীল কতিপয় আত্মীয়স্বজনেরও অনুযোগ ও তিরস্কারের ভাজন হইয়াছি।

"কিন্তু এই সকল (অনুযোগ, অভিযোগ ও তিরস্কার) যতই পুঞ্জীভূত হউক না কেন, তাহা আমি এই বিশ্বাসে সহ্য করিতে পারি যে, এমন এক-দিন আসিবে যেদিন আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাসমূহ নিরপেক্ষভাবে আলোচিত হইবে। সে যাহাই হউক, মানুষে যাহাই বলুক না কেন, আমি এই সান্ত্বনা হইতে কখনই বঞ্চিত হইব না যে, যে পরমপুরুষ গোপনে গোপনে সমস্তই অবলোকন করেন এবং প্রকাশ্যে পুরস্কার দেন, তিনি আমার অন্তরের অভিপ্রায়সমূহ অনুমোদন করিয়াছেন।"[১]

১ রামমোহন-স্মৃতি, পৃ. ৫৭-৫৮।

দ্বাদশ অধ্যায়

রামমোহন বেদান্ত গ্রন্থ বা ব্রহ্মসূত্রের ভাষা-বিবরণ ও বেদান্তসার সংকলন করার পর উপনিষদ-অনুবাদে মন দিলেন। উপনিষদ বলতে কী বুঝায় সে সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি—এখানে রামমোহন এতদ্‌সম্পর্কে কী বলেছিলেন সেইটি উদ্‌ধৃত করছি :

"ব্রহ্মবিষয়ের বিদ্যাকে উপনিষৎ শব্দে কহা যায়। অথবা যে বিদ্যা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করান সেই বিদ্যাকে উপনিষৎ শব্দে কহি। শমদমাদিবিশিষ্ট পুরুষ উপনিষদের অধিকারী জানিবে। সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম উপনিষদের বক্তব্য হয়েন। সর্ব্বপ্রকার দুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি উপনিষৎ অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়। আর উপনিষদের সহিত মুক্তির জন্যজনকভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ উপনিষদের জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ যে মুক্তি তাহা হয়।"[১] এই উদ্‌ধৃত অংশটুকু শঙ্কর-কৃত ভাষ্যের অনুবাদ।

অন্যত্র লিখেছেন—"ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন যে সমুদায় বেদ একবাক্যতায় বুদ্ধি মন বাক্যের অগোচর যে ব্রহ্ম কেবল তাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছেন সেই সকল সূত্রের অর্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের বুঝিবার নিমিত্তে সংক্ষেপে ভাষাতে বিবরণ করা গিয়াছে এক্ষণে দশোপনিষৎ যে মূল বেদ ও যাহার ভাষ্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন তাহার বিবরণ সেই ভাষ্যের অনুসারেতে [বঙ্গ] ভাষাতে করিবার যত্ন করা গিয়াছে।..."

রামমোহনের ইচ্ছা ছিল শঙ্করাচার্যের পথাশ্রয়ী হয়ে দশোপনিষদ বাংলায় প্রকাশ করবেন : "এই সকল উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে পরমেশ্বর এক মাত্র সর্ব্বত্র ব্যাপী আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগোচর হয়েন তাঁহারি উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয় আর নাম রূপ সকল মায়ার কার্য্য হয়।"

---

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১২।

রামমোহন শঙ্করের ভাষ্যের রীতি অবলম্বন করে প্রতিপক্ষের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন : "যদি কহ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে যে সকল দেবতাদের উপাসনা লিখিয়াছেন, সে সকল কি অপ্রমাণ, আর পুরাণ এবং তন্ত্রাদি কি শাস্ত্র নহেন। তাহার উত্তর এই যে পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন যেহেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধি মনের অগোচর করিয়া পুনঃ২ কহিয়াছেন তবে পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনার যে বাহুল্যমতে লিখিয়াছেন সে প্রত্যক্ষ বটে কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ২ এইরূপে করিয়াছেন যে যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত না হইয়া রূপ কল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয়, কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই।"[১]

রামমোহন দশোপনিষদ বাংলাভাষায় বিবরণ করবেন—এইরূপ সংকল্প গ্রহণ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাঁচখানি মাত্র অনুবাদ প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন ; সেগুলি হচ্ছে—সামবেদীয় তলবকার বা কেন উপনিষদ ;[২] যজুর্বেদীয় ঈশ ও কঠ উপনিষদ ; অথর্ববেদীয় মাণ্ডুক্য ও মুণ্ডক উপনিষদ।

শঙ্করাচার্য এই পাঁচটি ছাড়া ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ও কৌষিতকী ; যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর ও বৃহদারণ্যক : সামবেদীয় ছান্দোগ্য এবং অথর্ব-বেদীয় প্রশ্ন উপনিষদ— এই ১২টি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন। রাম-মোহন যে দশোপনিষদের কথা বলেছেন তাতে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য ধরা হয় নি। কেন গণনা থেকে বাদ দিলেন, সে সম্বন্ধে আমাদের অনুমান পরে বলব।

এখন রামমোহন-কৃত পঞ্চ উপনিষদের ভাষা-বিবরণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। কালানুযায়ী প্রকাশিত তালিকায় প্রথমে পাই তলবকার বা কেন উপনিষদ। ঈশোপনিষদের ভূমিকায় লিখিত হয়—"ঈশোপনিষদের

---

১ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৫।

২ "সামবেদের জৈমিনীয় বা তলবকার ব্রাহ্মণের আটটি অধ্যায়। এটি আরণ্যধর্মী। তারই মধ্যে সপ্তম অধ্যায়ের ১৮শ হইতে ২১শ খণ্ড পর্যন্ত হল কেন বা তলবকার উপনিষৎ।" — অনির্বাণ, বেদমীমাংসা, পৃ. ১১১।

ভাষাবিবরণ সমুদায় ছাপানোর পূর্ব্বেই সামবেদের তলবকার উপনিষৎ ছাপানো” হয়।

১৮১৬ অব্দের ২৯ জুন কেনোপনিষদ ও ঐ বৎসরের ১৩ জুলাই ঈশোপনিষদ প্রকাশিত হয়। কেনোপনিষদই বিবরণের জন্য প্রথম গ্রহণ করেন বলিয়া মনে হয়। ইহার কি কোনো কারণ আছে?

আমাদের তো মনে হয় কারণ ছিল। ‘জিজ্ঞাসা’র দ্বারা এই উপনিষদের আরম্ভ। সন্দেহ বা জিজ্ঞাসা হইতেই তত্ত্বানুসন্ধান শুরু হয়। মীমাংসাকার তাঁর সূত্র শুরু করছেন ধর্মজিজ্ঞাসা দিয়ে, বেদান্ত আরম্ভ হয়েছে ‘ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’ নিয়ে। বেদেও সেই জিজ্ঞাসা। ঋগ্‌বেদীয় ঋষি প্রজাপতিপুত্র হিরণ্যগর্ভ প্রশ্ন করেছিলেন— “কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম”— “কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি হবি।” (১০ মণ্ডল, ১২১ সূক্ত। দ্রষ্টব্য বেদবাণী। পৃ. ৪৩-৪৬)

তলবকার ঋষি সেই সুরে প্রশ্ন করলেন—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং বা উ দেবো যুনক্তি।

রামমোহন-কৃত অনুবাদই উদ্‌ধৃত করলাম—

“কোন্ কর্ত্তার ইচ্ছা মাত্রের দ্বারা মন নিযুক্ত হইয়া আপনার বিষয়ের প্রতি গমন করেন অর্থাৎ আপন বিষয়ের চিন্তা করেন। আর কোন্ কর্ত্তার আজ্ঞার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া সকল ইন্দ্রিয়ের প্রধান যে প্রাণ বায়ু তিনি আপন ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হয়েন। আর কার প্রেরিত হইয়া শব্দরূপে বাক্য নিঃসরণ হয়েন যে বাক্যকে লোকে কহিয়া থাকেন।

“আর কোন্ দীপ্তিমান কর্ত্তা চক্ষু ও কর্ণকে উহাদের আপন ২ বিষয়তে নিয়োগ করেন।”[১]

শিষ্যের এইরূপ জিজ্ঞাসা এবং গুরুর উত্তর— এইভাবে গ্রন্থের আরম্ভ।

“শিষ্যের প্রশ্ন গুরুর উত্তর কল্পনা করিয়া এ সকল শ্রুতিতে আত্মতত্ত্ব

---

১ পুর্বোল্লিখিত রামমোহন-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৮৭।

কহিয়াছেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রশ্ন উত্তররূপে যাহা কহা যায় তাহার অনায়াসে বোধ হয় আর দ্বিতীয় তাৎপর্য্য এই যে প্রশ্ন উত্তরের দ্বারা জানাইতেছেন যে, উপদেশ ব্যতিরেকে কেবল তর্কেতে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না।"[১]

এই শেষোক্ত 'তর্কেতে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না' বাক্যটি ভাববার মতো। কারণ আমরা প্রায়ই শুনি ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। এই দুটি বাক্য কি একই অর্থবোধক ? তা নয়। শঙ্কর ও রামমোহন গুরু-শিষ্য-পরম্পরা যুক্তিবিচারকে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের উপায় বলে মনে করতেন। নৈয়ায়িকদের তর্কসর্বস্ব বাগ্‌বিধি পরমসত্য-উপলব্ধির সহায় না হয়ে নাস্তিক্যের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই জন্যই রামমোহন বলেছেন, কেবল তর্কেতে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না।

রামমোহন কি ব্রহ্মসূত্রের কি উপনিষদের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাই অবলম্বনে সংক্ষেপতঃ ভাষাবিবরণ প্রকাশ করেছেন। এই বিবরণ কী প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত তার উদাহরণ উদ্‌ধৃত করছি —

"যেহেতু ব্রহ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলের জ্ঞানেন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়াছেন এই হেতু চক্ষুঃ তাঁহাকে দেখিতে পায়েন না বাক্য তাঁহাকে কহিতে পারেন না আর মন তাঁহাকে ভাবিতে পারেন না এবং নিশ্চয় করিতেও পারেন না অতএব শিষ্যকে কি প্রকারে ব্রহ্মের উপদেশ করিতে হয় তাহা আমরা কোন মতে জানি না। কিন্তু বেদে এক প্রকারে উপদেশ করেন যে যাবৎ বিদিত বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তুকে জানা যায় তাহা হইতে ভিন্ন হয়েন এবং অবিদিত হইতে অর্থাৎ ঘট পটাদি হইতে ভিন্ন হইয়া ঘট পটাদিকে যে মায়া প্রকাশ করেন সে মায়া হইতেও ভিন্ন ব্রহ্ম হয়েন। তর্ক এবং যজ্ঞাদি শুভকর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞানগোচর হয়েন না কিন্তু এইরূপ আচার্য্যের কথিত যে বাক্য তাহার দ্বারা এক প্রকারে তাঁহাকে জানা যায় ইহা আমরা পূর্ব্বে আচার্য্য-দের মুখে শুনিয়া আসিতেছি যে আচার্য্যেরা আমাদিগ্যে ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছেন।"[২]

---

১ পূর্বোল্লিখিত রামমোহন-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৮৭।

২ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৮৮।

এই শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ করলে এইরূপ হবে—

সেখানে (ব্রহ্মে) চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, না মন। জানি না; কিরূপে শিষ্যকে উপদেশ করতে হয় তাও জানি না। তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বস্তু হইতে পৃথক্। যাঁরা সে বিষয়ে (ব্রহ্মতত্ত্ব) স্পষ্ট করে বলেছেন, সেই পূর্বাচার্যগণের নিকট আমরা এরূপ শুনেছি।

অনুবাদ থেকে ভাষা-বিবরণের মধ্যে বিষয়টাকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

কেনোপনিষদের মূল বক্তব্য সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কৃত উপনিষদের ভূমিকায় বিবৃত হয়েছে; জিজ্ঞাসু পাঠক সেই বই দেখতে পারেন।

ঈশোপনিষদ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেও কিছু আলোচনা করেছি। এই উপনিষদ সংহিতার অন্তর্গত; অর্থাৎ কোনো ব্রাহ্মণ আরণ্যকের অংশ নয়। এর মাত্র ১৮টি মন্ত্রের মধ্যে এমন কতগুলি গভীর উক্তি আছে যা উপনিষদ সাহিত্যে অতুলনীয়।

এই উপনিষদের ভাবনাগুলির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যাজ্ঞবল্ক্যের পরিপূর্ণ জীবনদর্শন এই উপনিষদে ও বৃহদারণ্যকে রূপগ্রহণ করেছে। এর নির্গলিত উপদেশ— "ঈশ্বর-চৈতন্য দ্বারা সব কিছু উদ্‌ভাসিত দেখতে হবে। ত্যাগ আর ভোগের মধ্যে বিরোধ নেই। জীবন হেয় নয়। কর্ম করে যেতে হবে, কিন্তু নির্লিপ্ত হয়ে। আত্মানুভবের চরম— আত্মাই সব কিছু। অবিদ্যা এবং বিদ্যার, অসম্ভূতি এবং সম্ভূতির সহবেদন চাই। যেমন সত্যকে দেখতে হবে আলোর আড়াল ঘুচিয়ে, তেমনি দেখতে হবে সেই পরমপুরুষের কল্যাণতম পুরুষকেও। তিনি আর আমি এক। অমৃত জীবনে আমি তাঁরই ক্রতু।"[১]

কেনোপনিষদ প্রকাশিত হবার কয়েকদিন পরে ঈশোপনিষদ বাহির হয় (১৩ জুলাই ১৮১৬)। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রামমোহন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাই যে শ্রেষ্ঠ, তার বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্‌ধৃত করেছেন। ভূমিকাটি

১ অনির্বাণ, বেদমীমাংসা, পৃ. ১৮৭-৮৮।

পড়লে মনে হয়, কলকাতায় এসে আত্মীয়সভা স্থাপন করা থেকেই তাঁর মতামতের সমালোচনা পরোক্ষে প্রত্যক্ষে শুরু হয়েছিল। মানিকতলার বাড়িতে আত্মীয়সভার অধিবেশন হয়— সেখানে বেদ পাঠ হয় ও ব্রহ্মসংগীত গীত হয়। ১৮১৬ সালে রচিত একটি ব্রহ্মসংগীত উদ্‌ধৃত করছি— তার ভাব ও ভাষা সেই যুগের ধর্মবিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি :

কে ভুলালো হায়!
কল্পনাকে সত্য করে জান, একি দায়।
আপনি গড়হ যাকে
যে তোমার বশে তাঁকে
কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়?
কখনো ভূষণ দেও, কখনো আহার ;
ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেকে করহ সংহার ;
প্রভু বলি মান যারে
সম্মুখে নাচাও তারে—
হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায়?

কলকাতার বহু ভদ্র আত্মীয়সভায় আসতে আরম্ভ করেন রামমোহনের নামডাকে আকৃষ্ট হয়ে। কিন্তু ধর্মমত ও মুক্তবুদ্ধির আলোচনা শুনে অনেকেই সরে পড়েন এবং কেউ কেউ সভার নামে কুৎসা রটনাও শুরু করে দেন।

ঈশোপনিষদের ভূমিকা ও অনুষ্ঠান নামে দ্বিতীয় ভূমিকা নিরাকার ব্রহ্ম-উপাসনার সমর্থনে দীর্ঘ সমালোচনা। রামমোহন-লেখনী-নিঃসৃত এই প্রথম প্রবন্ধ, যাতে তিনি তাঁর মত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। বহু শাস্ত্র থেকে বচন উদ্‌ধৃত করা ছাড়াও তিনি যুক্তির দ্বারাও নিজমত প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্কের নমুনা আমরা উদ্‌ধৃত করছি :

"পণ্ডিত সকল যাঁহারা শাস্ত্রার্থের প্রেরক হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই বিশেষ মতে আত্মনিষ্ঠ হওয়াকে প্রধান ধর্ম্ম করিয়া জানিয়া থাকেন কিন্তু সাকার উপাসনায় যথেষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং ব্রত যাত্রা মহোৎসব আছে সুতরাং ইহার বৃদ্ধিতে লাভের বৃদ্ধি অতএব তাঁহারা কেহ ২ সাকার উপাসনার প্রেরণ সর্ব্বদা বাহুল্য মতে করিয়া আসিতেছেন এবং যাঁহারা প্রেরিত অর্থাৎ শূদ্রাদি এবং বিষয়কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ. তাঁহাদের মনের রঞ্জনা

সাকার উপাসনায় হয় অর্থাৎ আপনার উপমার ঈশ্বর আত্মবৎ সেবার বিধি পাইলে ইহা হইতে অধিক কি তাঁহাদের আহ্লাদ হইতে পারে।"

আসলে নানাপ্রকার লাভের আশায় ব্রাহ্মণরা যাগযজ্ঞ-পূজাহোমাদি অনুষ্ঠান করবার জন্য সাধারণ লোককে উত্তেজিত করেন। কিন্তু "ব্রহ্মোপাসনাতে কার্য্য দেখিয়া কারণে বিশ্বাস করা এবং নানাপ্রকার নিয়ম দেখিয়া নিয়মকর্ত্তাকে নিশ্চয় করিতে হয় তাহা মন এবং বুদ্ধির চালনের অপেক্ষা রাখে সুতরাং তাহাতে কিঞ্চিৎ শ্রম বোধ হয় অতএব প্রেরকেরা [পূজাদি কর্মে যাঁরা প্রেরণা বা উৎসাহ দেন] আপন লাভের কারণ এবং প্রেরিতেরা [যজমান] আপনাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এইরূপ নানাপ্রকার উপাসনার বাহুল্য করিয়াছেন···।" এর পর আর-একটি প্রশ্ন তুলেছেন : প্রায়ই লোকে বলে যে "বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইবে। কিন্তু এক জনের বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না ; ···দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে।"[১] কট্টর যুক্তিবাদী না হলে এ ভাবের কথা বলা শক্ত। কিন্তু সে-যুগে লোকে এ কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই।

সমাজের মধ্যে কোনো নূতন কথা ও মত প্রচারিত হলে লোকে tradition বা 'শিষ্টপরম্পরাসিদ্ধ' নয় ব'লে সে-সব মতকে স্বীকার করতে চায় না। রামমোহনের মতের বিরোধীরা ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতমণ্ডলী, যাঁরা ইংরেজ ভাবী-সিবিলিয়ানদের দেবভাষা সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষা বাংলা শেখাতেন। সকলেই ম্লেচ্ছের অধীনে বেতনগ্রাহী প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ, শূদ্রতুল্য। তাঁদেরই উদ্দেশে রামমোহন লিখছেন—

"কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি··· লৌকিক প্রয়োজন দেখিলে পূর্ব্ব শিষ্ট পরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রকারে অন্যথা শত ২ কর্ম্ম করেন,—সে সময়ে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব্বপরম্পরার নামো করেন না···। আর ইঙ্গরেজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে অধ্যয়ন করান কোন্ শাস্ত্রে আর কোন্ পূর্ব্বপরম্পরায় ছিল। আর কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাকে স্পর্শ করা আর তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন্ শাস্ত্রবিহিত আর পরম্পরাসিদ্ধ

১ পূর্বোল্লিখিত রামমোহন-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০০।

হয় ইঙ্গরেজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়ফর [নিষ্ঠীবন] দিয়া বন্ধ করা পত্র যত্নপূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন্ পূর্ব্বপরম্পরাতে পাওয়া যায় আর আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাঁহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা আর দেবতাসমীপে আহারাদি করান কোন্ পরম্পরাসিদ্ধ হয় এইরূপ নানাপ্রকার কর্ম্ম যাহা অত্যন্ত শিষ্টপরম্পরাবিরুদ্ধ হয়, প্রত্যহ করা যাইতেছে।"[১] রামমোহনের ভাষা প্রয়োজন হলে কিরূপ কঠোর ও বিদ্রূপবান কী শানিত হতে পারত, তার দৃষ্টান্ত এই উদ্‌ধৃতি।

কলকাতার নূতন-ধনীদের গৃহে পূজাপার্বণে যে-সব কাণ্ড হত তার চিত্র পাওয়া যায় সমকালীন পত্রিকা থেকে। অন্যত্র আমরা তার রূপরেখা অঙ্কিত করেছি।

ঈশোপনিষদের ইংরেজি তর্জমা ১৮১৬ সালে প্রকাশিত হয়; বইটিতে Preface ও Introduction আছে। প্রথমটি বাংলা ভূমিকার অনুবাদ; দ্বিতীয়টি নূতন রচনা— ইংরেজ-পাঠকদের জন্য রচিত।[২]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর পাঠক মাত্রই জানেন যে, ঈশোপনিষদের এক ছিন্ন পত্র তাঁর জীবনে কী পরিবর্তন এনে দেয়।

কালবদলের হাওয়ায়, হিন্দুসমাজের জ্যেষ্ঠদের আন্তরিক চেষ্টাকে ব্যর্থ করে, হিন্দুকলেজের যুবকদের কালাপাহাড়ী মতই প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই ভাবতরঙ্গ তখন কলকাতায় রামমোহন ও ডিরোজিওর দ্বারা বেশ প্রচারিত হয়েছিল। শিক্ষিত যুবকেরা প্রতিমাদির পূজা সম্বন্ধে অত্যন্ত critical হয়ে ওঠে। দেবেন্দ্রনাথ কৈশোরে এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে পারেন নি— তিনিও নবীনদের ভাবধারায় ভেসেছিলেন। তিনি লিখছেন:

"আমরা ভাইদের লইয়া একটা দল বাঁধিলাম। আমরা সকলে মিলিয়া

---

১ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০০-০১।

২ গ্রন্থটির পুরা নাম: Translation of the Ishopanishad, one of the chapters of the Yayurved, according to the commentary of the celebrated Shankara-charya, establishing the unity and incomprehensibility of the Supreme Being; and that HIS WORSHIP ALONE can lead to Eternal Beatitude. Calcutta, 1816.

সংকল্প করিলাম যে, পূজার সময়ে আমরা পূজার দালানে কেহই যাইব না; যদি কেহ যাই, তবে প্রতিমাকে প্রণাম করিব না।… যে শাস্ত্রে দেখিতাম পৌত্তলিকতার উপদেশ, সে শাস্ত্রে আমার আর শ্রদ্ধা থাকিত না। আমার তখন এই ভ্রম হইল যে, আমাদের সমুদায় শাস্ত্র পৌত্তলিকতার শাস্ত্র। অতএব তাহা হইতে নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের তত্ত্ব পাওয়া অসম্ভব।"[১]

একুশ বছরের যুবক দেবেন্দ্রনাথের মনের যখন এই সংশয়াকুল অবস্থা [১৮৩৯] 'তখন হঠাৎ এক দিন সংস্কৃত পুস্তকের একটা পাতা সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতে' দেখলেন। এই পাতাটি রামমোহন-প্রকাশিত ঈশোপনিষদের প্রথম পৃষ্ঠা। এটি ঘটে রামমোহনের মৃত্যুর ছ বছর পরে এবং দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণের চার বছর পূর্বে।

দেবেন্দ্রনাথের হাতে যে ছিন্নপত্র এসে পড়ে সেটি সংস্কৃতে মুদ্রিত। রামমোহন যে কেবল বাংলা অক্ষরে, বাংলা অনুবাদ-সহ, উপনিষদগুলি প্রকাশ করেছিলেন তা নয়; সংস্কৃত বৃত্তি বা টীকাও দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশ করেন। এই সংস্কৃত সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত রামমোহন-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় নি (দ্র. গ্রন্থাবলী, পৃ. ২৭২)। কেননা, এই বৃত্তি রামমোহন-বিরচিত নয়, ঈশোপনিষদের সংস্কৃত বৃত্তির রচয়িতা তাঁর খাস পণ্ডিত শিবপ্রসাদ শর্মা।

ঈশোপনিষদ মুদ্রিত হবার এক বছর পরে কৃষ্ণযজুর্বেদীয় কঠোপনিষদের "ভাষা বিবরণ ভগবান পূজ্যপাদের (শঙ্করাচার্য্য) ভাষ্যানুসারে" প্রকাশিত হয় (১৮১৭ অগস্ট)। এই গ্রন্থের ক্ষুদ্র ভূমিকার শেষে রামমোহনের একটি প্রার্থনা আছে :

"হে অন্তর্য্যামিন্ পরমেশ্বর, আমাদিগ্যে আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্ম্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বনিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণান্ত জানি এমৎ অনুগ্রহ কর।"

আমরা ইতিপূর্বে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মবাদ নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছি। অবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদে ঈশ্বরের নিকট কোনোপ্রকার অভিযোগ, যাচ্ঞা, প্রার্থনা, তাঁর উদ্দেশে স্তবস্তুতি, যাগযজ্ঞ-হোম আদি সম্ভব নয়।

১ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃ. ১৯-২০।

কিন্তু তবুও মানুষ আপনার ইচ্ছাকে বিশ্বমঙ্গল-ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করতে চায়। আমরা পূর্বে বলেছি, নিছক অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মের ধ্যান পর্যন্ত কল্পনা করলেও তা দ্বৈতবোধক হয়, কিন্তু মানুষ সেরকম abstractionএর মধ্যে থাকতে পারে না, কারণ আপনার অন্তরের মধ্যে অশেষ দ্বন্দ্বের সম্মুখীন যখনই হতে হয় তখনই সে ব্রহ্মকে সগুণরূপে ভাবনা করে। 'অনুগ্রহ কর'— এই বাক্য দুর্বলপ্রকৃতি মানুষের স্বাভাবিক উক্তি, 'এক কর' দৃঢ়-চরিত্র মুমুক্ষুর দাবি।

কঠোপনিষদ একটি অপূর্ব দীর্ঘ রূপক। "যজ্ঞফলের কামনাবিশিষ্ট বাজশ্রবস রাজা বিশ্বজিৎ নাম যজ্ঞ করিয়া আপনার সর্ব্বস্ব ধনকে দক্ষিণা দিলেন সেই যজ্ঞকর্ত্তা রাজার নচিকেতা নামে পুত্র ছিলেন। যে সময়ে ঋত্বিক্ আর সদস্যদিগ্যে দক্ষিণার গরু বিভাগ করিয়া দিতেছিলেন সেই কালে ওই নচিকেতা যে অতিবালক রাজপুত্র ছিলেন তাঁহাতে পিতার হিতের নিমিত্ত শ্রদ্ধা উপস্থিত হইল আর ওই রাজপুত্র বিচার করিতে লাগিলেন :

"যে সকল গরু পিতা দিতেছেন তাহারা এমৎরূপ বৃদ্ধ যে পূর্ব্বে জলপান এবং তৃণ আহার যাহা করিয়াছে সেইমাত্র পুনরায় জলপান এবং তৃণ আহার করিতে তাহাদের শক্তি নাই আর পূর্ব্বে যে তাহাদের দুগ্ধ দোহা গিয়াছে সেইমাত্র পুনরায় তাহাদিগ্যে দোহন করিতে হয়, কিম্বা পুনর্ব্বার তাঁহাদের বৎস জন্মে এমৎ সম্ভাবনা নাই এমৎরূপ গরু যে ব্যক্তি দক্ষিণাতে দান করে সে আনন্দশূন্য যে লোক অর্থাৎ নরক তাহাতে যায়।"[১]

আমরা নচিকেতার উপাখ্যান এখানে বিবৃত করছি না। আমরা যেটুকু উদ্‌ধৃত করলাম এটি মূল উপনিষদের আক্ষরিক অনুবাদও নহে, ইহা শঙ্করের ভাষ্যের রামমোহন-কৃত ভাবানুবাদ।

কঠোপনিষদ শ্রাদ্ধের সময় পঠিত হয় এবং তৎকালে মহাড়ম্বরে দানকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বকালে দানমহিমার কীর্তন করা হত। কিন্তু 'বুড়ো গরু ব্রাহ্মণকে দান'এর যে প্রবাদ বাংলা ভাষায় চলিত আছে তার আদিরূপ পেলাম এখানে—'পীতোদকা, দগ্ধতৃণা, দুগ্ধদোহা, নিরিন্দ্রিয়াঃ' গরুগুলি।

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১২-১৩।

কঠোপনিষদ "রূপকটার ভাব এই যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পূর্বে মানুষ যে যজ্ঞ বা ঈশ্বরোপাসনাদি করে, তাহা যদি কেবল সামাজিক আচাররূপে না করিয়া শ্রদ্ধার সহিত করে, তবে তাহাতে তাহার চিত্তশুদ্ধি ও হৃদয়ে ভক্তি সঞ্চারিত হওয়াতে সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হয়।... কঠোপনিষদে এই ব্রহ্মজ্ঞান যে প্রণালীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাতে কতিপয় ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু নাই। এই ইঙ্গিতগুলির

... 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ অয়ং
কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' ১।২।১৮

এই বাক্যটি [শ্লোকটি] বোঝার উপর ব্রহ্মজ্ঞান নির্ভর করে। আত্মাতেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রকাশ। এই প্রকাশ না দেখিলে ঈশ্বরাস্তিত্বের অন্য যত প্রমাণ আলোচনা করা যাক্, তাহাতে নিঃসংশয় বিশ্বাস জন্মে না এবং জন্মিলেও সেই বিশ্বাস সাক্ষাৎ অনুভূতিতে পরিণত না।"[১]

রামমোহন কঠোপনিষদের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৮১৯ সালে, বাংলায় বের হবার তিন বছর পরে। এই অনুবাদের আরম্ভে ভূমিকা ('Preface') আছে, বাংলায় তার মূল নাই। এই অনুবাদের উদ্দেশ্য—

"The present publication is intended to assist the European community in forming their opinion respecting Hindoo Theology, rather from the matter found in the doctrinal scriptures, than from the Puranas, moral tales, or any other modern works, or from the superstitious rites and habits daily encouraged and fostered by their self-interested leaders."[২]

কঠোপনিষদ প্রকাশের তিন মাস পরে ১৮১৭ সালের অক্টোবর মাসে মাণ্ডুক্যোপনিষদ প্রকাশিত হল। মাণ্ডুক্য অথর্ববেদীয় উপনিষদ— মাণ্ডুক্য

---

১ সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, উপনিষদ, প্রথম খণ্ড।

২ *English Works* (Panini office Edn), p. 45.

কঠোপনিষদের ইংরেজি অনুবাদ—

Translation of the Kuth Opunishud of the Ujoor-Ved., According to the gloss of the celebrated Sunkuracharyu. Calcutta, 1819.

ঋষির নামে পরিচিত। এই উপনিষদ অতি সংক্ষিপ্ত হলেও বৈদান্তিক সাহিত্যে এর স্থান উচ্চে। আচার্য গৌড়পাদ এর ব্যাখ্যা করে 'কারিকা' বা শ্লোকময় বৃত্তি লিখেছিলেন ; গৌড়পাদের অনুশিষ্য শঙ্কর উপনিষদের সঙ্গে এই কারিকারও ভাষ্য লেখেন। গৌড়পাদই অদ্বৈতবাদের প্রথম লেখক ; এঁর আগে অন্য কোনো সম্প্রদায় এত প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণ দাখিল করতে পারেন না। রামমোহন শঙ্করের ধারায় তাঁর ভাষা-বিবরণ প্রকাশ করেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রারম্ভে রামমোহনের এক দীর্ঘ ভূমিকা আছে ; তাতে লিখছেন —

"প্রণবের অবলম্বনের দ্বারা যে পরমাত্মার উপাসনা তাহা শ্রেষ্ঠ হয় ; অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের প্রতি প্রথমাবস্থায় ওঙ্কারের অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার বিধি সর্ব্বত্র উপনিষদে আছে।"[১]

এই ভূমিকায় প্রণব-জপের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

প্রণব-জপের স্থানকাল নেই ; বেদান্তসূত্র (৪।১।১১) উদ্‌ধৃত করে অনুবাদ করেছেন —

"যে কোনো দেশে যে কোনো কালে যে কোনো দিকে মনের স্থিরতা হয় তথায় উপাসনা করিবেক যেহেতু কর্ম্মের ন্যায় আত্মোপাসনাতে দেশ কাল দিক্ এসকলের নিয়ম নাই।"[২]

প্রণব বলতে ওম্ বুঝায় ; এই ওম্-এর উৎপত্তি, উচ্চারণ ও অর্থ নিয়ে পণ্ডিতরা অনেক বাদানুবাদ করেছেন ; আসলে একটা মুখনিঃসৃত ধ্বনির (sound) উপর আধ্যাত্মিক বা mystical মর্যাদা দান করে তুরীয়তায় উত্তীর্ণ করা হয়েছে। বস্তুতঃ কোনো শব্দের মধ্যে কোনো শক্তি নাই। বিশেষ শব্দ বা ধ্বনির উপর কতকগুলি বিশেষ ভাব আরোপ করে এক দলের মানুষ সেই ধ্বনিকে রাহস্যিক বা mystical করে তোলে। ওম্ শব্দও তাই, 'আমেন' শব্দও সেই শ্রেণীর। নিজ ধর্মের বাইরের লোকের উপর এ-সব শব্দ কোনো আধ্যাত্মিক মোহ সৃষ্টি করতে পারে না।

যাই হোক, প্রণব বা ওঁ-কার ধ্বনি ও ধ্যান করার কথা বহুবিস্তারে শাস্ত্র-গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। মুণ্ডকোপনিষদে (২।২।৪) আছে —

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩৮।
২ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩৯।

"প্রণবকে ধনুঃ করিয়া আর জীবাত্মাকে শর করিয়া আর পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন অতএব প্রমাদশূন্য চিত্তের দ্বারা ঐ লক্ষ্যস্বরূপ পরব্রহ্মেতে শরস্বরূপ জীবাত্মাকে বিদ্ধ করিয়া শরের ন্যায় লক্ষ্যের সহিত মিলিত হইবেক অর্থাৎ প্রণবের অনুষ্ঠানের দ্বারা ক্রমে জীবকে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করিবেক।"[১]

'ওঁ তৎসৎ'কে রামমোহন তাঁর অনেক পুস্তিকা ও পুস্তকের প্রারম্ভে motto করেছেন— বেদান্তগ্রন্থ থেকেই তার আরম্ভ। অনেকে ভুলে গিয়েছিল যে 'ওঁ তৎসৎ' শব্দত্রয় গীতায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং সপ্তদশ অধ্যায়ে কয়েকটি শ্লোকে এ সম্বন্ধে উক্তি পাওয়া যাচ্ছে (১৭।২৩।২৮)।

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধয় স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥

—ব্রহ্মের তিনটি নির্দেশ [নাম] বলিয়া [ব্রহ্মবিদ্‌গণ] স্মরণ করিয়া থাকেন, যথা—ওঁ, তৎ এবং সৎ। এই তিন প্রকার নির্দেশের দ্বারা পূর্বে ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ ও বেদ সকল নির্মিত হইয়াছে।

এর পর তিনটি শ্লোক ওঁ, তৎ ও সৎ দিয়ে আরম্ভ। ভারতীয় ধর্মের এই অতি প্রাচীন শব্দ, কালে অনেকে তার অর্থই বিস্মৃত হয়ে যায়; তা না হলে 'ওঁ তৎ সৎ' কখনও বিদ্রূপের বিষয় হতে পারে না; "'ওঁ তৎ সৎ' বলে বেটা বানিয়েছে ইস্কুল" প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক ছড়াও হয়তো রচিত হত না।

রামমোহন ভূমিকায় লিখছেন—

"মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কিরূপে দুর্ব্বলাধিকারি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা ওঁকারের অবলম্বনের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন তাহা বিস্তার ও বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন এই নিমিত্ত ওই মাণ্ডুক্যোপ-নিষদের ভাষাবিবরণ ভগবান্ পূজ্যপাদের ভাষ্যানুসারে করা গেল।"[২]

মাণ্ডুক্য-"উপনিষদের তাৎপর্য এই যে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা এবং সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ যে এক অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মা তেঁহ প্রণবের প্রতিপাদ্য হয়েন। ...কেবল ওঁকার জপের

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩৮।
২ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩৮-৩৯।

দ্বারা ওঁকারের অর্থ যে চৈতন্যমাত্র পরমাত্মা হইয়াছেন তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ··· অভ্যাসের উপদেশ করিয়াছেন।"[১]

রামমোহন মনে করতেন অদ্বৈতজ্ঞান হলেই মানুষের মুক্তি হয়। তিনি জানতেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মনের গঠন ও রুচিবোধ, ধ্যান ও মনন-শক্তি এক ধরনের নয়— বিচিত্র এ জগৎ। দুর্বল মানুষের পক্ষে 'অন্তরিন্দ্রিয়ের দমন' বা শম্ এবং 'বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ' বা দম্ কী কঠিন সাধনা। অধিকারভেদে কেউ হয় অঘোরপন্থী, কেউ বা বামাচারী। একজন বলে, 'অঘোরমন্ত্রের পর আর নাই'; অপরজন বলেন, 'বিন্দুমাত্র মদিরার দ্বারা তিনকোটি কুলের উদ্ধার হয়।' এই বিচিত্র ধর্মসাধনার উল্লেখ করে রামমোহন এই ভূমিকাতে লিখছেন—

"এ সকল বিধি অপরা বিদ্যা হয় কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এই যে আত্মতত্ত্ব-বিমুখ সকল যাহাদের স্বভাবত অশুচি ভক্ষণে মদিরাপানে স্ত্রীপুরুষঘটিত আলাপে এবং হিংসাদিতে রতি হয় তাহারা নাস্তিকরূপে এ সকল গর্হিত কর্ম্ম না করিয়া পূর্ব্বলিখিত বচনেতে নির্ভর করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে এ সকল কর্ম্ম যেন করে যেহেতু নাস্তিকতার প্রাচুর্য্য হইলে জগতের অত্যন্ত উৎপাত হয় নতুবা যথারুচি আহার বিহার হিংসা ইত্যাদির সহিত পরমার্থসাধনের কি সম্পর্ক আছে।"[২]

রামমোহন এটি জানতেন যে, সকলের সাধনার পথ এক নয়। মাণ্ডুক্যের ভূমিকায় এই তত্ত্বের বিচার করেছেন অতিবিস্তারে। তবে বরাবরই একটা কথা বলেছিলেন, প্রণব ও গায়ত্রীর ধ্যানের ও জপের মন্ত্র রূপে ব্যবহার একান্ত আবশ্যিক। এবং যদি কেহ মনকে একাগ্র করতে চায় তবে তাকে একটা জপের মন্ত্র ধ্যান করতেই হবে। 'ধ্যান' কথাটা ইচ্ছা করেই ব্যবহার করছি, কারণ দুর্বলভাবে অন্যমনস্ক হয়ে শব্দের পুনরুক্তি বা মন্ত্রজপ দ্বারা জীবনের মূল রসসিক্ত হয় না, ধ্যানও দৃঢ় হয় না। মন্ত্রশব্দের মূলে আছে 'মনন্' শব্দ।

এই উপনিষদের ভাষাবিবরণের পরে শিরোনামশূন্য একটি পরিশিষ্ট

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩৯।
২ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৪৫।

আছে। এই প্রবন্ধের দুটি কথা বিশেষভাবে আমাদের মনকে আকর্ষণ করে—'শ্রদ্ধার দৃঢ়তা' ও 'বিচারের ক্ষমতা'; অর্থাৎ যাঁরা বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে ইচ্ছুক, তাঁদের পক্ষে শ্রদ্ধা ও বিচার একান্ত প্রয়োজন। রামমোহন তাঁর নানা রচনায় বারে বারে শ্রদ্ধা ও বিচারের কথা বলেছেন। শঙ্করাচার্যও এই বিচারের পথাশ্রয়ী। এখানে এ প্রশ্ন করা যেতে পারে—শ্রদ্ধা কী? শ্রদ্ধা— যোগানুষ্ঠানের দ্বারাই সম্যক জ্ঞান, তদ্দ্বারা মোক্ষ—এইরূপ নিশ্চয়পূর্বিকা আস্তিক্যবুদ্ধি। সংশয় যেমন জিজ্ঞাসায় বা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে, শ্রদ্ধা বা শ্রথ্‌ বা চেষ্টার দৃঢ়তা তেমনি সাফল্য অর্জনে সহায়ক হয়। শ্রদ্ধা ও ভক্তি একার্থক হতে পারে না; শ্রদ্ধার মধ্যে মনের সতর্কতা, সকর্মতা— activity আছে; ভক্তির মধ্যে আছে passivity— আত্মবিসর্জনের ভাব। এ যেন উপাসনা ও পূজার মধ্যে পার্থক্যের মতো। সেইজন্য রামমোহন 'শ্রদ্ধার দৃঢ়তা' শব্দ প্রয়োগ করছেন। 'ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ'— এ ধরনের শিথিল উক্তির সমর্থন তাঁর লেখার মধ্যে পাই নে। 'শ্রদ্ধা'র সঙ্গে 'বিচার'— discrimination— অর্থাৎ সৎ-অসতের মধ্যে বাছাই করার শক্তি অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা। এই 'বিচার'-বুদ্ধির মধ্যে কেবল intellectএর প্রাখর্যই যথেষ্ট নয়; সুন্দর-অসুন্দর, ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ, প্রভৃতির বিচারক আর-একজন আছে অন্তরে, সেটি মানুষের রুচিবোধ— aesthetical apperception।

রামমোহন-কৃত পঞ্চ-উপনিষদের ভাষ্যানুবাদের শেষটি মুণ্ডকোপনিষদ। রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ -সম্পাদিত 'রামমোহন গ্রন্থাবলীতে' (১৮৮০) লিখিত হয় যে, "মুণ্ডকোপনিষদ মাণ্ডুক্যোপনিষদের পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভূমিকাতে এমন উল্লেখ আছে।" কিন্তু ভূমিকায় এরূপ কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় নি, এ কথা বলেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সমাচার দর্পণে' ২৭ মার্চ ১৮১৯ তারিখের সংখ্যায় 'নূতন পুস্তক'-এর মধ্যে এই বইয়ের কথা উল্লিখিত হয়েছিল। রেভারেণ্ড লং-এর বাংলাভাষার গ্রন্থতালিকায় এই বইকে ১৮১৯-এ প্রকাশিত বলে নির্ধারিত করা আছে।[১] এই বছরে মুণ্ডকোপনিষদের

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায় : সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৬, পৃ. ৯২।

ইংরেজি অনুবাদও বের হয়।

মুণ্ডকোপনিষদ মুদ্রণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল— প্রথমে সংস্কৃত পাঠ ও পরে পৃথক ভাবে বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়। যাঁরা সংস্কৃত জানেন না, কেবল বাংলায় উপনিষদ পড়তে চান, তাঁদের পক্ষে কেবল অনুবাদটি একত্র পেলেই ভালো লাগে। মুণ্ডকোপনিষদ মাণ্ডুক্যের ন্যায় অথর্ববেদীয়। মাণ্ডুক্য তো জনৈক ঋষির নাম বলে মনে করা হয়; কিন্তু মুণ্ডক? এ নামে কোনো ঋষির কথা পরম্পরা-সূত্রে জানতে পারা যায় না। তাই এ নাম নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত শোনা যায়। কেউ বলেন, কোনো মুণ্ডিতমস্তক বা মুণ্ডক অর্থাৎ কোনো প্রাক্তন বৌদ্ধভিক্ষু এই উপনিষদের প্রবক্তা। তাঁরা বলেন যে, এই উপনিষদে বৌদ্ধমতের অনুরূপ লয়বাদ আছে। কিন্তু এ তত্ত্ব তো অন্যান্য উপনিষদেও পাওয়া যায়, কারণ এক শ্রেণীর ঋষি এই মতের পোষক ছিলেন। এই উৎকৃষ্ট উপনিষদ থেকে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্মঃ' গ্রন্থে অনেক শ্লোক উদ্‌ধৃত করেছেন।

মুণ্ডকোপনিষদের বাণী নাকি ব্রহ্মা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বাকে উপদেশ-স্থলে দান করেন— এই বলে গ্রন্থ আরম্ভ হয়েছে। অথর্ববেদ যে বর্গীয় অর্থাৎ ব্রাত্যগোষ্ঠীভুক্ত— মুণ্ডকোপনিষদ তো সেই বেদেরই অন্তর্গত। সব যুগেই সব ধর্মসাধনার মধ্যে দেখা যায়— সরু মোটা দুটো তারই জড়িয়ে থাকে। কালোচিত বিশ্বাসের অনেক কিছুই রয়ে যায় মহৎ ভাবনার পাশাপাশি। কোনো ধর্মগ্রন্থ তার থেকে মুক্ত নয়। বিংশ শতকের সাত দশকের বিজ্ঞান-বুদ্ধির কষ্টিপাথরে ঘষা খেয়ে অনেক তত্ত্বের রস শুকিয়ে কঙ্কাল বের হয়ে গেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলব, অনেক মণিমুক্তা হীরা জহরত রয়েছে যা আজকের দিনে কোথাও খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। আমরা পূর্বে বলেছি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ থেকে ছেঁকে, আধুনিক মানুষের পক্ষে যতটা নিরীশ্বরবাদী না হয়ে' মানা সম্ভব, তা 'ব্রাহ্মধর্মঃ' গ্রন্থে সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন।

বেদ ও বেদ-সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা অপরা-বিদ্যার অন্তর্গত। বেদের অন্তে যাঁরা এলেন তাঁরা পরাবিদ্যা চর্চা আরম্ভ করেন— এঁরাই বেদান্তবাদী বা বৈদান্তিক। দেবেন্দ্রনাথ বেদান্ত বা উপনিষদাদি অধ্যয়ন করে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার চতুর্থ বছরে ১৮৪৭ অব্দের বৈশাখ সংখ্যা

পত্রিকার শিরোভাগে এই বেদবাক্য প্রকাশ করলেন—

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ
শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা জয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

যতদিন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা জীবিত ছিল, মুণ্ডকোপনিষদের এই বাণী ততদিন তাতে মুদ্রিত হত।

রামমোহন দশ-উপনিষদের ভাষাবিবরণ প্রকাশ করবেন, এই ছিল মনোভাব, কিন্তু পাঁচখানির বেশি অনুবাদ করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু দশোপনিষদের মধ্যে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য গণনা করেন নি। পূর্ব-উল্লিখিত পঞ্চ-উপনিষদ ব্যতীত প্রশ্ন, শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও কৌষিতকী নিয়ে দশোপনিষদ হয়। শঙ্করাচার্য বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যকে গ্রহণ করে দ্বাদশ উপনিষদ করেছেন। রামমোহন কিন্তু এই দুই গ্রন্থকে বাদ দিয়ে 'দশোপনিষদ' বলেছিলেন। কেন তাদের বাদ দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ বৃহদারণ্যকের মুখবন্ধে যা বলেছিলেন সেটি আমরা উদ্‌ধৃত করছি—

"উপনিষদ-সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণানুসারে আমরা উপনিষদ-গ্রন্থে ব্রহ্মজ্ঞানই অন্বেষণ করি। 'বৃহদারণ্যকে' গভীর ব্রহ্মজ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু হয়তো পাঠক দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে ইহাতে এমন অনেক বিষয় প্রবেশ করিয়াছে, যাহার প্রকৃত স্থান ব্রাহ্মণ গ্রন্থে,··· এই গ্রন্থ স্পষ্টতই অনেক ঋষির রচিত।··· তাঁহাদের চিন্তা যজ্ঞাঙ্গ এবং যজ্ঞাঙ্গের সহিত সম্বন্ধ বিষয়ক কলাপকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।"

রামমোহন তাঁর প্রবন্ধাদির মধ্যে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যর উদ্‌ধৃতি করেছেন এবং শ্রুতির সম্মানই দিয়েছেন। কিন্তু এই-সব উপনিষদের সকল তথ্য ও তত্ত্ব আধুনিক মানুষের পক্ষে নির্বিচারে স্বীকার করে নেওয়া কঠিন; বিজ্ঞানী-বুদ্ধিতে বিশ্লিষ্ট হলে এ-সব ধর্মগ্রন্থ থেকে অনেক কিছুই বাদ দিতে হয়। দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্মঃ' গ্রন্থ এই শ্রেণীর সংকলন—যা সকল হিন্দুর common book of prayer -এর মতো মেনে নেওয়া অসম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত বলি, এই শ্রেণীর একখানি গ্রন্থ সম্পাদন করেন কেশবচন্দ্র সেন 'শ্লোকসংগ্রহ' নামে।

প্রস্থানত্রয়ের ব্রহ্মসূত্র ও পঞ্চ-উপনিষদের আলোচনা সমাপ্ত হল এখানে, কিন্তু বাকি আছে ভগবদ্‌গীতার। দেখা যাক 'গীতা' সম্বন্ধে রামমোহনের মতামত ও মনোভাব কী। প্রথমেই বলা উচিত, রামমোহনের নামে 'গীতা'র অনুবাদাদি আমাদের গোচরীভূত হয় নি। তবে পরোক্ষে তার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। ১৮২৯ অব্দে 'সহমরণ-বিষয়' পুস্তকে রামমোহন লিখেছিলেন—

"সহমরণাদিরূপ কাম্য কর্ম্মের নিন্দা ও নিষেধের ভুরি প্রমাণ গীতাদি শাস্ত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আমাদের প্রকাশিত ভগবদ্গীতার কতিপয় শ্লোকে ব্যক্ত আছে।"[১]

১৮১৯ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গীতার মূল সংস্কৃত ও পয়ার ছন্দে বাংলায় অনুবাদ মুদ্রিত দেখতে পাই। বইটি "কলিকাতার বাঙ্গাল গেজেটি আপিসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপা করিয়াছেন।" শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের নাম, ধাম ও পুস্তকের প্রকাশকাল এইভাবে দেওয়া আছে—

'কোটি কোটি নতিস্তুতি করি কায়মনে।
কোন পণ্ডিতের সহকারাবলম্বনে ॥'

"এই অনুবাদ রামমোহন রায়ের বেনামী রচনা কি না বলিবার উপায় নাই, তবে রামমোহন যে 'ভগবদ্গীতা' পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।" ১৮৪৫ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ'-এ (আষাঢ় ১৭৮০ শক) বলেন যে, রামমোহন রায় গীতা অনুবাদ করেছিলেন 'বাঙ্গালি পদ্যে'।[২]

রামমোহনের বহু রচনাই বেনামে মুদ্রিত হত, এ তথ্য সুপরিচিত। বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মীয়সভার 'নির্বাহক' ছিলেন এবং 'কোন পণ্ডিতের সহকারাবলম্বনে' গীতা লিখিত এবং বৈকুণ্ঠনাথ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়ে থাকবে। ১৮১৬ সালের মধ্যে বাংলা ভাষায় গীতার

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৬।
২ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৫২।

অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়; রামমোহন ঈশোপনিষদের 'অনুষ্ঠান' অংশে (১৩ জুলাই ১৮১৬) লিখছেন—

"কোনো শাস্ত্রকে ভাষায় বিবরণ করিলে সে শাস্ত্র যদি সেই বিবরণ-কর্ত্তার মত হয় তবে ভগবদ্গীতা যাহাকে বাঙ্গালি ভাষায় এবং হিন্দোস্থানি ভাষায় কয়েক জন বিবরণ করিয়াছেন সেই সকল ব্যক্তির মত হইতে পারে··· ইহা হইলে অনেক গ্রন্থের প্রামাণ্য উঠিয়া যায়।"[১]

এখন প্রশ্ন, এ কোন্ অনুবাদ যার কথা রামমোহন এখানে উল্লেখ করেছেন ? আমরা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের রচনাবলীর মধ্যে ভগবদ্গীতার উল্লেখ পাই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ইহা [ভগবদ্গীতা] ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের (পৃ. ২১৬) এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে আছে।"[২]

আমাদের অনুমান গঙ্গাকিশোরের অনুবাদ ১৮১৬ সালেই হয়ে থাকবে এবং রামমোহন এই অনুবাদের কথাই ঈশোপনিষদের 'অনুষ্ঠান' অংশে উল্লেখ করেছেন।

রামমোহন তাঁর রচনার মধ্যে 'গীতা'র ভূরি ভূরি উদ্ধৃতি করেছেন। সে-সব শ্লোকের নিজকৃত গদ্য অনুবাদ প্রদত্ত হয়েছে। সেগুলি একত্র করলে গীতার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার কথাই প্রকাশ পাবে।

গীতা সম্বন্ধে আমরা পূর্বে প্রস্থানত্রয়াদির আলোচনাকালে অনেক কথা বলেছি, সুতরাং তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

ভগবদ্গীতার প্রতি রামমোহনের বিশেষ শ্রদ্ধার আর-একটি নিদর্শন পাই গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' (২০ জুন ১৮৫৪)-এ নীলরত্ন হালদার সম্বন্ধে সমালোচনা প্রসঙ্গে :

"আমরা বিশেষ জানি রাজা রামমোহন রায় মহাশয় গান দ্বারা ভগবদ্গীতার কূটার্থ সকল প্রকাশ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন কিন্তু সময়াভাব কিম্বা অন্য কোন কারণ যাহাই থাকুক ফলে জ্ঞানি প্রধান রাজা বাহাদুরও তাহাতে সিদ্ধাভিলাষ হইতে পারেন নাই। কেবল একটী গানের

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ ২০৪।

২ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৭।

মধ্যে এই মাত্র নিবিষ্ট করিয়াছিলেন "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব রে," ইহার মূল ভগবদ্গীতার শ্লোকার্দ্ধ এই "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" রাজা রামমোহন রায় যাহাতে বিস্তর ব্যাকুল হইয়াছিলেন বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় সেই বিষয়ে যোগারূঢ় হইয়াছেন অর্থাৎ ভগবদ্গীতার সারোদ্ধার করিয়া গানরচনা করিতেছেন··· বাবু নীলরত্ন যাহা ধরিয়াছেন তাহা অপূর্ব্বরত্নই করিবেন অতএব আমরা ঐ সকল গানামৃত পান পিপাসু হইয়া চাতকের ন্যায় রহিলাম।"[১]

রামমোহনের ব্রহ্মসংগীত সম্বন্ধে আমরা পরে অন্যত্র আলোচনা করব।

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলরত্ন হালদার, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৭।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্র এবং পঞ্চ-উপনিষদের শঙ্করভাষ্যের ভাষাবিবরণ রামমোহন করেন। শঙ্করের নিজকৃত গ্রন্থ 'আত্মানাত্মবিবেক' রামমোহন মূল সংস্কৃত বঙ্গাক্ষরেও বঙ্গানুবাদ-সহ ১৮১৯ অব্দে প্রকাশ করেন।

"ব্রহ্মজ্ঞ বিবেকি সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গোচর সকল বস্তু অনাত্মা হয় সর্ব্বসাক্ষি ব্রহ্ম যিনি তিনিই আত্মা, এই আত্মানাত্মবিবেক কোটি কোটি গ্রন্থ দ্বারা কথিত হইতেছে। স্বল্পগ্রন্থ দ্বারা আত্মানাত্মবিবেক কহিতেছেন।" (এখানে গ্রন্থ শব্দের অর্থ পুস্তক বা বই নয়; দক্ষিণ-ভারতের পুঁথির মধ্যে গ্রথিত পত্রকে গ্রন্থ বলে)। এই পুস্তকের মধ্যে দুঃখনিবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে হিন্দু দর্শনের পরিভাষাগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শঙ্করের প্রশ্ন— দুঃখের নিবৃত্তি কখন হয়; উত্তর— সর্বতোভাবে শরীর-পরিগ্রহ নাশ হইলেই দুঃখনিবৃত্তি হয়। অর্থাৎ total annihilation। অতঃপর শরীর-পরিগ্রহ কিভাবে নিবৃত্ত হলে দুঃখের নিবৃত্তি হয় তাই নিয়ে আলোচনা চলেছে। প্রথম জন বললেন, কর্মনিবৃত্তি হলে শরীর-পরিগ্রহ হবে না। তখন প্রশ্ন—কর্মনিবৃত্তি কেমন করে হবে; তার উত্তর হল— রাগ (অনু)-আদির নিবৃত্তি হলে কর্মনিবৃত্তি হবে। এইভাবে রাগাদি-নিবৃত্তি, অভিমান-নিবৃত্তি, অবিবেক-নিবৃত্তি, অজ্ঞান-নিবৃত্তি ও শেষকালে অবিদ্যা-নিবৃত্তি হলেই ব্রহ্মতে জীবের একত্ব-জ্ঞান হয়।

এবার প্রশ্ন উঠল— অবিদ্যা-নিবৃত্তি কিভাবে হতে পারে; তার উত্তরে বলছেন— 'বিচারাদেব ভবতি'— বিচার থেকেই হয়। আত্মা-অনাত্মা বিষয় বিচার থেকেই জ্ঞান হয়। আত্মানাত্মবিবেকে কে অধিকারী প্রশ্নের উত্তরে বলা হল— সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্নই অধিকারী। এখন সাধন-চতুষ্টয় বলতে কী বোঝায় তার বহুবিস্তারে ব্যাখ্যা চলে।

কয়েকটি শব্দের ধাতুগত অর্থ বেশ কৌতুকপ্রদ; যেমন 'শরীর'—"বাল্য কৌমার যৌবন বার্দ্ধক্যাদিবয়োদ্বারা শীর্ণ হয় এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা শরীর শব্দে

বাচ্য হয়।" "দহ ধাত্বর্থ ভস্মীকরণ এই ব্যুৎপত্তি দ্বারাও দেহ পদবাচ্য হয় অর্থাৎ ভস্মসাৎ হয়।"

স্থূল শরীর বা দেহের দুঃখের কারণ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।

অতঃপর সূক্ষ্মশরীর বিষয়ে বিশ্লেষণ বহুবিস্তারে কৃত। সব আলোচনার উদ্দেশ্য দুঃখনিবৃত্তি ; কিন্তু দুঃখ কী তার সংজ্ঞা দিচ্ছেন—

"প্রীতিশূন্য যে পদার্থ তাহার নাম দুঃখ।" সমষ্টি, ব্যষ্টি, জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, পঞ্চকোষ প্রভৃতি নানা পারিভাষিক শব্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। সবশেষে 'সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্বের ব্যাখ্যান' করা হয়েছে।

সদ্রূপ— "কাহার কর্ত্তৃক বাধিত না হইয়া যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানরূপ ত্রিকালেতে একরূপে থাকা তাহার নাম সদ্রূপ।"

চিদ্রূপ— "অন্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া আপন হইতেই প্রকাশমান আপনাতে আরোপিত সর্ব্ব পদার্থের প্রকাশক যে বস্তুধর্ম্ম তাহার নাম চিদ্রূপ।"

আনন্দরূপ— "নিত্য এবং যাহা হইতে অতিশয় নাই এমত যে পরম প্রেমের আধারত্ব তাহার নাম আনন্দস্বরূপত্ব কথিত হয়। ...বিজ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ এবং দানদাতা ইহারদিগের আশ্রয়স্বরূপ ব্রহ্ম ইহা শ্রুতি কহিতেছেন।... এই প্রকারে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব ব্রহ্মস্বরূপ আমি ইহাতে সংশয়সম্ভাবনা বিপরীতভাবনারহিত হইয়া যে জানে সে জীবন্মুক্ত হয়।"[১]

অদ্বৈতবাদের চরমরূপ মায়াবাদ। মায়াবাদের আর-একটা নাম অনির্বাচ্যবাদ, অর্থাৎ ঠিকমত শব্দ দিয়ে যাকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। দৃশ্যমান জগৎই হোক, আর মনোময় জগৎই হোক, তার স্বরূপ ভাষায় বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব। যে মুহূর্তে কোনো বস্তু দৃষ্টিভূত হল এবং সে-সম্বন্ধে কিছু বলতে যাচ্ছি এইটুকু সময়ের মধ্যেও বস্তুর স্বরূপের বদল হয়ে গেছে— কি স্থানে, কি কালে। যখন তার বর্ণনা হয়ে গেল, তখন দেখি সে-পদার্থ বা

১ রামমোহন - গ্রন্থাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১১-২৩।

বস্তুর বয়স গিয়েছে বেড়ে; তার ভিতর-বাইরে অনেক রাসায়নিক ও জীব-তাত্ত্বিক পরিবর্তন হয়ে গেছে। সুতরাং বস্তুর বর্ণনা কোনো ভাষার মাধ্যমে করাই অসম্ভব। বৌদ্ধ মহাযানের শূন্যবাদ ও অদ্বৈতবাদীর মায়াবাদের মধ্যে মিল যথেষ্ট। শূন্যবাদ নিছক নেতিধর্মী নয়, এটাও জানা ও বোঝা দরকার। 'অদ্বৈত' শব্দটা হিন্দু-দার্শনিক পরিভাষায় চালু হবার আগেই বৌদ্ধদের মধ্যে 'অদ্বয়' শব্দটার প্রয়োগ হয়েছিল। নাগার্জুন বলেন, বুদ্ধের প্রধান মত অদ্বয়বাদ। 'অদ্বয়'-শব্দ-যুক্ত বহু বৌদ্ধ-ভাব বিবৃত হয়েছে। বুদ্ধকে অমরসিংহ তাঁর কোষে 'অদ্বয়বাদী' বলেছেন। অদ্বয়বাদ ও অদ্বৈতবাদের আলোচনা পণ্ডিতদের কর্ম, আমার সাধ্য নয়। তবে মোটামুটিভাবে বলতে পারি, অদ্বয়-ভাবনা প্রাচীন ধারায় বিদ্যমান ছিল; ক্ষীণ ধারাস্রোত কালে ও স্থানে রূপান্তরিত হয়ে খরস্রোত নদীপ্রবাহে পরিণত হয়। প্রাচীন অদ্বৈতমত তেমনি কালপ্রবাহে বিরাট অদ্বৈতবাদের মাতামাতিতে রূপ নেয়।

গৌড়পাদ তাঁর মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকায় নাগার্জুনের তর্কশাস্ত্র ও উপনিষদের ভাবাত্মক চৈতন্যবাদের একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। গৌড়-পাদ বৌদ্ধযুগের লোক, তাই তাঁর কারিকাদির মধ্যে বুদ্ধের নাম ও মত একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। ড. রাধাকৃষ্ণন মনে করেন যে, "গৌড়পাদ তাঁর নিজের মতের সহিত বৌদ্ধমতের কোনো কোনো বিষয়ের সাদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং সেইজন্যই তিনি একটু বেশি প্রতিবাদ করে বলতেন, তাঁর মত বৌদ্ধ মত নয়। কারিকার উপসংহারেও বলেছেন, 'এ মত বুদ্ধের উক্তি নয়।" গৌড়পাদের প্রশিষ্য শঙ্কর; তিনি ঐ কারিকার উপর টিপ্পনী কেটে লিখেছেন, "বৌদ্ধমত ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে কিছু পরিমাণে সাদৃশ্য দেখা যায় বটে, কিন্তু যে অদ্বৈতবাদ বেদান্তদর্শনের কেন্দ্র ইহা সেই জাতীয় অদ্বৈতবাদ নহে।"[১]

পূর্বকালের লোকে শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলত, তাতে তাদের দোষ দেওয়া যায় না।

রামমোহন শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অনুসারে ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদের ভাষা-

১ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪।

বিবরণ করেন, কিন্তু শঙ্করের মায়াবাদ তিনি সমর্থন করেন নি। শঙ্কর সন্ন্যাসী ছিলেন, সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গড়েছিলেন। অদ্বৈতব্রহ্ম এমন তুরীয়তার মধ্যে উন্নীত হয়ে থাকলেন যে, তিনি সংসার থেকে একেবারেই বাদ পড়ে গেলেন ; সংসারে স্থান করে নিলেন ব্রহ্মার কনিষ্ঠ দুজন— বিষ্ণু ও শিব, এবং তাঁদের পরিবারের পুত্রকন্যা ; এমন-কি তাঁদের বাহনগুলি পর্যন্ত সারা সংসার জুড়ে বসলেন। রামমোহনের আদর্শ ব্রহ্মবিৎ রাজর্ষি জনক— নিরাকার নির্বিকার একেশ্বরের উপাসনার সঙ্গে সংসারধর্মপালনের বিরোধ তিনি দেখেন নি। বাস্তববোধ অত্যন্ত তীব্র ছিল বলে তিনি অতীতের ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে পশ্চিমের দর্শনবিজ্ঞানের মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন প্রাচীনকালের ধর্ম ও দর্শন নিয়ে ভারতীয়রা ডুবে থাকলে তাদের ভাবীকাল অন্ধকার। দুনিয়াকে মায়া বলে বাস্তবতা থেকে দূরে থাকার অর্থ escapism— তা বৈরাগ্য নয় ; পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য না করে, বড়ো কথার ছাতার নীচে আশ্রয় নেবার অছিলা মাত্র। তাই যখন কলিকাতায় ইংরেজ সরকার 'সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়' স্থাপনের প্রস্তাব করল রামমোহনই প্রতিবাদ করে খোলা চিঠি লিখেছিলেন—

This seminary can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to possessors or to society.[১]

সংস্কৃত ব্যাকরণ ও শাস্ত্রের কচ্‌কচি যুবকদের মনের মধ্যে বোঝার মতো চেপে থাকবে এবং সে-সবের কোনো বাস্তব প্রয়োজন না আছে ব্যক্তির না আছে সমাজের।

যে লোক বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন, তিনি এই পত্রে লিখলেন—

Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines, which teach them to believe that all visible things have no real existence.

তাই বলছিলাম, মায়াবাদের মানস বিলাস রামমোহনকে বাস্তবতা-হীন শাস্ত্রচর্চার রুক্ষ মরু-মধ্যে নিক্ষেপ করে রাখতে পারে নি।

---

১ *English Works*, p. 473.

শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ, যাকে বেদান্ত বলে রামমোহন ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার পরিবর্তন হয় দেবেন্দ্রনাথের সময়— যিনি 'ব্রাহ্মধর্মঃ' গ্রন্থ সম্পাদন করে একটি উপাসনাবিধি প্রবর্তন করলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখলেন— "আমরা ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদ্‌কেই বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম। বেদান্তদর্শনকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম না; যে-হেতুক, তাহাতে শঙ্করাচার্য্য জীব আর ব্রহ্মকে এক করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা চাই ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে।··· আমরা যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী, তেমনি অদ্বৈতবাদেরও বিরোধী। শঙ্করাচার্য্য উপনিষদের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে লইতে পরিলাম না; যে-হেতুক, তিনি অদ্বৈতবাদের পক্ষে টানিয়া তাহার সমুদায় অর্থ করিয়াছেন।"[১]

রামমোহন শঙ্করকে অনুবর্তন করেন। সেইজন্য রামমোহনের মতকে গ্রহণ করতে না পেরে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের ভাষ্য নূতন করে লিখতে আরম্ভ করেন। সে ভাষ্য ও মূল ছাপা হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। শঙ্কর, রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের তুলনামূলক আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন।

আমরা রামমোহন রায় ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে আমাদের আলোচনা সীমিত রাখতে প্রতিশ্রুত; কিন্তু 'পূর্ব ও পর'-এর আলোচনা স্বাভাবিক ভাবে এসে পড়েই। রামমোহনের 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম' অগ্রাহ্য করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুশাস্ত্র থেকে নিরাকার একেশ্বরের উপাসনার উপযোগী সংস্কৃত বচন সংগ্রহ করে 'ব্রাহ্মধর্মঃ' গ্রন্থ সম্পাদন করেন। উপনিষদ revealed গ্রন্থ; দেবেন্দ্রনাথ তাঁর এই সংকলিত গ্রন্থকে 'আপ্তবাক্য'র মর্যাদা দান করে ধর্মগ্রন্থরূপে পেশ করেন। রামমোহনের কঠোর যুক্তিবাদী ধর্মের আসন সরিয়ে, সেখানে সরল ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হল,— যা ছিল 'সমাজ', সর্বধর্মের ঈশ্বরবিশ্বাসীর ব্রহ্মোপাসনার কেন্দ্র, The Universal Religion-এর পীঠস্থান, তা হল 'মন্দির'। সেখানে হিন্দুশাস্ত্র থেকে মন্ত্রাদি পাঠ ও খ্রীষ্টানী প্রথায় sermon বা উপদেশ দানের ব্যবস্থা

---

১ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃ. ৩৭-৩৮]

হল। দেখতে দেখতে ভক্তিবাদ ব্রাহ্মসমাজের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল। ভক্তিবাদ বাংলা দেশে নূতন নয়। কিন্তু 'ভক্তি'টা পিচ্ছিল ভূমির উপর খাড়া, তাই কালের হাওয়ায় সেখানে এসেছে ধর্মের প্রতি ঔদাসীন্য। মোট কথা রামমোহন রায়ের কঠোর তত্ত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সৌধে ফাটল ধরে গেল। প্রখর বুদ্ধির স্থলে সরল ভক্তি আসন গ্রহণ করল। সহজ রসালুতা ধর্মকে তরল করে দিল। তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বাংলার যুবসমাজে।

কলকাতায় আসার পর আত্মীয়সভা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মিত্র ও অমিত্র যুগপৎ রামমোহনের ধর্ম ও কর্ম-জীবনের সহায়ক ও বিরোধক রূপে দেখা দেয়। রামমোহনের প্রতিপক্ষ ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণরা ও খ্রীষ্টান পাদরিরা। বেদান্তসূত্র ও বেদান্তসার প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুসমাজ রাম-মোহনকে বাধা দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়; হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা-কালে হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়রা, রামমোহন এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যাতে যুক্ত না হন তার ব্যবস্থা করেন। রামমোহন দূরে থাকলেন, পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রতিরোধীদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন রাধাকান্ত দেব— শোভাবাজারের 'রাজ'-বংশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। ইনি 'শূদ্র' হয়েও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ ও হিন্দুসমাজের সতীদাহ প্রভৃতি সংস্কার অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য রামমোহনের বিরোধী পক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। এতে খুব বিস্মিত হই নে, কারণ ব্রহ্মণ্যশাস্ত্রীয় শাসনের কড়া দাগ এঁদের মনের উপর এমনভাবে চেপেছিল যে, তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার রন্ধ্র খুঁজে পাওয়া ছিল শক্ত।

আমাদের আলোচ্য-পর্বে মদ্রদেশীয় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী আসেন কলকাতায়। তিনি রামমোহনের বেদান্তমত খণ্ডন করবার জন্য বিচারে আহ্বান জানা-লেন; এ ধরনের তর্ক ও বিচার এদেশে চিরাচরিত পদ্ধতি। আত্মীয়সভার এক অধিবেশন বসল বড়বাজারে (৩১ ডিসেম্বর ১৮১৬) বিহারীলাল দোবের গৃহে। এই বিহারীলাল সেকালের হিন্দী কবি-সাহিত্যিক ছিলেন বলে শোনা যায়। সারা দিন দুই পণ্ডিতে বাগ্‌যুদ্ধ চলে, অবশেষে রামমোহন জয়ী হন, এ কথা শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন তাঁর ব্রাহ্মসমাজের ইংরেজি ইতি-

হাসে। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গে বিচার-বিষয়ক পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় চার বছর পরে। এর কারণ কী? কলকাতায় বিতর্কের পর শাস্ত্রী মাদ্রাজে ফিরে যান এবং সেখান থেকে কলকাতার ব্রাহ্মণদের কাছে পত্রযোগে লিখে পাঠান যে :

"বেদাধ্যয়নহীন ব্যক্তিদের স্বর্গ এবং মোক্ষ হইতে পারে না, আর যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়াছে, তাহারি কেবল ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার এবং ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্বে বেদোক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত কর্ম অবশ্য কর্তব্য হয়।"

বলা বাহুল্য এ মত শঙ্করের প্রতিক্রিয়াশীল মতের বিকৃত সমর্থন।

এই পত্র সংস্কৃতে লিখিত এবং রামমোহন এর উত্তর সংস্কৃতেই লিখে পাঠান এবং যুগপৎ বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। রামমোহন সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর প্রত্যেকটি যুক্তি খণ্ডন করেন ও প্রমাণ রূপে ব্রহ্মসূত্রের (৩-৪-৩৬।৩৭) শঙ্কর-কৃত ভাষ্যের অনুবাদ করে দেখান যে, অনাশ্রমী ব্যক্তিদের বিদ্যাতে অধিকার আছে এবং রৈক্ক, বাচক্লবী প্রভৃতি আশ্রমকর্মহীন ব্যক্তিদের ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাপ্তি হয়েছে। "আর সর্ব্বদা বিবস্ত্র থাকিতেন [নগ্নচর্চা], এ প্রযুক্ত বর্ণাশ্রমকর্ম্মহীন যে সম্বর্ত্ত প্রভৃতি তাঁহাদেরও মহাযোগিত্ব ইতিহাসে দেখিতেছি।" রামমোহন শঙ্করাচার্যের ভাষ্য থেকে উদ্‌ধৃত করেছেন : "ইতিহাস পুরাণ-আগমেতে চারিবর্ণের অধিকার আছে, ইহা স্মৃতিতে লিখেন।"[১] এই সংক্ষিপ্ত রচনায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর যুক্তি খণ্ডিত হয়। ইংরেজিতে লিখিত অনুবাদের (১৮২০) নাম An Apology for the Pursuit of Final Beatitude, independently of Brahmunical Observances.[২] প্রসঙ্গত বলি, এটা হল রামমোহনের তৃতীয় ইংরেজি প্রবন্ধ।

---

১ বেদান্তদর্শনম্, তৃতীয় অধ্যায়, ৩।৪।৩৬-৩৮। শঙ্করভাষ্য ও অনুবাদ, কালীবর বেদান্তবাগীশ-কৃত। পৃ. ৪২৩-২৬।

২ *English Works*, pp. 129-31.

চতুর্দশ অধ্যায়

রামমোহনের প্রথম শাস্ত্রবিচার-গ্রন্থ 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার'। উৎসবানন্দের সঙ্গে এই বিচার-বিষয়ের কথা কিছুকাল পূর্বেও জানা ছিল না। শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত এই সংস্কৃত বিচার-পুস্তকগুলি[১] আবিষ্কার করেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত রামমোহন-গ্রন্থাবলীতে উৎসবানন্দের ও রামমোহনের প্রশ্ন ও উত্তরগুলি মুদ্রিত হয়েছে। রামমোহনের প্রথম উত্তরটি সংস্কৃতভাষা থেকে নলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বাংলায় অনুবাদ করে 'প্রবাসী' পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৩৫) প্রকাশ করেন।[২] গ্রন্থাবলীতে এই অনুবাদটি প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু রামমোহনের দ্বিতীয় উত্তরটি সংস্কৃত থেকে এখনও কেউ অনুবাদ করেন নি।

উৎসবানন্দ বৈষ্ণবপক্ষীয় পণ্ডিত ; তিনি নানা ভাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে রামমোহন 'আত্মীয়সভা'য় যে একেশ্বরবাদ ও ঈশ্বরের নিরাকারত্ব বিষয়ে উপদেশ ও আলোচনা করেন, তা শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যান নয়। উৎসবানন্দ বিষ্ণুভক্ত, সেইজন্য তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন— বিষ্ণুই সেব্য, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর সেবক। রামমোহন সংস্কৃতে যা লেখেন তার অনুবাদ অংশতঃ উদ্ধৃত করছি—

"আপনি বিষ্ণুর সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব সূচনা ও ব্রহ্মা এবং শিব হইতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও কেবল কষ্টসাধ্য ব্যুৎপত্তির সাহায্যে

---

১ Reply to the observations of Ootsobanund Bhuttacharjya... Rammohan Roy. [Sunscrit Press, ১৯ আশ্বিন ১২২৩ ; উৎসবানন্দ তাঁর প্রশ্ন পাঠিয়ে দেন আত্মীয়-সভায় ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৩]।

দ্বিতীয়টি উৎসবানন্দের উত্তর : Answer of the said Ootsobanund to the above. Rejoinder to the above answer of the said Bhuttacharjya... Rammohan Roy. —সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৬।

২ নলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (N. C. Ganguly) খ্রীষ্টান ছিলেন ; বহু বছর ধরে Y. M. C. A.-র সঙ্গে যুক্ত থাকা কালে *Rammohan Roy* নামে একখানি উৎকৃষ্ট জীবনী প্রকাশ করেন। ইনি কয়েক বছর বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

দশোপনিষদের যে যে শ্রুতিবাক্যের যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শিবোপাসক-গণও শিবের সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব এবং বিষ্ণু হইতে সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য সেইরূপ ভাবেই ব্যাখ্যা করিতে পারেন।…বিষ্ণুর মাহাত্ম্য প্রদর্শনের জন্য আপনি যে নারদপঞ্চরাত্রের বচন দেখাইয়াছেন, শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের জন্য শাক্ত-গণও সেই স্থলে অসংখ্য তন্ত্রের বচন পরমোৎসাহে উল্লেখ করিয়া থাকেন।”[১]

অতঃপর রামমোহন কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, যাতে শক্তি-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়েছে—

"অনন্তর মুরলীধর বিষ্ণু ভক্তি সহকারে বহু যত্নে মহাবিদ্যা কালীর আরাধনা করিয়া বৈকুণ্ঠাধিপতি হইয়াছেন।…

"সেই গোলোকাধিপতি দেবীর স্তুতি এবং দেবীর প্রতি ভক্তিবশতঃ কালীর অনুগ্রহে লোকপালক হইয়াছেন।…

"লোকের রক্ষার জন্য সস্ত্রীক মুরলীধর সর্ব্বদা ভদ্রকালীর আরাধনা করিয়া গোলোকে বাস করেন।"[২]

রামমোহন নানা শাস্ত্র থেকে দেখিয়েছেন যে, এভাবে সম্প্রদায়ে সম্প্র-দায়ে নিজ নিজ দেবতাতে ব্রহ্মত্ব আরোপ করে অন্যদের হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা মানুষের বহুকালের অভ্যাস। রামমোহন বলছেন—

"আপনি ভগবান্ বিষ্ণুর সেবক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের প্রশংসা করিয়াছেন। যাঁহারা ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত জগতের অনুভবকালে সত্তা স্বীকার করেন এবং যাঁহারা আত্মরত, কেবল সেই সকল অদ্বৈতিগণের নিন্দা এবং মুক্তিকে তুচ্ছ করিয়াছেন। ভক্তির উৎকর্ষ স্থাপনের জন্য 'বরং শূন্য বৃন্দাবনে সে শৃগালত্ব ইচ্ছা করে' ইত্যাদি শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সর্ব্বথা উত্তরের অযোগ্য। যেহেতু সর্ব্বপ্রকারে উহা বেদ দর্শন স্মৃতির বহির্ভূত।…সেই সকল অবিবেকী লোকগণ মুক্তির অনধিকারী।…এই সকল বিজাতীয় রুচিবিশিষ্ট লোকদিগের নিকট শাস্ত্রপ্রমাণ দেখান নিষ্প্রয়োজন।"[৩]

উৎসবানন্দ ভট্টাচার্য আত্মীয়সভার সদস্য ছিলেন এবং পরে ব্রাহ্মসমাজ-

---

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬-২৭।

২ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ২৭।

৩ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৩০।

মন্দির স্থাপিত হলে সেখানে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে বেদাদি-মন্ত্র-পাঠে সাহায্য করতেন। মনে হয়, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যেমন একদিন রামমোহনের ব্রহ্ম-বাদের বিরুদ্ধতা করতে এসে, পরাভূত হয়ে রামমোহনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও আজীবন সমাজের একনিষ্ঠ সেবক হয়ে কাটিয়ে দেন, উৎসবানন্দের জীবনেও বোধ হয় তদ্রূপ ঘটেছিল।

উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে (১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৩), রবিবারে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে লক্ষ্মীনারায়ণ সরকারের হাত দিয়ে প্রশ্ন কয়েকটি আত্মীয়সভায় পাঠিয়ে দেন। রামমোহন প্রশ্নগুলির উত্তর সংস্কৃতেই লেখেন। পুস্তিকা 'সংস্কৃত ছাপাখানায় ছাপা হইল।' নির্বাহকের নাম বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তিকা-শেষে মুদ্রিত হলেও আত্মীয়সভার পক্ষ থেকেই জবাবটা গিয়েছিল। পুস্তিকায় রামমোহনের নাম না থাকলেও, সেকালে সকলেই জানত যে লেখক রামমোহন রায়। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্টে (১৮১৯-২০) দেশীয় ছাপাখানায় মুদ্রিত বইয়ের তালিকায় তিনটি সংস্কৃত বইয়ের উল্লেখ আছে।[১]

রামমোহনকে বেদান্ত ও উপনিষদের ভাষাবিবরণ-মাধ্যমে প্রতিমা-প্রতীক-বিরোধী মত প্রচার করতে দেখে পণ্ডিতরা খুবই বিচলিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের আশঙ্কা, পাছে হিন্দুর ভেদাভেদ দূর হয়ে একাকার হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদচিহ্ন দূর হয়ে যায়; আর হিন্দু পূজা-পার্বণাদি যদি লোপ পায় তবে তাঁদের আর্থিক ক্ষতি সুনিশ্চিত। কারণ ধর্মব্যাবসার উপর ব্রাহ্মণদের জীবিকার নির্ভর। ব্রাহ্মণদের বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধে রামমোহনের অভিযানকে প্রতিহত করবার জন্য প্রথমে লেখনী ধারণ করলেন কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃতে সুপণ্ডিত— বহু গ্রন্থের লেখক; তাঁর গৃহে বেদান্তাদি গ্রন্থের মূল্যবান পুঁথিসমূহ ছিল। সুতরাং অন্যান্য তথাকথিত ব্রাহ্মণপণ্ডিত, যাঁরা উপনিষদাদির অস্তিত্বের খবরটুকু পর্যন্ত রাখতেন না, তাঁদের থেকে ইনি অনেক উঁচুদরের পণ্ডিত। কিন্তু মানুষের পাণ্ডিত্যকে

১ দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৬।

আচ্ছন্ন করে সংস্কার এবং সাধারণত এই সংস্কারের বশবর্তী হয়ে লোকে জেনেশুনেও অনেক সৎকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়। তাই দেখি, রামমোহনের বেদান্তমতকে বিকৃত করবার জন্য মৃতুঞ্জয় যে 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' লিখলেন তা ধর্ম ও দর্শনকে বিকৃতই করে তুলেছিল, আদৌ পরিষ্কৃত করতে পারে নি। বেদান্তের তত্ত্বকথা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে লেখকের ব্যক্তিগত সংস্কারের ধূমজালে। যে বৈদান্তিকতা বা নিস্পৃহতা অবলম্বন করে সত্য-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে হয়, মৃত্যুঞ্জয়ের সুবৃহৎ 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' গ্রন্থে তার একান্ত অভাব। রামমোহনের নাম স্পষ্টত গ্রন্থমধ্যে না করে তাঁর উদ্দেশে যে শ্লেষ ব্যঙ্গ তিনি প্রয়োগ করেছেন তা দার্শনিক বিচারের পরিভাষা নয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' ইংরেজি অনুবাদ-সহ মুদ্রিত হয়েছিল।[১] গ্রন্থকার হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের নাম পুস্তকে না থাকলেও, এ গ্রন্থের যে কে লেখক তা সমসাময়িকরা জানতেন। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক (১৮১৯-২০) বিবরণের পরিশিষ্টে আমরা এই তথ্য পাই—

Vedanta-Chondrica···on the Vedant System (in defence of Hindoo Idolatry, against the observations of Rammohun Roy) ···Mrityonjoy Bidyaloncar.[২]

মৃত্যুঞ্জয় নিজে ইংরেজি জানতেন না, অনুবাদে সহায়তা করেন তাঁর পুত্র। ইংরেজিতে মাত্র ২৫০ কপি ছাপা হয়, এবং তার দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নি।[৩] সুতরাং ঐ বইয়ের চাহিদা কিরকম ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

রামমোহনের প্রথম বাংলা বই, যা শাস্ত্রের অনুবাদ নয়— বিচারমূলক গ্রন্থ— তা হচ্ছে 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার'— মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র উত্তর। আমরা আগেই বলেছি, মৃত্যুঞ্জয় তাঁর 'চন্দ্রিকা'-রচনাকালে লেখনীর শুচিতা রক্ষা করতে পারেন নি ; তাঁর মন রামমোহনের বিরুদ্ধে এমনই উত্তেজিত ছিল যে তিনি বহু অশিষ্ট উক্তি করে নিজের যুক্তি ও

---

১ An Apology for The Present System of HINDOO WORSHIP. Written in the Bengalee Language, and Accompanied by an English Translation, Calcutta: Printed by A.G. Balfour, at the Government Gazetteer Press, No. 1, Mission Row. 1817.

২ দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৩।

৩ দ্র. পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ২৩।

তথ্যকে অত্যন্ত দুর্বল করে ফেলেন। তত্ত্ব-আলোচনায় আমরা প্রবেশ করব না; কেবল রামমোহন মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষাপ্রয়োগের উত্তরে যা বলেছিলেন, পাঠকদের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য তার কয়েক পংক্তি উদ্‌ধৃত করছি—

"ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রালাপে দুর্ব্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না। যদি ভট্টাচার্য্য কৃপাপূর্ব্বক দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ না করেন তবে যথেষ্ট শ্লাঘা করিয়া মানিব।··· আমাদের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন তাহার উত্তর না দিবার তিন কারণ··· পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ব্বাক্য কথন সর্ব্বথা অযুক্ত হয়··· আমাদের এমত রীতিও নহে যে দুর্ব্বাক্য-কথনবলের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই··· ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম।"[১]

'বেদান্ত চন্দ্রিকা' পাঠ করলে বেদান্ত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ অপেক্ষা প্রতিমাদিপূজার সমর্থনে বিস্তারিত যুক্তিজাল বেশি করে পাওয়া যায়। গ্রন্থখানির নাম দেখে হঠাৎ মনে হতে পারে, বইখানি বেদান্তবিষয়ক; কিন্তু বইখানি পড়লে সে ধারণা বজায় থাকে না। হিন্দুধর্ম তথা সমাজের *status quo* বজায় রাখবার জন্য লেখকের আপ্রাণ চেষ্টা গ্রন্থের প্রতি ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে— সত্য থেকে সংস্কার বড়।

প্রতিমাদি পূজার পক্ষে ভট্টাচার্য পাঁচ দফা যুক্তি দেখান; রামমোহন তার প্রত্যেকটির উত্তর দেন। একটা উদাহরণ উল্লেখ করছি। পঞ্চম যুক্তিতে পণ্ডিত বলেছিলেন যে, প্রতিমাপূজা পরম্পরাসিদ্ধ অর্থাৎ tradition-সম্মত, অতীত কাল থেকে চলে আসছে এই প্রথা। তার উত্তরে রামমোহন লিখছেন—

"পূর্ব্বকালে একাল অপেক্ষা করিয়া প্রতিমা প্রচারের অল্পতা ছিলো ইহার এক প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই হিন্দোস্থানের যে কোনো স্থানের চতুর্দ্দিকে ২০ ক্রোশের মণ্ডলীতে ভ্রমণ করিয়া যদি কেহ দেখেন তবে আমরা অভিপ্রায় করি যে ওই মণ্ডলীর মধ্যে বিংশতি ভাগের এক ভাগ প্রতিমা এক শত বৎসরের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এমৎ পাইবেন আর উনিশ ভাগ এক

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৫৬-৫৭।

শত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ইহা দেখিবেন। বস্তুত, যে ২ দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ক্রটি হইবেক সেই ২ দেশে প্রায় পরমার্থ সাধন বিধিমতে না হইয়া লৌকিক খেলার ন্যায় হইয়া উঠে।"[১]

রামমোহন 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র যুক্তিজালের চরম উত্তর দান করছেন গ্রন্থের শেষাংশে—

"এক ব্যক্তি লোকের যাবৎ শাস্ত্র গোপন করিয়া লোককে শিক্ষা দেয় যে যাহা আমি বলি এই শাস্ত্র ইহাই নিশ্চয় কর তোমার বুদ্ধিকে এবং বিবেচনাকে দূরে রাখ আমাকে ঈশ্বর করিয়া জান আমার তুষ্টির জন্যে সর্ব্বস্ব দিতে পার ভালই নিদান তোমার ধনের অর্দ্ধেক আমাকে দেও আমি তুষ্ট হইলে সকল পাপ হইতে তুমি মুক্ত এবং স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে।"

আজ দেশের দিকে তাকিয়ে এই গুরুবাদ ও পুরোহিত ও পাণ্ডাদের প্রভুত্ব ও শোষণের কোনো ন্যূনতা দেখছি? রামমোহন লিখছেন—

"একজন শাস্ত্র এবং লোকের বোধের নিমিত্ত যথাসাধ্য তাহার ভাষা-বিবরণ করিয়া লোকের সংমুখে রাখে এবং নিবেদন করে যে আপনার অনুভবের দ্বারা এবং বেদসম্মত যুক্তির দ্বারা ইহাকে বুঝ আর যাহা ইহাতে প্রতিপন্ন হয় তাহা যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর আর অন্তঃকরণের সহিত তাহারি কেবল সম্মান করিবে যাহার ঈশ্বরে ভয় ও নীতি ভাল দেখহ।"[২]

রামমোহনের মতে হিন্দুর পক্ষে বেদসম্মত যুক্তি (বেদান্তপ্রতিপাদ্য), বুদ্ধি ও বিবেচনার পথাশ্রয়ী হলেই পরম সত্য স্বতই উদ্ভাসিত হয়।

রামমোহন 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' নামে যে পুস্তিকায় বেদান্ত চন্দ্রিকার সমালোচনা করেন, তার ইংরেজি অনুবাদও যুগপৎ প্রকাশ করেছিলেন। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লেখেন :

For my European readers I have thought it advisable to make some additional remarks to those contained in the Bengali publication, which, I hope, will tend to make my arguments

---

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭৬।
২ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৮৪।

more clear and intelligible to them than a bare translation would do."১

ইংরেজিতে তর্জমা করার কারণ ছিল বলে মনে হয়। রামমোহনের মতকে য়ুরোপীয় খ্রীষ্টান পাদরিরা খুব সুনজরে দেখতেন না, ; তাই বোধ হয় তিনি গোঁড়া হিন্দুদের যুক্তিজালকে কিভাবে কেটেছেন, সেইটা পাদরিদেরও জানিয়ে দিলেন।

আমরা অন্যত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' কিভাবে হিন্দু বাঙালির সামাজিক প্রগতিকে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করেছে, সে-বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি।

রামমোহনের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন মুষ্টিমেয় যুবক। এই যুবগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন ব্রজমোহন মজুমদার। এঁর নামে প্রকাশিত 'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ' গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন, কারণ বহুদিন এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও একাধিকবার ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে প্রচারিত হয়।

রামমোহনের আত্মীয়সভায় যে-সব যুবজন আসতেন তাঁদের মধ্যে এক মজুমদার-পরিবার ছিলেন। সমকালীন 'সমাচার দর্পণ' (২২মে১৮১৯)লেখেন—

"বেদান্তমত।— ৯ মে (১৮১৯) রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনারদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে সেই সভাতে জাতির প্রতি বিধি কিম্বা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল ও খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল [জাতিভেদ ও খাদ্যাখাদ্যবিচার]। এবং যুবতি স্ত্রীর স্বামি মরণান্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কাল ক্ষেপ কর্ত্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিক কর্ম্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদ হইতে আপনারদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া

১ A Second Defence of the Monotheistical System of Vedas : in Reply to an Apology for the present State of Hindoo Worship: Calcutta, 1817. *English Works*, pp. 101-26.

গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।"[১]

ব্রজমোহন মজুমদার ১৮২০ অব্দে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে 'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ' পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, 'ব্রাহ্ম' শব্দটি ১৮২০ সালের মধ্যে প্রযুক্ত হচ্ছে।

উক্ত গ্রন্থের লেখক কে এই নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে। পাদরী লঙ (James Long)-এর বাংলা পুস্তকের তালিকা (১৮৫৫) গ্রন্থে 'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ' গ্রন্থকে রামমোহনের রচনা বলে নির্দিষ্ট আছে (Brahma putalika Sambad 1820, by R. Ray: Conference between an Idolator and True Believer.) কিন্তু ১৮১৯-২০ সালের ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির কার্যবিবরণের মধ্যে ব্রজমোহনকে এই বইয়ের লেখক বলা হয়— '*Bruhma-pootlik-sombad*, Conference between a True Believer and Idolator...Brojomohan Mozoomdar'। এই বইখানি প্রকাশিত হয় ১৯ মে ১৮২০। বোধ হয় 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' পুস্তিকা প্রকাশের পর 'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ' প্রকাশিত হয়।

ব্রজমোহনের এই পুস্তক ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন Deocar Schmid; এই Schmid ও তাঁর অনুবাদ প্রভৃতি নিয়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Stephen Hay বহু গবেষণা করেছেন।[২]

দেওকর স্মিট জাতিতে জার্মান, Jena বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত। নেপোলনীয় সমরের অবসানে দেওকর লণ্ডন আসেন ও Church Missionary Society-র সঙ্গে যুক্ত হন। এদেশে দেওকর ও তাঁর ভ্রাতা আসেন ১৮১৭ সালের শেষ দিকে—মাদ্রাজে এসে ওঠেন। লণ্ডনে বাসকালে রামমোহন-কৃত বেদান্তসারের ইংরেজি অনুবাদ তাঁর হস্তগত হয়। এটি লণ্ডনে মুদ্রিত সংস্করণ। এই সংস্করণের ভূমিকায় রামমোহন তাঁর এক ইংরেজ

১ আত্মীয়সভার কোনো অধিবেশনের বর্ণনা। দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজমোহন মজুমদার, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৭।

২ Stephen Hay, *A Tract against the Prevailing System of Hindoo Idolatry*: K. L. Mukhopadhyaya, 1963.

বন্ধুকে ধর্ম সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করেন তা দেওকরকে খুবই মুগ্ধ করে। তিনি খ্রীষ্টান পাদরি—একজন ভারতীয়কে 'I have found the doctrines of Christ more conducive to religious principles, and better adapted for the use of rational beings,' ইত্যাদি লিখতে দেখে ভেবেছিলেন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের উপযুক্ত একটি মানুষকে পাওয়া যাবে ভারতে। অতঃপর মাদ্রাজে উপনীত হয়ে ৪ মে ১৮১৮ তারিখে রামমোহনকে লেখেন—

"Even when I resided in London, it was a matter of great joy to me, that I should probably find an opportunity of forming an acquaintance with you and of conversing with you on the most important subjects that can enter into the consideration of men."১

বেদান্তসারের জার্মান অনুবাদ Jena থেকে ১৮১৭ সালে প্রকাশিত হয়। অনুবাদক দেওকর স্মিট কি না তা সঠিক বলা যায় না; হয়তো তরুণ উৎসাহী লুথারীয় চার্চের পাদরি এটি অনামে প্রকাশের ব্যবস্থা করে থাকবেন। কারণ, রামমোহনের ভূমিকায় উদ্‌ধৃত পত্রখানি পড়ে অনুবাদকের মনে হয়েছিল, "The author's intention seems to have been to show the agreement with Christianity of the foundation of Brahmaism."২

দেওকর স্মিট মাদ্রাজ থেকে বদলি হয়ে কলকাতায় এলেন ১৮১৯ সালে। রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় হল; কিন্তু কথাবার্তা বলে বুঝলেন, এ লোকের খ্রীষ্টের প্রতি যতই শ্রদ্ধা থাক্‌, খ্রীষ্টানীর প্রতি তেমন আকর্ষণ নেই। ১৮১৯-এর পহেলা ডিসেম্বর তারিখে দেওকর বিলাতে চার্চ মিশনারী সোসাইটির সম্পাদককে যে পত্র দেন তাতে বলছেন যে, রামমোহন সম্বন্ধে 'I have not any joyful news to report', কারণ তিনি কয়েকজন য়ুরোপীয় Socinian অর্থাৎ Unitarian-এর পাল্লায় পড়েছেন।

১৮২০ সালে ব্রজমোহনের 'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ' প্রকাশিত হলে শ্রীরাম-

১ Stephen Hay, *A Tract against the Prevailing System of Hindoo Idolatry*, p. 6.
২ Stephen Hay লিখছেন: "This sentiment is additional evidence that the translator was none other than the hopeful young missionary, Deocar Schmid."—p. 5.

পুরের পাদরিদের পত্রিকা *The Friend of India* (December 1820) উচ্ছ্বসিত হয়ে ঐ পুস্তক সম্বন্ধে লিখলেন :

"It is a masterly exposure, by a native, of the absurdities of the present Hindoo System.

"While the work is argumentative in a high degree, it is interspersed with observations, which for keenness of satire would scarcely have disgraced the pen of Lucian.

"What European could have written a work equally delicate and equally... in its application ?

..."a native of India has been capable of producing so masterly a treatise by the pure force of unassisted genius.

"The rich vein of oriental intellect is no longer hidden from our view..."[১]

ব্রজমোহনের এই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ শুরু করেন দেওকর স্বয়ং; রামমোহন সেই অনুবাদের সহায়ক হলেন এবং মুদ্রণের ব্যবস্থাভার গ্রহণ করলেন। গ্রন্থে অনুবাদকের নাম ছিল না, কেবল Translator শব্দটি ছিল। স্মিট ভালো বাংলা জানতেন, তৎসত্ত্বেও রামমোহনের কাছে অনুবাদ-ব্যাপারে পরামর্শ নিয়েছিলেন। এই অনুবাদ-কার্য শেষ করে, গ্রন্থের লেখক ব্রজমোহন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য রামমোহনকে পত্র দেন এবং আমরা তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু জানবার তা ঐ পত্র থেকে জানতে পারি।[২]

দেওকর স্মিটই 'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ' গ্রন্থের একমাত্র অনুবাদক নহেন। ১৮৪৩ ফেব্রুয়ারি মাসে পুস্তকটি পাদরি W. Morton অনুবাদ করে প্রকাশ করেন ; এইসঙ্গে তিনি বাংলা পুস্তকখানিও পুনর্মুদ্রিত করেন :

"ওঁ তৎসৎ। অর্থাৎ শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দেব কর্তৃক বিরচিত তথ্য প্রকাশ। পুনর্ব্বার শুদ্ধিকরণ পূর্ব্বক টীকা সহিত মুদ্রাঙ্কণ করা গেল।"

১৭৬৮ শকাব্দে (১৮৪৬) তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে 'পৌত্তলিক প্রবোধ'

---

১ *Ibid*, Introduction। এই ব্রজমোহন তথা রামমোহন যখন A Friend of Truth নামে *Precepts of Jesus* লিখলেন, তখন এই 'ভারতবন্ধু' মার্শম্যান ঐ গ্রন্থের লেখককে heathen বলেছিলেন। অন্যত্র এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

২ দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৯, পৃ. ৬২ ; এবং Stephen Hay, *A Tract against the Prevailing System of Hindoo Idolatry*, pp. 12-15.

নামে এই পুস্তক মুদ্রিত হয় এবং ১৮৬৬ অব্দে তৃতীয় সংস্করণ হয় বলে জানা যায়।[১] মূল 'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ' গ্রন্থের কোনো কপি পাওয়া যায় নাই, তবে 'পৌত্তলিক প্রবোধ' গ্রন্থই যে 'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ' তা দেওকর স্মিট -কৃত ইংরেজি অনুবাদ হতেই বুঝা যায়। 'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ'-কে কেউ কেউ 'পৌত্তলিকমুখ চপেটিকা' নামাঙ্কিত করেছিলেন। বোধ হয় এই নাম সমকালীনদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

ব্রজমোহনের বেনামে রামমোহন এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন কেন— সে প্রশ্ন লোকের মনে ওঠে। তবে রামমোহন বহু গ্রন্থ ও পুস্তিকা এবং পত্রিকায় বন্ধুবান্ধবদের নামে পত্র প্রকাশ করতেন; একই লোক পৌত্তলি-কতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে না, আরও লোক এর সঙ্গে যুক্ত, বোধ হয় এই ভাবনা থেকেই অন্য লোকের নামে লেখা প্রকাশ করতেন। তা ছাড়া রামমোহনের নামেই হিন্দুরা আতঙ্কিত হত; তাঁর লেখা বই তারা স্পর্শ করবে না—সেইজন্য হয়তো অন্য নামে লেখাগুলি প্রকাশ করতেন। তা ছাড়া অনেক পুস্তক বা পুস্তিকায় কোনো নামই দিতেন না; বেদান্তসার গ্রন্থের অনুবাদক-স্থলে 'Translator' মাত্র ছিল।

ব্রজমোহন তথা রামমোহনের 'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ' ১৮২০ সালের শেষভাগে প্রকাশিত হবার পর, 'সমাচার চন্দ্রিকা'র দৃষ্টি পড়ে এর উপর। "শ্রীমদ্ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির প্রিয় পোষ্যস্য কস্যচিৎ ক্ষুদ্র শিষ্যস্য ইতি স্বাক্ষরিত 'জ্ঞানাঞ্জনশলাকা' নামে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ" প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের প্রত্যুত্তরে রামমোহন 'গুরুপাদুকা' নামে ক্ষুদ্র এক পুস্তিকা লেখেন। রেভারেণ্ড লঙ -এর বাংলা গ্রন্থতালিকাতে এটির উল্লেখ আছে।

"*Gurupaduka*, by R. Ray, pp. 6, 1823: Reply to the *Chandrika's* Defence of Idolatry."

এই গ্রন্থের ভূমিকাংশে আছে: 'জ্ঞানাঞ্জনশলাকা'র "দুর্ব্বাক্যের উত্তর দিবার প্রয়োজনাভাব কিন্তু গত চন্দ্রিকায় তদুত্তর প্রার্থনায় শ্রীগৌরাঙ্গ দাস এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং তাহার এবং তৎসংসর্গিদের

---

১ সাহিত্যপরিষদ গ্রন্থাগার, পুস্তক-তালিকা, ১৩৪৮; পৃ. ৩০, ৫১:একমেবাদ্বিতীয়ং/পৌত্তলিক প্রবোধ/শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দেবের কৃত গ্রন্থ হইতে প্রাজ্ঞ ও পৌত্তলিকের/প্রশ্নোত্তর ছলে উদ্ধৃত হইয়া/২৪ কার্ত্তিক ১৭৬৮ শক/কলিকাতা/তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল।

কৃতার্থের নিমিত্ত গুরুপাদুকানামিকা এই পত্রিকা প্রদান করিতেছি ইহাতে যদি জ্ঞান না জন্মে তবে চেষ্টান্তর করিতে হইবেক।"[১]

'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ' গ্রন্থের ভাষার ও যুক্তির নমুনা-স্বরূপ আমরা তৃতীয় প্রকরণ হতে কয়েকটি পংক্তি উদ্‌ধৃত করছি:

যদি বল যুক্তিসিদ্ধ অথবা শাস্ত্রসিদ্ধ হউক অথবা না হউক পিতৃপিতামহ যাহা করিয়া আসিয়াছেন তাহাই করিব।

উত্তর। তোমরা পুত্তলিকা লইয়া খেলিবার নিমিত্ত পিতৃপিতামহের নাম উল্লেখ করহ নতুবা কি লৌকিক কি পারমার্থিক কোন বিষয়ে আপন ২ পিতৃপিতামহের ব্যবহারানুসারে অতি অল্প কর্ম্ম করিয়া থাক এ অতি আশ্চর্য্য। তোমাদের মধ্যে যাঁহাদের পিতৃপিতামহ সৎ-কর্ম্মান্বিত এবং বিদ্যা ব্যবসায়ী ছিলেন, এমন সহস্র সহস্রকে দেখিতেছি তথাপি তাঁহারা পিতৃপিতামহের ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ঘোর বিষয়ী হইয়া ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যদি কাহার ধনবত্তা হয় তবে সে বংশের তিলক কহায়—এখন দুর্গোৎসবাদিতে যবনীর নৃত্য ও ম্লেচ্ছাদির নিমন্ত্রণ ও তাহাদের ভোজন করাইয়া প্রশংসনীয় হইতেছেন; কিন্তু পিতৃপিতামহ কবে এসকল করাইয়াছেন? ঝোলনা যাত্রায় ও নন্দোৎসবেতে কেহ ২ যবনী নৃত্য করাইতেছেন ইহা কোন পিতৃপিতামহের ব্যবহারে ছিল··· (পৃ. ৮৪)।

যদি বল প্রতিমার আরাধনা মহাজন পরম্পরায় হইয়া আসিতেছে অতএব মহাজনেরা যাহা করিয়া আসিতেছেন তাহাই কর্ত্তব্য।

উত্তর। কৌলেরা আগমবাগীশ বিরূপাক্ষ প্রভৃতিকে মহাজন শব্দে কহিয়া আসিতেছেন আর তাঁহারা হরিদাস ও গৌরাঙ্গদাস ও নিতাইদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবের মহাজনদিগকে অবহেলা করেন ঐরূপ বৈষ্ণবেরা হরিদাস ও গৌরাঙ্গ দাস ও নিতাই দাস প্রভৃতিকে মহাজন জানিয়া আগমবাগীশ প্রভৃতির নিন্দা করেন; আর উদাসী প্রভৃতি

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৬।

সকলে গুরুনানককে মহাজন কহিয়া থাকেন। এই প্রকার নানা পথের লোক সকল পৃথক ২ ব্যক্তিকে মহাজন কহিয়া থাকেন কিন্তু ঐ মহাজন সকলের পরস্পর মতের অত্যন্ত অনৈক্য এখন সকলকে কি মহাজন জানিয়া সকলের মত গ্রহণ করিতে হইবেক কি শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যাইবেক।···

অথ গড্ডলিকা প্রবাহে যেমন এক মেষ স্রোতজলে অথবা কূপেতে পড়িলে অন্য মেষ সকল সেই জলে অথবা কূপে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। ইহার কারণ ঐ মেষ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের যদি তাৎপর্য্যবোধের এবং বাক্য প্রয়োগের শক্তি থাকিত তবে এই উত্তর দিত ঈশ্বর আমাদের ভদ্রাভদ্র বিবেচনার শক্তি দেন নাই সুতরাং এক অগ্রগামি মেষকে জলে পড়িতে দেখিলাম, আমরাও তদনুসারে জলে পড়িলাম। ইহাতে দুঃখই পাই আর প্রাণই বা যাউক কি করিব।

উটের বৎস কণ্টক ভোজন করিয়া মুখে যখন অতিশয় রক্তপাত করে, সেকালে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার তাৎপর্য্যবোধের এবং বাক্য প্রয়োগের শক্তি থাকিলে এইমাত্র কহিত আমার পিতৃ পিতামহকে কণ্টক ভোজন করিয়া মুখে রক্তপাত করিতে দেখিয়াছি আমিও সুতরাং তদনুসারে কণ্টক ভোজন করি—যেহেতু ঈশ্বর আমাকে সৎঅসৎ বিবেচনার শক্তি দেন নাই।

প্রশ্ন। যদি বল আমরা পুত্তলিকা আরাধনার সংস্থাপনের নিমিত্ত শাস্ত্র প্রমাণ দিব, অতএব গড্ডলিকা প্রবাহ কহিতে পারিবে না।

উত্তর। এ বিষয়ের উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছি। ফলতঃ শাস্ত্রে পুত্তলিকা আরাধনার বিধি মূঢ় অবোধের প্রতি দিয়াছেন, অতএব তোমরা শাস্ত্রপাঠে ও বিষয়কর্ম্মে সর্ব্বত্র সুবোধ হও, কেবল পুত্তলিকা আরাধনার সময় আপনাকে অবোধ কহ এরূপ বাক্য কৌশলে ধর্ম্মকে বঞ্চনা করিতে পারিবে না॥ ইতি তৃতীয় প্রকরণ (পৃ. ৯৪)।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়— রামমোহনের বাংলা গদ্য গত কয়েক বছরের মধ্যে কত স্বচ্ছ হয়েছে; এর একটি কারণ, শাস্ত্রগ্রন্থ-অনুবাদে ও ব্যাখ্যানে তাঁকে মূলের সঙ্গে সর্বদা সংগতি রক্ষা করতে হয়েছে, রচনার

স্বাধীনতা সেখানে কম ছিল। গদ্যরচনার রীতির দিক থেকে 'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ" বইটির বাংলা গদ্য-সাহিত্যর ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান প্রাপ্য।

বেদান্তসার, কেনোপনিষদ, ঈশোপনিষদ ইংরেজিতে অনূদিত হয় ১৮১৬ সালের মধ্যে। রামমোহনের ধর্ম-বিষয়ক মতামত বাংলাদেশের বাইরে ইংরেজি-জানা সমাজেও প্রচারিত হয়; ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদারধর্মনীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা রামমোহনের বইগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়েছিলেন বলে মনে হয়। Miss Adrienne Moore -এর *Rammohan Roy and America* নামে ইংরেজি বইখানি দেখলেই এই তথ্যটি স্পষ্ট হয়। কিন্তু বাংলা দেশে ও বাংলার বাইরে খ্রীষ্টান মহল থেকেই বিরোধটা জমে ওঠে বেশি করে। ভারতে ব্যাপটিস্ট খ্রীষ্টান পাদরিদের সঙ্গে রামমোহনের যে বিরোধ বাধে তার কথা অন্যত্র আলোচনার অন্তর্গত হবে। আমাদের আলোচ্য পর্বে, অর্থাৎ ১৮১৬ সালে, অপ্রত্যাশিত আক্রমণ এল মাদ্রাজ হতে। তথাকার গবর্মেণ্ট কলেজের ইংরেজির প্রধান শিক্ষক শঙ্কর শাস্ত্রী *Madras Courier* পত্রে এক দীর্ঘ পত্রে রামমোহনের অনূদিত তিনখানি গ্রন্থের সমালোচনা করলেন (২৬ ডিসেম্বর ১৮১৬)। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়—সকল মনুষ্যজাতির মধ্যে মানসিক উন্নতির জন্য শাস্ত্রে মূর্তিপূজার ব্যবস্থা আছে। রামমোহন ইংরেজিতে উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু লিখলেন যে, শাস্ত্রীয় বিচার হিন্দুরা দেবভাষাতেই করে থাকেন; বিদেশী ভাষায় তাঁকে উত্তর করতে হচ্ছে বলে তিনি খুবই নৈরাশ্য বোধ করছেন :

...I beg...to express the disappointment I have felt in receiving from a learned Brahman controversial remarks on Hindoo theology written in a foreign language···

শঙ্কর শাস্ত্রীর পত্র পড়ে রামমোহনের সন্দেহ হয় যে, পত্র-প্রবন্ধের লেখক কোনো ইংরেজ:

"the letter is the production of an Englishman, whose literality, I suppose, has induced him to attempt an apology even for the absurd idolatry of his fellow creatures."

রামমোহন বারো দফায় শাস্ত্রীর পত্রের উত্তর দেন ; পঞ্চম উত্তরটি আমরা উদ্ধৃত করছি :

The learned gentleman states, that 'the difficulty of attaining a knowledge of the Invisible and Almighty Spirit is evident from the preceding verses.' I agree with him in that point, that the attainment of perfect knowledge of the nature of the God-head is certainly difficult, or rather impossible ; but to read the existence of the Almighty Being in his works of nature, is not, I will dare to say, so difficult to the mind of a man possessed of common sense, and unfettered by prejudice, as to conceive artificial images to be possessed, at once, of the opposite natures of human and divine beings, which idolaters constantly ascribe to their idols, strangely believing that things so *constructed* can be converted by ceremonies into *constructors* of the universe.[১]

প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বরূপ দেখা যায়, এ কথাটার নূতনভাবে ব্যাখ্যান এখানে পাচ্ছি।

মূর্তিপূজার এই সমর্থনের উত্তরে রামমোহন লিখেছিলেন যে, যারা নিরাকারের ধ্যান করতে পারে না, তাদের জন্য সাকার পূজার ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে; কিন্তু সমগ্র মানবজাতির জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে—একথা তো সত্য নয়। মুসলমানদের মধ্যে ধনী-দরিদ্র বিদ্বান-মূর্খ, য়ুরোপের প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টান এবং ভারতের কবীর-পন্থী ও শিখধর্মীরা তো মূর্তি ছাড়াই পরমেশ্বরের উপাসনা করে। শঙ্কর শাস্ত্রী তাঁর পত্রের শেষ দিকে বলেন, "that the saviour should be considered a personification of the mercy and kindness of God (I mean actual, not allegorical personification)।" যীশুখ্রীষ্টকে পরিত্রাতা স্বীকার করে তাঁর মূর্তিপূজাদি বিষয়ে যে কথা লেখক তোলেন, রামমোহন বললেন এ বিষয়ের আলোচনা অবান্তর।

শঙ্কর শাস্ত্রী যদি ইংরেজ নাও হয়ে থাকেন তিনি ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ছিলেন ; সেইজন্য তিনি মূর্তিপূজার সমর্থন করেন। এই পত্র-পুস্তিকায়

১ A Defence of Hindoo Theism in Reply to the Attack of an Advocate for Idolatry at Madras— *English Works* ।

রামমোহন শ্রীকৃষ্ণের তীব্র নিন্দা করেছিলেন; শিবের যে প্রতীক পূজিত হয় তা যে নরনারী-দেহের বিশেষ গোপন অঙ্গ তা "it is impossible to explain in language fit to meet the public eye" (*English Works*, —p. 99)। মোটকথা এই পত্র-পুস্তিকায় রামমোহন মদ্রদেশীয় খ্রীষ্টান শাস্ত্রীকে ধর্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত 'অসোয়াস্তিকর' প্রশ্ন করে বিব্রত করেছিলেন।

উৎসবানন্দ ভট্টাচার্য বৈষ্ণব-পক্ষে ধর্ম সমর্থন করে যে আলোচনা উত্থাপন করেছিলেন সে বিষয়ের আলোচনা হয়ে গেছে। এবার যিনি বৈষ্ণবধর্মের পক্ষ নিয়ে এগারোপাতাব্যাপী দীর্ঘ পত্র বাংলায় লিখে পাঠান তাঁর নাম লিখিত ছিল 'ভগবদ্ গৌরাঙ্গপরায়ণ গোস্বামিজী,' আসল নাম তিনি কবুল করেন নি। গোস্বামীর আসল নাম বোধ হয় 'রামগোপাল শর্মা'। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের সঙ্গে যে পুস্তক-তালিকা মুদ্রিত হয়েছিল, তাতে রামমোহনের একটি পুস্তিকার নাম উল্লেখ আছে—'Reply to a MS. of Ram-gopala Sormono'। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন এই বই 'গোস্বামীর সহিত বিচার'।[১]

'ভগবদ্ গৌরাঙ্গপরায়ণ গোস্বামিজী' শাস্ত্র মন্থন করে প্রতিমাপূজার পক্ষে বহু বচন উদ্ধৃত করেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য—শ্রীভাগবতপুরাণ বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য। রামমোহন ভাগবত পড়েছিলেন, তার প্রমাণ রয়ে গেছে বহু উদ্ধৃতির মধ্যে। ভাগবত যে বেদান্তের ভাষ্য হতে পারে না—একথা রামমোহন খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন তাঁর উত্তরে। তিনি শাস্ত্র দিয়ে শাস্ত্রকে কেটেছেন। রামমোহনের প্রশ্ন, পণ্ডিতদের মধ্যে ভাগবত সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ, অনেকে তো একে 'পুরাণ' বলে স্বীকারই করেন না; এ গ্রন্থের রচয়িতা বোপদেব গোস্বামী, এমন মতও প্রচলিত আছে। রামমোহনের যুক্তির ভাষা ও ভঙ্গির একটু নমুনা উদ্ধৃত করছি—

"এ দেশে পুরাণ সকলের প্রায় পরম্পরা প্রচার নাই এবং সুলভ সংস্কৃতে অনায়াসে পুরাণের ন্যায় বচনের রচনা হইতে পারে এই অবসর পাইয়া এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবেরা যেমন শ্রীভাগবতকে ভাষ্য করিয়া প্রমাণ

---

১ রামমোহন রায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৬।

করিবার নিমিত্ত গরুড়পুরাণ বলিয়া বচন রচনা করিয়াছেন আর [গত] দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে জন্ম যাঁহাদের এবং অন্য দেশে অপ্রসিদ্ধ এমৎ নবীন ২ ব্যক্তিকে অবতার করিয়া স্থাপন করিবার নিমিত্ত ভবিষ্য ও পদ্মপুরাণ বলিয়া যেমন কল্পিত বচন লিখেন সেইরূপ কোনো ২ শাক্ত-শ্রীভাগবতকে অপ্রমাণ করিয়া কালীপুরাণকে ভাগবতরূপে স্থাপন করিবার নিমিত্ত স্কন্দপুরাণীয় বচনের প্রকাশ করেন।"

স্কন্দপুরাণীয় বচন উদ্ধৃত করে তার অনুবাদ করছেন--

"যে গ্রন্থেতে নানা অসুর বধের সহিত ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য কহিয়াছেন, তাহাকে ভাগবত করিয়া জানিবে। কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক সকল ভগবতীর মাহাত্ম্যযুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবতের কল্পনা করিবেক।"

এই অনুবাদের পর রামমোহন নিজমত ব্যক্ত করছেন—

"অতএব পূর্ব্ব ২ গ্রন্থকারের অধৃত বচন সকলকে শুনিবা মাত্র যদি পুরাণ করিয়া মান্য করা যায় তবে পূর্ব্বের লিখিত বৈষ্ণবের রচিত বচন এবং এইরূপ শাক্তের কথিত বচন এ দুইয়ের পরস্পর বিরোধ দ্বারা শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য এবং অর্থের অনির্ণয় ও ধর্ম্মের লোপ এককালে হইয়া উঠে অতএব যে সকল পুরাণের ও ইতিহাসের সর্ব্বসম্মত টীকা না থাকে তাহার বচন প্রাচীন গ্রন্থকারের ধৃত না হইলে প্রমাণ হইতে পারে না। পঞ্চম শ্রীভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নহেন, ইহা যুক্তির দ্বারাতেও অতি সুব্যক্ত হইতেছে।"[১]

সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রগ্রন্থে প্রচুর প্রক্ষিপ্ত বচন (interpolation) আছে, এ কথা তখনও তেমনভাবে পণ্ডিত-মহলে আলোচিত হতে আরম্ভ করে নি। রামমোহনের কঠোর যুক্তিবাদী মন অসৎ পাণ্ডিত্যকে বরাবর আঘাত করে এসেছিল। খ্রীষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে খ্রীষ্টতত্ত্ব নিয়ে যে মসী-যুদ্ধের কথায় আমরা পরে আসব, সেখানেও রামমোহনের যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী মনের সন্ধান পাব।

রামমোহন গোস্বামীর আর-একটি উক্তির অসারত্ব প্রমাণ করেন।

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৯-৫০।

গোস্বামী বলেন— সাকার কৃষ্ণই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। অবশ্য এ ধরনের প্রচেষ্টা এখনও বন্ধ হয় নি, এবং বহু সদ্‌গুরু প্রথমে অবতার রূপে এবং পরে পূর্ণ-ব্রহ্ম রূপে হোম যাগযজ্ঞ দ্বারা পূজিত হচ্ছেন। রামমোহন পরিষ্কার বললেন, "বেদান্তসূত্রের সহিত শ্রীভাগবতের সম্পর্ক মাত্র নাই।" "বৈষ্ণব সম্প্রদায় কেহ কেহ কেবল ব্যুৎপত্তিবলের দ্বারা অক্ষর সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বেদান্ত শাস্ত্রকে স্পষ্টার্থের অন্যথা করিয়া শ্রীকৃষ্ণপক্ষে এবং তাঁহার রাস-ক্রীড়াদি লীলাপক্ষে বিবরণ করিয়াছেন।" রামমোহন লিখছেন, "শৈবসকল ঐ বেদান্তসূত্রকে ব্যুৎপত্তিবলের দ্বারা শিবপক্ষে ও তাহার কোচবধূর সহিত লীলাপক্ষে অক্ষর ভাঙ্গিয়া ব্যাখ্যান করিয়াছেন এবং এইরূপে বিষ্ণু-প্রধান শ্রীভাগবতকে কালীপক্ষে ব্যাখ্যা কোন শাক্তবিশেষ করিয়াছেন...।" এই বৈয়াকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করলে কোনো শাস্ত্র থেকেই সঠিক বার্তা আমরা পেতে পারি না। "ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা এবং প্রসিদ্ধার্থকে ত্যাগ করিয়া এরূপ ব্যাখ্যার প্রামাণ্য করিলে কোন্ শাস্ত্রের কি তাৎপর্য্য স্থির না হইয়া শাস্ত্র-সকল কদাপি প্রমাণ হইতে পারে না।" ব্যাকরণের সাহায্যে রাতকে দিন এবং দিনকে রাত প্রমাণের চেষ্টা এ দেশে যথেষ্ট হয়েছে ; শুনেছি কোনো ভাষ্যকার 'প্রাজ্ঞ' শব্দের অর্থ করেছিলেন পাঁড়মূর্খ ; কারণ, প্র-অজ্ঞর অর্থ প্রকৃষ্টরূপে অজ্ঞ। শঙ্করাচার্যও ফেলা যান না, তাঁর প্রচেষ্টার কথা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

গোস্বামী আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে শঙ্করাচার্যের বেদান্তভাষ্যকে 'মোহের নিমিত্ত' বলেন ; রামমোহন তদুত্তরে যা বলেন, তাতে চৈতন্যদেবের প্রতি তাঁর মনোভাব প্রকাশ পায়। তিনি লিখছেন :

"যদ্যপিও ভগবান আচার্য্যের [শঙ্কর] কৃত ভাষ্যকে মোহের নিমিত্ত করিয়া কহা সকলেরি দুষ্কৃতের কারণ হয় তথাপি বিশেষ করিয়া চৈতন্যদেব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগ্যের অত্যন্ত অপরাধজনক হইবেক।"

অপরাধের কারণ সম্বন্ধে বলছেন :

"পূজ্যপাদ ভগবান্ ভাষ্যকারের শিষ্যানুশিষ্য প্রণালীতে কেশব ভারতী ছিলেন সেই কেশব ভারতীর শিষ্য চৈতন্যদেব হয়েন... শ্রীধর স্বামীও পূজ্যপাদ সম্প্রদায়ের শিষ্যশ্রেণীতে ছিলেন তাঁহার কৃত গীতা প্রভৃতির টীকা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে কি অন্য সংপ্রদায়ে সর্ব্বথা মান্য এবং চৈতন্যদেবও ঐ টীকাকে

মান্য করিয়াছেন... অতএব ভগবান্ আচার্য্যের মত মোহের কারণ হয় এমৎ কহিলে চৈতন্যদেব ও শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি সেই সম্প্রদায়ের সংন্যাসীদিগ্যে মুগ্ধ করিয়া স্বীকার করিতে হইবেক... আচার্য্যের নিন্দা করাতে এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবদিগ্যের ধর্ম্মের ক্রমে মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। আর আমাদের প্রতি আচার্য্যমতাবলম্বী করিয়া যে কটাক্ষ করিয়াছেন সে আমাদের শ্লাঘ্য সুতরাং ইহার উত্তর কি লিখিব।"[১]

রামমোহনের 'গোস্বামীর সহিত বিচার' প্রসঙ্গে একটা কথা স্পষ্ট হয় যে, চৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রতি তাঁর অসামান্য শ্রদ্ধা ছিল না। প্রত্যক্ষ কারণ, উৎসবানন্দ ও রামগোপালের অযৌক্তিক বাক্যবিন্যাস শুনে বৈষ্ণবীয় ধর্মের উপরই তিনি বিরক্ত হয়ে যান। সে যুগের বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের চরম দুর্গতির দিন। বৈষ্ণব বলতে 'বোষ্টম,' 'নেড়া-নেড়ি'র ধর্ম ও আচার বুঝাত ; তখনও মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম, শাস্ত্র, এমন-কি পদাবলীর প্রতিও আকর্ষণ দেখা দেয় নি। 'পথ্য প্রদান' গ্রন্থে তিনি স্পষ্টই লেখেন :

"গৌরাঙ্গ যাহার [বৈষ্ণবের] পরব্রহ্ম ও চৈতন্যচরিতামৃত শব্দব্রহ্ম তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ ... কেবল বৃথাশ্রমের কারণ...।" এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, অদ্বৈতবাদী ও অবতারবাদীর মধ্যে ব্যবধান দুস্তর।

রামমোহনের প্রধান অনুবর্তক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অদ্বৈতবাদ স্বীকার করতে পারেন নি, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। দেবেন্দ্রনাথ ভক্তিবাদী ; কিন্তু বৈষ্ণবীয় নৃত্যগীত-উচ্ছ্বাস আধ্যাত্মিক জীবনের প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করেন নি ; তাঁর আভিজাত্যের শালীনতায় উচ্ছ্বাস-প্রদর্শন বাধত। সেই ভাবনাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রূপ পায়—

"যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা

[১] রামমোহন-গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৫-৫৬।

উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ !···
সম্বরিয়া ভাব-অশ্রুনীর
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর।" —নৈবেদ্য : ৪৫

আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে খোল-করতালাদির ব্যবহারে সংগীত-পরিচালনা নিষিদ্ধ ছিল। রামমোহনের সংগীত-আলোচনা কালে, ব্রাহ্মসমাজের আদিপর্বের গানের কথা আসবে; তখন আমরা এ বিষয়ের অবতারণা আবার করব।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, বাংলাদেশে সংকীর্তনের প্রবর্তক চৈতন্যমহাপ্রভু, গত চার শো বছর ধরে তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যেই সংকীর্তন সীমিত ছিল। পথে পথে নৃত্য করে গান করার রীতি বাঙালিসমাজে ছিল, কিন্তু ধর্মসংগীত কীর্তন করবার রীতি চৈতন্যমহাপ্রভু হতেই শুরু হয়; শোনা যায়, খোল বা শ্রীখোল তাঁরই সৃষ্ট বাদ্যযন্ত্র।

বর্তমান যুগে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে কীর্তন ও নগর-সংকীর্তন প্রবর্তন করেন কেশবচন্দ্র সেন এবং এখনো সেই ধারার ক্ষীণপ্রবাহ মাঘোৎসবের সময়ে কলকাতার রাজপথে দেখতে পাওয়া যায়। অত্যাধুনিক কালে গৌরাঙ্গ-আবির্ভাব-দিন প্রতিপালনের অঙ্গরূপে বিরাট সংকীর্তন-মিছিল কলকাতায় ও মফস্বলেও বের হচ্ছে কয়েক বছর থেকে। বলা বাহুল্য, এ সবই sophisticated সমাজের ধার্মিকতার বাহ্যপ্রকাশ— খানিকটা রাজনৈতিক অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মহাপ্রভুকে ব্যবহার করা হয়; খানিকটা revivalism-Hindu nationalism-এর ভাবও আছে। গ্রামাঞ্চলে এখনো অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিতদের মধ্যে বৈষ্ণবীয় সংকীর্তন প্রচলিত আছে— সেখানে পরম্পরাগত সংস্কার ও আচার-পালনই মুখ্য হয়ে আছে।

রামমোহনের মতামত নিয়ে আলোচনা আন্দোলন ও আক্রমণ শুরু হয়েছে উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে ১৮১৬ সাল থেকে, আর ১৮১৭ সালে বিচার হয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে। পরের বছর গোস্বামীর সঙ্গে বিচার। ইতিমধ্যে সহমরণ সম্বন্ধে তাঁর পুস্তিকাদ্বয় (১৮১৮, ১৮১৯) প্রকাশিত হওয়াতে রামমোহনের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ আক্রমণ শুরু হল ১৮২০ সালে।

'কবিতাকার' নাম গ্রহণ করে এক পণ্ডিত রামমোহনের ব্রহ্মবাদ, নিরাকার উপাসনা, প্রভৃতি যাবতীয় মতের বিরুদ্ধে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন ১৮২০ সালে। কবিতাকারের পুস্তিকার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৪ ও রামমোহনের উত্তর-পুস্তিকার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৯।

রামমোহন তাঁর এই পুস্তিকায় শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে বহু অংশ উদ্‌ধৃত করেছেন কবিতাকারের মন্তব্য খণ্ডন ও তাকে নতুন করে আক্রমণ করবার জন্যে। কবিতাকারের রচনায় 'যুক্তি' থেকে তিক্ত বাক্য প্রয়োগই সমধিক। রামমোহন তাঁর পুস্তিকার ভূমিকায় লিখছেন :

"ঈশোপনিষৎ প্রভৃতির ভূমিকায় আমরা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহার উল্লেখ মাত্র না করিয়া কবিতাকার উত্তর দিবার ছলে নানাপ্রকার কটূক্তি ও ব্যঙ্গ আমাদের প্রতি করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দ্বারা এই উপলব্ধি হয় যে অতিশয় দ্বেষ প্রযুক্ত কেবল আমাদের প্রতি দুর্ব্বাক্য কহিতে কবিতাকারের সম্পূর্ণ বাসনা ছিল কিন্তু শিষ্ট লোক সকল হঠাৎ নিন্দা করিবেন এই আশঙ্কায় শুদ্ধ গালি না দিয়া গালি ও তাহার মধ্যে ২ দেবতা বিষয়ের শ্লোক এই দুইকে একত্র করিয়া ঐ পুস্তককে প্রত্যুত্তর শব্দে বিখ্যাত করিয়াছেন যদ্যপিও আমাদের কোন ২ আত্মীয়ের [আত্মীয়সভার সদস্য অর্থে] আপাতত বাসনা ছিল যে ঐ সকল বাক্যের অনুরূপ উত্তর দেন কিন্তু অপ্রিয় কথা সত্য হইলেও তাহার কথনে লোকত ও ধর্ম্মত বিরুদ্ধ জানিয়া মহাভারতীয় এই শ্লোকের স্মরণ করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন…। পরের নিন্দা করিয়া যেমন শিষ্ট ব্যক্তি দুঃখিত হয়েন সেইরূপ দুর্জ্জন ব্যক্তি পরের নিন্দা করিয়া আহ্লাদিত হয়। কিন্তু কবিতাকারকে অন্য কোন কবিতাকার তদনুরূপ প্রত্যুত্তর দিতে যদি বাসনা করে তাহাতে আমাদের হানি লাভ নাই।"

রামমোহন ঐ পুস্তকে পৃষ্ঠা ও পংক্তি ধরে ধরে উদ্‌ধৃতি করে, যুক্তি দিয়ে ও শাস্ত্রবচন তুলে উত্তর দিয়েছেন। পণ্ডিতদের কী সংস্কার ছিল! ১৮১৭ সালে ভাগীরথী-গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্তিত হওয়ায় কাশিমবাজার অঞ্চলে মারীভয় হয় এবং যশোহরে ওলাওঠা রোগে বহু লোক মারা যায়। দোষ হল রামমোহনের শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ। রামমোহন উত্তরে লিখছেন :

"লোকের মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল হওয়া আপন ২ কর্ম্মাধীন হয় ঈশ্বর সম্বন্ধীয়

গ্রন্থের অথবা পুত্তলিকা সম্বন্ধীয় পুস্তকের রচনার সহিত তাহার কোনো কার্য্যকারণ ভাব নাই আমাদের এই সকল পুস্তক প্রকাশের অনেকদিন পূর্ব্বে কবিতাকারের রোগনিমিত্ত এবং মিথ্যা অপবাদ দ্বারা ধনের হানি ও মানহানি জন্মে তাহাতেও বুঝি কবিতাকার কহিতে পারেন যে তাঁহার স্বকর্ম্মের ফল নহে কিন্তু অন্য কোনো ব্যক্তির গ্রন্থ করিবার দোষে ঐ সকল ব্যামোহ কবিতাকারের হইয়াছিল আপনাকে নির্দ্দোষ জানাইবার উত্তম পথ কবিতাকার সৃষ্টি করিয়াছেন।"

রামমোহনের বিচারবুদ্ধি ও যুক্তি এবং সে-সবের সমর্থনে উপযুক্ত শাস্ত্রীয় উক্তির উদ্‌ধৃতি উপভোগ্য। এই শ্রেণীর শাস্ত্র-বিচার বর্তমানে অচল কি? এখনও কি এক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল তথাকথিত বিদ্বানদের লেখনী থেকে অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব সমর্থিত হতে দেখি না?

প্রস্থানত্রয় বা ব্রহ্মসূত্র উপনিষদ্ (গীতা)-এর অনুবাদ হল। হিন্দুধর্মের দার্শনিক ভিত্তি এদের মধ্যে। হিন্দু সমাজের এক শ্রেণীর পণ্ডিতের প্রবল আপত্তি সংস্কৃতশাস্ত্র লোকভাষায় প্রচারে। রামমোহন সেই প্রতিবাদ গ্রাহ্য করেন নি; এবার তিনি যে বৈদিক মন্ত্রে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার সেই 'গায়ত্রী' মন্ত্র প্রকাশ করলেন— মূল ও বঙ্গানুবাদ। এটা যে কতবড়ো অশাস্ত্রীয় ও পরম্পরাগত হিন্দু সংস্কারের বিরুদ্ধকর্ম তা আজ আমরা কল্পনাও করতে পারি নে।

রামমোহনের সংগ্রামময় জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী দেখে প্রশ্ন জাগে, তিনি কি সর্বদাই কর্মের দোলায় চঞ্চল হয়ে জীবন নির্বাহ করতেন? না, কোথাও একটা ধ্রুববিন্দু ছিল যার দিকে বদ্ধদৃষ্টি হয়ে ক্ষুব্ধ সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন? তিনি বলেছিলেন যে, গায়ত্রী মন্ত্র জপ ও 'ভর্গোদেবস্য' (ঐশীতেজ) ধ্যান তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার ছিল, সেই জপ ও ধ্যান তাঁকে জীবনের সকল সমস্যা থেকে রক্ষা করেছিল।

এ তথ্য সুবিদিত যে গায়ত্রী মন্ত্র ব্রাহ্মণের জপের মন্ত্র। অব্রাহ্মণ এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে বা শুনতে পেত না— এই ছিল লৌকিক ধারণা। এই নিষেধের কারণ, গায়ত্রী মন্ত্র বেদাংশ[১] এবং সেইজন্য শূদ্রের পক্ষে অশ্রাব্য।

১ ঋগ্‌বেদ ৩. ৬২ সূক্ত, ১০ ঋক।

রামমোহন এই বৈদিক মন্ত্র বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত ও বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে প্রকাশ ও প্রচার করলেন (১৮১৮)।

লৌকিকভাবে যাকে 'গায়ত্রী' মন্ত্র বলা হয়, আসলে তা ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্র— সাবিত্রী সূক্ত। ছন্দের নাম গায়ত্রী, বোধ হয় সেইজন্য সমগ্র মন্ত্রটি 'গায়ত্রী' নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। যাস্ক তাঁর নিরুক্তে বলছেন, যে গাতাকে ত্রাণ করে, যার দ্বারা দেবতা স্তুত হন— তাই 'গায়ত্রী'। সমগ্র গায়ত্রীটির তিন অংশ : প্রণব বা ওঁম্ এই ধ্বনি, ব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূঃ ভুর্বঃ এবং স্বঃ এই ত্রিপদ শব্দ। আর ত্রিপদ গায়ত্রী হচ্ছে :

তৎ সবিতুঃ বরেণ্যং
ভর্গোদেবস্য ধীমহি—
ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ।

ভট্ট গুণবিষ্ণু গায়ত্রীর অর্থের উপসংহারে যা লিখেছিলেন, রামমোহন তাঁর 'গায়ত্রীর অর্থ' পুস্তিকায় তার অনুবাদ ব্যাখ্যান করেছেন— "যে সর্ব্বব্যাপি ভর্গ [সূর্য্যস্থ ঐশী তেজঃ— ইতি শব্দসার] আমাদের অন্তর্যামি হইয়া প্রেরণ করিতেছেন তেঁহ জল জ্যোতিঃ রস অমৃত এবং ভূরাদি লোকত্রয় হয়েন এবং সকল চরাচরস্বরূপ হয়েন আর ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বর সূর্য্যাদি নানা দেবতা হয়েন তেঁহই বিশ্বময় পরব্রহ্ম তেঁহ ভূঃ প্রভৃতি সপ্ত লোককে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ করেন তেঁহ আমাদের জীবাত্মাকে জ্যোতির্ম্ময় সত্যাখ্য সর্ব্বোপরি ব্রহ্মপদকে প্রাপ্ত করিয়া চিদ্রূপ পরব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে একত্ব প্রাপ্ত করেন এইরূপ চিন্তা করিয়া জপ করিবেক। বিশেষত গায়ত্রীতে ধীমহি শব্দের দ্বারা জপাতিরিক্ত চিন্তা করিবার প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে অতএব গায়ত্রী জপকালে অর্থের জ্ঞান অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। এবং যে তন্ত্রানুসারে এতদ্দেশে দীক্ষা করিয়া থাকেন তাহাতেও লিখেন যে মন্ত্রার্থ না জানিলে জপের বৈফল্য হয়।... প্রাচীন সংগ্রহকার ভট্ট গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যানুসারে এতদ্দেশীয় সংগ্রহকার স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও [অনুবাদে] লেখা যাইতেছে :

"সূর্য্যদেবের অন্তর্যামি যে তেজঃস্বরূপ ব্রহ্ম জন্মমৃত্যুসংসারভয় নিবারণের নিমিত্ত সকলের প্রার্থনীয় হয়েন তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তর্যামিস্বরূপ জানিয়া চিন্তা করি যে ঈশ্বর আমাদের অর্থাৎ সকল জীবের বুদ্ধিকে ধর্ম্মার্থ-

কামমোক্ষেতে প্রেরণ করিতেছেন। এরূপ অভেদ চিন্তনের তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বাধিক তেজস্বী ও প্রকাশক এবং মহান্ যে সূর্য্য তাঁহার অন্তর্যামি আত্মা আর অতি সাধারণ জীব যে আমরা আমাদের অন্তর্যামি আত্মা একই হয়েন কিন্তু বিকারময় যে নামরূপ তাহার মধ্যে পরস্পর উপাধিভেদে উত্তম অধম ভেদ আছে বস্তুত আত্মার ভেদ নাই।"[১]

আমরা রামমোহন-কৃত এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার একটু বিস্তারিত আলোচনা করলাম, তার কারণ এই গায়ত্রীর ধ্যান ও জপাদির সঙ্গে ব্রহ্মণ্য হিন্দুধর্মের যে যোগ তা বিশাল হিন্দুজাতির একশতাংশতম ব্রাহ্মণের একচেটিয়া অধিকার-ভুক্ত। কারণ ব্রাহ্মণেতর হিন্দু মাত্রই এই মন্ত্র জপের বা শ্রবণের অধিকার থেকে শাস্ত্রমতে বঞ্চিত। রামমোহন সেই কৃত্রিম বাধাকে ভেঙে দিয়ে সর্বমানবের জন্য গায়ত্রী উপহার দিলেন; বিশেষ ধর্মের শ্রেষ্ঠ অধিকার সেদিন থেকে অস্বীকৃত হল। এটা যে কত বড়ো বিপ্লব তা আধুনিকদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

'গায়ত্রী' দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের মন্ত্র ছিল। দেবেন্দ্রনাথ অপৌত্তলিকভাবে উপনয়ন বিধি প্রচলন করেন রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ তিনটি বালকের উপনয়ন-কালে। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল গায়ত্রী মন্ত্রের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও বৈজ্ঞানিক বিচার:

"ওমিতি ব্রহ্ম, এই ওঁ শব্দ ব্রহ্মের প্রতিবোধক।... ভূ এই পৃথিবী, ভুব অন্তরীক্ষ, স্ব স্বর্গ। যে অগণ্য নক্ষত্র আকাশে জলদক্ষর রূপে দীপ্তি পাইতেছে তাহাই দেবলোক, তাহাই স্বর্গ।... পরমাত্মার আয়তন ভূর্ভুবঃস্বঃ। ভূর্ভুবঃস্বঃ আকাশে ওতপ্রোত রহিয়াছে।... পরমাত্মার আয়তন অসীম আকাশ, যে আকাশে দূর হইতে দূরস্থ নক্ষত্রসকল খচিত রহিয়াছে। জ্যোতির্বেত্তারা অদ্যাপি তাহার অন্ত করিতে পারে নাই এবং কখন তাহার অন্ত করিতে পারিবেও না। ব্রহ্মের মন্দির এই জগন্মন্দির, অনন্তের আবাসস্থান অনন্ত লোক। ওঁ বলিয়া ব্রহ্মকে অন্তরে জানিবে এবং ভূর্ভুবঃস্বঃ বলিয়া এই ভূমিতে ঈশ্বর, অন্তরীক্ষে ঈশ্বর, এবং স্বর্গেতে ঈশ্বর ভাবিবে। এই ভূর্ভুবঃস্বর্গব্যাপী পরম দেবতা সবিতা।"[২]

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫-৭।

২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৭৯৪ শক। দ্র. জীবনস্মৃতি, গ্রন্থপরিচয়।

'গায়ত্রী' মন্ত্র দ্বারা সর্বলোকের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনার প্রচার সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের দ্বিধা ছিল। তিনি 'আত্মজীবনী'তে লিখছেন :

"আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, রামমোহন রায়ের উপদেশমত কেবল একমাত্র গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারাই ব্রাহ্মেরা ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন; সে কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইল। দেখিলাম যে, সাধারণের পক্ষে এ মন্ত্র বড় কঠিন হইয়া উঠে। ইহাদ্বারা উপাসনা করিতে তাহাদের রুচি হয় না। গায়ত্রীমন্ত্র আয়ত্ত করিয়া, তাহার অর্থ বুঝিয়া, ব্রহ্মের উপাসনা করা অনেক সাধনা সাপেক্ষ; 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন' এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে এ মন্ত্রে সিদ্ধ হওয়া যায় না।

"কিন্তু এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও তন্নিষ্ঠ ব্যক্তি পাওয়া অতি দুর্লভ;... সহস্রের মধ্যে যদি কেহ এক জন হয়। আমি চাই যে, আপামর সাধারণ সকলে ব্রহ্মোপাসনা করিবে। অতএব আমি স্থির করিলাম, যাহারা গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারে, তাহারা করুক; যাহারা তাহা না পারে, তাহারা যে কোন সহজ উপায়ে ঈশ্বরে আত্মা সমাধান করিতে পারে, তাহাই অবলম্বন করুক। অতএব প্রতিজ্ঞাতে, 'প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক দশ বার গায়ত্রী জপের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিব' এই কথার পরিবর্তে এই হইল যে, 'প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব'।"[১]

রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন, তখন প্রতিষ্ঠাদিনে ছাত্রদের ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করার পর গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন (১৯০১)।[২] শান্তিনিকেতন উপদেশ মালায় 'মন্ত্রের বাঁধন' ভাষণে (১৯০৮) অন্য মন্ত্রের উপর জোর দিতে দেখি।[৩]

'গায়ত্রীর অর্থ' লিখেই (১৮১৮) রামমোহন নিবৃত্ত হলেন না; প্রায় দশ বছর পরে (১৮২৭) যখন ধর্মজীবন গভীর ও মন বহু অধ্যয়নাদি করে জ্ঞানসমৃদ্ধ হয়েছে তখন 'গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনা বিধানম্'—গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার বিধান নামে পুস্তিকা প্রকাশ করেন। "ইহা বিবিধ শাস্ত্রীয়

---

১ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃ. ৪৮-৪৯।

২ দ্র. শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, পৃ. ১৪। রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৬-৪৩।

৩ রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২১৫।

প্রমাণসহ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত মুদ্রিত। সমুদয় বেদপাঠ ব্যতিরেকে কেবল গায়ত্রী জপ দ্বারাই ব্রহ্মোপাসনা হয়, এই গ্রন্থে এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহার ইংরাজি অনুবাদ ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।" (১ম সংস্করণে প্রকাশক)

এই গ্রন্থে বহু শাস্ত্র উদ্‌ধৃত হয়েছে, যেমন— মনুস্মৃতি, যোগিযাজ্ঞবল্ক্য, মুণ্ডক উপনিষৎ, ভগবদ্‌গীতা, ভট্ট গুণবিষ্ণু, গৌড়ীয় স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য। মহানির্বাণতন্ত্র থেকে যে ১২টি শ্লোক উদ্‌ধৃত হয়েছে সেগুলি নাকি আধুনিক মুদ্রিত মহানির্বাণতন্ত্রে পাওয়া যায় না। আমরা এখানে রামমোহন-কৃত অনুবাদের কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করছি:

"সেই মতে সকল মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রীকে শ্রেষ্ঠরূপে কহিয়াছেন। মনের পবিত্রতা যে কালে হইবেক তখন মন্ত্রার্থ চিন্তাপূর্বক তাঁহার জপ করিবেক॥ প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী যদি পঠিত হন তবে অন্য সকল ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা করিয়া গায়ত্রী ঝটিতি শুভ প্রদান করেন॥··· প্রথমে প্রণবের উচ্চারণ করিবেক পরে তিন ব্যাহৃতি তাহার পর গায়ত্রী পাঠ করিয়া শেষে প্রণবে সমাপ্তি করিবেক॥"

গায়ত্রী মন্ত্র এইভাবে শ্লোকে ব্যাখ্যাত হয়েছে:

যস্মাৎস্থিতিলয়োৎপত্তিঃ যেন ত্রিভুবনং ততং।
সবিতুর্দৈবতস্যান্তর্যামি তদ্ ভর্গমব্যয়ং॥
বরণীয়ং চিন্তয়ামঃ সর্ব্বান্তর্যামিনং বিভুং।
যঃ প্রেরয়তি বুদ্ধিস্থো ধিয়োঽস্মাকং শরীরিণাং॥

"এইরূপ অর্থযুক্ত তিন মন্ত্রকে নিত্য জপ করিলে অন্য নিয়ম ও আয়াস ব্যতিরেকে সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। একমাত্র দ্বিতীয়রহিত [একমেবাদ্বিতীয়ং] যিনি সকল উপনিষদে কথিত হইয়াছেন সেই নিত্য মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের অগোচর পূর্ব্বোক্ত এই তিন মন্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হইলেন। একবার অথবা দশবার অথবা শতবার যে ব্যক্তি একাকী অথবা অনেকের সহিত হইয়া এসকলের জপ করে সে উত্তরোত্তর সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জপ সাঙ্গে পুনরায় সেই এক অদ্বিতীয় বিভুকে স্মরণ করিবেক ইহার দ্বারা তাবৎ বর্ণাশ্রমকর্ম্ম না করিলেও সে সকল সম্পন্ন হয়।

"অবধূত [যো বিলঙ্ঘ্যাশ্রমান্ বর্ণান আত্মন্যেব স্থিতঃপুমান্। অতি

বর্ণাশ্রয়ী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে ॥] অথবা গৃহস্থ সেইরূপ ব্রাহ্মণ কিম্বা ব্রাহ্মণ ভিন্ন [অব্রাহ্মণ] এই তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে সকলে অধিকারী হন ॥"

মহানির্বাণ-তন্ত্রোক্ত এই মত বৈদিক বা বৈদান্তিক মতধারা থেকে নূতন। সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের নির্ভর বর্ণাশ্রমের উপর ; কিন্তু তন্ত্রে নূতন কথা শুনলেন রামমোহন।

এই 'গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানং' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ[১] করে উপসংহারে স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্ -কৃত ইংরেজি ভাষান্তর সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তা আমরা উদ্‌ধৃত করলাম :

'While translating this essay on the Gayatri, I deemed it proper to refer to the meaning of the text as given by Sir William Jones, whose talents, acquisitions, virtuous life, and impartial research, have rendered his memory an object of love and veneration to all. I feel so much delighted by the excellence of the translation, or rather the paraphrase, given by that illustrious character, that with a view to connect his name and his explanation of the passage with this humble treatise, I take the liberty of quoting... here...The Gayatri, or Holiest Verse of the Vedas.

'Let us adore the supremacy of that divine sun [opposed to the visible luminary], the Godhead [Bhargas] who illuminates all, who recreates all from whom all proceed, to whom all must return, whom we invoke to direct our understandings aright in our progress toward his holy seat....

'What the sun and light are to this visible world, that are the *Supreme Good and Truth* to the intellectual and invisible universe ; and, as our corporeal eyes have a distinct perception of objects enlightened by the sun, thus our souls acquire certain knowledge, by meditating on the light of truth which emanates from the Being of beings : *that* is the light by which alone our minds can be directed in the path of beatitude.'[২]

---

১ A Translation into English/of a/Sansckrit Tract/including/The Divine Worship :/Esteemed/By those who believe in the Revelation of/The Veds as most appropriate to the/Nature of/the Supreme Being. Calcutta/1827.

২ *English Works*, pp. 79-86 : Sadharan Brahmo Samaj Edition, Part II, p. 80.

সার্ উইলিয়াম জোন্স্ -এর অনুবাদ উনবিংশ শতকের শেষভাগে লিখিত হয়েছিল— তার পাঠক ছিল ইংরেজিভাষা-অভিজ্ঞ লোকেরা। এই ইংরেজি অনুবাদের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে রামমোহন বাঙালি পাঠকের জন্য গায়ত্রীর অর্থ এবং আরো দশ বৎসর পরে গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা বিধান বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হিন্দুর সব থেকে গূঢ় মন্ত্র, যা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবর্ণের ধ্যানের সম্পদ ছিল, তা সর্ববর্ণ সর্বধর্মের লোকের জন্য প্রচার করেন।

'গায়ত্রীর অর্থ' (১৮১৮) ও 'গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধান' (১৮২৭) পুস্তিকা রচনার মধ্যে রামমোহনের ব্যক্তিগত জীবনের উপর দিয়ে বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে যায়। কিন্তু তার কোনো চিহ্ন তাঁর লেখার মধ্যে ছায়াপাত করতে পারে নি। অন্তর-জীবনে তিনি সাধক ছিলেন সে কথা আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়, কারণ তাঁকে আমরা ধর্মসংস্কারক রূপেই দেখতে অভ্যস্ত, ধর্মসাধক রূপে নয়।

রামমোহনের অধ্যাত্মজীবন-গঠন-কাজে যিনি সর্বাপেক্ষা বেশি সহায়তা করেছিলেন, তিনি তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ব্রহ্মবাদী হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী। রাম-মোহন বেদান্তচর্চা করে অদ্বৈতবাদী হন ; কিন্তু মানুষের কাছাকাছি আসতে হলে দর্শনশাস্ত্রের পূর্ণসহায়তা কার্যকরী হয় না। নিরাকার নির্বিকল্প ঈশ্বরকে সগুণ উপাসনার দ্বারাই মানুষকে কাছে পাওয়া যায়। কিন্তু আচারী হিন্দুর সংস্কারের বাধা অগণ্য। সেই সংস্কারের বাধা ভেঙে দিলেন হরিহরানন্দ তন্ত্রের সাধন-পথ দেখিয়ে। এই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে রামমোহন দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু সে দীক্ষা কী তা আমরা জানি না। যাকে আমরা সাধারণত তন্ত্রাচার বলি, তার নিন্দা তো রামমোহন বহু স্থানেই করেছেন ; সুতরাং তাঁকে সে শ্রেণীর তন্ত্রাচারী বলতে পারি না। অথচ তাঁর সতীর্থ তান্ত্রিক জ্ঞানী সুখানন্দ নাথ[১] বলছেন যে, রামমোহন অবধূত ছিলেন। মোট কথা হরিহরানন্দ রামমোহনকে নূতন রূপ দেখিয়েছিলেন, যা তৎকালীন আচারী তান্ত্রিকদের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন ছিল।

রামমোহনকে হরিহরানন্দ জানতেন বোধ হয় ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে— যখন তাঁর বয়স চোদ্দ বছর মাত্র আর তীর্থস্বামীর নিজের বয়স তখন পঁচিশ বছর।

---

১ দ্র. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, পৃ. ২২৫।

হরিহরানন্দের পূর্বনাম ছিল নন্দকুমার ভট্টাচার্য এবং তাঁর বাড়ি ছিল চাকদহ ও সিমুলিয়ার মাঝে 'পালপাড়া' গ্রামে।[১] এঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, যাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে পরে।

নন্দকুমারের ন্যায়দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। গার্হস্থ্যধর্ম ত্যাগ করে নাম গ্রহণ করেন— হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, পরে হন কুল-অবধূত।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি মাঝে মাঝে বোধ হয় রামমোহনের সঙ্গে দেখা করতেন। রামমোহনের রংপুর-বাস-কালে (১৮০৯-১৪) হরিহরানন্দ তাঁর কাছে প্রায়ই থাকতেন বলে মনে হয়, এবং তিনিই তাঁকে বলেন যে, হিন্দু ধর্মশাস্ত্র থেকে নিরাকার একেশ্বরের উপাসনার সমর্থন পাওয়া যাবে এবং 'প্রস্থানত্রয়'এর সাহায্যে বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

রামমোহন যখন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করবার জন্য এলেন, হরিহরানন্দও সঙ্গে আসেন; তবে তিনি বরাবর থাকতেন বলে মনে হয় না। কলকাতায় আসার পর তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় করিয়ে দেন। কলকাতায় বাস-কালে হরিহরানন্দ 'কুলার্ণব'তন্ত্র প্রকাশ করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অপর প্রমাণ 'মহানির্বাণতন্ত্র' সম্পাদন ও তার টীকা রচনা। এই তন্ত্র সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করেছি।

রামমোহন যখন বিলেতে সেই সময়ে হরিহরানন্দের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর সমসাময়িক সমাচার দর্পণ (১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২) লেখেন—

"ইনি অল্প বয়সেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া··· প্রায় বিংশতি বৎসর হইতে কাশীতে বাস করিতেন কাশীতে রাজাপ্রভৃতি অনেকে এবং কলিকাতা নগর ও পশ্চিম রাজ্যের লোকের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন কাশীতে বাসের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণব-নামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয়।"[২]

---

১ দ্র. বাংলায় ভ্রমণ, পৃ. ৮৬।

২ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৯, পৃ. ৯৪।

এই 'কুলার্ণব' (১৮২০) রামমোহনের প্রথম গ্রন্থাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছিল; বর্তমান সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণে এটি রামমোহনের নিজস্ব রচনা নয় বলে বাদ দেওয়া হয়েছে।

হরিহরানন্দ রামমোহনকে 'মহানির্বাণতন্ত্র' নামে এক নূতন তন্ত্র-সংকলন গ্রন্থের সন্ধান দেন ও তন্ত্রের মৌলিক শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ দেন। তন্ত্রের শিক্ষায় রামমোহনের বহুকালের ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারের জড় গেল নড়ে। কোরান ও ইসলামীয় দর্শনাদির গ্রন্থ পড়ে যেমন তাঁর মন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তন্ত্র পড়ে ও হয়তো তন্ত্র-সাধনা করে তিনি সর্বমানবের মূলগত ঐক্য বোধ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। মহানির্বাণ-তন্ত্রের তৃতীয়োল্লাস পড়ে মনে হয়, সমাজের সংস্কার বিষয়ে অনেক কিছুই তিনি তন্ত্র থেকে পেয়েছিলেন, জাতিভেদ নিরাকরণ এই বিশ্বাসেরই অন্যতম।

'মহানির্বাণতন্ত্রে' রামমোহন পড়লেন :

"পরব্রহ্মের আরাধনাতে কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই তিন প্রকারের যেরূপ ইচ্ছা হয় নমস্কার করা যায়— কিন্তু ভাবশুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন। ...পরমেশ্বরের পূজায় আবাহন ও বিসর্জন নাই, এবং সকল সময়ই ব্রহ্ম-সাধনার উপযোগী।... গঙ্গাজল এবং শালগ্রাম শিলাদিতে স্পর্শদোষ ঘটিতে পারে, কিন্তু পরমব্রহ্মে যে বস্তু সমর্পণ করা যায় তাহাতে কোন দোষ স্পর্শে না।"...

তন্ত্রের মধ্যে জপের কথা বিশেষভাবে বলা আছে। 'গায়ত্রীর কথা'র মধ্যে জপের বিষয় বিশেষভাবে উল্লিখিত পাই। তন্ত্র থেকে তিনি পেলেন জপের অর্থ 'বিধানেন মন্ত্রোচ্চারম্।' জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে তিন প্রকার জপের উল্লেখ আছে— বাচিক, উপাংশু ও মানস। বাচিক জপ সর্ব-নিম্ন অর্থাৎ চেঁচিয়ে ভগবানকে বা দেবতাকে ডাকা; উপাংশু জপ মধ্যম—এখানে মন্ত্র অব্যক্ত, কিন্তু ঠোঁট নড়ে। মানস জপই শ্রেষ্ঠ। রামমোহন এই মানস জপ করতেন এবং 'গায়ত্রীর কথা'য় সেই মানস জপের কথাই তিনি বলেছেন।

জপের ব্যাখ্যা মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষ্যে শঙ্করাচার্যও করেছেন, রামমোহন মাণ্ডূক্যের ভূমিকায় তার ভাষা-বিবরণ দিয়েছেন। মনুস্মৃতি

(২.৮৭) থেকেও স্থত্র উদ্‌ধৃত করে রামমোহন ব্যাখ্যা লিখেছেন :

"প্রণব জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণ মুক্তি পাইবার যোগ্য হয়েন ইহাতে সংশয় নাই অন্য বৈদিক কর্ম্মকে করুন অথবা না করুন তাহাতে দোষ হয় না যেহেতু ঐ জপকর্ত্তা ব্যক্তি সকলের মিত্র হইয়া ব্রহ্মেতে লীন হয় ইহা বেদে কহেন। যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডে যেমন স্থান এবং কাল ইত্যাদির নিয়ম আছে সেরূপ নিয়ম-সকল আত্মোপাসনায় নাই।"[১]

এ বিষয়ে বেদান্তের সমর্থন রয়েছে (৪-১-১১); স্থত্রটি সামান্য—'যেখানে একাগ্রতা, সেখানে বিশেষ নিয়ম নাই।' শঙ্করের ভাষ্য অবলম্বনে তার অনুবাদ-ব্যাখ্যা এইরূপ :

"যে কোনো দেশে যে কোনো কালে যে কোনো দিকে মনের স্থিরতা হয় তথায় উপাসনা করিবেক যেহেতু কর্ম্মের ন্যায় আত্মোপাসনাতে দেশ কাল দিক্‌ এসকলের নিয়ম নাই।"[২]

যাঁরা বলেন পূর্ব দিকে মুখ করেই উপাসনা করতে হবে, বা অন্য যাঁরা বলেন যে অন্য বিশেষ দিকে মুখ ফিরিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে—তাঁরা যেন ঈশ্বরের বিশ্বব্যাপকতা অস্বীকার করেন।

মহানির্বাণতন্ত্রে 'গায়ত্রী'কে ব্রহ্মগায়ত্রী বলা হয়েছে, যদিও মহানির্বাণের তান্ত্রিক গায়ত্রী মন্ত্রে কিছু বদল দেখা যায়। যাই হোক, এ কথা জোর গলায় বলা যায় যে, রামমোহনের উপর মহানির্বাণতন্ত্রের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। অদ্বৈততত্ত্ব তথা তন্ত্রতত্ত্ব মিশিয়ে বেদান্তের যে নূতন ব্যাখ্যা রামমোহন করলেন, তাতে তার সমাজের নাম হয় ব্রাহ্ম্য বা ব্রাহ্ম; বেদান্তকে নিজের অনুভূতিমতে মেনে নিয়ে নানা সম্প্রদায় নানা নামে প্রচলিত হয়েছিল; যেমন, রামানুজ-সম্প্রদায় শ্রী নামে, মাধ্বাচার্যের মত ব্রহ্ম, নিম্বার্কের শাখা চতুঃসন, ইত্যাদি। এই একেশ্বরবাদী সমাজের 'ব্রাহ্ম্য' নামটি হরিহরানন্দ স্বামীর দ্বারা সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়; সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে ইংরেজিতে যে পত্র ক্যালকাটা জর্নালে তিনি লেখেন (১১ এপ্রিল ১৮১৯), তাতে রামমোহনের 'সমাজ' বা সভাকে Brahmyu or Unitarian Hindu Community বলে উল্লেখ করেন। মহানির্বাণতন্ত্রের এই উল্লাসকে ব্রহ্মতন্ত্র

---

১ মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। রামমোহন-গ্রন্থাবলী, পৃ. ২৩৯।

২ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ২৩৯। বেদান্তদর্শনম্‌, কালীবর ৪। পৃ. ৩৯-৪০।

অধ্যায় বললেই মানায় ভালো। এই উল্লাসের ২০৭-সংখ্যক শ্লোকে স্পষ্টতঃ 'ব্রাহ্ম' শব্দের উল্লেখ আছে :

পরমব্রহ্মোপাসকা যে ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মতৎপরাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরুণাঃ শান্তাঃ সর্বপ্রাণিহিতব্রতাঃ॥ ২০৬
নির্বিকারা নির্বিকল্পা দয়াশীলা দৃঢ়ব্রতাঃ।
সত্যসংকল্পকা ব্রাহ্মাস্ত এবাত্রাধিকারিণঃ॥ ২০৭

বাংলা অনুবাদক লিখছেন, "যাঁহারা সত্যসংকল্প ও ব্রাহ্ম, তাঁহারাই এই তত্ত্বচক্রের অধিকারী।"[১]

মোট কথা, বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদীর পক্ষে সগুণ উপাসনার জন্য সর্বধর্মের সর্বজাতির মানুষদের ডেকে এনে একই কক্ষে ধর্মসাধনা করা তন্ত্র-দীক্ষিত সাধকের পক্ষেই সম্ভব। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের পক্ষে বর্ণাশ্রমবিচারহীনতা বা সর্বশ্রেণীর সর্বজাতির উপাসকদের সঙ্গে মাখা-মাখি ইত্যাদি প্রশ্নই উঠতে পারে না। রামমোহন সংসারী, বৈদান্তিক ও অদ্বৈতবাদী; তাঁর মতে আদর্শ সমাজে জাতিভেদ থাকতে পারে না; অথচ হিন্দুধর্মের মূলকথা হচ্ছে 'বর্ণাশ্রম' বা জাতমানা বা colour bar, apartheid। সন্ন্যাসীরা তাদের জাত হারায়, নাম হারায়; সমাজ সংসার ত্যাগ করে মঠবাসী হয়েও বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদের বিরুদ্ধে কথা বলবার সাহস তাঁদের অনেকের হয় না। তার একটা উদাহরণ শঙ্করের ভাষ্য থেকে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। সকলেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের status quo বজায় শুধু নয়, তাকে সুদৃঢ় করবার জন্য শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন, নূতন নূতন শ্লোক রচনা করে ও কাহিনী সৃষ্টি করে যুক্তিকে অকাট্য প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সংসারে থেকেও ব্রহ্মবাদী হয়ে, জাতিভেদ না-মানার সমর্থন পাওয়া গেল মহানির্বাণতন্ত্র থেকে।

তন্ত্রের ধর্ম বহু প্রাচীন, বৈদিকাদি মতবাদের সমান্তরাল ধারায় চলে আসছে। কালে তার মধ্যে অনেক বিকৃতিও দেখা দেয়, যেমন দেখা দিয়েছিল অন্য সব ধারার মধ্যে। আমাদের মনে হয় বেদান্তের আলোকে হরিহরানন্দ স্বামী এই মতকে আংশিকভাবে পরিশুদ্ধ করে তৎকালীন

১ বসুমতী-সং পৃ. ১৮৮। Avalon-এর মহানির্বাণতন্ত্রের অনুবাদের পাদটীকায় Brahma শব্দ প্রদত্ত হয়েছে; অনুবাদে আছে, 'who have realized the Brahman.'— p. 242.

পরিচিত, অপরিচিত নানা মন্ত্রাদি সংগ্রহ করে মহানির্বাণতন্ত্র সম্পাদন করেছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান ও অদ্বৈতমত-পক্ষের শ্লোকগুলি কোন্ সময় কার দ্বারা রচিত তা নির্ণয় করা অসম্ভব। মুশকিল হয়েছে মহানির্বাণের প্রামাণিকতা নিয়ে; কারণ এই তন্ত্রের উল্লেখ বা নাম প্রাচীন কোনো গ্রন্থে বা সংগ্রহে পাওয়া যায় না। বর্তমানে প্রচলিত 'মহানির্বাণতন্ত্রে' বহু হাতের স্পর্শ রয়েছে, তা গ্রন্থটি পাঠ করলেই বোঝা যায়। চৈতন্য-মহাপ্রভুর সমকালীন তান্ত্রিক সাধক নবদ্বীপের কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে মহানির্বাণের নামোল্লেখ পাই নে; তবে নাম না থাকলেই তার প্রাচীনত্বের দাবি নাকচ হতে পারে না, কারণ আরো অনেক প্রসিদ্ধ তন্ত্রের নাম আগমবাগীশ করেন নি। কিন্তু মহানির্বাণের প্রাচীন কোনো ভাষ্য নেই— আংশিক ভাষ্য হরিহরানন্দ লিখে থাকবেন, যা রামমোহন নিজহস্তে কপি করেছিলেন। 'শক্তিমঙ্গলতন্ত্র' এবং 'মহাসিদ্ধান্তসার-তন্ত্রে' ভারতকে তিন অংশে ভাগ করা হয়েছে— অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তা। বিন্ধ্য হতে চীন পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলে বা রথক্রান্তায় যে চৌষট্টি-তন্ত্রের প্রচলন ছিল বলে প্রসিদ্ধ, তাদের মধ্যে মহানির্বাণের নাম পাওয়া যায়; কিন্তু ঐ-সব তন্ত্র কত প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারে তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। সুতরাং মহানির্বাণতন্ত্রের উল্লেখমাত্র দ্বারা প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই তন্ত্রের প্রাচীন পুঁথিও আবিষ্কৃত হয় নি, যার দ্বারা কাল নির্ণীত হতে পারে। রামমোহনের সমকালীন 'পাষণ্ডপীড়ন' গ্রন্থের লেখক বলেন, "মহানির্ব্বাণাদিও কল্পিত ও অসদাগম হয়।"[১] মনে হয়, সমসাময়িক এক শ্রেণীর মধ্যে এই মত প্রবল ছিল যে, মহানির্বাণ অর্বাচীন তন্ত্র। তবে উপনিষদও রামমোহনের দ্বারা রচিত এমন কথা তখন চলিত হয়েছিল; সুতরাং সমকালীনদের মতের এমন বিশেষ মূল্য দেওয়া যায় না যার দ্বারা মহানির্বাণতন্ত্রের অর্বাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব ও প্রমাণত্বর একটি নিদর্শন এই যে, সে গ্রন্থের ভাষ্য টীকাদি থাকবে এবং পরবর্তী লেখকগণ কর্তৃক উক্ত গ্রন্থ থেকে সূত্রাদি উদ্‌ধৃত হবে। মহানির্বাণতন্ত্রের ভাষ্য বা টীকা না থাকায় পরবর্তী কোনো গ্রন্থে একে 'প্রামাণিক' বলে

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৬।

উদ্‌ধৃতও করতে দেখছি নে। সার্ জন উড্রফ ওরফে আর্থার অ্যাভলন তার *Mahanirvan Tantra*-গ্রন্থের 'Introduction'এ লিখেছেন যে, "it has been suggested that the Mahanirvana was a fabrication in whole or in part of Hariharananda."[১]

"The Manuscript of the commentary which is with the editor, is almost entirely in the Raja's handwriting. In the beginning of each chapter of the commentary the Raja writes *Om namo Brahmane* ।"

'প্রাণতোষিণী' নামে সংগ্রহ-গ্রন্থে 'মহানির্বাণতন্ত্রে'র উল্লেখ ও উদ্‌ধৃতি আছে, কিন্তু সে কি এই তন্ত্র? তা স্পষ্ট নয়। 'মহানির্বাণতন্ত্রে'র উদ্‌ধৃতির সঙ্গে অধুনা-প্রকাশিত মহানির্বাণতন্ত্রের পাঠাদির তুলনামূলক বিচার না হওয়া পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিজ্ঞানীবুদ্ধির পরিচায়ক হবে না।

তা ছাড়া 'প্রাণতোষিণী' খুব প্রাচীন নিবন্ধ-গ্রন্থ নয়; এটি ১৮২৪ সালে সংগৃহীত ও সম্পাদিত হয়।[২]

১৮২৮ সালের আগস্ট মাসে (৬ ভাদ্র ১৭৫০ শক) 'ব্রহ্মসভা' স্থাপিত হল কমল বসুর ভাড়াটিয়া বাড়িতে। আত্মীয়সভা স্থাপিত হয়েছিল তেরো বছর আগে— এতদিন পরে তার 'ব্রহ্মসভা' নামকরণ হল। এই সভার জন্য 'ব্রহ্মোপাসনা' নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুদ্রিত হয়, তাতে মহানির্বাণতন্ত্র থেকে স্তোত্র গৃহীত হয়েছিল। 'নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়'[৩] ইত্যাদি স্তোত্র

---

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৯, পৃ. ৯০-৯১, পা. টী.।

২ সমাচার দর্পণে (১৩ নভেম্বর ১৮২৪। ২৯ কার্তিক ১২৩১) প্রাণতোষিণীর কিছুটা বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছিল, তাতে এই গ্রন্থমধ্যে কোন্ কোন্ তন্ত্র থেকে উদ্‌ধৃতি সংগৃহীত হয়েছে তার আংশিক তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। সেখানে 'মহানির্বাণতন্ত্র' নাম এবং নির্বাণতন্ত্রেরও নাম পাই। দ্র. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৫।

"বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রাণতোষিণী-তন্ত্রে প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ও সম্পাদক রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে কোনো তথ্য দেন নাই। পরন্তু রামতোষণকে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বৃদ্ধ প্রপৌত্র বলিয়াছেন। প্রাণকৃষ্ণের অর্থানুকূল্যে পুস্তক মুদ্রিত হয় ১৮২৩ সালে। প্রাণকৃষ্ণ ১৮২০ সালের জানুয়ারি মাসে খড়দহের গঙ্গাতীরে বহু শিবমন্দির নির্মাণ করেন; ধর্মসভা-স্থাপন-কালে ১৮৩০ অব্দে অর্থসাহায্য করেন; সতীদাহ নিবারণ আইন পাস হইলে তাহা নিষিদ্ধ করিবার জন্য যে আবেদনপত্র বিলাতে যায় তাহাতে প্রাণকৃষ্ণের সহি ছিল।"— দ্র. সংবাদপত্রে সেকালের কথা।

৩ মহানির্বাণতন্ত্রের পাঠ ও ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের পরিবর্তিত পাঠ পরিশিষ্টে সংযোজিত হইল।

খুবই পরিচিত। কিন্তু আজকাল ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে তা যেভাবে গীত হয় তার ভাষা কিন্তু স্থানে স্থানে পৃথক। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ প্রণয়নকালে এই স্তবের পরিবর্তন করেন; কারণ, এই স্তোত্র সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদ-পক্ষীয়; এবং যে কারণে তিনি রামমোহনের বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্মের পরিবর্তন করে 'ব্রাহ্মধর্ম' নাম প্রবর্তন করেন, সেই অদ্বৈতবাদ-বিরোধী ভাবনা হতেই স্তোত্রের ভাষা পরিবর্তিত হয়।

তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তন্ত্রসাধনা করার ফলেই বোধ হয়, রামমোহনের জাতিভেদ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারের পরিবর্তন হয়েছিল। তা না হলে 'বজ্র-সূচী'র ন্যায় এমন একটা কালাপাহাড়ী সংস্কৃত বই মুদ্রণ ও তার ভাষা-বিবরণ প্রকাশ করতেন না।

'বজ্রসূচী' নামে এক উপনিষদ আছে; বলা বাহুল্য 'বজ্র' নামের দ্বারাই সূচিত হচ্ছে যে, এটি মূলত বৌদ্ধ-মহাযান সাহিত্যের অন্তর্গত গ্রন্থ— যে ভাবে নানা সাম্প্রদায়িক গ্রন্থকে 'উপনিষদ' আখ্যা দিয়ে 'শাস্ত্রের' আভিজাত্য দান করা হয়েছে, এই 'বজ্রসূচী' তজ্জাতীয় গ্রন্থ। ওয়েবার[১]-এর ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে 'আপ্তবজ্রসূচী' নামে গ্রন্থ অথর্বোপনিষদ-তালিকায় (২৯-সংখ্যক) প্রদত্ত হয়েছে। এ বই বেদান্তধারায় রচিত; 'আপ্ত' শব্দ 'বজ্রসূচী'র পূর্বে প্রযুক্ত হবার কারণ বোধ হয়, বৌদ্ধ আচার্য অশ্বঘোষ-কৃত ঐ নামের গ্রন্থের সহিত পার্থক্য প্রকট করার জন্য। এই 'আপ্তবজ্রসূচী' সম্বন্ধে Weber লিখছেন: "... treats at the outset of what makes a Brahmana a Brahmana; it is not *jāti* (birth), *varna* (colour), *pānditya* (learning); but the *Brahmavid* (he who knows Brahman) is alone a Brahmana. Then it passes to the different definitions of *moksa* (liberation), starting the only correct one to be the perception of the oneness of *jiva* (the individual soul) and *Paramesvara* (the All-soul) and lastly rejecting all sects, it expounds the two highly important and *Tat* (the Absolute) words *Twam* (the objective)" [তৎ+তম্ অসি]।

বজ্রসূচী উপনিষদ্ নামে যে গ্রন্থ চলিত আছে তা বেদান্ত-দ্যোতক;

১ Albrecht Weber, *The History of Indian Literature*: Translated from the second German edition, 1878, pp. 161-62.

কোনো উপনিষদের গ্রন্থকারের যেমন নাম থাকে না, এ গ্রন্থেও তাই।

বৌদ্ধদের মধ্যে যে 'বজ্রসূচী' গ্রন্থ পাওয়া যায় তার গ্রন্থকার 'সিদ্ধাচার্য্য অশ্বঘোষ'। এই গ্রন্থের মূল পাওয়া যায় নেপালে ১৮২৯ সালে; বি. এইচ. হগ্‌সন নেপাল-যুদ্ধের পর রেসিডেণ্ট হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি এই গ্রন্থের পুঁথি পেয়েছিলেন।[১]

তৃতীয় পুঁথি 'বজ্রসূচী' নামে রামমোহন রায় বাংলা অনুবাদ-সহ প্রকাশ করেন ১৮২৭ সালে, অর্থাৎ হগ্‌সন-কর্তৃক আবিষ্কৃত হবার দু বছর পূর্বে। কিন্তু এই বইয়ের সঙ্গে না মেলে 'আপ্তবজ্রসূচী' উপনিষদ, না সিদ্ধাচার্য অশ্বঘোষ -কৃত 'বজ্রসূচী'। রামমোহনের গ্রন্থের নিম্নে আছে: 'শ্রীভগবৎ পূজ্যপাদ মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য বিরচিতে প্রথম নির্ণয়ঃ সমাপ্তঃ।'

এই গ্রন্থের লেখক মৃত্যুঞ্জয় আচার্য[২]—ইনি কে জানা যায় না। দ্বিতীয়ত এটিকে 'প্রথম নির্ণয়ঃ' বলা হয়েছে; তা হলে কি এর একাধিক নির্ণয় ছিল? এ বিষয়ে কোনো তথ্য জানা যায় নি এখন পর্যন্ত।

বজ্রসূচী-উপনিষদের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় আচার্য -কৃত বজ্রসূচীর কতকগুলি মিল আছে, তবে অমিলই বেশি। দুটির আরম্ভ একই প্রকারের—

'বজ্রসূচীং প্রবক্ষামি শাস্ত্রজ্ঞানভেদনং।
দূষণং জ্ঞানহীনানাং ভূষণং জ্ঞানচক্ষুষাং॥'

'অজ্ঞানের নাশ করেন এমতরূপ বজ্রসূচী নামে শাস্ত্র কহিতেছি; যে শাস্ত্র অজ্ঞানিদের দূষণ আর জ্ঞানিদের ভূষণ হন॥'

অশ্বঘোষ-আরোপিত গ্রন্থ এ-দুটি পাঠ থেকে অনেক বড়ো। আমরা পূর্বে বলেছি, উপনিষদীয় বজ্রসূচী বেদান্তমতদ্যোতক; কিন্তু অশ্বঘোষ-কৃত ও মৃত্যুঞ্জয়-কৃত গ্রন্থদ্বয়ের উদ্দেশ্য জাতিভেদের নিন্দা। অশ্বঘোষ তাঁর গ্রন্থে মহাভারত, মনুস্মৃতি, প্রভৃতি শাস্ত্র থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন জাতিভেদের অসারতা প্রমাণ করার জন্য। গ্রন্থ শেষ করেছেন এই বলে—হতবুদ্ধি

১ দ্র. শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় -কৃত *The Vajrasuci of Asvaghosa*, Second edition, 1960। শ্রীমুখোপাধ্যায় রামমোহনের 'বজ্রসূচী' সম্বন্ধে বোধ হয় অবগত ছিলেন না, তাই এ গ্রন্থের নামোল্লেখ করেন নি।

২ হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর এক পুত্রের নাম মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য, ইনি 'পিতৃব্যদের সহিত দেশে বাস করিতেছেন'। সমাচার দর্পণ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৯, পৃ. ৯৫।

ব্রাহ্মণদের মোহ নাশ করবার জন্য, আমরা এইরকম বললাম, যাঁরা সৎ, যদি তাঁরা যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তবে তা স্বীকার করে নিন অথবা ত্যাগ করুন। বৈশম্পায়নের উক্তি বলে উদ্‌ধৃতির মধ্যে স্পষ্টতঃ রয়েছে—

'ন জাতির্দৃশ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
জীবিতং যস্য ধর্মার্থে পরার্থে যস্য জীবিতম্।
অহোরাত্রং চরৈতযাস্তি তং দেবাঃ ব্রাহ্মণং বিদুঃ।'

এই 'বজ্রসূচী'র যথার্থ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ মানুষের আদর্শ রূপে বর্ণিত হয়েছে; সদ্ব্যবহারের দ্বারা চণ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ হয়— এই মতই নানা ভাবে ব্যক্ত হতে দেখি। কিন্তু ব্রহ্মণ্যধর্মের বা বেদান্তাদি মতের কোনো কথা বা সমর্থন পাই না।

মৃত্যুঞ্জয় আচার্য -কৃত 'বজ্রসূচী'— যা রামমোহন অনুবাদ করেছিলেন— তাতেও জাতিভেদের নিন্দা করা হয়েছে এবং আদর্শ ব্রাহ্মণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

'শাস্ত্রে কহে "জন্মপ্রাপ্ত হইলে সর্ব্বসাধারণ শূদ্র হয়, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজশব্দবাচ্য হন, বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্র আর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন" অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্মণ, অন্য নহে ইহা নিশ্চয় হইল।'

মৃত্যুঞ্জয় আচার্য বেদান্তপক্ষে ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে যুগপৎ এই ক্ষুদ্র পুঁথিটি রচনা করেছিলেন। এ কি অশ্বঘোষের বজ্রসূচী ও বজ্রসূচী-উপনিষদের সমন্বয় করে মৃত্যুঞ্জয় রচনা করেছিলেন? কিন্তু সংস্কৃতে মৃত্যুঞ্জয় আচার্য[১] নামে কোনো লেখকের নাম অজ্ঞাত। এই 'বজ্রসূচী'ও কি হরিহরানন্দ দ্বারা সম্পাদিত কোনো গ্রন্থ, যা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মৃত্যুঞ্জয়ের নামে প্রচারিত হয়েছিল? এ রহস্য উদ্‌ঘাটন গবেষণাসাপেক্ষ।

রামমোহন জাতিভেদের সমর্থন করেন নি, এ কথা সুবিদিত নয়; বিলেতে তাঁর বন্ধুকে ১৮২৮ সালের ১৮ জানুয়ারি এক পত্রে লিখেছিলেন—

"...I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The *distinction of castes*, introducing *innumerable divisions and sub-divisions* among them, has entirely deprived

১ "তাঁহার [হরিহরানন্দের] পরিবারের মধ্যে কেবল এক পুত্র শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য পিতৃব্যদের সহিত দেশে বাস করিতেছেন।" সমাচার দর্পণ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৯, পৃ. ১৫।

them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise... It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort."—*English Works*, pp. 929-30.

জাতিভেদ ভারতের রাজনৈতিক দুর্দশার অন্যতম কারণ— সেইজন্য তাকে দূর করতে হবে— এ কথা রামমোহনের আগে কেউ বলেন নি। ভারত স্বাধীনতা লাভের পর এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে দেশের নেতারা সচেতন হয়ে ওঠেন ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে আইন বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে গেল— আইনের দ্বারা বহু শতাব্দীর সংস্কার কি দূর হয়? জনতা অন্তর থেকে যতদিন না এ সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে ততদিন ঘরে বাইরে সে মার খাবে। রবীন্দ্রনাথের উক্তি ফলবতী হবে— 'অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান'— স্বেচ্ছায় যা দিতে কার্পণ্য করব, অনিচ্ছা সত্ত্বেও একদিন সব ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হবে।

রামমোহন-কৃত যে-সব সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে প্রায়শই শ্লোক উদ্‌ধৃত হতে দেখি, তাদের একটি হচ্ছে 'কুলার্ণবতন্ত্র'। আমরা পূর্বেই বলেছি, রামমোহন তন্ত্রগ্রন্থের কয়েকখানিকে যুক্তি ও তর্কের সময় প্রামাণ্যশাস্ত্র রূপে ব্যবহার করতেন— তাদের মধ্যে 'মহানির্বাণতন্ত্রে'র কথা সুবিদিত। 'কুলার্ণবতন্ত্র'র মূল সংস্কৃত রামমোহন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় এবং রাজনারায়ণ বসু-সম্পাদিত 'গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত ছিল (পৃ. ৩৯৯-৪০৫)। কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-প্রকাশিত 'গ্রন্থাবলী' হতে কুলার্ণব বর্জিত হয়েছে। এই গ্রন্থখানি বোধ হয় ১৮২০ সালে কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। হরিহরানন্দ স্বামীর মৃত্যুর পর সমাচার দর্পণ লেখেন, "প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয়।"[১]

কুলার্ণবতন্ত্র সুবৃহৎ গ্রন্থ; সপাদলক্ষ বা একলক্ষ পঁচিশ হাজার গ্রন্থে রচিত; পাঁচটি খণ্ডের পুস্তকের প্রত্যেকটি খণ্ডে ১৭টি করে 'উল্লাস' [পরিচ্ছেদ]।

---

১ সমাচার দর্পণ, ১১ ফেব্রুরারি ১৮৩২। দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৯।

পঞ্চম খণ্ডের ১৭টি উল্লাসে ২০৪৮টি শ্লোক আছে; প্রথম উল্লাসে ১২১টি শ্লোক। অপর 'উল্লাস' গুলিতে সাধনপ্রণালী প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। আর্থার অ্যাভেলন ১৯১৭ সালে 'কুলার্ণব'-এর যে সংস্করণ প্রকাশ করেন তাতে তিনি রামমোহনের গ্রন্থের পাঠের সহিত নিজ গ্রন্থের পাঠান্তর আদি লিপিবদ্ধ করেছেন।[১]

রামমোহন 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' 'কবিতাকারের সহিত বিচার' প্রভৃতি গ্রন্থমধ্যে 'কুলার্ণব'-এর পঞ্চম খণ্ডের নানা উল্লাস থেকে উদ্‌ধৃত করেছেন।

রামমোহন বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম ও তন্ত্রোক্ত স্তব প্রবর্তন করেছেন সত্য, কিন্তু 'ব্রহ্মোপাসনা' নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকায় খুবই সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে দিয়ে ধর্মের সারকথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে ধর্মের দুটি দিক : এক, "সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা দ্বিতীয় এই যে পরস্পর সৌজন্যতে এবং সাধু ব্যবহারেতে কাল হরণ করা।" অর্থাৎ একটি হল অন্তর্মুখী সাধনা, অপরটি বহির্মুখী কর্ম বা লোকব্যবহার।

১ "পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে তাঁহাকে আপনার আয়ুর এবং দেহের আর সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা এবং প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার নানাবিধ সৃষ্টিরূপ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার চিন্তন করা এবং তাঁহাকে ফলাফলের দাতা এবং শুভাশুভের নিয়ন্তা জানিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সমীহা করা অর্থাৎ এই অনুভব সর্ব্বদা কর্ত্তব্য যে যাহা করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি।

২ "পরস্পর সাধু ব্যবহারে কাল হরণের নিয়ম এই যে অপরে আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের তুষ্টির কারণ হয় সেইরূপ ব্যবহার আমরা অপরের সহিত করিব আর অন্যে যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের অতুষ্টি হয় সেরূপ ব্যবহার আমরা অন্যের সহিত কদাপি করিব না।"

১৮২৮ সালে লিখিত এই অংশের সঙ্গে ১৮০৩ সালে তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীনে লিখিত রামমোহনের মত তুলনীয়। সেখানে লেখেন—

"জাতি বর্ণ ও ধর্ম্মনির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয় পরস্পরের প্রতি প্রীতি

---

১ রামমোহন-স্মৃতি, পৃ. ২৪-৩৬।

ভালবাসা দিয়া জয় করাই প্রকৃতির স্থষ্টিকর্তা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট গ্রহণীয় পূজা।" (পৃ. ২৮)

ধর্মের বীজক-মধ্যে মানবপ্রীতির অন্তর্ভুক্তি সে যুগে হিন্দু-সমাজে অভাবনীয়। 'সাধু ব্যবহার' ধর্মজীবনের অচ্ছেদ্য অংশ এ কথা সর্ববাদিসম্মত হলেও মানুষে মানুষে ভেদের প্রাচীর হিন্দুসমাজে তখন বড়োই তীব্র।

আমরা যে এই ব্রহ্মোপাসনার আলোচনা করছিলাম, তার মধ্যে মহানির্বাণতন্ত্রের বিখ্যাত স্তোত্র উদ্‌ধৃত করে বলেছিলেন, 'তন্ত্রোক্ত স্তব তান্ত্রিকাধিকারে হয়'। শ্লোকগুলি উদ্‌ধৃতির পর লেখেন—

"এ ধর্ম্ম সুতরাং গোপনীয় নহে অতএব ছাপা করাণ গেল শেষ ছাপা হইল।"

এইটুকু মন্তব্য পড়ে মনে হয়, তখন পর্যন্ত মহানির্বাণতন্ত্র তন্ত্রসাধকদের নিজস্ব গোপন তত্ত্ব ছিল এবং তা ইতিপূর্বে মুদ্রিত হয় নি। বহু বৎসর পরে হরিহরানন্দনাথ-বিরচিত টীকাসহ 'মহানির্বাণতন্ত্র' ১৮৭৪ সালে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় রামায়ণ যন্ত্রে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়।

রামমোহনের এই মানবপ্রীতির অন্যতম উৎস ছিল যীশুখ্রীষ্টের বাণী বা নিউ টেস্টামেণ্ট। আমরা যে দুটি বীজক উদ্‌ধৃত করেছি, তার সঙ্গে বাইবেলের মথি-লিখিত সুসমাচারের কয়েকটি স্তবকের আশ্চর্য মিল :

"যীশু বলিলেন, 'তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে ; এইটিই মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টি ইহার তুল্য ; তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মতো প্রেম করিবে। এই দুইটি আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা (Law) এবং ভাববাদী গ্রন্থ সংহত আছে।"—মথি ২৩.৩৭-৪০।[১] 'ব্রহ্মোপাসনা' পুস্তিকায় বিবৃত দুইটি সারকথার সহিত তুলনীয়।

---

১ Jesus said unto him, 'Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment.

'And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbour as thyself.

'On these two commandments hang all the laws and the Prophets.' —Mathew 23. 37-40.

কোরাণ থেকেও অনুরূপ বাণী উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে। ইসলামের মূল কথা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ও প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যপালন।

'ব্রহ্মোপাসনা' ও 'অনুষ্ঠান' এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাদ্বয়ের আলোকে রামমোহনের 'ব্রাহ্মসমাজ'এর ট্রাস্টডীডটি পড়লে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মতটি স্পষ্ট হয়। ব্রহ্মমন্দির সর্বমানবের মিলন-ভূমি—"a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction"। কিন্তু সেখানে উপাস্য দেবতা কে? বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা, অনাদ্যনন্ত, অগম্য ও অপরিবর্তনীয় পরমেশ্বরই উপাস্য। "...unsearchable, unmutable Being who is the Author and Preserver of the Universe, but not under or by any other name, designation or title..."। যে কোনো সম্প্রদায়, যে কোনো ধর্ম, যে কোনো অবস্থার লোক— উপাসনার জন্য সমবেত হতে পারে। উপাসনা-প্রণালী অভিনব। মন্দিরে কোনো প্রতিমা-প্রতীকাদি নেই— যার অভাবে হিন্দুমন্দিরের কল্পনা করা যায় না। খ্রীষ্টান, মুসলমানদের ধর্মগৃহে মূর্তি নেই ঠিক কথা, কিন্তু সর্বধর্মের লোকের তো আহ্বান সেখানে নেই। রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঈশ্বর-বিশ্বাসী মাত্রই প্রবেশ করতে পারে। ব্রহ্মোপাসনা বা The Universal Religion-এর প্রতীক এই ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রহ্মমন্দির।

পরবর্তী যুগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোলপুরের নিকট শান্তিনিকেতন আশ্রম স্থাপন করে যে ট্রাস্টডীড নিষ্পন্ন করেন এবং তাঁরও পরে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী-প্রতিষ্ঠা-কালে যে মেমোরেণ্ডাম প্রচার করেন— সে দুটি রামমোহনের ট্রাস্টডীডের সহিত তুলনা করবার যোগ্য।

'ব্রহ্মসভা'-স্থাপন-কালে রামমোহন 'ব্রহ্মোপাসনা' নামে ক্ষুদ্র এক পুস্তিকা রচনা করেন (অগস্ট ১৮২৮)। পরের বছর 'অনুষ্ঠান' নামে ক্ষুদ্র আর-একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

"উপনিষদে কথিত, শুদ্ধ স্বভাব প্রাপ্ত সনাতন উপাসনাকে প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে সংক্ষেপে এই পুস্তকে লেখা গেল, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানকে অনায়াসে জানিতে ও কৃতার্থ হইতে সমর্থ হইবেন।"

এই 'অনুষ্ঠান' পুস্তিকার প্রশ্ন ও উত্তর বাংলায় লিখিত। উত্তরের মূলতত্ত্বগুলি সংস্কৃত প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত— আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে সেগুলিকে গাঁথা হয়েছে; এর ইংরেজি অনুবাদের নাম : The Universal

Religion / Religious Instructions founded on Sacred Authorities (Calcutta, 1751)। অবশ্য এখানে Sacred Authorities বলতে সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থই বুঝিয়েছে।

এই শ্রেণীর আলোচনা গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর রূপে লিখিত হবার রীতি শ্রুতি ও স্মৃতিতে, আবার গ্রীক্ দর্শনেও এই পদ্ধতি অনুসৃত হতে দেখা যায়। খ্রীষ্টান catechism এই ধরনের গ্রন্থ। রামমোহন সেই catechism পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন— ১২টি প্রশ্ন ও তার উত্তরের মধ্যে ধর্মতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ কথাগুলি বলা হয়েছে।

ইংরেজিতে নাম লেখা হয়েছে Universal Religion— 'বিশ্বধর্ম'; এটাই যথার্থ নামকরণ, কারণ অনুষ্ঠানের মধ্যে যে কটি কথা আছে তা ঈশ্বর-বিশ্বাসী যে-কোনো ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির পক্ষে স্বীকার করে নিতে কোনো বাধা নেই। উপাস্যকে এই প্রশ্নই আদি প্রশ্ন। তার উত্তর লিখেছেন এইরকম—

"অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যক্তি সম্বলিত অচিন্তনীয় রচনাবিশিষ্ট যে এই জগৎ, ও ঘটিকাযন্ত্র অপেক্ষাকৃত অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত রাশিচক্রে বেগে ধাবমান চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদিযুক্ত যে এই জগৎ, ও নানাবিধ স্থাবর জঙ্গম শরীর যাহার কোন এক অঙ্গ নিষ্প্রয়োজন নহে সেই সকল শরীর ও শরীরীতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি তিনি উপাস্য হন।"

সংস্কৃত অংশে যে বচনগুলি আছে, বেদান্তসূত্র, তৈত্তিরীয় উপনিষদ, মুণ্ডক উপনিষদ, মনুস্মৃতি, মহানির্বাণতন্ত্র, প্রভৃতি থেকে সেগুলি উদ্ধৃত। বাংলা অংশ সংস্কৃতের অনুবাদ নয়। কারণ বিশ্বরচনা সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক ধারণা এখানে বিবৃত হয়েছে তা পুরাতন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে আশা করা যায় না। ইংরেজি অংশটি অতি স্পষ্ট বলে এখানে উদ্ধৃত করলাম :

"To the Author and Governor of the Universe, which is incomprehensibly formed, and filled with an endless variety of men and things ; in which, as shown by the zodiac, in a manner far more wonderful than the machinery of a watch, the sun, the moon, the planets and the stars perform their rapid courses ; and which is fraught with animate and inanimate matter of various kinds, locomotive and immovable, of which there is not one particle but has its functions to perform."—*English Works*, p. 135.

বিশ্বভাবনার সকল কথাই এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির মূল্য এখনও আছে। আমরা প্রশ্নগুলো উদ্‌ধৃত করছি[১] —

১. কাহাকে উপাসনা কহেন।

২. কে উপাস্য।

৩. তিনি কি প্রকার।

৪. কোনো উপায়ে তাঁহার স্বরূপের নির্ণয় হয় কি না।

৫. বিচারত এই উপাসনার বিরোধী কেহ আছে কি না।

৬. বেদে কোন স্থলে সেই পরমেশ্বরকে অগোচর অনির্দ্দেশ্য শব্দে কহিতেছেন, এবং অন্যত্র জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ তাঁহার প্রতি করিতেছেন, ইহার সমাধান কি।

৭. আপনারা অন্য২ উপাসকের বিরোধী ও দ্বেষ্টা হন কি না।

৮. যদি আপনারা পরমেশ্বরের উপাসনা করেন এবং অন্য২ উপাসকেরাও প্রকারান্তরে সেই পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তবে তাঁহাদের সহিত আপনাদের প্রভেদ কি।

৯. কি প্রকারে এ উপাসনা কর্ত্তব্য হয়।

১০. এ উপাসনাতে আহার ব্যবহারাদিরূপ লোকযাত্রা নির্ব্বাহের কি প্রকার নিয়ম কর্ত্তব্য।

১১. এ উপাসনাতে দেশ, দিক্, কাল, ইহার কোনো বিশেষ নিয়ম আছে কি না।

১২. এ উপাসনার উপদেশের যোগ্য কে।[১]

এই দ্বাদশটি প্রশ্নের মধ্যে নবম প্রশ্নটির উত্তর কিভাবে রামমোহন দিয়েছিলেন, তা আমরা উদ্‌ধৃত করছি।

৯ প্রশ্ন। কি প্রকারে এ উপাসনা কর্ত্তব্য হয়।

৯ উত্তর। এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা পরমেশ্বর হন, শাস্ত্রত ও যুক্তিত এইরূপ যে চিন্তন তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। ইন্দ্রিয় দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয়। ইন্দ্রিয়দমনে যত্ন, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৭-৭০।

অন্তঃকরণকে এরূপে নিয়োগ করিতে যত্ন করিবেন যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে, বস্তুত যে ব্যবহারকে আপনার প্রতি অযোগ্য জানেন তাহা অন্যের প্রতিও অযোগ্য জানিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে যত্ন করিবেন। প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন, অর্থাৎ আমাদের অভ্যাস সিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না, অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী ও শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেন। এবং অগ্নি বায়ু সূর্য্য ইহাঁদের হইতে ক্ষণেং যে উপকার হইতেছে ও ব্রীহি যব ঔষধি ও ফল মূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে, সে সকল পরমেশ্বরাধীন হয় এই প্রকার অর্থ প্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তি দ্বারা সেইং অর্থকে দার্ঢ্য করিবেন। ব্রহ্মবিদ্যার আধার সত্যকথন ইহা পুনঃং বেদে কহিয়াছেন, অতএব সত্যের অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনায় সমর্থ হন।"[১]

'অনুষ্ঠান'এর মধ্যে বাংলায় যা লিখিত হয়েছে তার পরিপোষক শ্রুতি উদ্ধৃত হয়েছে দ্বাদশ প্রশ্নোত্তরের পরেই।

সংস্কৃত অংশে 'সৎ' এই শব্দ প্রথমত মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত লেখা হয়। ভগবদ্গীতার শ্লোক (১৭।২৬) উদ্ধৃত করে অন্য শাস্ত্রাদির বচন লিখিত হয়েছে; এই শ্লোকটি—

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সৎশব্দঃ, পার্থ যুজ্যতে॥'

'অনুষ্ঠান' পুস্তিকায় এই শ্লোকের অর্থ প্রদত্ত হয় নি; আমরা প্রথমে অনুবাদ ও পরে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যানুবাদ উদ্ধৃত করছি—

অনুবাদ: 'হে পার্থ! সৎ এই শব্দটি সদ্ভাব এবং সাধুভাবকে বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হয়; এবং যে কর্ম প্রশস্ত, তাহাও বুঝাইবার জন্য সৎ এই শব্দটি প্রয়োগ হইয়া থাকে।'

গীতায় তিনটি শ্লোকে পরপর ওঁ, তৎ ও সৎ শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন—

---

১ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৯।

"ওঁ এবং তৎ এই দুইটি শব্দের বিনিয়োগ দর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে সৎ এই শব্দটির বিনিয়োগ কথিত হইতেছে··· 'সদ্ভাব' শব্দের অর্থ অসতের অভাব ; যেমন পুত্র ছিল না, পুত্র হইলে পুত্রের 'সদ্ভাব' হইয়াছে বলা যায়। সাধুভাব শব্দের অর্থ অসাধু ব্যক্তির সচ্চরিত্র হওয়া— এই সদ্ভাব এবং সাধু-ভাবকে বুঝাইবার জন্য 'সৎ' এই শব্দটি প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ উক্ত হয়— বা অভিহিত হয়। এবং কোনো প্রকার প্রশস্ত কর্ম অর্থাৎ বিবাদিতেও 'সৎ' এই শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। হে পার্থ, ইহা হইল তাৎপর্য।"[১]

রামমোহন 'গীতা'র এই শ্লোক প্রথমে ব্যবহার করায় রেভারেণ্ড লং তৎ-সম্পাদিত Descriptive Catalogue of Bengali Books (1855)-এ এই পুস্তিকা সম্বন্ধে বলেছিলেন : "12 Questions with their answers and proofs from the Bhagavat Gita on worship।" লং সাহেব ভুল করে বইটির নামকরণ করেন 'অবতরণিকা'। এই পুস্তিকার সংস্কৃত অংশে বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়, মুণ্ডক, কেন, ছান্দোগ্য, কঠ, প্রভৃতি উপনিষদ এবং ব্রহ্মসূত্র, গৌড়পাদকারিকা, বিষ্ণুপুরাণ, মনুসংহিতা, মহানির্বাণতন্ত্র, প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন।[২]

এই 'অনুষ্ঠান'এর আরও দু-একটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর উদ্ধৃত করছি। ৭ম প্রশ্ন ছিল 'অন্য২ উপাসকের বিরোধী ও দ্বেষ্টা হন কি না।' তার উত্তর—

"কদাপি না, যে কোন ব্যক্তি যাঁহার২ উপাসনা করেন সেই২ উপাস্যকে পরমেশ্বর বোধে কিম্বা তাঁহার আবির্ভাবস্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাদের দ্বেষ ও বিরোধ ভাব তাঁহাদের প্রতি কেন হইবেক।"

আচার্য শীল এ সম্বন্ধে বলেছেন—

"The worshippers might belong each to his own religious fold, Saivite or Vaishnavite, Smarta or Vedantist, in theory, he might be Christian or Moslem, Jew or Jaina, anybody could join in the prayers, and no one was expected to depart from his own religious tradition..."

---

১ গীতাভাষ্য, পৃ. ৮৫৭-৫৮।

২ দ্র. Sophia Dobson Collet, *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, Appendix, p. 530.

রামমোহনের আইডিয়া ছিল, হিন্দুশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ভাব যেমন মুসলমান, খ্রীষ্টান ও সমগ্র ঈশ্বরবিশ্বাসীর পক্ষে গ্রহণীয় হতে পারে, তেমনি খ্রীষ্টানের প্রেমধর্মের আদর্শ ও ইসলামের ভ্রাতৃত্বভাবের পরমবাণীর দ্বারা তাঁদের পক্ষেও 'বিশ্বধর্ম' প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু কার্যত তা হতে পারে নি, কারণ মানুষ জন্মগ্রহণ করে এক-একটা বাঁধাবুলি বা সংস্কারাবদ্ধ সমাজের মধ্যে এবং জন্মাবধি নিজ নিজ ধর্মের বা বিশ্বাসের কথা শুনতে শুনতে বা প্রথা পালন করতে করতে তার দেহ ও মনের অবস্থা এমন হয় যে, সেই-সব বিশেষ বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানে সাড়া দেওয়াটা প্রায় তার reflex action-এর মতো হয়ে ওঠে। বুদ্ধি বা বিচার মনের মধ্যে কার্যকরী হবার আগেই সে সংস্কার বা অভ্যাসে সাড়া দিয়ে বসে আছে।[১] বুদ্ধি বা বিবেক যখন শুধোয় 'এমন কাজটা কেন করলে?' মন থতমত খেয়ে উত্তর দিতে পারে না— শেষকালে বলে 'সংস্কার!'

'অনুষ্ঠান'এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৭৫১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮২৯ সালেই। ইংরেজিতে বলা হয়— The Universal Religion।

এই অনুষ্ঠান পুস্তিকা ইংরেজি ও মূল সংস্কৃত নাগরী লিপিতে মুদ্রিত হয়। (*English Works*, pp. 135-41)

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পূর্বে এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়— মনে হয় বিশ্বধর্মের সারকথা এই কয়টি পাতার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

ব্রাহ্মসমাজগৃহ স্থাপিত হল এই 'বিশ্বধর্ম' বা Universal Religion -সাধনার জন্য। একে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছেন—

The Centre of Universal Convergence, কিন্তু কার্যত "The con-

---

১ "...So long as it is inculcated on the minds of youths, and even infants, who, being once thoroughly impressed with the name of the Trinity in Unity, and Unity in Trinity, long before they can think for themselves, must be always inclined, even after their reason has become matured, to interpret the sacred books, even those texts which are evidently inconsistent with the doctrine, in a manner favourable to their prepossessed opinion, whether their study be continued for three, or thirty, or twice thirty years."—Final Appeal to the Christian Public, *English Works*, p. 688.

gregation in the Raja's Brahmo Samaj was a congregation of Hindu Theists, using the rituals and symbols of that particular type of theism; for public worship must be embodied in some concrete form." (*Universal Man*, p. 22) । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্রাহ্ম-ধর্ম' গ্রন্থ সম্পাদন করে ব্রাহ্মসমাজকে সম্পূর্ণভাবে হিন্দু রূপ দান করেন। রামমোহনের অনুষ্ঠান, ব্রহ্মোপাসনার ন্যায় 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ সংস্কৃত শাস্ত্র থেকেই সংকলিত। এ-সবের দ্বারা হিন্দুধর্মকে বিশ্বধর্মের রূপদানের চেষ্টা হয়।

আমরা এতক্ষণ রামমোহনের ধর্মবিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ, টীকা এবং প্রতি-পক্ষীয়দের আক্রমণের উত্তর-প্রত্যুত্তর প্রভৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলাম। সকলেই টুকরোভাবে তাঁর মতামতের সমালোচনা করেন। কিন্তু 'পাষণ্ড-পীড়ন' নামে এক বেশ বড়ো গ্রন্থে রামমোহনের রচনা ও ধর্ম বিষয়ে ধারণা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। গ্রন্থের রচয়িতা কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ও গ্রন্থ-রচনার প্ররোচক উমানন্দ বা নন্দলাল ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পৌত্র ও হরিমোহন ঠাকুরের পুত্র। উমানন্দ 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' নাম নিয়ে ১৮২২ সালের এপ্রিল মাসে সম্বাদলিপিতে অর্থাৎ পত্রযোগে 'চারি প্রশ্ন' আত্মীয়সভায় পাঠিয়ে দেন। সেই 'চারি প্রশ্নের উত্তরে' রামমোহন এক পুস্তিকা লেখেন (মে ১৮২২); তার ভূমিকায় বলেন—"চৈত্র মাসের সম্বাদ লিপিতে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী চারি প্রশ্ন করিয়াছিলেন যদ্যপি বিশেষ বিবেচনা করিলে তাহার উত্তরের প্রয়োজন থাকে না তথাপি সাধারণ নিয়মানুসারে ঐ চারি প্রশ্নের উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যে লিখিলাম এখন ইহার প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় এবং আমার প্রশ্ন সকলের উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম যেহেতু ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী আপনাকে সর্ব্বজনহিতৈষী নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ঐ চারি প্রশ্নকে এবং তাহার এই উত্তরকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভাষান্তরেও ত্বরায় প্রকাশ করা যাইবেক ইতি॥ সম্যগনুষ্ঠানক্ষম তজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্ট॥" রামমোহনের উত্তর এই পুস্তিকায় প্রকাশিত হলে 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে সুবৃহৎ এক প্রত্যুত্তর-পুস্তক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকারের নামের স্থলে আছে— "কোন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি কর্ত্তৃক কোন পণ্ডিতের সহায়তায় স্বদেশীয় লোক হিতার্থ প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইল…

সমাচার চন্দ্রিকা মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল··· কলিকাতা সন ১২২৯ ২০ মাঘ। [১৮২৩ ফেব্রুয়ারী]।"

এখানে গ্রন্থকারের নামের স্থলে 'কোন পণ্ডিত'এর সহায়তার কথা আছে; এই পণ্ডিত হচ্ছেন কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন; চারিটি প্রশ্ন বোধ হয় তিনিই করেছিলেন— তার ইঙ্গিত উত্তর-পুস্তিকার মধ্যেই পাওয়া যায়। আগেই বলেছি উমানন্দ (নন্দলাল) ঠাকুরের নির্দেশে এটি রচিত হয়।

গ্রন্থের মধ্যে 'প্রয়োজন' নামে সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি শ্লোক আছে, যেমন 'নমো ধর্মায় মহতে', 'পাষণ্ডপীড়ন নাম প্রত্যুত্তর' ইত্যাদি। তার পরও একটি শ্লোক ও শ্লোকের ভাষা (অনুবাদ) লিখিত আছে। আমরা সেই অনুবাদটি উদ্‌ধৃত করছি—

জয় জয় ধর্ম্ম, বিতর বিশ্বের শর্ম্ম,
ধার্ম্মিকের কর লজ্জা ছেদ।
বিপক্ষ পক্ষের গর্ব্ব অবিলম্বে কর খর্ব্ব,
পাষণ্ডের কর মর্ম্মভেদ ॥

গ্রন্থ আরম্ভ হয়েছে 'ভাক্তত‌ত্ত্বজ্ঞানীর ভূমিকা' উদ্‌ধৃত করে; অতঃপর 'ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর ভূমিকা'। 'ভক্তত‌ত্ত্বজ্ঞানী' নাম 'চারি প্রশ্নে'র কর্তাই প্রথম ব্যবহার করেন এবং সেই নামই রামমোহন তাঁর 'উত্তর' গ্রন্থে ব্যবহার করেন। রামমোহনকে 'ভাক্ত' নামে অলঙ্কৃত করবার কারণ, 'ভাক্ত' শব্দের অর্থ— 'গৌণবৃত্তিবোধিত'; আপ্তের অভিধানে বলা হয়েছে— 'Inferior, Secondary (opp. মুখ্য), often used in the Saniraka Bhasya in this sense'। শব্দটা হীনার্থে প্রযুক্ত— দেবপ্রিয়, মহাব্রাহ্মণ, মহাবৈদ্য আদি শব্দের ন্যায়। বুদ্ধদ্বেষীরা অশোকের 'দেবপ্রিয়' নামের অর্থ করলেন দেবতাদের প্রিয় অর্থাৎ অজ। রামমোহন সম্বন্ধে 'ভাক্ত' শব্দও যেমন অপপ্রয়োগ 'পাষণ্ড' শব্দও তদ্রূপ। গ্রন্থের 'প্রয়োজন' অংশে 'পাষণ্ডান' পণ্ডান্ [নিষ্ফল], 'ভণ্ডান' একত্র লিখিত হয়েছে। 'পাষণ্ড' শব্দ অপপ্রয়োগ বলছি এইজন্য যে লৌকিক ভাষায় 'পাষণ্ড' ও 'পাপিষ্ঠ' প্রতিশব্দবাচক হয়ে আছে। মূল শব্দের অর্থ 'নাস্তিক, সদাচারভ্রষ্ট, ঈশ্বরের বা পরলোকের বা বেদপ্রমাণের অস্বীকর্তা'। এই সংজ্ঞায় রামমোহনকে কলঙ্কিত করা যায় না। লৌকিক অর্থেই অর্থাৎ 'পাপিষ্ঠ' অর্থে লেখক এর প্রয়োগ করেছিলেন বলে মনে হয়।

'পাষণ্ডপীড়ন' গ্রন্থের লেখক কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের একজন সহকারী পণ্ডিত, ১৮১৩ হতে ১৮২৪ পর্যন্ত সেখানে তিনি কাজ করেন। রামমোহনের বিরুদ্ধে যে পুস্তিকা তিনি লেখেন তা এখানে চাকুরি করার পূর্বেই রচিত। রামমোহনের বেদান্ত-উপনিষদের অনুবাদের কয়েক বছর পর কাশীনাথ পণ্ডিত ১৮২১ সালে বিশ্বনাথ তর্কালংকার -লিখিত ন্যায়দর্শনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভাষা পরিচ্ছেদ' গৌড়দেশীয় সাধু ভাষাতে সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রভৃতি টীকার অনুসারে স্পষ্টরূপে অর্থপ্রকাশ করেন। তর্কপঞ্চাননের "ন্যায়দর্শন" আলোচনা থেকে কয়েকটি নমুনা উদ্‌ধৃত করলাম—

"...তাহার অভিপ্রেত কোন্ যোগ, জ্ঞানযোগ, কি কর্ম্মযোগ, কি সাংখ্যযোগ, যদ্যপি জ্ঞানযোগ তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তথাপি এক্ষণে কহিতে লজ্জিত হইবেন.... কিন্তু কর্ম্মযোগ কহিতে সাহস করিতে পারেন, যেহেতু তাঁহারা অনাসক্ত হইয়া বৃথাকেশচ্ছেদন, সুরাপান, যবনীগমন, অবৈধ হিংসা ও শৈব বিবাহ, ইত্যাদি অনেক সৎকর্ম্ম করিতেছেন।"

"তাঁহারা আপনারদিগের সেই আত্মসংযমযোগও স্বীকার করিতে সাহস করেন, তবে তাঁহারদিগকে সাহসিক, অত্যন্ত প্রতারক, লজ্জালেশশূন্য, ছিন্ননাসিক ও ছিন্নকর্ণ কে না কহিবেন।"

"ভাক্তুতত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়েরা যে নিগূঢ় শাস্ত্রের অনুসারে অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান ও অগম্যাগমন ইত্যাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সে নিগূঢ় শাস্ত্রের নাম কি?... কি আশ্চর্য্য, সুরাচার্য্য সুরাসঙ্গে পরমরঙ্গে অচৈতন্য হইয়া শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত অবতারকে এবং তদুপাসক সকলকে অমান্য ও জঘন্য জ্ঞানে অম্লানবদনে অতিসামান্যের ন্যায় ব্যঙ্গ ও নিন্দা করিয়াছেন... ধিক২ এ নরাধমের কি গতি হইবেক...।"[১]

রামমোহন 'পাষণ্ডপীড়ন'এর উত্তরে লেখেন 'পথ্যপ্রদান'। এই গ্রন্থের ভূমিকায় আছে—

"বাস্তবিক ধর্ম্মসংহারক অথচ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নাম গ্রহণ পূর্ব্বক যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন... তাহাতে [ভূমিকায়]... ব্যঙ্গ ও নিন্দাসূচক শব্দ ভিন্ন স্পষ্ট কটূক্তি বিংশতি শব্দ হইতে অধিক আমাদের প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন; এইরূপ সমগ্র পুস্তক প্রায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ হয়। ইহাতে এই

১ দ্র. রামমোহন-গ্রন্থাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৯-৫১।

উপলব্ধি হইতে পারে যে দ্বেষ ও মৎসরতায় কাতর হইয়া ধর্ম্মসংহারক শাস্ত্রীয় বিবাদছলে এইরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া অন্তঃকরণের ক্ষোভ নিবারণ করিতেছেন, অন্যথা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বিনা শাস্ত্রীয় বিচার সর্ব্বথা সম্ভব ছিল··· আমরা··· তিন কারণে দুর্ব্বাক্যের বিনিময় হইতে ক্ষান্ত রহিলাম। প্রথমত, যে কেহ উত্তরে কটূক্তি শুনিবার আশঙ্কা না করিয়া আপন অধীন ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রতি গর্হিত বচন প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়, তাহার প্রতি উত্তরে কটূক্তি কথনের প্রয়োজন যে তাহার ক্ষোভ ও লজ্জা ও মনঃপীড়া এ সকল না হইয়া কেবল তত্তুল্য নীচত্ব সেই উত্তর প্রদাতার স্বীকার মাত্র হয়, সুতরাং নীচস্যোচ্চৈর্ভাষাঃ সুজনঃ স্ময়তে ন শোচতে তাভিঃ। কাকভেকখরশব্দাৎ বদ কো নগরং বিমুঞ্চতে ধীরঃ॥

"দ্বিতীয়ত, বালক ও পশ্বাদির হিতকরণে ও চিকিৎসাসময়ে তাহারা আস্ফালন ও চীৎকার এবং বিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা যদি করে ও হিংসাতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে ওই অবোধ প্রাণীর চীৎকারাদির পরিবর্ত্ত না করিয়া দয়ালু মনুষ্যেরা তাহাদের হিতেচ্ছা হইতে ক্ষান্ত হয়েন না, সেইরূপ আমাদের হিতৈষার বিনিময়ে ধর্ম্মসংহারকের বিরুদ্ধ চেষ্টায় ও দ্বেষপ্রকাশে আমরা রাগাপন্ন না হইয়া ওই প্রত্যুত্তরের উত্তরে শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ততোধিক স্নেহ প্রকাশ করিতেছি। তৃতীয়ত, ভাগবতে লিখেন··· পরমেশ্বরে প্রেম, তাঁহার অধীন ব্যক্তি সকলের সহিত মিত্রতা, মূর্খ ব্যক্তিদিগ্যে কৃপা, ও দ্বেষ্টাদের প্রতি উপেক্ষা যে করে সে মধ্যম হয়, অতএব সাধ্যানুসারে ধর্ম্মসংহারকের প্রতি উপেক্ষাই কর্ত্তব্য হয়।"[১]

পথ্যপ্রদানের 'বিজ্ঞাপনা'য় পুনশ্চ লেখেন—

"আমাদের নিন্দার উদ্দেশে ধর্ম্মসংহারক আপন প্রত্যুত্তরের নাম 'পাষণ্ড-পীড়ন' রাখেন তাহাতে বাগ্‌দেবতা পঞ্চমী সমাসের দ্বারা ধর্ম্মসংহারকের প্রতি যাহা যথার্থ তাহাই প্রয়োগ করিয়াছেন।

"প্রয়োজন পৃষ্ঠে (তদুত্তরস্বরূপেণ) ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বারা যে দুর্ব্বাক্য আমাদের উদ্দেশে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতে বাগ্‌দেবতা 'তৎ' পদের উদ্দেশ্য প্রশ্নচতুষ্টয়কে দেখাইয়া ওই সকল দুর্ব্বাক্য ধর্ম্মসংহারকের প্রতি উল্লেখ করেন।

---

১ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থাবলী।

"আমাদের নিন্দোদ্দেশে ধর্ম্মসংহারক 'নগরান্তবাসী' এই পদ প্রয়োগ পুনঃ২ করিয়াছেন, অথচ বাগ্‌দেবতার প্রভাবে এ শব্দের প্রতিপাদ্য তিনি যে স্বয়ং হয়েন তাহা স্মরণ করিলেন না।

"প্রত্যুত্তর প্রকাশের দিবস সন ১২২৯ শাল ২০ মাঘ লিখেন কিন্তু এ নগরস্থ অনেক সজ্জনের নিকট প্রকাশ আছে যে বৈশাখ মাসে প্রত্যুত্তরের বিতরণ হয় ইতি॥ ১২৩০, ১৫ পৌষ।"[1]

রামমোহনের 'পথ্যপ্রদান' সুবৃহৎ গ্রন্থ (পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৬১)। গ্রন্থকারের নামের স্থলে আছে 'সম্যগনুষ্ঠানাক্ষমঃ তজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্টঃ'। কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকে রামমোহন বরাবরই 'পথ্যপ্রদানে' 'ধর্ম্মসংস্থাপনকারী' ও 'ধর্ম্মসংহারক' বলে বিদ্রূপ করেছেন। লেখক স্বয়ং ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নাম নিয়েছিলেন। 'পাষণ্ডপীড়ন' গ্রন্থের প্রয়োজনপত্রে লিখিত হয়—

দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় শিষ্টানাং ত্রাণহেতবে।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় স্বর্গারোহণ সেতবে॥

ঠিক যেন 'গীতা'য় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

রামমোহনের জীবনীকার 'পথ্যপ্রদান'এর বিস্তারিত চুম্বক তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন; সুতরাং তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এই গ্রন্থরচনায় রাম-মোহনের শাস্ত্রজ্ঞান, যুক্তিবল ও বাংলাভাষার উপর দখল, প্রচ্ছন্ন-তীব্র বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপের অসাধারণ ক্ষমতা প্রভৃতি দেখে বিস্মিত হতে হয়।

১৮২২ সালে চারটি প্রশ্নেরই বিস্তারিত উত্তর প্রদত্ত হয়েছিল; 'পাষণ্ড-পীড়নে'' চারি প্রশ্নের উত্তর' ছিল। 'পথ্যপ্রদান' আবার সেই পুস্তিকার উত্তর। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন যে চারটি প্রশ্ন করে পাঠিয়েছিলেন তা লেখকের ভাষায় লিপিবদ্ধ করছি।

প্রথম প্রশ্ন: "ইদানীন্তন ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী এবং তৎসংসর্গী··· ধনিলোকেরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়া স্বস্বজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন এতাদৃশ··· সন্তান সকলের সহিত সংসর্গ ভদ্রলোকের অবশ্য অকর্ত্তব্য কি না?"

---

১ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থাবলী।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: "সদাচার সদ্ব্যবহারহীন ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানীর" "যজ্ঞোপবীত ধারণ নিরর্থক" কি না?

তৃতীয় প্রশ্ন: ব্রাহ্মণ সজ্জনের পক্ষে অবৈধ হিংসার দ্বারা আত্মোদর ভরণ অনুচিত কি না?

চতুর্থ প্রশ্ন: "লোক লজ্জা ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান" ও ব্যভিচার যাঁহারা করেন তাঁহারা বিরুদ্ধকারী কি না?

'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থে রামমোহন সাতটি পরিচ্ছেদে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন, বহু শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে শ্লোকাদি উদ্‌ধৃত করে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর তিনটি পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে; যথা, স্নেহপ্রকাশক নাম প্রথম পরিচ্ছেদ; সর্বহিতপ্রদর্শক নাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এবং অনুকম্পাসূচক নাম তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর— অতিদয়াবিস্তার নাম চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর— ভূরি কৃপাবলোক নাম পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর— ক্ষমাপ্রচুর নাম ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, অতিপ্রিয়কর নাম সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রশ্নগুলি 'সমাচার দর্পণে' (২৫ চৈত্র ১২২৮। ৬ এপ্রিল ১৮২২) প্রকাশিত হয়। উদ্‌ধৃতিশেষে সম্পাদক-পক্ষে লিখিত হয়— "এই পত্র অনেক বিশিষ্ট লোকের অনুরোধে দর্পণে অর্পিত করিলাম কিন্তু আমরা পরস্পর বিরোধের সহকারী নহি এবং যদ্যপি কেহ ইহার উপযুক্ত শাস্ত্রীয় উত্তর পাঠান তাহাও আমরা দর্পণে স্থান দিব।"[১]

এই 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে চতুর্থ প্রশ্ন সবিস্তারে আলোচিত হয়; এই পরিচ্ছেদে সুরাপান ছিল মুখ্য বিতর্কের বিষয়।

এ কথা অবিদিত নয় যে, রামমোহন সুরাপান করতেন; কিন্তু কখনও মাত্রাতিরিক্ত হত না। একবার তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে কেহ তাঁকে অতিরিক্ত পানীয় দেন, তজ্জন্য তিনি বহুমাস তাঁর মুখদর্শন করেন নি। শাস্ত্র থেকে সুরাপানের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি দেখিয়ে তিনি চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরটি লেখেন।

মানুষ সম্বন্ধে রামমোহনকে তেমন কোনো অবাস্তব আদর্শবাদ পোষণ

১ দ্র. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩২৭-২৮।

করতে দেখি না। তাই শাস্ত্র থেকে নানা উদ্ধৃতি করে বলেছেন— লোলুপ হয়ে মদ্যপান করলে নরকে যেতে হয়; যাতে চিত্তের বিভ্রম হয়, এমত পান করলে সিদ্ধি হয় না। অতএব আপন আপন উপাসনা অনুসারে সংস্কৃত, অর্থাৎ পূজায় নিবেদিত ও পরিমিত, মদ্য পান করলে, হিন্দুর শাস্ত্র যাঁরা মানেন তাঁরা সেটি শাসন করতে প্রবৃত্ত হবেন না।

"যদিস্যাৎ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী, স্বীয় মৎসরতার জ্বালাতে, যবন শাস্ত্রের কিম্বা চৈতন্যমঙ্গলাদি পয়ারের অবলম্বন করেন, যাহাতে কোনমতে মদিরা পানের বিধি নাই, তবে শাসনের ক্ষমতা হইলে, বৈধ মদ্যপানে দোষ কহিয়া শাসন করিতে পারগ হইবেন।" বর্তমানে ঠিক এই কার্যই ধর্মসংস্থাপনা-কাঙ্ক্ষীরা করছেন— প্রহিবিশন বা মাদকসেবন-নিষেধ জারি করে দেশমধ্যে মিথ্যা ও চৌর্যের অবাধ প্রশ্রয় প্রসারিত করছেন।

বহু বৎসর পরে কাশীনাথ ও রামমোহনের 'পাষণ্ডপীড়ন ও পথ্যপ্রদান পুস্তকের সঙ্গতাসঙ্গত বিচার' করে নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য ১৭৮০ শকে (১৮৫৮?) 'বিবাদভঙ্গার্ণব' নামে পুস্তক (পৃ. ১১১) প্রকাশ করেন।[১]

'পথ্যপ্রদান'এর সপ্তম পরিচ্ছেদে মদ্যপান বিষয়ে যে আলোচনা হয়েছিল, সেটা সমাজে একেবারে স্তব্ধ হয় নি। তিন বছর পরে, ১৮২৬ সালে, 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার' নামে এক পুস্তিকায় রামমোহনকে লিখতে দেখি; তবে "কল্পিত রামচন্দ্র দাসের নামে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শূদ্রের মদ্যপান করা অশাস্ত্রীয় নহে; বিহিত মদ্যপানে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণেরও অধিকার আছে; শাস্ত্রানুসারে মদ্যপান করিলে ধর্ম্ম লোপ হয় না; এই সকল মত প্রদর্শন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। পথ্য প্রদান গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদেও ঐ বিষয়ের বিচার আছে।"[২]

এই পুস্তিকার আরম্ভে আছে—

---

১ দ্র. রামমোহন-গ্রন্থাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৫। সম্পাদকীয় মন্তব্য। গ্রন্থখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে।

২ রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ -সম্পাদিত 'রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি' (১৮৮০ সাল) থেকে গৃহীত হয়েছে। দ্র. রামমোহন-গ্রন্থাবলী। এই পুস্তিকার মূল কপি পাওয়া যায় নি; তাই ১৮৮০ সালের গ্রন্থাবলী-সংস্করণ থেকে পুস্তিকাটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে গৃহীত।

"কোনো বিশিষ্ট বংশোদ্ভব কায়স্থ কহিয়া থাকেন যে "একি কাল হইল, আমাদের বর্ণের মধ্যে অনেকেই মদ্য পান করিয়া ধর্ম্ম লোপ করিতেছে; ইহারা অতি নিন্দনীয় সুতরাং এ সকল লোকের সহিত আলাপ করা কর্ত্তব্য নহে।"

নানা শাস্ত্রগ্রন্থের রচনাদি উদ্‌ধৃত করে শ্রীরামচন্দ্র দাস ওরফে রামমোহন লিখছেন—

"ঐ কায়স্থ মহাশয় কহিয়া থাকেন যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কান্যকুব্জে ছিলেন তথা হইতে গৌড়রাজ্যে আইলেন অতএব প্রত্যক্ষ কেন না দেখেন যে কান্যকুব্জস্থ কায়স্থেরা এই শাস্ত্রপ্রমাণে পরম্পরানুসারে মদ্যপানে কদাপি পাপ জানে না।"[১] অর্থাৎ উত্তর-ভারতের কায়স্থ বা লালাদের মদ্যপান সম্বন্ধে কোনো বিরূপ সংস্কার নাই— এ তথ্য সুপরিচিত।

রামমোহনের তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধিবলে তিনি অতি ধার্মিক ও অতি নীতি-বাগীশদের total prohibition সমর্থন করতে পারেন নি; তাই বলছেন—

"যদি কেহ স্বলাভের উদ্দেশে মূর্খ ভুলাইবার নিমিত্ত শূদ্র কমলালয় ইত্যাদি গ্রন্থের নাম গ্রহণপূর্ব্বক, শূদ্রের মদ্যপান নিষেধ বিষয়ে স্বকপোল-কল্পিত শ্লোক পাঠ করেন, তবে বিশিষ্টবংশোদ্ভব কায়স্থ মহাশয়কে বিবেচনা করা উচিত হয়···।" (গ্রন্থাবলী, পৃ. ১৮৪)

কলকাতায় ভদ্রসমাজে সে যুগে মদ্যপানের অভ্যাস বিস্তারলাভ করে; বিলাতের সাহেবরা হন তাঁদের আদর্শ। তাঁরা দেখেছেন সাহেবরা কী করিৎকর্মা।

প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুসমাজের মুখপাত্ররূপে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন যে 'পাষণ্ডপীড়ন' গ্রন্থ লেখেন, সে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কলিকাতায় রামমোহনের বিপ্লবী ধর্মীয় ও সামাজিক মত প্রতিহত করবার জন্য বর্ণহিন্দুরা

---

১ এখন প্রশ্ন— এই 'বিশিষ্টবংশোদ্ভব কায়স্থ' কি কোনো সত্যকার ব্যক্তি, না শ্রীরামচন্দ্র দাস তথা রামমোহনের কল্পিত পুরুষ। তৎকালে কায়স্থদের মধ্যে রাধাকান্তদেব ছিলেন হিন্দুসমাজের নেতাস্বরূপ, তবে তিনিই কি লক্ষ্যস্থল? জানি না। 'কমলালয়' গ্রন্থ কী? ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কলিকাতা কমলালয়' নামে গ্রন্থ লেখেন ১৮২৩ সালে; এখানে 'কমলালয়' শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে কি? বলা যায় না। এক বছর আগে ভবানীচরণ সম্বাদ কৌমুদী ও রামমোহনের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করে 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্র প্রকাশ করেন ও রামমোহনের মতামতসমূহকে নানাভাবে আক্রমণ করে আসছেন— তার সঙ্গে কি এই রচনার মধ্যস্থিত 'কমলালয়'এর কোনো সূক্ষ্ম যোগ আছে?

'গৌড়ীয় সমাজ' গঠন করেছিলেন (৮ মার্চ ১৮২০)। রামমোহন ছাড়া সেকালের নামকরা ও নামজাদা প্রায় সকল ভদ্রই এই 'সমাজে'র সদস্য হন। 'পাষণ্ডপীড়ন' প্রকাশিত হবার এক মাসের মধ্যেই এই সভা আহূত হয় হিন্দু কলেজ গৃহে। সভায় "রসময় দত্ত কহিলেন এই সভায় যদি কেবল বিদ্যাবিষয়ের উপায়ান্তর চেষ্টা করা যায় তবে আমি ইহার মধ্যে আছি আর যদি ইহাতে রাজসংক্রান্ত বিষয় থাকে ও আমারদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নিন্দা কেহ করে তাহার উত্তর লেখ তবে আমি তাহার মধ্যে নহি শ্রীযুত কাশীকান্ত ঘোষালেরও ঐ কথা শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর কহিলেন যে আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র নিন্দা করিয়া যদ্যপি কেহ কোন গ্রন্থ প্রকাশ করে তাহার উত্তর অবশ্যই লিখিতে হইবেক শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব তাহার পোষকতা করিলেন।"[১]

এই 'গৌড়ীয় সমাজে'র সদস্যদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাম পাই, রামমোহনের নয়। কারণ আমরা অনুমান করতে পারি। হিন্দুদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে তাঁরা রামমোহনকে দূরেই রাখতে চাইতেন; হিন্দু কলেজ স্থাপনের সময় এইটি ঘটে। 'সমাজ' স্থাপিত হল— সভাও কয়েকটি বসল এখানে সেখানে ধনীর গৃহে— কিন্তু হিন্দুসমাজকে সুদৃঢ় করবার মতো কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাকে কার্যকরী রূপ দেবার প্রয়াস দেখা গেল না। বহু বৎসর পরে 'ধর্ম্মসভা' দেখা দিল; কিন্তু তার অবস্থাও কী হল?

---

১ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড (১৩৫৬), পৃ. ১০।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মনের মুক্তি না হলে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। ধর্মের তত্ত্বকথা নিয়ে বা সামাজিক হিতসাধনের প্রস্তাব নিয়ে যে-সব কথার আলোচনা হয়, তাকে সাহিত্য পর্যায়ে ফেলা যায় না ; তবে এই-সব তত্ত্ব থেকেই ধীরে ধীরে মনের মুক্তি হয় এবং সত্যকার সাহিত্যের জন্ম হয়। আদিসাহিত্য সব দেশেই ধর্মসাহিত্য ; সে-সবই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে বিশেষ বিশেষ ভাষার মধ্যে। বাংলাদেশের আদি গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব হয় 'ধর্ম' নিয়ে— বাইবেলের তর্জমা হচ্ছে তার আদিমরূপ। পত্রাদি বা দলিল-দস্তাবেজ বাংলা গদ্যে রচিত—কিন্তু তা সাহিত্য নয়; তাকে যদি গদ্যসাহিত্যের নমুনা বলতে হয়, তা হলে পদ্যে হোমিওপ্যাথি, বর্ষফল, প্রভৃতি লিখলেও তা কাব্যপদবাচ্য হবে। আমরা মনে করি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্য লিখিত পাঠ্যপুস্তকগুলি ও কেরী-অনূদিত বাইবেল ও তাঁর লেখা অন্যান্য বইয়ে বাংলা গদ্যের আদিরূপ দেখতে পাই ; আর তত্ত্বকথা সহজ গদ্যে প্রচলিত করবার কৃতিত্ব রামমোহনের— এ তথ্য সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু এ গদ্যও বিশুদ্ধ সাহিত্যধর্মী নয়— ধর্ম ও সমাজ -বিষয়ক বিতর্ক বা polemics।

এতক্ষণ আমরা যে-সব পুস্তক-পুস্তিকা নিয়ে আলোচনা করলাম তা মুখ্যত ধর্ম তথা দর্শন -বিষয়ক। তবে আমরা ধর্মবিষয়ক গদ্য আলোচনা নিঃশেষ করে উঠতে পারি নি— খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক এখনও বাকি আছে ; তবে তার বেশির ভাগই ইংরেজি ভাষায় লেখা, তাই খ্রীষ্টধর্ম ও রামমোহন সম্বন্ধে আলোচনাটা মুলতবি রাখলাম পৃথক পরিচ্ছেদের জন্য। আপাতত হিন্দুধর্ম তথা সমাজ-বিষয়ক প্রশ্ন নিয়ে দেশমধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে এবং যাতে রামমোহনকে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করতেই হয়, —সেই সতীদাহ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। বিষয়টা এখন সম্পূর্ণ ইতিহাসের অন্তর্গত— জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত বলে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়।

দর্শনশাস্ত্র তত্ত্বকথা শোনায়, 'ধর্ম' জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। কিন্তু বর্ণভেদের মজ্জাগত সংস্কার— যার পটভূমে আছে আর্থিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য— সুবিধাভোগের একচেটিয়া অধিকার— পদে পদে ধর্মকে উপহাস করে। আর দর্শনতত্ত্বের কথা? অনেকেই জীবিকার জন্য দর্শন অধ্যয়ন করে, জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য নয়। য়ুরোপ ধর্ম থেকে দর্শনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বলে তাদের দর্শনশাস্ত্র নানা তত্ত্বকথায় মুখর হয়ে উঠেছে এবং উঠছে; আর সমাজ ও ধর্মের বাঁধন ছিঁড়েছে বলে সেখানেও নব নব অভিজ্ঞতা ও বৈচিত্র্য এসেছে। দার্শনিক তর্কের সময় তারা বিচারণীয় তর্কের প্রমাণ বাইবেলে অনুসন্ধান করে না এবং খাওয়া-ছোঁওয়া, বিয়ে-তালাকের সময় স্মৃতিশাস্ত্রের পাতা উলটোয় না।

এককালে য়ুরোপে ধর্মতত্ত্বের গোঁড়ামি নিয়ে বহুসহস্র লোক যুদ্ধে মরে। এক সম্প্রদায়ের গোঁড়ামির সপক্ষে রাজশক্তি থাকার জন্য, য়ুরোপে মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে; এরকম ঘটনা অবশ্য ভারতে বিরল। তবে ধর্মের জন্য যে নিগ্রহ ও নরহত্যা একেবারেই হয় নি তা নয়। হিন্দুদের দর্শনশাস্ত্রমধ্যে চিন্তাশক্তি ও বিশ্লেষণশক্তির চরম উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও তাকে কথায় কথায় বেদের বা শ্রুতি এবং শাস্ত্রের দোহাই পাড়তে হয়— বিশুদ্ধ যুক্তি বা বুদ্ধির উপর ষোলো-আনা নির্ভর করে কিছু নিঃশেষে বলে ফেলার সাহস হয় না, আর শ্রোতারাও যুক্তির উপর নির্ভর করে নূতন কথাটাকে মানতে পারেন না। সমাজচেতনা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। নিরপরাধ বিধবাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতায় জীবন্ত পোড়ানো, অথবা বৈষ্ণব হলে মৃতস্বামীর সঙ্গে জীবন্ত সমাধিস্থ করা, উচিত কি না এটার বিচার হবে শাস্ত্রের উক্তি নিয়ে— বুদ্ধি বিবেচনা মনুষ্যত্ব স্নেহ প্রেমের স্থান নেই সেখানে। মানুষকে গুরু বা অবতার বানিয়ে তাঁর সব কথাকে অভ্রান্ত বলে মানাও যেমন, বুদ্ধি-বিবেচনার ঊর্ধ্বে তুলে শাস্ত্রের শ্লোককে অকাট্যপ্রমাণ রূপে মানাও তেমন অর্থহীন। সতীদাহের পক্ষে ও বিপক্ষে শাস্ত্রের যুদ্ধ চলে; সেখানে শাস্ত্রের কথা মানার নাম ধর্ম, না মানার নাম অধর্ম। সতীদাহ নিয়ে পরিস্থিতিটা এইরকম দাঁড়ায়— যে সৎ-হিন্দু সে নারীমেধ যজ্ঞের পোষক; আর রামমোহন প্রমুখ নব্যের দল সতীদাহ-নিবারণের জন্য আন্দোলন করেন বলে

তাঁরা ধর্মদ্রোহী। সতীদাহ প্রাচীন প্রথা; বাল্যকাল থেকে সতীদাহ দেখতে ও আর্তনাদ শুনতে অভ্যস্ত বলে এর মধ্যে যে কোনো নৃশংসতা আছে, এ ভাব দেশের অনেকের মনে জাগতই না। বিদেশী খ্রীষ্টানদের চোখে সর্বপ্রথম এর বীভৎসতা প্রকট হয়।[১]

কিন্তু ইংরেজ শাসনের প্রথম পঞ্চাশ বছর শাসকরা সতীদাহপ্রথা নিয়ে কিছু করবার সাহস পান নি, পাছে লোকে মনে করে যে বিদেশী খ্রীষ্টান রাজা হিন্দুদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করছে। ইংরেজ সওদাগর বানিয়া ও কোম্পানির কর্মচারীরা হিন্দুদের ধর্মের উপর খুব দরদী— এই ভাবটা দেখাবার জন্য তারা কলকাতার কালীঘাটে কালীবাড়িতে সিধে পাঠিয়ে দিত, আর বাংলা সুবার দেওয়ানি পদ লাভের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাদের 'রাজ্য'মধ্যে খ্রীষ্টান-পাদরিদের ঢুকবার অনুমতি পর্যন্ত দেয় নি। সেখানেও সেই ভয়— পাছে লোকে মনে করে 'খ্রীষ্টান' ধর্ম প্রচারের জন্য কোম্পানি পাদরিদের আমদানি করেছেন। কিন্তু ১৮১৩ সাল থেকে পাদরিদের আসা আর তাঁরা রুখতে পারলেন না। শ্রীরামপুরে ইতিপূর্বেই ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদরিরা এসেছিলেন; এবার কলকাতায় অ্যাংলিকান ও অন্যান্য চার্চের পাদরি বিশপরা এসে বাস করতে আরম্ভ করলেন।

শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান পাদরিরা বরাবরই সতীদাহপ্রথার বিরোধী।

---

১ Alexander Dow ১৭৭২ সালে তাঁর হিন্দুস্থানের ইতিহাস গ্রন্থের এক স্থানে লেখেন—

"All religions must be tolerated in Bengal, except in the practice of some inhuman customs...We must not permit young widows, in their virtuous enthusiasm, to throw themselves on the funeral pile, with their dead husbands; nor the sick and aged to be drowned, when their friends despair of their lives." —*The History of Hindostan*, Vol. iii.

ত্রিশ বছর পরে (১৮০২) কেরী লিখেছিলেন—

"I consider that the burning of women, the burying them alive with their husbands, as in the case of many jogees (যোগী), the exposure of infants (female), and the sacrifice of children at Saugar ought not to be permitted, whatever religious motives may be pretended, because they are all crimes against the State."

ওয়েলেসলি ১৮০২ অগস্ট মাসে ঘোষণা করে জানালেন, সাগরদ্বীপে শিশুকে জলে ফেলে দিলে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হবে; মেলার সময় সিপাহি মোতায়েন করে দেওয়া হল। দেখা গেল কোথাও কোনো প্রতিবাদ হল না। সাতাশ বছর পরে সতীদাহনিবারণ-বিষয়ক আইন পাস হলেও দেখা গিয়েছিল যে লোকে প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু তার বেশি কিছু করবার নৈতিক বা ধর্মীয় বল তাদের ছিল না।

পাঠকের স্মরণ আছে, শ্রীরামপুর প্রায় চোদ্দ মাস ব্রিটিশদের হাতে ছিল; ১৮০২ সালের ১৪ জুলাই দিনেমারগণ আবার সে নগরী ফিরে পায়। অতঃপর পাদরিরা ১৮০৩ সালে সতীদাহ-বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা কলকাতার আশেপাশে লোক নিযুক্ত করে জানতে পারলেন যে ঐ বছর ৪০০ সতীদাহ হয়েছে। পরের বছর ১৮০৪ সালে গঙ্গার তীরে এই সন্ধানের ফলে ৬ মাসে ৩০০ সতীদাহের খবর তাঁরা পেলেন। কেরী তখন ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের বাংলাবিভাগের অধ্যাপক; তিনি পণ্ডিতমহাশয়দের সতীদাহ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের মতামত সংগ্রহ করে দিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন। সেই-সব কাগজপত্র কেরী মি. উড্‌নি মারফত লর্ড ওয়েলেস্‌লির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উড্‌নি তখন কলকাতা সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য—ইংরেজ সমাজে ও সরকারী মহলে সুপরিচিত। ওয়েলেস্‌লি তখন দেশে ফিরে যাবার মুখে খুব ব্যস্ত, বিশেষ কিছু করতে পারলেন না; তবে নিজামত আদালতের অধ্যক্ষকে (১৮০৫), এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের মত কী, তাঁকে জানাতে বললেন। পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা শাস্ত্রীয় মতামত জ্ঞাপন করেন—কে, কী কারণে সহমৃতা হতে পারে, সহমৃতা হলে কী পুণ্য অর্জিত হয়, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে নিষেধ আছে, এবং সহমৃতা হবার সংকল্প গ্রহণ করে যদি কেউ কথা ফিরিয়ে নেয় তার কী প্রায়শ্চিত্ত, ইত্যাদি। মোট কথা, শাস্ত্রের দিক থেকেই আলোচনাটা সীমিত আছে এখন পর্যন্ত। ১৮০৫ সালের পর কয়েক বছর বিষয়টা প্রায় চাপা পড়ে যায়; কিন্তু কোনো কোনো উৎসাহী ব্রিটিশ কর্মচারী নানা ভাবে নারীহত্যা নিবারণের চেষ্টা করেন। ১৮১৭ সালে সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচার-পতির অনুরোধে নিযুক্ত জজ-পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার সতীদাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত প্রেরণ করেন; সংস্কৃতে লেখা তাঁর পত্রে তিনি এই প্রথার প্রতিকূল মতই পেশ করেন। এই মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের বেদান্তাদি গ্রন্থের বিরুদ্ধে 'বেদান্তচন্দ্রিকা' নামে গ্রন্থ লিখেছিলেন।

ইতিমধ্যে রামমোহন রায় ১৮১৫ সালের শেষভাগে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বাস করছেন ও 'আত্মীয়সভা' স্থাপন করে ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। এই-সব আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল 'সতীদাহ'। যে বছর তিনি কলকাতায় এলেন সেই

বছরই কলকাতার উপকণ্ঠে ২৫৩ জন নারী সহমৃতা হয়, ১৮১৬ সালে ২৮৯ এবং ১৮১৭ সালে ৪৪২ জন। যা কিছু অসত্য বলে প্রতিভাত হত— তা সে ধর্ম হোক, সমাজ হোক, অর্থনীতি হোক, বা রাষ্ট্রনীতি হোক— সেই অপ্রশংসনীয় বিষয়কে রামমোহন শাস্ত্রের বা প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়ে সমর্থন করতে পারতেন না। তাই সতীদাহর মতো প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করলেন না; গোঁড়া হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার এত সাহস তখন কোনো হিন্দুর ছিল না।

রামমোহনের প্রথম পুস্তিকার নাম 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ'।[১]

দেশের মধ্যে একশ্রেণীর লোকের শাস্ত্রীয়মত কী তা রামমোহন জানতেন; তাই প্রতিপক্ষের বা প্রবর্তকের সহমরণ-বিষয়ক যুক্তি অনুমান করেই তিনি নিবর্তকের হয়ে উত্তর দিয়েছেন। এই পদ্ধতি বেদান্তাদি আলোচনায় অনুস্যূত হয়ে আসছে। এই গ্রন্থের আরম্ভ—

"প্রথমে প্রবর্ত্তকের প্রশ্ন।— আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি যে তোমরা সহমরণ ও অনুমরণ যাহা এদেশে হইয়া আসিতেছে তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস করিতেছ।

"নিবর্ত্তকের উত্তর।—সর্ব্বশাস্ত্রেতে এবং সর্ব্বজাতিতে নিষিদ্ধ যে আত্মঘাত তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস পাইলে তাঁহারাই আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারেন যাঁহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই এবং যাঁহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ করিয়া থাকেন।

প্রবর্ত্তক।— তোমরা এ বড় অযোগ্য কহিতেছ যে সহমরণ ও অনুমরণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় এ বিষয়ে অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিদের বচন শুন। স্বামী মরিলে পর যে স্ত্রী ঐ পতির জ্বলন্ত চিতাতে আরোহণ করে সে অরুন্ধতী যে বশিষ্ঠের পত্নী তাঁহার সমান হইয়া স্বর্গে যায়। আর যে স্ত্রী ভর্ত্তার সহিত পরলোকে গমন করে সে মনুষ্যের দেহেতে যত লোম আছে যাহার সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি তত বৎসর স্বর্গে বাস করে। আর

১ ব্রহ্মসভার সম্পাদক বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। বাঙ্গাল গেজেট প্রেসে মুদ্রিত, নভেম্বর ১৮১৮।

যেমন সর্পগ্রাহকেরা আপন বলের দ্বারা গর্ত্ত হইতে সর্পকে উদ্ধার করিয়া লয় তাহার ন্যায় বলের দ্বারা ঐ স্ত্রী স্বামীকে লইয়া তাহার সহিত সুখ ভোগ করে। আর যে স্ত্রী ভর্ত্তার সহিত পরলোকে গমন করে সে মাতৃকুল পিতৃকুল এবং স্বামিকুল এই তিন কুলকে পবিত্র করে।··· আর পতি যদি ব্রহ্মহত্যা করেন কিম্বা কৃতঘ্ন হয়েন কিম্বা মিত্রহত্যা করেন তথাপি ঐ পতিকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করে ইহা অঙ্গিরামুনি কহিয়াছেন॥ স্বামী মরিলে সাধ্বী স্ত্রী সকলের অগ্নি প্রবেশ ব্যতিরেকে আর অন্য ধর্ম্ম নাই।"[১]

উপরোক্ত যুক্তি ঘনশ্যাম শর্মা ১৮০৫ সালেও লিখে পাঠিয়েছিলেন ; তাই মনে হয় এই অতিপ্রচলিত যুক্তি, যা সহমরণের সপক্ষে ব্যবহৃত হত, রামমোহন সেটিই উদ্‌ধৃত করেছিলেন। তার পর বহু শাস্ত্র থেকে উভয়েই উদ্‌ধৃতি করেছেন। এই-সব উত্তর-প্রত্যুত্তরের আবেদন আজ হিন্দুর কাছে নিরর্থক। কিন্তু দেড় শত বৎসর আগে এই-সব নিয়েই হিন্দুরা মত্ত ছিলেন। আর শাস্ত্রের শ্লোক রচনা করে, অথবা ঋগ্‌বেদের (১০।১৮ ৭) সূক্তের 'অগ্রে' শব্দকে 'অগ্নে' শব্দ প'ড়ে বিধবার সহমরণে বেদ থেকেও সমর্থন পেয়েছিলেন।

প্রতিক্রিয়াপন্থী হিন্দুরা কথায় কথায় 'পরম্পরা' বা traditionএর দোহাই দিতেন। রামমোহন তার উত্তরে লিখেছেন, "কোনো ব্যক্তি যাহার লোকভয় ও ধর্ম্মভয় আছে সে এমত কহিবেক না যে পরম্পরাপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রীবধ মনুষ্যবধ ও চৌর্য্যাদি কর্ম্ম করিয়া মনুষ্য নিষ্পাপে থাকিতে পারে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ পরম্পরাকে মান্য করিলে বনস্থ এবং পার্ব্বতীয় লোক যাহারা২ পরম্পরায় দস্যুবৃত্তি করিয়া আসিতেছে তাহাদিগ্যে

---

১ সে যুগে কোনো কাজই সিদ্ধ হত না শাস্ত্রের দোহাই না পাড়লে। কোম্পানির কর্তারা ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের কাছে জানতে চান— শাস্ত্রে কী বলে। রামমোহনও সেই পথই ধরেন— Rammohan's propaganda also took the same line of Sastric argument... Rammohan wrote three tracts on the subject; but what further active steps he took for the cause we do not know definitely—এ কথা লিখেছেন ডক্টর সুশীলকুমার দে। অবশ্য একটু পরেই তিনি আবার লিখেছেন—Undoubtedly Rammohan took an important part in the movement, but to attribute all the credit to him is obviously unfair to the progressive Hindu community, as well as to Govt. authorities, without whose active efforts the measure for abolition could not have been passed against the determined opposition of the Hindu Dharma-Sabha and other orthodox bodies. —*Bengali Literature*, pp. 522-23.

নির্দ্দোষ করিয়া মানিতে হয় এবং এসকল কুকর্ম্ম হইতে তাহাদিগ্যে নিবর্ত্ত করণে প্রয়াস পাওয়া উচিত হয় না··· অবলাকে স্বর্গাদি প্রলোভ দেখাইয়া বন্ধনপূর্ব্বক বধ করা অত্যন্ত পাপের কারণ হয়।"[১]

'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' পুস্তিকা বোধ হয় ১৮১৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়; ইংরেজি তর্জমার ভূমিকায় লেখা আছে যে পুস্তিকাটি has been for several weeks past in extensive circulation। ১৮১৮ সালে ২৬ ডিসেম্বরের সমাচার দর্পণে এই পুস্তিকার উল্লেখ আছে—"কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"[২]

রামমোহনের এই পুস্তিকা মুদ্রিত হয় হরচন্দ্র রায়ের বাঙ্গাল গেজেটি প্রেসে (১৪৫ চোরবাগান স্ট্রীট)। বাংলাদেশের প্রথম মাসিকপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি'তে এই পুস্তিকাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত 'বাঙ্গাল গেজেটি'র কোনো কপি পাওয়া যায় না; তবে Asiatic Journal -এর ১৮১৯ জুলাই সংখ্যায় (পৃ. ৬৯) এই তথ্যটি প্রকাশিত হয়। আমাদের মনে হয় হরচন্দ্র রায় ও গঙ্গাকিশোর উভয়েই আত্মীয়সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালের ১৫ মে তারিখে (দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা: 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য'); এবং ঐ বছরেই অক্টোবর মাসে রামমোহনের পুস্তিকা মুদ্রিত হয়। অনুমান ১৮১৯ সালের গোড়ার দিকে তা 'বাঙ্গাল গেজেটি'তে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। বিলাতের 'এশিয়াটিক জর্নাল' (জুলাই ১৮১৯) পত্রে প্রকাশিত তথ্যটি কলিকাতায় প্রকাশিত *The India Gazette* হতে গৃহীত: "We have been informed this little work [on Suttees] has been republished in a newspaper, which for some time past has been

---

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১০।

২ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৭।

"Some months ago, too, Bykunthanath Banoorjee, Secretary to the Brahmya Unitarian Hindoo Community, published a tract in Bengali, a translation of which into English is also before the public."—*The Calcutta Journal*, April 1819.

printed and circulated in the Bengalee language and character, under the sole conduct of natives. This additional publicity which the labours of Rammohan Roy will obtain, cannot fail to produce beneficial consequences ; and we are happy to find that the conductors of the Bengalee journal have determined to give insertion to articles that are likely to prove more advantageous to their countrymen, than the pompous and inflated productions of a most learned Hindoo, who, we understand, has declared that the cholera morbus can never be overcome, until general puja shall be performed to conciliate the angry deity, by whom his affliction has been occasioned."[১]

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "তখন 'বাঙালী-পরিচালিত' অপর কোন বাংলা সংবাদপত্র ছিল না, সুতরাং উদ্‌ধৃত অংশে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র কথাই বলা হইয়াছে।"[২]

১৮১৮ সালের ৩০ নভেম্বরে রামমোহনের 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে ১৮১৮ সালের অগস্ট মাসে বড়োলাট হেস্টিংসের দরবারে হিন্দুদের পক্ষ থেকে Counter petition of some Hindoo inhabitants of Calcutta প্রেরিত হয় (*Asiatic Journal*, July 1819 : quoted in J. N. Mazumder's *Raja Rammohan Roy and Progressive Movement in India*, pp. 115-17)। এখনও সতীদাহ নিষিদ্ধ হয় নি, কেবল কতকগুলো প্রতিবন্ধকী আইন জারি হয়েছিল মাত্র। এ সম্বন্ধে *India Gazette* এ (এপ্রিল ১৮১৯) হরিহরানন্দ স্বামীর নামে প্রকাশিত পত্র থেকেও একটি দরখাস্তের কথা জানা যায় : "In the year 1818, a body of Hindoos prepared a petition to Government, for the removal of the existing restrictions on burning widows....while another body petitioned for at least further restrictions, if not the total abrogation of the practice, upon the ground of its absolute illegality।" এই পত্রমধ্যে বলা হয়েছে, ব্রাহ্ম বা একেশ্বরবাদী হিন্দু

১ J. N. Mazumder, *Raja Rammohan Roy and Progressive Movement in India*, pp. 117-18.

২ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য'।

সমাজের সম্পাদক বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন এবং তার ইংরেজি অনুবাদও সাধারণের সমক্ষে পেশ করা হয়েছে। এটিই রামমোহন-কৃত সহমরণের বিরুদ্ধে রচিত পুস্তিকা ও তার অনুবাদ— যার কথা আগেই বলা হয়েছে।[১]

রামমোহনের সহমরণ-বিষয়ক বাংলা পুস্তিকা (অক্টোবর ১৮১৮) এবং যুগপৎ ইংরেজি অনুবাদ[২] প্রকাশিত হলে (নভেম্বর ১৮১৮) কলকাতার তথাকথিত হিন্দু-অভিজাত, অর্থাৎ বণিক-সম্প্রদায় ও ম্লেচ্ছ-শূদ্রের অর্থে লালিত প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণগণ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ইতিপূর্বে রামমোহনের ন'খানি বই প্রকাশিত হয়েছে— সে-সবে তিনি তথাকথিত প্রচলিত হিন্দু-ধর্মকে আক্রমণ করেছেন ; এবার হিন্দু সমাজ নিয়ে টান দিয়েছেন— তাদের চিরাচরিত, পরম্পরাগত, শাস্ত্রসম্মত সতীদাহপ্রথা রদ করবার জন্য আন্দোলন শুরু করেছেন। এবার তাঁকে রুখতেই হবে। কালাচাঁদ বসু নামে জনৈক কায়স্থর প্ররোচনায় কাশীনাথ তর্কবাগীশ রামমোহনের পূর্বোল্লিখিত পুস্তিকার উত্তর প্রস্তুত করলেন— 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ'। কালাচাঁদ বসু ছিলেন ধনী গুরুপ্রসাদ বসুর পুত্র— প্রতিক্রিয়াপন্থীদের অন্যতম সহায়ক। পিতাপুত্রের নাম নানা দানকর্মের জন্য সমসাময়িক পত্রিকায় পাওয়া যায়। কালাচাঁদ বসুর আগ্রহে তর্কবাগীশ কর্তৃক 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ'

১ 'হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী', সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৯।

পত্রখানি ২৭ মার্চ ১৮১৯ লিখিত হয়, ১৮১৮ সালে নয়। কারণ ১৮১৮ সালের মার্চ মাসে রামমোহনের পুস্তিকা ও তার অনুবাদ প্রকাশিত হয় নি ; সেগুলি যথাক্রমে ১৮১৮ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

২ সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ, নভেম্বর ১৮১৮, পৃ. ২২। ইংরেজি : Conference between an Advocate for, and an opponent of, the practice of Burning Widows Alive, Calcutta, November 30, 1818 (*English Works*, pp. 321-32)। এই ইংরেজি অনুবাদটি ক্যালকাটা গেজেটের ২৪ ডিসেম্বর সংখ্যায় মুদ্রিত হয় (দ্র. *Selections from Calcutta Gazette*, 1816-23, Vol. v : by Hugh David Sandeman (1869) pp. 271-81)। সম্পাদকীয় মন্তব্য-শেষে লিখিত হয় :

"As the object of the translator is avowedly to give further publicity to the reasoning and arguments contained in his pamphlet, we willingly contribute our aid to that deservable end, by inserting the whole in our columns. It is too short for an abstract." (p. 271)। এই সম্পাদকীয় মন্তব্যে রামমোহনের নাম নাই— মুদ্রিত পুস্তিকাতেও নাই ; তাই লিখিত হয়েছে 'a learned and philosophical Hindoo'.

লিখিত ও তাঁর অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত হয়। "সম্প্রতি দুই তিন বৎসর হইল মোং কলিকাতার হিন্দুরদের শাস্ত্রসিদ্ধ সহমরণের বিষয়ে কেহ২ প্রতিবাদী হইয়াছেন তন্নিমিত্ত কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কালাচান্দ বসুজা এক নূতন পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইয়াছেন। সে পুস্তকে সহমরণনিষেধকের কথা ও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন ও তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ সহমরণবিধায়কের বাক্য ও তাহারও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন আছে এবং বাঙ্গালা ভাষাতে তাহার তর্জমা আছে এবং সেই বিষয়ের ইংরাজী ভাষাতে পৃথক এক কেতাব অতি সুন্দররূপে তর্জমা। এই পুস্তক অত্যল্প দিন প্রকাশ হইয়াছে।"[১]

কাশীনাথের এই বই অনামে ছাপা হয় ১৮১৯ সালের গ্রীষ্মকালে—রামমোহনের পুস্তিকা প্রকাশের মাস পাঁচ পরে। *The Friend of India*র ১৮১৯ সালের জুলাই সংখ্যায় এ গ্রন্থ প্রকাশের সংবাদ ছাপা হয়।[২]

বিধায়ক ও নিষেধকের কথাবার্তা— এ যেন battle of wits; বিধায়কের যুক্তি সহমরণের সপক্ষে, আর নিষেধকের বাক্যে তার উত্তর; আবার সে-সবেরও প্রত্যুত্তর আছে বিধায়কের যুক্তিমতে। এই পুস্তিকার শেষ পংক্তি শোনবার মতো—

"এই বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদের মধ্যে যে মুণ্ডকশ্রুতি প্রভৃতি আছে তাহা শূদ্রাদির পাঠ্য নয় এবং শ্রোতব্য নয়।"[৩]

কাশীনাথ পণ্ডিতের দানপতি শূদ্র কালাচাঁদ বসুও নিশ্চয়ই এ গ্রন্থ পড়তে পান নি; কারণ সেকালে বাংলার হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুটি মাত্র জাতি স্বীকৃত হত— ব্রাহ্মণেতর সকল জাতই শূদ্র। (দ্র. লালমোহন বিদ্যানিধি -প্রণীত 'সম্বন্ধ-নির্ণয়')।

রামমোহন এই পুস্তিকার উত্তরে লিখলেন— "সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ": A Second Conference between an

১ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮১৯। ৩ আশ্বিন ১২২৬। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৯।

২ ... a small work in defence of this practice just published... without name or date; but a manuscript note on the first blank leaf informs us that it is published by *Cassee-nath-turku-bagish*, by the desire of Cala-chund-bhose. It is in the form of a dialogue, written in Bengalee with an English translation.— দ্র. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৫২।

৩ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪।

Advocate and an Opponent of the Practice of Burning Widows Alive (Calcutta, Mission Press, 1819)। এই পুস্তিকার ইংরেজি তর্জমা To the Most Noble the Marchioness of Hastings, অর্থাৎ বড়োলাট লর্ড হেস্টিংসের পত্নীকে উৎসর্গ করা হয়। উৎসর্গ-পত্রের পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত ছিল—

"The following tract being a translation of a Bengalee Essay, published sometime ago, as an appeal to reason in behalf of humanity I take the liberty to dedicate to YOUR LAD SHIP for, to whose protection can any attempt to promote a benevolent purpose be with so much propriety committed ?"

রামমোহন শাস্ত্রের পর শাস্ত্র উদ্‌ধৃত করে কাশীনাথ পণ্ডিতের তর্কজাল ছিন্ন করেন। তিনি লিখছেন—

"সর্ব্বশাস্ত্রসার ভগবদ্‌গীতাকে এককালে উচ্ছন্ন না করিলে কাম্যকর্ম্মের প্রশংসা করা যায় না।"

অন্যত্র—

"গীতাপুস্তক অপ্রাপ্য নহে, এবং আপনারাও তাহার অর্থ না জানেন এমৎ নহে ; তবে এই সকল শাস্ত্রকে অন্যথা করিয়া অজ্ঞলোকের তুষ্টির নিমিত্ত স্বর্গের প্রলোভন দেখাইয়া শাস্ত্রজ্ঞানরহিত যে স্ত্রীলোক, তাহার-দিগকে নিন্দিত পথে কেন প্রেরণ পুনঃপুনঃ করেন ?"

সদ্যমৃত স্বামী-শোকাতুরা নারীকে আত্মাহুতি দেবার জন্যে প্ররোচিত করা হত কেবল যে ধর্মের জন্যে তা নয়— অর্থের জন্যেও ধর্মের নামে এই হত্যাকাণ্ড করা হত। ব্রাহ্মণেরা মনে করতেন, নারী বিধবা হয়ে শুচি জীবন পালন করতে অসমর্থ ; সুতরাং "তাহার জীবন অপেক্ষা মরণ শ্রেষ্ঠ"। নারী স্বভাবতই অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্রী, সানুরাগিণী এবং ধর্মজ্ঞানশূন্যা। নারী সম্বন্ধে এই ছিল তৎকালীন ভদ্রদের মত ! কিন্তু একটি নারীকে কতশত পুরুষ কলঙ্কিত করে আসছে, তাদের সম্বন্ধে কোন্ বিশেষণ প্রযুক্ত হতে পারে, তা লেখক উল্লেখ করেন নি। স্মৃতিকারগণ পুরুষ— তাঁদের সাত খুন মাপ।

নারী সম্বন্ধে যে পাঁচ দফা আশঙ্কার উল্লেখ করা হয়েছে তা উল্লেখ করে রামমোহন লিখছেন—

"দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।"[১]

সহমরণ বিষয়ে রামমোহনের আর-একটি বাংলা পুস্তিকা আছে— সেটি লিখিত হয় ১৮২৯ সালে। তখন সতীদাহ নিবারণ গভর্মেণ্ট স্থিরই করেছেন। সহমরণ-বিষয়ক ক্ষুদ্র পুস্তিকা এত বছর পরে পুনরায় লেখবার প্রত্যক্ষ কারণ কী? 'বিপ্র' এবং 'মুগ্ধবোধ' নামে দুই ব্যক্তি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় দুখানি পত্র প্রকাশ করেন; সকাম ও নিষ্কাম কর্মের যে মৃদু সমালোচনা 'দ্বিতীয় সম্বাদে' রামমোহন করেছিলেন, এই প্রবন্ধগুলিতে সেই মতই ছিল প্রত্যক্ষ আক্রমণের বিষয়। বিধবা সহমৃতা হলে অনন্তকাল স্বামীর সঙ্গে বসবাস করবে প্রভৃতি যে-সব লোভনীয় পরকাল-চিত্র সংস্কৃত শ্লোকে ছন্দোবদ্ধ করে 'শাস্ত্র' আখ্যা দিয়ে প্রচার করা হয়েছিল— রামমোহন সেই সকাম ধর্মমূঢ়তার প্রতিবাদ করেন শাস্ত্র দিয়েই— কণ্টক দ্বারা কণ্টক উৎপাটন। 'বিপ্র' ও 'মুগ্ধবোধ' ছাত্রদ্বয় এই সকাম নিষ্কাম কর্ম নিয়েই তর্ক তোলেন; সংস্কৃত শ্লোক মাত্রই প্রাচীনত্ব ও শাস্ত্রত্বের দাবি ক'রে প্রথমে যজমানের বিচারবুদ্ধি হরণ ও পরে অর্থ অপহরণ করে আসছেন। মস্তিষ্কের অপব্যবহারে মানুষ কতদূর হীনত্বে নেমে যেতে পারে তা রামমোহনের তীক্ষ্ন যুক্তি ও স্পষ্ট কথা পড়লেই বুঝতে পারা যাবে। বিপ্রনামা স্বর্গের লোভ দেখিয়ে নরসিংহপুরাণের বচন উদ্‌ধৃত করেছেন— "যে ব্যক্তি জলে প্রবেশ করিয়া মরে সে আনন্দনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, সাহসপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া যে মরে সে প্রমোদনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, পর্ব্বতাদি উচ্চদেশ হইতে পতনপূর্ব্বক যে মরে সে সৌখ্যনামক স্বর্গকে পায়, যুদ্ধপূর্ব্বক যে মরে তাহার অতি নির্ম্মলনাম স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, আহার ত্যাগপূর্ব্বক যে মরে সে ত্রিপিষ্টনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়।" রামমোহন এই যুক্তির পর বলছেন— "অতএব ইহাতে নির্ভর করিয়া বিপ্রনামা কহিবেন যে, সঙ্কল্প ত্যাগপূর্ব্বক এ সকল প্রকারে শরীর ত্যাগ করিলে নিষ্কাম কর্ম্মের ন্যায় এই নানাবিধ আত্মহত্যাও চিত্তশুদ্ধির প্রতি কারণ হয়। এবং স্মার্ত্তধৃত

১ রামমোহন গ্রন্থাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৭।

এ বচনও পাঠ করিবেন··· সকল পাপযুক্ত হইয়াও যে মনুষ্য নিয়মপূর্ব্বক পুণ্যতীর্থে প্রাণত্যাগ করে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেক। ওই বচন পাঠানন্তর বিপ্রনামা এ প্রবৃত্তিও দিতে সমর্থ হইবেন যে কামনা ত্যাগ করিয়া তীর্থমরণে চিত্তশুদ্ধি হইবেক, কিন্তু বিপ্রনামার ইহাও অনুভব হইল না যে স্বর্গাদি কামনা না করিলে এ প্রকার আত্মহননরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। এবং এ প্রকার দুঃসাহস কর্ম্মে যে প্রবৃত্তি সে তামসী প্রবৃত্তি হয়, যাহা গীতায় ও উপনিষদে বারম্বার নিষিদ্ধ করিয়াছেন, এইরূপ বিপ্রনামা ভবিষ্যপুরাণোক্ত নরবলি প্রদানের প্রবৃত্তিও দিবেন,···এবং কলিতেও তন্ত্রানুসারে নরবলির প্রথা ছিল এবং এ কালেও দেশবিশেষে হইতেছে, অতএব শাস্ত্রপ্রাপ্ত এবং পরম্পরা ব্যবহারসিদ্ধ নরবলি অবশ্য কর্ত্তব্য, যদি কেহ কহে যে কামনাপূর্ব্বক কর্ম্ম গীতাদি শাস্ত্রমতে নিন্দিত হয়, তবে বিপ্রনামা কহিবেন যে কামনা ত্যাগপূর্ব্বক নরবলি দান কেন না কর চিত্তশুদ্ধি হইয়া মুক্তি হইবেক। ধন্য২ বিপ্রনামা ধন্য অধ্যাপক।"[১]

আমরা এই উদ্ধৃতি করলাম রামমোহনের যুক্তি ও ভাষার তীব্রতার নমুনা রূপে। এইটেই রামমোহনের 'সতীদাহ' সম্বন্ধে বাংলায় শেষ গ্রন্থ। 'সতীদাহ' সম্বন্ধে বিলেতে পার্লামেন্টের কাছে ইংরাজিতে এক আবেদন পেশ করেন।

১৮০৫ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পঁচিশ বছর ইংরেজ গবর্মেণ্ট কিভাবে ধর্মের নামে নারীহত্যা নিবারণের চেষ্টা করেছিলেন, সে ইতিহাস বহু স্থলে বিবৃত হয়েছে, সুতরাং তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। অবশেষে ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ সালে বড়োলাট লর্ড বেন্টিংক স-কাউন্সিল-স্বাক্ষরিত আদেশে সতীদাহ নিষিদ্ধ করলেন ও বিলেতে ডিরেক্টরদের কাছে পত্র পাঠিয়ে দিলেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে হিন্দুরা বড়োলাটের কাছে আবার আবেদন পাঠান; তাতে তাঁরা লেখেন।

"Some blasphemous persons, whose minds are infected with atheism, misinterpret the meanings of the text of several intelligent

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৩-৫৪।

sages through their incompetence to understand the genuine construction of the law." (কতকগুলি ঈশ্বরনিন্দুক লোক, যাঁদের মন নাস্তিকতায় বিষাক্ত, তাঁরা জ্ঞানী ঋষিদের রচিত শাস্ত্রের কদর্থ করবেনই, কারণ ধর্মের মূল অর্থ উপলব্ধি করার শক্তি তাঁদের নেই)। বলা বাহুল্য, রামমোহন ও আত্মীয়-সভার সদস্য, যাঁরা সতীদাহ নিষিদ্ধ করার আন্দোলন করেছিলেন, এ নিন্দার লক্ষ্যস্থল ছিলেন তাঁরাই।

বড়োলাট-বাহাদুর আবেদনকারীদের জানিয়ে দিলেন যে, তিনি সব কিছু দেখেশুনেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তাঁরা যে প্রথার সমর্থনের জন্য আবেদন পেশ করেছেন তাকে রদ করাই ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তাঁদের একান্ত কর্তব্য বলে মনে করেন ("...have made it an urgent duty of the British Government to prevent the usage in support of which the petition has been preferred.")— এটি বড়োলাটের দপ্তর থেকে লিখিত হয় ১৪ জানুয়ারি ১৮৩০।

বেন্টিংকের মত জানতে পেরে সতীদাহ-নিবারক দলের লোকে উল্লসিত হয়ে টাউন হলে দুদিন পরে (১৬ জানুয়ারী ১৮৩০) সভা ডেকে বড়োলাটকে অভিনন্দন জানালেন। এই প্রশস্তির খসড়া রামমোহন-রচিত বলে অনুমিত হয়। এই ঘটনার পরের দিনই (১৭ জানুয়ারি ১৮৩০) গোঁড়া হিন্দুরা সংস্কৃত কলেজ-গৃহে এক সভা আহ্বান করলেন। 'এই সভায় সম্ভ্রান্তসমূহ সমবেত হইলে' ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় বলেন যে বড়োলাটের কাছ থেকে তাঁদের আবেদনপত্রের উত্তর পাওয়া গেছে ; রাধাকান্ত দেব সেটি পাঠ করে শোনালেন। তিনি জানালেন যে বড়োলাট তাঁদের "আরজি তুষ্টপূর্ব্বক বিলাতে পাঠাইয়া দিবেন।"

এই আহূত সভার নাম হল 'ধর্মসভা'; আমাদের আলোচ্য পর্বে কমল বসুর বাটীতে ব্রাহ্মসভার কাজ হচ্ছে আগস্ট ১৮২৮ থেকে এবং চিৎপুর রোডের উপর 'ব্রাহ্মমন্দির'-নির্মাণকার্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কয়েকদিন পরে (২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। ১১ মাঘ ১২৩৬) নূতন মন্দির উন্মুক্ত হল। কালে সেই গৃহ আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নামে খ্যাত হয়।

ব্রাহ্মদের ধর্মগৃহ স্থাপন করতে দেখে ভদ্রহিন্দুদের মনে এই কথা জাগে— "সর্ব্বসাধারণের বৈঠক নিমিত্ত কোন নিরূপিত স্থান নাই।...একারণ...বহুতর

ভদ্রলোক একত্র হইয়া ধর্ম্মসভা নামে এক সমাজ স্থাপন করিয়াছেন ঐ ধর্ম্মসভার নিমিত্ত এই মহানগরমধ্যে এক বাটী প্রস্তুত হইবেক।"[১]

এই সভায় আর-একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়: "যে সকল লোক হিন্দু অথচ আমারদিগের হিন্দুধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বিপরীত মতাবলম্ব করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহারদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি রহিত করিতে হইবেক।" মতান্তর হলে সমাজপতিরা চিরদিনই তো হিন্দুসমাজ থেকে বিদ্রোহীদের বহিষ্কৃত করে এসেছেন! বলা বাহুল্য. হিন্দুসমাজের সেই মনোবৃত্তি নিয়ে কলিকাতার ভদ্রেরা হিন্দুদের মিলিত করবার জন্যে 'ধর্মসভা' স্থাপন করলেন। কিন্তু গত দেড় শো বছরের মধ্যে কি ধর্মসভা-গৃহ নির্মিত হয়েছে? মিলনকেন্দ্র কি আবিষ্কৃত হয়েছে? গৌড়ীয় সমাজ কোথায়?

ধর্মসভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তার দ্বারা হিন্দুকে এক করবার পথ উন্মুক্ত হল না। রামমোহনও সমস্ত হিন্দুকে এক করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন; তাঁর বিশ্বধর্মবাদ হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদ্‌ধৃতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে আশা করেছিলেন।

রামমোহনকে ব্রাহ্মসভার জন্য হিন্দুশাস্ত্র থেকে উদ্‌ধৃতি করতে দেখে এবং সংস্কৃতে মন্ত্রাদি উচ্চারণ করতে দেখে, প্রতিপক্ষীয়রা বলেন যে, তিনি তাঁর Unitarian মতবাদ থেকে Hindoo Theism-এ সরে গিয়েছিলেন। এ সমালোচনা অবশ্য প্রধানত খ্রীষ্টানদের। কথাটা ভাববার মতো। খ্রীষ্টানদের মধ্যে যাঁরা Unitarian তাঁরা Christian Unitarianism প্রতিষ্ঠিত করতে চান, রামমোহন চেয়েছিলেন Hindoo Unitarianism।

একটা দেশের একটা জাতি বিশেষ একটা ভাষার মধ্য দিয়ে তার ভাবনা প্রকাশ করে; সেটাই হয় তার জাতীয় সাহিত্য। ভারতে হিন্দুর সংস্কৃতি সংস্কৃতের মধ্য দিয়ে, ইস্‌লামীয় দেশে আরবি ফার্শি ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, চীনদেশে তাদের লেখকদের রচনার মধ্য দিয়ে, য়ুরোপের নানা দেশে নানা ভাষার মধ্য দিয়ে নিজ নিজ সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে এবং হয়ে আসছে। তার পর সেই সেই দেশে যখন নূতন কেউ নূতন কথা বলেন তখন তাঁকে তাঁর নিজ দেশের ভাষার মধ্য দিয়ে, সেই দেশের সাংস্কৃতিক

১ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩০৪। সমাচার দর্পণ, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ২৫ মাঘ ১২৩৬।

পরিভাষার সাহায্যে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়। রামমোহন হিন্দুসমাজের মধ্যে জন্মেছিলেন; তাঁর পক্ষে ভারতীয় ভাষায়, ভারতীয় ভাবধারায় তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করবার সুবিধা ছিল। তাই তিনি যে 'ব্রাহ্মসভা' স্থাপন করেছিলেন, তার ব্যবহারের ভাষা ভারতীয় হতে অর্থাৎ সংস্কৃত হতে বাধ্য হয়। 'ধর্মসভা' সকল হিন্দুকে এক সূত্রে বাঁধবার ভাষা ও সূত্র আবিষ্কার করতে পারল না। রামমোহন সব হিন্দুকে বেদান্তের সূত্রে কেবল আহ্বানই জানালেন না, তিনি যে নীড় রচনা করলেন সেখানে সকল মানব সমবেত হবার পরিবেশ পেল— সেটাই হল 'ব্রাহ্মসমাজ'। সেটা সফল হয় নি কেন সে আলোচনার ক্ষেত্র এ গ্রন্থ নয়। তবু সংক্ষেপে বলি, বাহ্য ভেদ লোপ করলেই মানুষকে এক করা যায় না। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে যে পরিবার সকল সদস্যকে থাকতে দিতে পারে সেটাই আদর্শ পরিবার। ভেদ স্বীকার করে নিয়েই সমাজ-সংসারে থাকতে হবে— শুধু এক আকার (uniformity) হলেই ঐক্য (unity) হয় না। ইউনিফর্মিটি বাহ্যিক, ইউনিটি আত্মিক।

রামমোহনের সতীদাহ-প্রতিরোধ-প্রচেষ্টার পটভূমে আছে হিন্দুনারীর প্রতি সহানুভূতি। হিন্দুনারী পিতৃধন স্বামীধন থেকে বহুকাল বঞ্চিত। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের পর ১৯৫৬ সালের আইনমতে নারী তার যোগ্য সম্মান ও অধিকার পেয়েছে। রামমোহন সহমরণের বিরুদ্ধে যেমন লেখনী ধারণ করেছিলেন, বহুবিবাহের প্রতিও তেমনি তাঁর বিরুদ্ধ মত ছিল। ১৮২২ সালে একটি পুস্তিকায় রামমোহন স্পষ্টই লেখেন যে, প্রাচীন কালের স্মৃতিকারগণ নারীর যে মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছিলেন, মধ্যযুগে 'দায়ভাগ' 'দায়তত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থে নারীর সে অধিকার অপহৃত হয়।

"...a widow...can receive nothing, when her husband has no issue by her..." স্বামীর মৃত্যুর পর "a woman who is looked up to as the sole mistress by the rest of a family one day, in the next, becomes dependent on her sons, and subject to slights of her daughters-in-law. She is not authorised to expend the most trifling sum or dispose of an article of the least value, without the consent of her son or daughter-in-law, who were all subject

to her authority, but the day before."[১]

রামমোহন এই পুস্তিকায় বলেন যে, বিধবারা অনেক সময়ে এই অসহ্য উৎপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আত্মহত্যা করত 'সতী' হয়ে। বাংলাদেশে এই দায়ভাগের আইন কঠোরভাবে চালু থাকার জন্য এই দেশেই সতীদাহের সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশ থেকে অনেক বেশি হত।

'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' পুস্তিকায় তৎকালীন বাঙালী হিন্দুনারীর যে চিত্র অঙ্কিত করেন, ভাষার দিক হতে তা কী প্রাঞ্জল, তা নিম্নোদ্ধৃত অংশ থেকে স্পষ্ট হবে। বিষয়ের গুরুত্বের উপর যে ভাষার নির্ভর তা বেদান্ত গ্রন্থাদির ভাষা-বিবরণের সঙ্গে এই রচনার ভাষা তুলনা করলেই বোঝা যাবে :

"প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে২ বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাতা আছে, বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণপূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।···

"পঞ্চম তাহারদের ধর্ম্মভয় অল্প, এ অতি অধর্ম্মের কথা, দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাঁহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারি বার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি

১ Brief remarks regarding modern encroachments on the ancient rights of females according to the Hindu Law of Inheritance, Calcutta, 1822.

ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামী দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতাপূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাহারা আপন২ স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি২ দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে; এবং স্থপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষণাদি আপন২ নিয়মিত কালে করে, যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন এই নিমিত্ত বিষয়ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইহারদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; ঐ রন্ধনে ও পরিবেষণে যদি কোনো অংশে ক্রটি হয়, তবে তাহারদের স্বামী শাশুড়ি দেবর প্রভৃতি কি২ তিরস্কার না করেন; এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষপূর্ব্বক আহার করিয়া কাল যাপন করে; আর অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ যাঁহারদের ধনবত্তা নাই, তাঁহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম তাহাও করেন, মধ্যে২ কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ক্রটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যাভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাস মধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে, আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবা রাত্রি মনস্তাপ

ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্মভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয়, যে এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়ন করে, এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধর্ম্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণার অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহ ত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই২ পতিহস্তে আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্ব্বজাতক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।" ১৬ অগ্রহায়ণ ১৭৪১ শক।[১]

আমরা স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে রামমোহনের আন্তরিকতার যে নমুনা উদ্ধৃত করলাম, তার সঙ্গে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার -লিখিত 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' গ্রন্থের (মার্চ ১৮২২) কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি; পাঠক লক্ষ্য করবেন যে দুটির মধ্যে কী মিল :

"যদি বল স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অল্প এ কারণ তাহাদের বিদ্যা হয় না, অতএব পিতামাতাও তাহাদের বিদ্যার জন্যে উদ্যোগ করেন না, এ কথা অতি অনুপযুক্ত। যেহেতুক নীতিশাস্ত্রে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বুদ্ধি চতুর্গুণ ও ও ব্যবসায় ছয়গুণ কহিয়াছেন। এবং এদেশের স্ত্রী লোকেদের পড়া শুনার বিষয়ে বুদ্ধি পরীক্ষা সংপ্রতি কেহই করেন নাই। এবং শাস্ত্র বিদ্যা ও জ্ঞান ও শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করাইলে যদি তাঁহারা বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে না পারেন তবে তাঁহারদিগকে নির্ব্বোধ কহা উচিত হয়। এদেশের লোকেরা বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞানের উপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন না বরং তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করে তবে তাঁহাকে মিথ্যা জনরব মাত্র সিদ্ধ নানা অশাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দেখাইয়া ও ব্যবহার দুষ্ট বলিয়া মানা করান।"[২]

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৫-৪৭।

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৭।

লেখক যে-সব শিক্ষিত নারীর নাম উল্লেখ করেছেন, রামমোহনও তার অনেকগুলির নাম করেছেন। ভাষার সাদৃশ্য তুলনীয়—

"বৃহদারণ্যক উপনিষদে সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে, যে অতিশয় কঠিন এবং প্রায় অনেকের বুদ্ধির অগোচর যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং মৈত্রেয়ী সেই সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া জ্ঞান পাইয়া কৃতার্থা হইয়াছেন।"

আমাদের মনে হয়, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার রামমোহনের অনুবর্তক ছিলেন। রামমোহন প্রত্যক্ষভাবে নারীশিক্ষার মধ্যে নামতে চান নি; তিনি জানতেন ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় হিন্দুরা তাঁর কী বিরোধিতা করেছিলেন। তাই স্কুল বুক সোসাইটি ও ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন নি। গৌরমোহন রামমোহনের ভাবনাটি গ্রহণ করে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তক লেখেন। নামটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দু বছর আগে রামমোহনের 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' প্রকাশিত হলে প্রতিপক্ষ 'বিধায়ক-নিষেধকের সম্বাদ' (১৮১৯) নামে পুস্তিকা লেখেন। সতীদাহের পক্ষে 'বিধায়ক' যুক্তি দেন; গৌরমোহন স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে 'বিধায়ক' রূপে বইখানি লেখেন। ইনি রাম-মোহনের পক্ষে ছিলেন আমাদের এই যে অনুমান, তার আর-একটি প্রমাণ আছে; গোঁড়া হিন্দুরা প্রায়শ গ্রন্থারম্ভে 'শ্রীশ্রীহরিঃশরণম্' অথবা 'শ্রীশ্রীদুর্গা-জয়তি' অথবা 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃশরণম্' ইত্যাদি লেখেন, কিন্তু স্কুল বুক সোসাইটিকে লিখিত এক পত্রে 'শ্রীশ্রীপরমেশ্বরো জয়তি' লেখা ছিল।[১] এই পত্রখানি গৌরমোহনের রচনা; সোসাইটি শিক্ষার প্রসারের জন্য যে কার্য করেছেন সেই কথাটি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে ১৮জন ব্রাহ্মণ ও ১১জন কায়স্থ সহি দিয়েছিলেন।

১ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ৬, পৃ. I-V.

ষোড়শ অধ্যায়

বাংলাভাষায় রামমোহনের দান সম্বন্ধে বর্তমান সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার রামমোহন রায় গ্রন্থে লিখছেন— "বাংলা-গদ্যের স্রষ্টা হিসাবে রামমোহন বহু বার বহু জন কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছেন।" কিন্তু তিনি বলেন "বাংলা-গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবৃন্দের দান অপরিসীম। তাঁহারা সকলেই রামমোহনের পূর্ব্বগামী। বিশেষ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে।"

এ কথা অনস্বীকার্য যে মৃত্যুঞ্জয় সত্যই মহাপণ্ডিত ছিলেন; তাঁর প্রথম বাংলা বই বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) -এর ভাষা কালের দিক থেকে বিচার করলে ভালোই বলতে হবে। কিন্তু সে ভাষায় ও শৈলীতে দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্বকথা আলোচনা করা যায় না, তা রামমোহনও জানতেন, মৃত্যুঞ্জয়ও বুঝতেন। মৃত্যুঞ্জয়ের বেদান্তচন্দ্রিকার ভাষা (১৮১৭) ও রামমোহনের ভাষার পার্থক্য খুব বেশি নয়।

রামমোহন যখন বেদান্ত গ্রন্থ[১] রচনা আরম্ভ করেন (১৮১৪) তখন দার্শনিক তত্ত্বকথা লেখবার মত ভাষার আদর্শ তাঁর সামনে ছিল না, কারণ এর পূর্বে এ শ্রেণীর গ্রন্থ রচিত হয় নি।

এই অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি বুঝলেন যে "বিচারযোগ্য বাক্য বিনা সংস্কৃত শব্দের দ্বারা কেবল স্বদেশীয় ভাষাতে [বাংলায়] বিবরণ করা যায় না আর আমি সাধ্যানুসারে সুলভ করিতে ত্রুটি করি নাই উত্তম ব্যক্তি সকল যেখানে অশুদ্ধ দেখিবেন তাহার পরিশোধ করিবেন আর ভাষানু-

১ বাংলাভাষায় রামমোহনের প্রথম মুদ্রিত বই 'বেদান্ত গ্রন্থ' The/Bengali Translation/of the/Vedant,/or/Resolution/of all the/Veds;/"The most celebrated and revered work/of/Brahmanical Theology,/establishing the unity/of/the Supreme Being./And/that He is the only object of Worship./Together with/a preface,/by the Translator./Calcutta./From the press of Ferris and Co./1815.

রোধে কোন কোন শব্দ লিখা গিয়াছে তাহারো দোষ মার্জ্জনা করিবেন।"
—ভূমিকা।

নিবন্ধাদি রচনায় বাংলাভাষার মান ও আদর্শ তখনও প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় রামমোহন বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকার পর 'অনুষ্ঠান' নামে আর-একটি ভূমিকায় এই ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি—

"প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কথকগুলিন শব্দ আছে এ ভাষা সংস্কতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়।"

এটি লেখেন তৎকালে-প্রচলিত কোম্পানির যে-সব রেগুলেশন বা কানুনের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তাদের ভাষার জড়তা সম্বন্ধে। এই কথা অতি সত্য।

"অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ [অর্থাৎ বাংলায় প্রকাশ] সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ২ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন।"[১]

১৮১৫ সালে যে কয়খানি বাংলা বই চলিত ছিল তার সবগুলি হয় খ্রীষ্টান-ধর্ম সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য জন-ভাষায় লিখিবার প্রয়াস, অথবা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাহেব সিবিলিয়ন ছাত্রদের বাংলা শিখাইবার জন্য রচিত। গভীর বিষয়ে প্রবন্ধ বা নিবন্ধ রচনার কোনো আদর্শ তখন বাংলাভাষায় ছিল না— বেদান্ত গ্রন্থ বাংলাভাষার প্রথম গ্রন্থ, যাতে গভীর বিষয়ের আলোচনা লিখিত হতে দেখি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "তাঁহার [রামমোহনের] শাস্ত্রবিচার ও তৎসংক্রান্ত বিবাদমূলক রচনার সাহায্যে বাংলা-গদ্যের গুরুত্ব যে প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহাতে

---

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯।

আর সন্দেহ নাই। তিনি এক দিকে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহকে ভাষায় প্রকাশ করিয়া যেমন ভাষার ভাব ও শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমনই অন্য দিকে তর্ক ও বিচারমূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া ভাষায় প্রকাশ-ভঙ্গির দৃঢ়তা ও মননশীলতা সঞ্চার করিয়া ইহাকে ঋজু, সতেজ ও পুষ্ট করিয়াছিলেন।"

রামমোহন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও বাংলাভাষা সংস্কৃত-ঘেঁষা করে লেখেন নি, অর্থাৎ সর্বনাম, ক্রিয়াদি ছাড়া সব শব্দই সংস্কৃত শব্দসূচী থেকে সংগ্রহ করে প্রবন্ধাদি রচনা করেন নি। কিন্তু দর্শনাদি বিষয়ের আলোচনা খাঁটি বাংলায় সম্ভব নয়।

"যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক।"

বাংলা রচনাকে কিভাবে বুঝতে হবে সেই পদ্ধতিটি রামমোহন তাঁর প্রথম গ্রন্থের 'অনুষ্ঠান' নামক ভুমিকায় স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন। ইতিপূর্বে কোনো বাঙালী লেখক বাংলা বাক্যের লিখনভঙ্গি বুঝবার ক্রম ও পদ্ধতি সাধারণ লোকের বোধের জন্য প্রকাশ করেন নি। রামমোহন লিখেছেন—

"বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু একবাক্যে কখন২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না।···" এই নির্দেশ দিয়ে রামমোহন একটি বাক্য উদাহরণ-স্বরূপ ব্যবহার করেছেন এবং ঐ বাক্যের প্রত্যেক শব্দের পরস্পরের যোগ কিরূপ হবে বুঝিয়ে বলেছেন। "বস্তুত··· বেদান্তের বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত অনেক বর্ষ উত্তম পণ্ডিতেরা শ্রম করিতেছেন যদি দুই তিন মাস শ্রম করিলে [অর্থাৎ বাংলা ভাষা বুঝিয়া পড়িলে]

এ শাস্ত্রের এক প্রকার অর্থ বোধ হইতে পারে তবে অনেক সুলভ জানিয়া ইহাতে চিত্ত নিবেশ করা উচিত হয়।"[১]

১৮১৫ হইতে ১৮৩০ সালের মধ্যে রামমোহন বাংলায় ও ইংরেজিতে অনেকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা লেখেন ও লেখান এবং নিজব্যয়ে মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন। বাংলাভাষায় লিখিত রচনাগুলি যদি একটু মনঃসংযোগপূর্বক পড়া যায় তবে দেখা যাবে, রামমোহন বাংলাভাষাকে সাবলীল করবার জন্য কী চেষ্টা করেছেন। আমরা এই আলোচনা-গ্রন্থে তাঁর নিজ-লিখিত ভাষা অবিকল উদ্‌ধৃত করেছি— এই বিবর্তন দেখাবার জন্য। এখানে একটা কথার পুনরুক্তি করছি— বিষয়ের গুরুত্বের উপর ভাষার প্রকাশভঙ্গি নির্ভর করে; বেদান্ত গ্রন্থ বা উপনিষদগুলির আলোচনা এবং তথ্যপ্রদানাদি বিতর্কমূলক রচনা আর পাদরির সহিত তিন চীনা খ্রীষ্টানের কথোপকথনের ভাষা কখনই একই ধরনের হতে পারে না এবং হয় নি।

বাংলাভাষার প্রতি উপেক্ষা সকলেরই— ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা এ ভাষা মন দিয়ে শিখতেন না, হিন্দু কলেজের নবীন ছাত্রদলের বাংলাভাষার প্রতি কোনো দরদ ছিল না; কারণ, সত্যই তখন পড়বার মতো কিছু ছিল না বাংলাভাষায়। তারা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বিরাট য়ুরোপীয় সাহিত্যের স্বাদ পাচ্ছে, বাংলা পড়ে কে সময় নষ্ট করতে চায়! আমাদের মনে হয় ১৮২৬ সালে রামমোহন ইংরেজি ভাষায় যে বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন, তা দেশীয়দের কথাই মনে রেখে রচিত। ইতিপূর্বে হ্যালহেড (১৭৮০) ও কেরী (১৮০১) বাংলাভাষার যে ব্যাকরণ লিখেছিলেন তা ইংরেজিতে এবং ইংরেজ শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা; তা ছাড়া, এঁরা সংস্কৃতের উপর বেশি জোর দেওয়াতে বাংলাভাষার বৈশিষ্ট্য বেশ খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়। রামমোহন বাংলাভাষাকে তার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অতঃপর রামমোহন বাংলায় যে ব্যাকরণ লিখলেন তার নাম দেন গৌড়ীয় ব্যাকরণ— ইংরেজি যেটা ইতিপূর্বে লিখেছিলেন তার নাম ছিল Bengali Grammar in the English Language।

বাংলায় যে গৌড়ীয় ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় সে গ্রন্থের ইংরেজি নাম ছিল

---

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯-১০।

Grammar of the Bengali Language। এই বাংলা গ্রন্থ ১৮৩০ সালের পূর্বে লিখিত, কিন্তু এটি ইংরেজির অনুবাদ নয়। এ গ্রন্থটি ১৮৩৩ সালে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি দ্বারা তম্মুদ্রণ যন্ত্রে মুদ্রিত। ভূমিকাটি উদ্‌ধৃত করছি, সেটা পড়লেই এই গ্রন্থ লেখার ইতিহাস জানা যাবে—

"সর্ব্বদেশীয় ভাষাতে এক২ ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ আছে যদ্দ্বারা তত্তদ্ভাষা লিখনে ও শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা পূর্ব্বক কথনে উত্তম শৃঙ্খলামতে পারগ হয়েন, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ না থাকাতে ইহার কথনে ও লিখনে সম্যক্ রূপে রীতিজ্ঞান হয় না, এবং বালকদিগ্যের আপন ভাষা ব্যাকরণ না জানাতে অন্য ভাষা ব্যাকরণ শিক্ষাকালে অত্যন্ত কষ্ট হয়, আর আপন ভাষা ব্যাকরণ যাহার বোধ অল্প পরিশ্রমে সম্ভবে তাহা জানিলে অন্য২ ভাষা ব্যাকরণ জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে। এ কারণ স্কুলবুক্ সোসাইটির অভিপ্রায়ে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় ঐ গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ তদ্ভাষায় করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। পরন্তু তাঁহার ইংলণ্ড গমন সময়ের নৈকট্য হওয়াতে ব্যস্ততা ও সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত কেবল পাণ্ডুলিপি মাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন পুনর্দৃষ্টিরও সাবকাশ হয় নাই, পরে যাত্রাকালীন ইহার শুদ্ধাশুদ্ধ ও বিবেচনার ভার স্কুলবুক সোসাইটির অধ্যক্ষের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন তেঁহ যত্নপূর্ব্বক তাহা সম্পন্ন করিলেন ইতি।" (রামমোহন-গ্রন্থাবলী)

রামমোহনের পুত্র রাধাপ্রসাদ পুস্তকটির ছাপার কাজ তদারক করেন। কলকাতায় ১৮৩৩ সালের এপ্রিল মাসে বই ছাপা হয়। রামমোহনের মৃত্যু হয় সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে—এ বই মুদ্রিত হবার পর তাঁর হাতে সময়মত পৌঁচেছিল কি না জানা যায় না।

সপ্তদশ অধ্যায়

কলকাতায় আসার অব্যবহিত পরেই রামমোহন 'আত্মীয়সভা' স্থাপন করেন। প্রথম দিকে মানিকতলার বাড়িতে, পরে সিমলা পল্লীতে ষষ্ঠীতলায় তাঁর অন্য একটি বাড়িতে ও পরে পুনরায় মানিকতলার বাড়িতে সভা বসত। সন্ধ্যার পর সভাগৃহে সদস্যরা সমবেত হতেন; সেখানে শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদপাঠ করতেন ও গোবিন্দ মাল ব্রহ্মসংগীত গাইতেন। কিন্তু ১৮১৭ থেকে রামমোহনকে উত্ত্যক্ত করবার জন্য তাঁর আত্মীয় ও শরিকরা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমা আরম্ভ করেন। এই পর্বে রামমোহন সর্বদা 'আত্মীয়সভা'র অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারতেন না; সভা কখনো এ বাড়িতে কখনো সে বাড়িতে আহূত হত। এইভাবে কিছুদিন পরে 'আত্মীয়সভা' নষ্ট হয়ে যায়। এই সভার জন্য রামমোহন যে ব্রহ্মসংগীত রচনা করে দেন সেইটি কি তাঁর রচিত প্রথম সংগীত? গানটি—

> কে ভুলালো হায়
> কল্পনাকে সত্য করি জান, একি দায়।
> আপনি গড়হ যাকে,
> যে তোমার বশে তাঁকে
> কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়?
> কখনো ভূষণ দেও, কখনো আহার;
> ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণে করহ সংহার।
> প্রভু বলি মান যারে,
> সম্মুখে নাচাও তারে—
> হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায়?[১]

বহুকাল রামমোহনকে সংগীত সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশে বা সংগীত রচনায় প্রবৃত্ত দেখি না; তবে সংগীত যে ধর্মসাধনার একটা অঙ্গ, এটি মেনে নিতে দেখি 'প্রার্থনাপত্র' নামে এক পুস্তিকায় (১৮২৩)। প্রশ্ন— বেদ বেদান্ত

---

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭। দ্র. মডার্ন রিভিউ, এপ্রিল ১৯৩৫, পৃ. ৪১৫-১৬।

বর্ণিত ব্রহ্মকে যাঁরা জ্ঞানের দ্বারা জানতে পারেন না, তাঁদের ঈশ্বর সম্বন্ধে বোধ কিভাবে হতে পারে? "তাঁহারা ঐ সকল শ্রুতির সাক্ষাৎ অধ্যয়ন না করিয়া তাহার তাৎপর্য্যার্থের দ্বারা পরমেশ্বরেতে তৎপর হইয়া থাকেন" কী করে? রামমোহন ভারতের বিচিত্র ধর্মসাধনার কথা জানতেন; তাই লিখছেন—

"দশনামা সন্ন্যাসিদের মধ্যে অনেকে, এবং গুরু নানকের সম্প্রদায়, ও দাদূপন্থী, ও কবীরপন্থী, এবং সন্তমতাবলম্বি প্রভৃতি,[১] এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন; তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়। ভাষা বাক্যই কেবল তাঁহাদের অনেকের উপদেশের দ্বার এবং ভাষা গানাদি উপাসনার উপর হইয়াছে।"[২]

রামমোহনের মত এই যে গীত-ভজনাদি দ্বারা পরমার্থ-সাধন হয়। যাজ্ঞবল্ক্য বেদগানে অসমর্থদের প্রতি কহিয়াছেন যে—

"ঋক্‌সংজ্ঞক গান ও গাথাসংজ্ঞক গান ও পাণিকা এবং দক্ষবিহিত গান ব্রহ্মবিষয়ক এই চারি প্রকার গান অনুষ্ঠেয় হয়। মোক্ষসাধন যে এই সকল গান ইহার অভ্যাস করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। বীণাবাদনে নিপুণ ও সপ্ত স্বরের বাইশ প্রকার শ্রুতি ও আঠার প্রকার জাতি ইহাতে প্রবীণ এবং তালজ্ঞ ইঁহারা অনায়াসে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।"[৩]

ধর্মদেশনায় সংগীতের স্বপক্ষে রামমোহনের এই উক্তি ছাড়া ১৮২৮ পর্যন্ত আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৮২৮ সালে 'ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত হলে 'ব্রহ্মসংগীত' সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত দেখি। খুব সম্ভবত ১৮২৮ সালে 'ব্রহ্মসংগীত' প্রকাশিত হয়; অবশ্য এই গ্রন্থে কোনো গানের রচয়িতার নাম প্রদত্ত নাই। রামমোহনের নিজ-রচিত সংগীত ৩২টি; অন্যান্য যাঁদের গান এই ব্রহ্মসংগীতভুক্ত হয়েছিল তাঁদের কথায় পরে আসব।

'আত্মীয়সভা'য় যে গোবিন্দ মাল গান গাইতেন তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানা

১ রামমোহন উত্তর-ভারতের এই-সব সম্প্রদায় সম্বন্ধে তথ্য কিভাবে জানতে পারেন— এ প্রশ্নের উদয় হওয়া উচিত। আমাদের মনে হয় ওয়ারেন হেস্টিংস এই-সব সম্প্রদায় সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করান। দ্র. *Rhin, Catalogue of Persian Manuscripts*। এই পুঁথি দেখে উইল্‌সন-সাহেব sects সম্বন্ধে বই লেখেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত 'ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থ সংকলন করেন।

২ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, চতুর্থ খণ্ড।

৩ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থাবলী।

যায় না ; কিন্তু 'ব্রাহ্মসমাজে' যাঁরা গানে নিযুক্ত হন, সেই বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী ও কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্তী সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানতে পারি। এ ছাড়া গোলাম আব্বাস ছিলেন সংগতকার। দুজন শ্রেষ্ঠ কলাবৎ ও একজন নামকরা সংগতকার 'ব্রাহ্মসমাজ'-গৃহে গানের জন্য নিযুক্ত হওয়ার ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উনবিংশ শতকের তিন দশকে কলকাতার ধনীগৃহে ওস্তাদরা আশ্রয় পেতে আরম্ভ করেছেন— মুর্শিদাবাদ, রাজনগর, বিষ্ণুপুর, প্রভৃতির রাজা-জমিদাররা নিষ্প্রভ হয়ে আসাতে সংগীত-কলাবৎগণ নূতন ধনীদের গৃহে আশ্রয়সন্ধানে কলকাতায় আসছেন। কলকাতার ধনীসমাজে সংগীত-কার ও নর্তকীদের যথেষ্ট চাহিদা ও সমাদর ছিল, তা আমরা সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার বর্ণনা থেকে জানতে পারি। রামমোহন তাঁর নিজগৃহে ভোজের সময়ে সে যুগের শ্রেষ্ঠ নর্তকী নিকীকে আনিয়ে অতিথিদের চিত্ত-বিনোদনের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। সুতরাং সংগীত সম্বন্ধে রামমোহনের কোনো রকমের allergy ছিল না তা স্পষ্টই বোঝা যায়। তিনি সংগীতের সমঝদার ছিলেন বলেই বিষ্ণুচন্দ্র ও কৃষ্ণপ্রসাদের ন্যায় গায়কদের ও গোলাম আব্বাসের ন্যায় সংগতকারকে 'ব্রাহ্মসমাজে' সংগীত-পরিচালনার কার্যে নিযুক্ত করেন।

বাঙালির বৈশিষ্ট্য গানে— এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। বহু শতাব্দী থেকে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান কবিরা গান রচনা করে আসছেন। বাংলা গানে ভাবের সঙ্গে সুরের গাঁটছড়া বাঁধা। উচ্চাঙ্গের গান আছে সব দেশেই, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাবের দৈন্য বা অকিঞ্চিৎকরতা সুরের ও বাদ্যাদির অলংকারের কোলাহলে আচ্ছন্ন ; বাংলাদেশে ভারতীয় সংগীতের প্রথম ব্যাখ্যাতা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গীতসূত্রসারে' যা লিখেছিলেন তা সে যুগের গান সম্বন্ধে বর্ণে বর্ণে সত্য : "হিন্দু সংগীতের ··· ওস্তাদগণ প্রায়ই নিরক্ষর ; সুতরাং গানের কথার ভাবার্থের প্রতি তাঁহাদের যথোচিত উপলব্ধি না থাকাতে গীতের কবিত্বের প্রতি তাঁহাদের আস্থা নাই ; এবং সেইজন্য কথার ভাবার্থানুসারে যথাযোগ্য রসের অবতারণা সম্বন্ধে তাঁহাদের অনুষ্ঠানও নাই।" মানুষের আর্টিস্ট-সত্তা সাময়িকভাবে তাল-মান-লয়-যুক্ত সুরের কসরতে আমোদিত হয়। কিন্তু মানুষের গভীর

জীবনের শূন্যতাকে ভরতে পারে না। সেখানে সংগীত থেকে যায় art for art's sake পর্যায়ে— জীবনের সমস্যায় গান তখন আর কোনো সহায়তায় আসে না।

বাঙালির গান তার চিত্তকে বিচিত্র রসে পূর্ণ করে আসছে। বৌদ্ধগান ও দোহা, বৈষ্ণবপদাবলী, দেবী দুর্গার আগমনী ও বিজয়া, কালীকীর্তন, গম্ভীরার গান, আউল-বাউল-সাঁই-দরবেশদের দেহতত্ত্বসংগীত, জারী, মুরশেদী, ভাটিয়ালি প্রভৃতি লোকসংগীত, ইত্যাদি অধিকাংশ গানের মূলে আছে ঈশ্বর-তত্ত্ব— যা প্রকাশ পেয়েছে নানা দেবদেবীর স্তুতি, আরাধনা, প্রার্থনায়— কখনো প্রতীকমূলক 'সন্ধ্যা'-ভাষায় দেহতত্ত্ব ও গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে কবিওয়ালা, হাফ-আখড়া, দাঁড়-আখড়া, তরজা, ঝুমুর, খেমটা, প্রভৃতির চল হয়। এখানে যে-সব গান হত তাদের বিষয়বস্তু অনেক সময়ে রুচির দিক থেকে অত্যন্ত হীন ছিল। আমাদের আলোচ্য পর্বে, অর্থাৎ ১৯ শতকের গোড়ায়, ধ্রুপদাদি উচ্চাঙ্গের সুর বাংলা-গানের মধ্যে চল হয় নি। খেয়াল ও টপ্পা ছিল সুপরিচিত— রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) ও কালী মির্জা ছিলেন নামকরা ওস্তাদ রচয়িতা। এ দুজনের প্রভাব রামমোহনের সংগীতে খুবই স্পষ্ট; কারণ তাঁর ৩২টি গানের মধ্যে ২৮টি খেয়াল-টপ্পা অঙ্গের গান। খেয়াল-টপ্পা শুনলেই মনে হয়, ঐ-সব গানে লঘুচিত্ততা প্রকাশ পায়; কিন্তু রামমোহনের করস্পর্শে যে-সব গান রচিত হল তা নূতন রূপ পেল। তাঁর গানগুলির সুর এল হিন্দুস্থানী অথবা মার্গ সংগীতের ধারা বহন করে; আর গানের বিষয়বস্তু হল বেদান্তের সগুণ ব্রহ্মের কথা। ব্রহ্ম নিরাকার, নিরবয়ব, সর্বব্যাপী— সংসার অনিত্য, অদ্বৈত ভাবে আস্থা ও দ্বৈত ভাবে অনাস্থা, বৈরাগ্য সাধন, পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ, প্রভৃতি ভাব রামমোহনের গানের বিষয়বস্তু। এই গানগুলি আত্মজ্ঞানসাধনের সহায় কঠোর জ্ঞানমার্গ-আশ্রয়ী। রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'নৈবেদ্য' কাব্যের কতকগুলি কবিতা পড়লে মনে হয় যেন ব্রাহ্ম-ধর্মধৃত উপনিষদের বাণী বাংলাছন্দে রূপায়িত হয়েছে; তেমনি রাম-মোহনের গানগুলি বেদান্ত-অদ্বৈতবাদের রূপান্তর মনে হয়।[1]

---

১ এই আলোচনার অনেক তথ্য, এমন-কি ভাষাও, শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়-লিখিত 'রামমোহনের সংগীতজীবন' প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। দ্র. প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও ফাল্গুন ১৩৬৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সংকলিত— ১৬ জ্যৈষ্ঠ - ১ আষাঢ়, ১-১৬ শ্রাবণ, ১৩৭০।

আমরা রামমোহনের সংগীতের কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করছি : এর থেকে তাঁর কাব্যরচনার ভাষার আভাস পাওয়া যাবে—

মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।
সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ তায়, কিরূপে সম্ভবে।
ইচ্ছা মাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে
ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই সত্য এইমাত্র নিতান্ত জানিবে।

পুনশ্চ—

একি ভুল মনঃ! দেখিবারে চাহ যারে না দেখে নয়ন।
আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে, যে ব্যাপিল আকাশেরে,
আকাশের মাঝে তারে আনা এ কেমন।
চন্দ্রসূর্য্য গ্রহ যত, যে চালায় অবিরত,
তারে দোলাইতে কত, করহ যতন।
পশু পক্ষী জলচরে, যে আহার দেয় নরে,
চাহ সেই পরাৎপরে, করাতে ভোজন।

পুনশ্চ—

নিরূপমের উপমা, সীমাহীনে দিতে সীমা,
নাহি হয় সম্ভাবনা।
অচিন্ত্য উপাধিহীনে, অতিক্রান্ত গুণ তিনে,
যত সব অর্ব্বাচীনে করয়ে কল্পনা।
পদার্থ ইন্দ্রিয় পর, বিভু সর্ব্ব অগোচর,
বেদ বিধির অন্তর, মন জান না।
বর্ণেতে বর্ণিতে নারি, বাক্যেতে কহিতে হারি,
শ্রবণ মনন তাঁরি, কর স্থচনা।

প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে বলছেন—

মন এ কি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জ্জন বল কর কার।
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে,
ইহাগচ্ছ বল তাকে,

তুমি কেবা আন কাকে,
একি চমৎকার…
বিবিধ নৈবেদ্য সব,
তারে দিয়া কর স্তব,
এ বিশ্ব যাহার।

অদ্বৈতভাব-প্রণোদিত সংগীত—

দ্বৈতভাব ভাব কি মন না জেন্যে কারণ।
একের সত্তায় হয় যে কিছু সৃজন।

অন্যত্র—

দ্বিভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন দুই নয়।
…
কর অভিমান খর্ব্ব,
ত্যাজ মন দ্বৈত গর্ব্ব,
একাত্মা জানিবে সর্ব্ব,
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময়।

পুনশ্চ—

পরমাত্মায় মন রে হও রত।
বেদ বেদান্ত সর্ব্ব শাস্ত্রসম্মত॥

পুনশ্চ—

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার,
আদি অন্ত নাই যার,
সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে।

বৈরাগ্য ও দেহতত্ত্ব-বিষয়ক কয়েকটি গান—

মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।…
অতএব সাবধান ত্যাজ দম্ভ অভিমান
বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর।

এই শ্রেণীর আরও কয়েকটি গান আছে—

একদিন যদি হবে অবশ্য মরণ।
এত আশা বৃদ্ধি কেন এত দ্বন্দ্ব কি কারণ।
এই যে মার্জ্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ,
ধূলি সার হবে তার মস্তক চরণ।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহ নাশ না হয় বারণ।
অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত,
দয়া কর জীবে লও সত্যের শরণ।

বৈরাগ্য সম্বন্ধে পুনশ্চ—

ত্যজ দম্ভ তমোগুণ, মনেতে বৈরাগ্য আন,
হৃদে সত্য পরাৎপর।

অন্যত্র—

অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান,
পরহিতে মন দিবে, সত্যকে চিন্তিবে।

অন্যত্র—

বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে।

বিদেশ হতে তিনি তাঁর শেষ গান পাঠান ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ সালে—

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা;
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।

রামমোহনের যে-সকল বন্ধু ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন তাঁদের নাম—কৃষ্ণমোহন মজুমদার,[১] নীলমণি ঘোষ, গৌরমোহন সরকার, নীলরত্ন

---

১ কৃষ্ণমোহন মজুমদার ও তাঁর ভ্রাতা ব্রজমোহন মজুমদার উভয়েই বোধ হয় আত্মীয়-সভার সদস্য ছিলেন। ব্রজমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে পুস্তক প্রকাশ করেন (দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৭)। কৃষ্ণমোহনের একটি বিখ্যাত গান—

'তুমি কার, কে তোমার, কারে বল হে আপন।'

এই গানটি রামমোহন-প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত'এ স্থান পায়।

হালদার,[১] কালীনাথ রায় চৌধুরী,[২] নিমাইচরণ মিত্র ও ভৈরবচন্দ্র দত্ত।

রামমোহন ব্রহ্মসংগীতের স্রষ্টা; তার পর তাঁর পথ ধরে বহু কবি ও সাধক ব্রহ্মসংগীত তথা ধর্মসংগীত রচনা করেন। রামমোহনের সমকালীন রচয়িতাদের কথা বলেছি; পরবর্তী যুগে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গুণেন্দ্রনাথ, তাঁর পুত্রদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের ধারায় ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। অবশ্য এই পর্বে সংগীতের রূপ ও সুরের মধ্যে যে পরিবর্তন হয়েছে তার আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। তবে সংক্ষেপে এটুকু বলতে পারি যে, দেবেন্দ্রনাথ বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম যেমন ছাড়েন তেমনি অদ্বৈত মতও বর্জন করেন। এতে যুগপৎ সংগীতের ভাবের পরিবর্তন সাধিত হল আর অদ্বৈত-প্রশংসাও গানের মধ্যে থেকে অন্তর্হিত হল। সেইজন্য ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দিকে মাঘোৎসবাদির জন্য রচিত সংগীত এবং পরবর্তী যুগে রচিত গানের ভাষা ও ভাবের মধ্যে বেশ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের ব্রহ্মসংগীত ও শেষ বয়সের ধর্মসংগীতের মধ্যে গুণগত ভেদ স্পষ্ট; তবে যুগপৎ এ কথাও বলব যে নদীর উৎপত্তি ও পরিণতির মধ্যে অখণ্ড যোগসূত্র আছে বলেই সে প্রবহমান প্রাণদায়িনী নদী। রামমোহনের সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবন পর্যন্ত (১৮১৬-১৯৪০) পর্বে ব্রহ্মসংগীতের রূপের যে বিবর্তন হয়েছে তা ধর্মবিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী স্বাভাবিক পরিণতি।

---

১ 'বঙ্গদূত' সাপ্তাহিকের (১০ মে ১৮২৯) সম্পাদক নীলরত্ন হালদার, 'বেঙ্গল হেরাল্ড' নামক ইংরেজি সাপ্তাহিকের স্বত্বাধিকারীদের অন্যতম ছিলেন। রামমোহনের 'ব্রহ্মসঙ্গীত' গ্রন্থে এঁর গান ছিল— 'অহে পথিক শুন, কোথায় কর গমন' ইত্যাদি (দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৭)।

২ কালীনাথ রায় চৌধুরী টাকির জমিদার; ইনি বহু ব্রহ্মসংগীতের রচয়িতা। সহমরণ রহিত করবার পর বেণ্টিংককে টাউন-হলে যে অভিনন্দন জানানো হয়, তাতে কালীনাথ প্রথমে বাংলাভাষায় লিখিত অভিনন্দনপত্রখানি পাঠ করেন। দ্র. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৭৭।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রামমোহনের বাংলা ও সংস্কৃত বই, পুস্তিকা এবং তৎসংক্রান্ত আলোচনায় এতক্ষণ আমরা ব্যাপৃত ছিলাম। এবার উদ্যত খ্রীষ্টানী শক্তির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটার কথা পাড়া যাক।

তিন শো বছর য়ুরোপীয়রা এসেছে ভারতে ; কিন্তু উনিশ শতকের শুরু থেকে এতদঞ্চলে তাদের ধর্মান্দোলন কার্যকরী হতে থাকে। বাংলাদেশে খ্রীষ্টানদের আবির্ভাবের ইতিহাস সংক্ষেপে বললে আলোচ্য বিষয়টি স্পষ্টতর হবে।

খ্রীষ্টানী ধর্ম প্রচারিত হতে আরম্ভ করে পোর্তুগীজদের আবির্ভাবের পর থেকেই। ধর্মপ্রচারে পোর্তুগীজ ও স্পেনীয়দের উৎকট উৎসাহ ধর্মের ইতিহাসে কলঙ্কময় কাহিনীতে পরিপূর্ণ। বাংলাদেশে পোর্তুগীজদের খ্রীষ্টানী নিদর্শন রয়ে গেছে একমাত্র ব্যাণ্ডেলের ক্যাথলিক চার্চে। এই চার্চ সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। ব্যাণ্ডেলের চার্চ নির্মিত হয় ১৫৫৯ সালে ; তখন দিল্লীর মসনদে আকবর বাদশাহ বাইরম খাঁর অছিত্বাধীন ; আর বাংলাদেশে তখন স্বাধীন পাঠান সুলতানরা বিরাজমান।

সাত সমুদ্র পার হয়ে পোর্তুগীজরা বাংলাদেশে হাজির হয়েছে। একঘর খ্রীষ্টান নেই কোথাও ; খ্রীষ্টানীর নামও তখন এ দেশে অশ্রুত। পশ্চিমবঙ্গের বন্দর সপ্তগ্রাম, পূর্ববঙ্গের বন্দর চট্টগ্রাম। নদীমাতৃক পূর্ববাংলায় সহস্র ধারায় প্রবাহিত নদীপথ দিয়ে বহুদূর চলে যায় পোর্তুগীজরা : ব্যাবসা-বাণিজ্য করে দেশী লোকদের সঙ্গে, খ্রীষ্টানী প্রচার করে, সুবিধে পেলে জবরদস্তি করতেও কসুর করে না। ক্যাথলিকরাই পৃথিবীর সর্বত্র ধর্মপ্রচারে অগ্রণী হয়— গোয়া থেকে জাপান পর্যন্ত। ব্যাবসার সঙ্গে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের এমন অদ্ভুত সমন্বয় বড়ো দেখা যায় না। সমুদ্রের উপকূলে বন্দরে বন্দরে তাদের বাণিজ্যের কুঠি এবং সর্বত্রই চার্চ ও খ্রীষ্ট-জীবনের বহু চিহ্ন রয়ে গেছে ; এখনও চীনের ম্যাকাও পোর্তুগীজদের দখলে আছে।

পোর্তুগীজরা ভারতে আসে ১৪৯৭ সালে, দক্ষিণ-ভারতে কোচিনে আশ্রয় পায় তারা। বছর-চৌদ্দর মধ্যে তারা গোয়া দখল করে রাজ্য গড়ে তোলে (১৫১০)। তখন দক্ষিণ-ভারতে বাহমনি ও বিজয়নগরের প্রতাপ। ১৫১৭ সালে বাণিজ্য উপলক্ষে তারা দক্ষিণ-ভারত থেকে বাংলাদেশে আসে। স্বভাব-নির্বোধ ভারতীয় রাজাদের গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়ে স্বভাব-ধূর্ত পোর্তুগীজরা বাংলাদেশে অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়। বহু বৎসর পরে আকবরের সময়ে (১৫৮০) হুগলিতে তারা কুঠি স্থাপন করে। কালে এদের অত্যাচারে ও জলদস্যুবৃত্তির জন্য ভারতীয়দের বহির্বাণিজ্য লুপ্ত হয় এবং সপ্তগ্রাম ধ্বংস হয়। সম্রাট শাহ্‌জাহান এই দুর্বৃত্তদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়িত করেন ১৬৩৯ সালে। পোর্তুগীজদের স্বর্ণময় যুগে ১৫৫৯ সালে ব্যাণ্ডেলের চার্চের পত্তন হয় কিন্তু ১৬৩১ সালে মুঘলদের দ্বারা স্থানীয় হিন্দু-মন্দিরের সঙ্গে ব্যাণ্ডেল চার্চও ধ্বংস হয়: অবশ্য পরে এই চার্চটি পুনর্নির্মিত হয়।

পোর্তুগীজদের রাজ্য ও বাণিজ্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হয়। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই পোর্তুগীজ পাদরিরা বাংলা শিখে পোর্তুগীজ ভাষা থেকে বাংলাভাষায় রোমান ক্যাথলিক ধর্ম-সংক্রান্ত বইয়ের অনুবাদ করতে লাগলেন। এই বোধ হয় বাংলাভাষায় বিদেশীদের গ্রন্থ লেখার আদি প্রয়াস; সে-সব বই এখন অবশ্য দুষ্প্রাপ্য। কতকগুলি বই সম্বন্ধে আলোচনা অন্যত্র হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে যেমন হুগলি-ব্যাণ্ডেল পোর্তুগীজদের বাণিজ্যের ও ধর্ম-প্রচারের কেন্দ্র হয়, পূর্ববঙ্গে তেমনি ঢাকা-ভাওয়ালে তাদের ধর্মকর্মের বড়োরকম আস্তানা গড়ে ওঠে। সেখানে ও তার আশেপাশে বহু পোর্তুগীজ ও দেশীয় খ্রীষ্টান ও দো-আঁশলা ফিরিঙ্গীর বাসভূমি হয়। ভাওয়াল পরগনার নাগরী গ্রামে পোর্তুগীজ পাদরিদের কেন্দ্রে দোম্‌ আন্তোনিও (Dom Antonio) নামে এক বাঙালি খ্রীষ্টান ছিলেন। ইনি খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' নামে একখানি বই লিখেছিলেন। কিন্তু তখন এদেশে বাংলা বই ছাপবার ব্যবস্থা ছিল না; আর তখনও পর্যন্ত বাংলা লিপির হরপও তৈরি হয় নি। তাই রোমান অক্ষরে লিপ্যন্তর (transliterate) করে ছাপবার জন্যে বইখানির পাণ্ডুলিপি লিসবন

মহানগরীতে পাঠানো হয় ১৭২৬ সালে; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অবস্থায় পড়ে ছিল দুই শো বছরের বেশি। ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুরেন্দ্রনাথ সেন-কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।[১]

দোম আন্তোনিও ভূষণার রাজকুমার ছিলেন; ১৬৬৩ সালে মগরা তাঁকে বন্দী করে আরাকানে নিয়ে যায়। পরে জনৈক পোর্তুগীজ পাদরি টাকা দিয়ে তাঁকে কিনে নেন ও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে ধর্ম-প্রচারের কাজে নিযুক্ত করেন। ইনি প্রথম বাঙালি যিনি খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে বই লিখেছিলেন। এঁর দৃষ্টান্তে ও অনুপ্রেরণায় পাদরি মানোএল্-দা-আসুসুম্পসাম্ দুখানি বই লেখেন—'বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দ-সংগ্রহ' ও 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। ভাওয়ালের নাগরী মিশনে বসেই পাদরি মানোএল্ 'কৃপার শাস্ত্র' লিখে লিসবনে ছাপবার জন্যে পাঠিয়ে দেন (১৭৪৩)।[২]

মোট কথা, পূর্ববঙ্গের সমুদ্রতীরে ও আন্তর নদীর ধারে, গ্রামের মধ্যে পোর্তুগীজরা অনেক বাঙালি ও মগকে খ্রীষ্টান করেছিল বলে মনে হয়। ঢাকায় পোর্তুগীজ নামধারী যে-সব ক্যাথলিক খ্রীষ্টান আছে তারা সংকর-বর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের কার্যকলাপ তেমন ব্যাপক হয়েছিল বলে মনে হয় না, ব্যাণ্ডেলের চার্চ তাদের ধর্মপ্রতাপের একমাত্র নিদর্শন। পোর্তুগীজদের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য কিছুকাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। য়ুরোপ থেকে ক্যাথলিক-ধর্মদ্বেষী প্রোটেস্টান্টরা ভারত-মহাসাগরে এসে পড়াতে এবং যুগপৎ বাংলার সুবাদার ও মুঘল বাদশাহদের সঙ্গে বিবাদ বাধবার ফলে পোর্তুগীজদের বাংলাদেশ থেকে নড়তে হয়।

১৬০০ সাল থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছিল সম্পূর্ণ-ভাবে ব্যবসায়ে লিপ্ত। এতবড়ো রাজ্য তাদের আয়ত্তাধীন হবে, এ কথা তারা স্বপ্নেও ভাবে নি। 'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়', তা না

১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৭। ভূমিকাতে বহু তথ্য আছে।

২ এই পুস্তক সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায়, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় -লিখিত প্রবেশক ও টীকা-সহ, রঞ্জন পাবলিশিং হাউজ (কলিকাতা)-কর্তৃক ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার অন্তর্গত (১২) হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

হলে প্রায় বিনারক্তপাতে এতবড়ো দেশটা বণিকের পায়ের তলায় এসে যাবে কেন? যাই হোক, এই পর্বের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কথা কোম্পানির লোকের মনে উদিত হয় নি। ১৬৯০ সালে কলকাতায় জব চার্নকের আসার পর বিলাতে কোম্পানির কর্তাদের মধ্যে খ্রীষ্টানী সম্বন্ধে মনোভাবের একটু পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল সাময়িকভাবে। বিলাত থেকে যে-সব সাহেব এদেশে কোম্পানির কর্মী রূপে বা ব্যবসায়ের সহায়ক রূপে আসতেন, তাঁদের ধর্মকর্ম নিষ্পন্ন করবার জন্য কলকাতা ও অন্যান্য কুঠি-নগরে ব্রিটিশ চ্যাপলেন রাখতে হত কোম্পানির খরচে। এক সময়ে প্রত্যেক জাহাজের সঙ্গেও চ্যাপলেন থাকার নিয়ম করেন কোম্পানির ডিরেক্টররা। যুদ্ধে মানুষ মারতে যাবে, তার আগে একবার ভগবানকে ডেকে নিতে হবে— হত্যাকাণ্ডে তিনি সহায় হউন!

কলকাতায় ফ্যাক্টরির দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হবার দু বছর পরে কোম্পানিকে যখন রাজ-দরবার থেকে চার্টার নিতে হল তখন তাতে লেখা হয়— "The Chaplains in the factories are to study the vernacular language, the better to enable them to instruct the Gentoos [Hindoos] that shall be the servants or slaves of the same company, or of their agents, in the Protestant religion." অর্থাৎ, চ্যাপলেনদের দেশীয় ভাষা শিখতে হবে, যাতে করে তারা সহজভাবে হিন্দুভৃত্য ও ক্রীতদাসদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাদের প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টধর্ম-মত বোঝাতে পারে। কিন্তু Richter তাঁর *History of Missions in India* গ্রন্থে (p. 129) বলেছেন : "But in the general scramble for riches the clause had remained a dead letter।" অনেক সময়ে 'চ্যাপলেন' হয়ে এদেশে এসে নিজেই ব্যবসায়ে ঢুকে পড়ত; ধর্মকর্মের জন্য লোক পাওয়া ছিল দায়।

সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা-আক্রমণের পর 'অন্ধকূপে' যে-সব লোক মরে তাদের মধ্যে দুজন চ্যাপলেন ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর যখন ইংরেজরা ভালো করে গেড়ে বসল তখন শহরে পাদরি পাওয়া যায় নি ধর্মকর্ম করবার জন্য। দক্ষিণ-ভারত থেকে Rev. John Kiernander নামে এক পাদরিকে আনা হল— ইনি সুইড্-জাতীয় বলা যেতে

পারে ; ইনিই বাংলাদেশে প্রথম মিশনারী। অত্যন্ত সাধারণ মানুষ ; ধর্ম থেকে বাইরের কর্মে মন ছিল বেশি। কলকাতায় এসে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে স্ত্রীভাগ্যে ধনের অধিকারী হন। নিজে বিলাস-ব্যসন করেও তিনি একটা সৎ কাজ করেন, কলকাতায় Beth-Tephillah নামে একটা চার্চ নির্মাণ করে দেন ; বর্তমানে এই চার্চের নাম Old Mission Church।

প্রসঙ্গত বলি, এই কিরনেনডারকে হিকি তাঁর *Bengal Gazette* পত্রিকায় একটি ব্যঙ্গকৌতুকের (Lampoon, Pasquinade) অন্যতম পাত্র রূপে খাড়া করেন। হেস্টিংস Sir F. Wronghead, Don Quixote প্রভৃতি আখ্যাপ্রাপ্ত হন। কিরনেনডার এই ব্যঙ্গের জন্য হিকির নামে মামলা করেন।[১]

কোম্পানির আদিযুগের ইংরেজ ব্যবসায়ী, শাসক-কর্মচারী, চ্যাপলেন প্রভৃতির নৈতিক জীবন বাঙালিদের অপেক্ষা যে খুব মহৎ ছিল তা নয়। অধিকাংশ ইংরেজের স্থানীয় রক্ষিতা থাকত ; ইংরেজ মহলে মহিলাদের নামেও কুৎসার অন্ত ছিল না। সাধারণ ইংরেজের ধর্মের জন্য কোনো উৎকণ্ঠা ছিল না। চ্যাপলেন, যাঁরা কোম্পানির কাছ থেকে বেতন পেতেন ধর্মকর্ম করবার জন্য, তাঁরা অর্থের ধান্ধায় ঘুরতেন গ্রামে গ্রামে, বন্দরে বন্দরে। হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিসের সময়ে Blanshard নামে এক চ্যাপলেন পঁচিশ বছর এদেশে বাস করে ৫০ হাজার পাউণ্ডের সম্পত্তির মালিক হন। চ্যাপলেন জন্সন তেরো বছর কাজ করে ৩৫ হাজার পাউণ্ড রোজগার করে দেশে ফেরেন। চ্যাপলেন ওয়েন দশ বছরে ২৫ হাজার পাউণ্ড উপার্জন করে ঘরে যান। নিশ্চয়ই বাংলাদেশে খ্রীষ্টানদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের যজমানি কাজ থেকে এই পরিমাণ ধনাগম হয় নি। আসল কথা, সকলেই ব্যক্তিগতভাবে ব্যাবসা করতেন। সুতরাং খ্রীষ্টান বলে য়ুরোপীয়দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কাউকে আকর্ষণ করত না। যে কটা চার্চ ছিল তাতে খ্রীষ্টমাস ও ঈস্টার ছাড়া বড়ো কেউ উপস্থিত হতেন না। নাচগান, থিয়েটর, মুখোশ বা ফ্যান্সি ড্রেস, প্রভৃতি চিত্তবিনোদন ছিল

[১] Busteed, *Echoes from Old Calcutta*, pp. 203-04.

সপ্তাহান্তে ক্লান্তি-অপনোদনের মাধ্যম। আর ধনী হিন্দুদের বাড়িতে দুর্গাপূজা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি সামাজিক ক্রিয়াকর্মের উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে প্রচুর পানাহার করে তৃপ্ত হতেন।

এদেশে খ্রীষ্টান পাদরিদের প্রবেশাধিকার দেওয়া সম্বন্ধে কোম্পানির পরিচালকদের খুবই আপত্তি; কেন আপত্তি তা আমরা পূর্বেই বলেছি। তাঁদের ভয়, পাছে বিদেশী খ্রীষ্টানরা হিন্দু-মুসলমানের ধর্মে হস্তক্ষেপ করেন, পাছে খ্রীষ্টের উদার ধর্মনীতি ভেদাভেদবোধকে নিন্দিত করে। খ্রীষ্টান পাদরিরা এসেই সাম্য-মৈত্রীর বাণী শোনাবে, ওয়েলেসলি এই ধরনের মত পোষণ করতেন। তিনি যে খুব ধর্মপ্রাণ ছিলেন তা নয়; তবে তিনি ধর্মকে মনে করতেন "safeguard of social order"।[১] সেইজন্যে খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে যাতে স্থানীয় ইংরেজরা সচেতন হন, তজ্জন্য তিনি অনেক আইন প্রণয়ন করেন; যেমন— রবিবারে স্যাবাথ রক্ষা করতে হবে, সেদিন ঘোড়দৌড় বা জুয়াখেলা চলবে না, খবরের কাগজ বের হবে না, ইত্যাদি। প্রসঙ্গত বলি, আমরা এখন যে রবিবারে খবরের কাগজ পাই, তার ইতিহাস খুব আধুনিক। ওয়েলেসলি মনে করতেন, "Christian religion was the religion of the state।"[২] কিন্তু খুব বেশি কিছু করার জন্য অগ্রসর হতে পারেন নি।

ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে কোম্পানির লোকেদের এতই ভয় যে দেশীয় কোনো কর্মচারী খ্রীষ্টান হলে তার চাকরি খতম করা হত। ১৮১৯ সালে মিরাটে প্রভু দীন নামে এক পদস্থ সৈনিক (Corporal) খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। লোকতুষ্টির জন্য কালীঘাটে পূজা দেওয়া হত। পাদরি ওয়ার্ড তাঁর জর্নালে লিখেছেন—

"Last week, a deputation from the Government went in procession to Kaleeghat, and made a thank-offering to the goddess of the Hindoos, in the name of the company for the

১ "The religion of the Bible appeared to be entirely foreign to their minds, and they were distinguished from the heathen around them chiefly by their total disregard of all religious observances."— Marshman, *History of the Serampore Mission*, Vol. I, p. 125.

২ *Ibid.*, p. 126.

success which the English have lately obtained in the country. Five thousand rupees were offered. Several thousand natives witnessed the English presenting their offerings to this idol. We have been much grieved at this act, in which the natives exult over us."[১]

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে কোম্পানির বিলাতের পরিচালকবর্গ ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের বিরোধী ছিলেন; কিন্তু কোম্পানি ও ব্রিটিশ জনমত সমার্থক নয়। কোম্পানির মুষ্টিমেয় অংশীদারদের মুঠোর মধ্যে সীমিত ছিল এই ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান; কোম্পানির একমাত্র উদ্দেশ্য যেন-তেন-প্রকারেণ মুনফা কামানো। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বহু চার্চ বা সম্প্রদায় ধর্মপ্রচারের জন্য উৎসুক হয়ে ওঠেন। শিল্প-বিপ্লবের অভিঘাতে ব্রিটেনে একদল লোক চরম দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে; অপর পক্ষে মুষ্টিমেয় শিল্পপতি অশেষ ধনের অধিকারী হন। এই ধনবৈষম্য একদল হৃদয়বান মানুষকে চিন্তাকুল করে তোলে। দুঃখত্রাণের উপায় আবিষ্কার করতে না পেরে তাঁরা 'দরিদ্রেরাই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী' বলে হতভাগ্য জনতাকে সান্ত্বনা দিতে প্রবৃত্ত হলেন— খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও ব্যাখ্যা হল তার শ্রেষ্ঠ পথ। এই সময়ে কেম্‌ব্রিজের একদল যুবক খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। মানবপ্রেমিক উইলবারফোর্স, যিনি ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন করেছিলেন, তিনি পার্লামেণ্টের সদস্যরূপে ১৭৯৩ সালে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন যে ভারতে খ্রীষ্টান-পাদরিদের অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া হোক।

"He [Wilberforce] aimed at converting the inhabitants of British India to Christianity and at persuading the Governors-General to regulate their external policy by moral maxims, according to the spirit of the Act of 1784."[২]

ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে উইলবারফোর্স প্রমুখের প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশে ছিল শিক্ষার প্রসার, তাও নাকচ হয়। ওয়ারেন

১ Marshman, *History of the Serampore Mission*, Vol. I, p. 157.
২ Philips, *The East India Company*, 1784-1834 (Oxford), p. 131.

হেস্টিংস, হ্যালহেড, প্রমুখ ভারত-ফেরতা সদস্যরা আপত্তি জানালেন—পাদরিদের প্রবেশ করতে দিলেই কোম্পানির সর্বনাশ! আর আরও সর্বনাশ হবে ভারতীয়দের লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করলে!

কিন্তু য়ুরোপ তথা গ্রেটব্রিটেনে কালবদলের হাওয়া এসে গিয়েছে। লোকে বাণিজ্য-বিষয়ে মুক্তদ্বার নীতি চায়, ধর্মপ্রচার-বিষয়ে স্বাধীনতা দাবি করে। ইংলণ্ডে ব্যাপটিস্ট, মেথডিস্ট, অ্যাংলিক্যান, স্কটল্যাণ্ডে প্রেস্‌বিটার, প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হল বিদেশে খ্রীষ্টবাণী প্রচারের জন্য। ব্যাপটিস্টদের কথা পরে বিস্তারিত করে বলতে হবে, কারণ প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টানদের মধ্যে ধর্ম ও সাহিত্য প্রচারে তারাই ছিল অগ্রণী।

আমরা অন্যত্র বলেছি যে, কোম্পানির রাজ্য-মধ্যে খ্রীষ্টানপাদরিরা বাস করবার অনুমতি পেতেন না। তাই কেরী প্রমুখ ব্যাপটিস্টরা ১৭৯৩ সালে দিনেমারদের শহর শ্রীরামপুরে, আর লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি ১৭৯৮ সালে ওলন্দাজদের শহর চুঁচুড়ায় মিশন স্থাপনের সুযোগ গ্রহণ করেন। বিলাতে ১৭৯৯ সালে Church Missionary Society (CMS) এবং ১৮০৪ সালে British and Foreign Bible Society স্থাপিত হয়; এদের সবারই উদ্দেশ্য বিদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করা। ক্লডিয়াস বুকানন নামে এক অতি উৎসাহী ধার্মিক চ্যাপলেন এক পুস্তিকায় লিখলেন (১৮০৫):
"A wise policy seems to demand that we should use every means of coercing this contemptuous spirit of our native subjects!"[১]

ভাগ্যে এঁর পরামর্শ গৃহীত হয় নি। মাদ্রাজে ভারতীয় সৈন্যদের ধর্মীয় চিহ্ন চুল, দাড়ি, শিখা, তিলকাদি প্রতীক দূরীকরণের প্রস্তাব হওয়ায় সেখানে মিউটিনি (Vellore Mutiny) দেখা দেয়। কোম্পানি বুঝলেন, ধর্মের স্থানে হাত দেওয়া চলবে না— টাকার জন্য প্রাণ বিকোতে পারে, মান বিসর্জন দিতে পারে না— সংস্কার!

১৮১৩ সালের সনন্দ গ্রহণের সময়ে কোম্পানির অনেক পুরোনো সুযোগ-সুবিধা পার্লামেণ্ট হরণ করে নিল— বাণিজ্যের একচেটিয়াত্ব গেল— খ্রীষ্টান

১ Philips, *The East India Company*, p. 159.

পাদরিদের প্রবেশ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হল। উইলবারফোর্স তখনও জীবিত আছেন—তিনি ও অন্যান্য সাধু খ্রীষ্টানরা কেবল "Open door for all missionaries" চাইলেন না, তাঁরা আরও দাবি জানালেন "to obtain at the same time the establishment of the Anglican Church in India,"[১] অর্থাৎ ইংলণ্ডের সরকারি চার্চের পাদরিরা ভারতে যাবে ধর্মপ্রচার করতে।

১৮১৩ সালের চার্টারের ১২-সংখ্যক প্রস্তাবে স্পষ্ট বলা হল : "...that the East shall be placed under the superintendence of a Bishop and three Archdeacons and that adequate provision should be made from the territorial revenues of India for the maintenance...."[২] অর্থাৎ অ্যাংলিক্যান চার্চের পাদরি পোষণের ব্যয়টা ভারতীয় রাজস্ব থেকে প্রদত্ত হবার ব্যবস্থা হল। প্রথম বিশপ মিডল্‌টন এলেন ১৮১৪ সালে।[৩]

আমরা পূর্বে বলেছি, ১৭৯৯ সালে লন্‌ডনে চার্চ মিশনারী সোসাইটি স্থাপিত হয় এবং কলকাতায় ১৮০৭ সালে তার একটা ছোটো শাখা গড়ে ওঠে। এই মিশনের খরচ আসত বিলেত থেকে। ধর্মপ্রচারের জন্য টাকার অভাব এখন হচ্ছে না; কিন্তু দুঃখের বিষয়, মিশনের কাজ করবার মতো লোকের অভাব ঘুচে না। পাদরির কাজে বেশি টাকা নেই, তাই সিবিল সার্বিসের আকর্ষণই যুবকদের কাছে বেশি। যাই হোক, ১৮১৬ সালের মধ্যে মিশনারীরা এসে বিদ্যালয় স্থাপনে মন দিলেন; ১৮১৮ সালে প্রায় ১৮০০ ছাত্র তাঁদের স্কুলে দেখা যায়। আজও কলকাতায় CMS কলেজ ও বোর্ডিং সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। বহু বছর পূর্বে (১৮০০ সালে) শ্রীরামপুরে মিস্টার ও মিসেস মার্শম্যানের চেষ্টায় একটা বোর্ডিং-স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে সাহেবদের ছেলেরাই কেবল

---

১ Richter, *History of Missions in India*, p. 155 and 273.

২ *Ibid.*, p. 273.

৩ Bengal Civil Offices, 1826-27.
কলিকাতার লর্ড বিশপ-এর বার্ষিক বেতন ৫০,৩০৩ টাকা। আর্চডিকন ও ৩১ জন চ্যাপলেনের জন্য মোট বার্ষিক ৩,০০,২২২ টাকা। দ্র. Rammohun Roy, *English Works* : "Additional queries respecting the condition of India."

পড়ত। সেই বোর্ডিং-এর আয় থেকে মিশনের সহায়তা হত।

পাদরিদের সাহায্য -নিরপেক্ষ কোম্পানির লোকদের বেসরকারি সহ-যোগিতায় বাঙালিরা ইংরেজি-বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, আবার য়ুরোপীয় ব্যক্তি ব্যাবসার সুবিধার জন্য ইংরেজি শেখবার বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। শিক্ষার সে ইতিহাস বহুস্থানে আলোচিত হয়েছে বলে পুনরুক্তি করলাম না।

আমরা আগে বলেছি, কেরী এবং তাঁরও আগে একজন কুঠিয়াল গ্রামের লোকেদের শিক্ষার জন্য পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন মালদহ জেলায়। শ্রীরামপুরের চার মাইল দূরে নবাবগঞ্জ গ্রামে মার্শম্যান প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৮১৬ সালে। এখানে Lancaster method of teaching[১] অনুসৃত হয়। এ ছাড়া গুরুট্রেনিং বিদ্যালয় শ্রীরামপুরে খোলা হল, গ্রাম থেকে শিক্ষকরা এখানে আসতেন শিক্ষাপদ্ধতি আয়ত্ত করবার জন্য।[২]

শিক্ষাপ্রচারে খ্রীষ্টান-পাদরিরা পথিকৃৎ হলেন কেন তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শ্রীরামপুরের পাদরিরা 'বাইবেল'-প্রচারকল্পে কী উৎসাহী ছিলেন সে কথা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। ১৮১৩ সালের পর যখন নানা প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের পাদরি এদেশে এলেন, তখন তাঁরা এই কথাটি স্পষ্ট করে বুঝেছিলেন যে শিক্ষাবিস্তার না করতে পারলে ধর্মপ্রচার ব্যর্থ হবে—"Both Methodists and Evangelicals concentrated on securing a minimum standard of education, as a prerequisite for conversion, at least sufficient for a person to read and understand the Bible.।"[৩] কমপক্ষে বাইবেল নিজভাষায় পড়বার

১ See *Chambers' Encyclopedia* : Bell, Andrew.

২ প্রসঙ্গত বলি, শিক্ষাবিধিতে এই Lancaster পদ্ধতির উৎপত্তি কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে। অ্যানড্রু বেল (১৭৫৩-১৮৩২) যখন দক্ষিণ-ভারতে অর্ফানেজ বা অনাথ-আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তখন Monitorial system প্রবর্তন করেন; এই পদ্ধতি তিনি ভারতীয় পাঠশালার দেখেছিলেন— বড়ো পড়ুয়ারা ছোটোদের পড়াতে সাহায্য করছে। ১৭৯৭ সালে বেল বিলাতে ফিরে গিয়ে একটা পুস্তিকা লেখেন। ১৮০৩ সালে জোসেফ ল্যাংকাস্টার নামে এক কোয়েকার এই পদ্ধতি সমর্থন করে বই লেখেন। তখন থেকে এই পদ্ধতি Lancaster method নামে পরিচিত হয়। কিন্তু আসলে বেল এই পদ্ধতির উদ্ভাবক ও ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি আছে এর পটভূমে।

৩ Eric Stokes, *The English Utilitarians and India*, p. 30.

মতো বিদ্যাও তাদের দিতে হবে—এই হল পাদরিদের শিক্ষাপ্রচারের প্রথম উদ্দেশ্য।

নতুন যুগের মনীষীরা মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এবং ব্যক্তিগত সদসৎ-বিচারবুদ্ধির বা বিবেকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ ডেমোক্র্যাসির মূল কথা। এই সময়ের এক শ্রেণীর মনীষীর বিশ্বাস, মানুষের চরিত্রের আকস্মিক ও সার্বিক বিবর্তন হতে পারে, যদি তার মনের উপর আক্রমণ চালাতে পারা যায়; সেই বিপ্লব সম্ভব হয় শিক্ষাবিধির মাধ্যমে। এই মতবাদ থেকে পাদরিরা শিক্ষাকর্মে ব্রতী হন এবং সেই পথেই তাঁদের সাফল্য হয়েছিল।

চার্লস গ্রাণ্ট কোম্পানির এক বড়ো কর্মী, নামী ও মানী লোক;[১] ভারতে দীর্ঘকাল ছিলেন। এদেশ ত্যাগ করবার পর ১৭৯২ সালে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন ও ১৭৯৭ সালে তা ছাপিয়ে বিতরণ করেন। তার পর সনন্দ গ্রহণের সময়ে ১৮১৩ সালে প্রবন্ধের উগ্র মত ও তীব্র ভাষা একটু মার্জিত করে পার্লামেণ্ট থেকে সেটা পুস্তিকাকারে ছাপানো হয়। সেই পুস্তিকা সে-যুগের ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে উৎসুক খ্রীষ্টানদের মনের কথা। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ১৭৯৩ সালে কেরী এসে গেছেন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে; বিশ বছর কেরী ও তাঁর সহকর্মীরা কাজ করছেন ব্রিটিশ এলাকার বাইরে।

বিলাতে গ্রাণ্ট, উইলবারফোর্স, প্রমুখ মনীষীদের সম্ভদের ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করতে দেখি, তা আজ কোনো য়ুরোপীয় খ্রীষ্টান বলতে বা লিখতে সংকোচ বোধ করবেন, কারণ তাঁদের বাস্তববোধ ও ভারতীয়

১ চার্লস গ্রাণ্ট (১৭৪৬-১৮২৩) স্কটল্যাণ্ডে জন্মলাভ করেন। অল্পবয়সে ভারতে আসেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে বোর্ড অব ট্রেডের সম্পাদকতা করেন (১৭৭২)। ১৭৮১ সালে তাঁকে মালদহের 'কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট' করা হয়। কর্নওয়ালিস বড়োলাট হয়ে এলে গ্রাণ্ট তাঁকে নানা ভাবে সাহায্য করেন। ১৮০২ সালে পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হন; ১৮০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বাইবেল সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেণ্ট; ইনি ওয়েলেসলির কার্যাবলীর ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং তাঁর ইম্‌পিচমেণ্টের দাবি করেন। ১৮১৩ সালের চার্টারে ভারতের শিক্ষার জন্য যে এক লক্ষ টাকা ধার্য হয়, তা এঁরই চেষ্টায় সম্ভব হয়। কলকাতায় ও নানা স্থানে খ্রীষ্টীয় চার্চ স্থাপনে উৎসাহী ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিদ্বন্দ্বী কলেজ Haileyburyতে স্থাপনের পরিকল্পনা এঁরই।

ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান গভীর ও ব্যাপক হয়েছে, আক্রমণের পদ্ধতিও বদলেছে।[১]

আমরা আগেই বলেছি, এই-সব অতি-উৎসাহী ধার্মিকদের সে যুগের লোকে বলত Saint Politicians ; একজন তো একটা বই লিখে ফেলেন *Saints in Politics* নাম দিয়ে। এঁরা পৃথিবীতে heathen-দের উদ্ধারের জন্য অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠেন। গ্রাণ্ট প্রমুখ ব্যক্তিরা বলতেন যে হিন্দুর মনের মুক্তির জন্য সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে শিক্ষা-প্রচার। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পূর্বে কুসংস্কার ও ভ্রমপূর্ণ বিশ্বাস দূর করতে হবে। শিক্ষাই "silently undermine··· the fabric of error, and by restoring to the inhabitants of India the use of their reason would in itself work a great moral revolution."[২] বুদ্ধির জড়তা থেকে মুক্তি চাই সর্বাগ্রে, বিলাতে উইলবারফোর্স (1759-1833) ছিলেন এই মতের গোঁড়া সমর্থক। ১৭৮৮ সাল থেকে তিনি দাসপ্রথা রদের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখন থকে তাঁর খ্যাতিনিন্দা সর্বদেশে ছড়িয়ে পড়ে। উইলবারফোর্স মানবদরদী, অতি নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান ; তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস, খ্রীষ্টধর্মকথা ভারতে প্রচারিত হবার বিশেষ প্রয়োজন··· "never was there a country where there is a greater need than in India for the diffusion of its [Christianity] genial influence." এই কথাটি তিনি বলেন যখন পার্লামেণ্টে নূতন করে সনন্দ দেওয়া নিয়ে আলোচনা চলছিল (২২ জুন ১৮১৩)।[৩]

ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তার হলে ব্রিটিশদের আরও যে-সব সুবিধা হতে পারে তার দিকেও গ্রাণ্ট প্রমুখদের যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। গ্রাণ্ট স্পষ্টই লিখেছেন যে, ধর্মপ্রচার হলে লোকের মনের মুক্তি তো হবেই, তা ছাড়া ব্রিটিশরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এসেছেন সেই বাণিজ্যেরও প্রসার হবে, অর্থাৎ বিদেশের মাল ভারতের বাজারে কাটবে। শিক্ষার গুণে রুচি বদলাবে, তখন তারা বিদেশী সামগ্রীর জন্য লালায়িত হবে— "We shall also serve

১ Charles Grant, Observations on the State of Society among the Asiatic Subjects of Great Britain, particularly with respect to Morals and on the Means of Improving it (Privately printed), 1797.

২ Eric Stokes, *The English Utilitarians and India*, p. 132.

৩ Quoted by Eric Stokes, p. 33.

the original design with which we visited India, that design—still so important to this country— the extension of our commerce."[১]

Eric Stokes লিখেছেন— "Hitherto British manufacturers had found only a limited market in India because of the poverty of the people and their unformed taste. Education and Christianity would now remove these obstacles. In this way, the noblest species of conquest, the spread of true religion and knowledge, would not forfeit its earthly reward ; for wherever *our principle and our language are introduced our commerce will follow.*" (p. 35). যেখানে য়ুরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসারলাভ করবে সেখানেই তাঁদের ব্যাবসা-বাণিজ্য পিছু পিছু যাবে, কথাটা যে কত সত্য তা ভারতীয় খ্রীষ্টানদের জীবন ও শিক্ষিত হিন্দুর রুচি দেখলেই বোঝা যায়।

বিলাতে কোম্পানির অংশীদার ও পরিচালকরা ভারতে তাঁদের একচেটিয়া অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে চান না। কিন্তু কালে দেখা গেল জনমত চায় "free trade, free European settlement and the complete abolition of the company as a commercial organ." ব্যবসায়ীরা যেমন স্বাধীনভাবে ভারতে বাণিজ্য করবার অধিকার দাবি করছিলেন, প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টান পাদরিরা ও তাঁদের সমর্থকরা তেমনি চাইছিলেন ধর্মপ্রচার-বিষয়ে স্বাধীনতা। তাঁরা মানুষকে সিধে পথে চালাবার জন্যে কঠোর আইন প্রবর্তনের সমর্থক। তাঁদের ধারণা, আইন করে মানুষকে সত্য পথে চালনা করা যায়।

ধর্মপ্রচার-পাগল উৎসাহীদের বাইরে ছিলেন নূতন-আদর্শ-বাদী ভাবুকের দল, যাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে Utilitarian। তাঁদের বিশ্বাস—বেশির ভাগ মানুষের উন্নতি ও উপকারের জন্য সব-কিছু করা উচিত। আইন দিয়ে মানুষ গড়া যায় না এ তত্ত্ব তাঁরা জানতেন— "In its largest sense their solution was that of education."[২]

১ Quoted from Grant's *Observations* by Eric Stokes in *The English Utilitarians and India*, p. 34.
২ *Ibid*, p. 35.

নূতন ভাবুকরা অজ্ঞেয়বাদী, যুক্তিবাদী, মুক্ত মন নিয়ে জগৎসমস্তাকে দেখতে চান। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মনের মুক্তি হবে এই তাঁদের বিশ্বাস ছিল।

১৮১২ সালে যে Fifth Report পার্লামেণ্টের কাছে পেশ করা হয় এবং যাতে তৎকালীন ভারতের অবস্থা ও কর্মচারীদের নানা বিষয় সম্বন্ধে মতামত সংগৃহীত হয়, তাতে দেখা যায় যে বাংলাদেশের জেলাসমূহের ব্রিটিশ জজেরা শিক্ষার মাধ্যমে সংস্কার আনার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। মোট কথা, কি খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক, কি সমাজ-সংস্কারক, কি সিবিল সার্বিসের লোক, সকলেই শিক্ষা-প্রসারের পক্ষপাতী। জেম্‌স্ মিল্ বললেন—"Ignorance is the natural concomitant of poverty; a people wretchedly poor are always ignorant." এ কথা অতি সত্য যে গরিবের ছেলেই লেখাপড়া শিখতে পারে না। দারিদ্র্য কেন হয় সে প্রশ্নের উত্তরে জেম্‌স্ মিল্ বলছেন—"Poverty is the effect of bad laws and bad government." শিক্ষা দেশের মঙ্গল তখনই করবে যখন উত্তম আইন-কানুনের সাহায্যে দরিদ্রকে শোষণ করার পথ রুদ্ধ হবে, দারিদ্র্য দূর হবে। এই ভাবনা এ যুগে এক শ্রেণীর মানব-দরদী (Humanist) ভাবুক দার্শনিকের মনকে উত্তেজিত করে তোলে। জেরম বেন্‌থাম্ এই নূতন চিন্তাধারার জনক; জেম্‌স্ মিল্ বেন্‌থামের প্রত্যক্ষ মানসশিষ্য। জেম্‌সের পুত্র জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ Utilitarianism-এর উপর যে গ্রন্থ লেখেন তা এই মতবাদের দার্শনিক ভিত্তি রূপে সুপরিচিত। জেম্‌স্ মিল্-এর মত যাই থাক্, পাদরিরা জানতেন, বিধিবিধান রদবদল করে গবর্মেণ্টকে সজাগ করার শক্তি তাঁদের নেই। তাই তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচারের দিকেই মনোযোগ দিলেন। কোম্পানির কর্মচারীদের ঠিক সে দিকেই সব থেকে উৎসাহ কম। তবে দু-একজন মহানুভব ব্যক্তি শিক্ষা-প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা জানতেন, এই শিক্ষার দ্বারা ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্ব স্থায়ী হবে। পাদরিরাও মনে করতেন, যারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবে তারা ব্রিটিশ-শক্তির স্থায়িত্বের জন্য চেষ্টান্বিত থাকবে; কারণ, তারা জানে, খ্রীষ্টান হবার পর তারা যে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে, নানা বিষয়ের শিক্ষা লাভ করেছে, তা হিন্দু-

সমাজে তাদের হীনজাতিত্বর জন্য সম্ভব হয় নি। তারা ব্রিটিশ-শক্তির স্তম্ভ রূপে জনতার মধ্যে খ্রীষ্টানভাবে কাজ করবে।[১]

ইংলন্ডে বিপ্লব হয়ে গেছে কয়েক শতাব্দী পূর্বে। রাজহত্যা ও রাজপরিবারের নির্বাসনের পর পার্লামেন্টের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ জাত কনজারভেটিভ, নূতন-কিছু সহজে গ্রহণ করতে নারাজ, পুরোনোকে সহজে বর্জন করতেও পরাঙ্মুখ। কিন্তু বিপ্লব চলছে মানুষের অন্তরে— দার্শনিকদের ভাবনায়, ধর্মপ্রাণ মানবদরদীদের চেতনায়। জেরম বেন্থাম্ (১৭৪৮-১৮৩২) এই নবচেতনার গুরু; তিনি ১৭৮০ সালে Introduction to Principles of Morals and Legislation ও পরে পরে নানা গ্রন্থে যে মত প্রচার করেন তার নির্গলিত রূপ হচ্ছে 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনই আদর্শ'। বেন্থামের মতবাদ Utilitarianism নামে পরিচিত। Utility-র অর্থ 'উপযোগিতা', অর্থাৎ কোনো জিনিসের দ্বারা যখন মানুষের প্রয়োজন মেটে তখন বলা যায় যে ঐ জিনিসের উপযোগিতা (utility) আছে। মানবের হিতসাধন সর্বাপেক্ষা উপযোগী কর্ম— সেইজন্য এই মতবাদের নাম Utilitarianism— ব্যবহারের দিক থেকে বহুজনহিতায় কাজ করবার প্রেরণা।

ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুষ্টিমেয় অংশীদারের স্বার্থ-সংরক্ষণ-বিরোধী মতবাদ দেখা দিয়েছে এই principle থেকে; খ্রীষ্টীয় gospel বহুজনহিতায় প্রচার করতে হবে, সে ভাবনার উদয় হয় এই দার্শনিক মতবাদ থেকেই— প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখ দিতে হবে।

বাংলাদেশের গবর্নর-জেনারেল কর্নওয়ালিস খাঁটি অভিজাত ইংরেজ, তিনি ইংলন্ডের জমিদারি-প্রথাকে শাসন-ব্যবস্থার আদর্শ অবস্থা মনে করতেন। তাই তাঁর নিজস্ব গোষ্ঠীর মতো একটি অভিজাত-সম্প্রদায় বাংলাদেশেও সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা নির্দিষ্ট রাজস্ব দিয়ে চির-

১ স্বাধীন ভারতে নাগাল্যান্ডে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার অন্যতম কারণ, সেখানকার শতকরা প্রায় ৫৮ জন অধিবাসী খ্রীষ্টান এবং ব্রিটিশ পাদরিরা তাদের মন্ত্রণাদাতা। নাগারা মনে করে যে তারাই তাদের স্বার্থ দেখে।

বিহার-ছোটোনাগপুরে ঝাড়খণ্ড-আন্দোলনকারীদের মধ্যেও শিক্ষিত আদিবাসী খ্রীষ্টানরা নেতৃত্ব করছে।

কালের মতো জমিদারি ভোগ করবেন, রাজকর্মচারীরাও নিরুদ্‌বেগে শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন— রাজকোষে ধনাগম হবে সহজে। কিন্তু এই ব্যবস্থা যে আদর্শ ব্যবস্থা এ কথা নূতন মানুষরা মানছে না। তাই দেখতে পাই, তার অব্যবহিত পরে যে যুবক সিভিলিয়ান-দল এলেন, তাঁরা বহুজনহিতের জন্য রায়তদের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত করলেন— মুষ্টিমেয় জমিদারের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা রাখলেন না। রামমোহন, দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার, প্রমুখ সে-যুগের শিক্ষিত বাঙালি কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থায় বিত্তবান হয়েছিলেন।

স্বাধীন ভারতে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ হওয়ায় সব থেকে আঘাত পেয়েছিলেন বাংলার হিন্দু-জমিদার, পত্তনিদার আর অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগীরা —যাঁরা পুরুষানুক্রমে তপশীলী হিন্দু ও মুসলমান রায়তদের কাছ থেকে আদায়ী খাজনা বিনাশ্রমে পেয়ে আসছিলেন ও বিলাসে-ব্যসনে-স্বৈরাচারে মধ্যযুগীয় জীবন যাপন করে আসছিলেন। এঁদের ক্ষোভ এখনও মেটে নি। পাশ্চাত্য শিক্ষা এঁরা পেয়েছেন, য়ুরোপীয় উদারনীতি-বিষয়ে বই পড়েছেন— কিন্তু জীবনকে চলমান জগতের উদার মতবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। এঁরা মনে করেন, পরজীবী হয়ে বাস করাটা 'কর্নওয়ালিসি বেদ' অনুসারে তাঁদের জন্মগত অধিকার।

ইংলন্‌ডে Utilitarian মতবাদ এক শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদের খুবই আকৃষ্ট করে। জেম্‌স্ মিল্ ১৮১৯ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত কোম্পানির আপিসে কাজ করেন এবং তাঁর পুত্র জন্ স্টুয়ার্ট মিল্‌ও ১৮২৩ সাল থেকে ঐ আপিসেই ভর্তি হন। জেম্‌স্ মিল্ ভারতে আসেন নি; লন্‌ডনের আপিসে বসেই ভারতের সুবৃহৎ ইতিহাস রচনা করেন। পিতাপুত্র উভয়েই বেন্‌থামের ভক্ত— জন্ স্টুয়ার্ট তো Utilitarianism নামেই বই লেখেন। বেন্‌থাম্ ভারতের আইনসমূহ সুবিন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর প্রকাশিত কাগজপত্রে এর আভাসও পাওয়া যায়।

বেন্‌থাম্ তাঁর গুণগ্রাহী মিল্-পিতাপুত্রকে কোম্পানির ইন্‌ডিয়া আপিসে প্রবেশ করতে দেখে খুব উৎসাহিত হন। উইলিয়ম বেন্টিংকও বহুজনহিতের মতবাদের পোষক; তিনি যখন ভারতের বড়োলাট হয়ে আসছেন তখন

ঐতিহাসিক Grote-এর বাড়িতে এক বিদায়-ভোজ দেওয়া হয়; সেখানে বেন্টিংক নাকি বেন্‌থাম্‌কে বলেছিলেন, "I am going to British India, but I shall not be the Governor-General." ঠিক এই কথাটাই এইভাবে উক্ত হয়েছিল কি না তা স্পষ্ট নয়, তবে বেন্টিংক যে 'বহুজনহিতে' বিশ্বাসী ছিলেন তা তাঁর কার্যাবলী পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়।[১]

কলকাতার Alexander Co. -এর অন্যতম কর্মকর্তা জেম্‌স্‌ ইয়ং যখন এ দেশে আসছেন তখন বেন্‌থাম্‌ তাঁকে বলেছিলেন "to expound the full details of the Benthamic principles to the new Governor-General ; and Young had soon acquired an influence over the Supreme Government, with access to the confidential papers, that Malcolm thought improper. Rammohan Roy, the bright morning star of the new age, had long been catechized."[২]

রামমোহন বিলেত যাবার সময়ে ইয়ং-এর কাছ থেকে এক পরিচয়পত্র নিয়ে বেন্‌থামের কাছে যান। আমরা আগেই বলেছি, ইয়ং ছিলেন বেন্‌থামের পহেলা নম্বর অনুবর্তক। রামমোহন যেদিন লিভারপুল থেকে লন্ডনে এসে পৌঁছলেন, সেই রাত্রেই অশীতিপর বৃদ্ধ বেন্‌থাম্‌ হোটেলে যান রামমোহনের সঙ্গে দেখা করতে। বেন্‌থাম্‌ বৃদ্ধ বয়সে নিজের বাগানে পায়চারি করা ছাড়া বাইরে কারও সঙ্গে দেখা করতে যেতেন না। অধিক রাতে রামমোহনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শোনেন যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। বেন্‌থাম্‌ একখানি দীর্ঘ পত্র রেখে গেলেন। সে পত্রখানি পড়লে বোঝা যায় বৃদ্ধের কী শ্রদ্ধা ছিল রামমোহনের প্রতি। তাঁর এক বই সম্বন্ধে বেন্‌থাম্‌ বলেছিলেন : "I should have ascribed to the pen of a superiorly well-educated and instructed Englishman." জেম্‌স্‌ মিল্‌ সম্বন্ধে এই পত্রে লিখেছেন যে গত ২৩।২৪ বছর "he has membered himself among my disciples."

জেম্‌স্‌ মিল্‌-এর ব্রিটিশ-ভারতের ইতিহাস রচনার পদ্ধতি বহুল পরিমাণে বেন্‌থামের দ্বারা প্রভাবান্বিত। বেন্‌থাম্‌ এই পত্রে লেখেন, "For these many years a grand object of his ambition has been to provide

১ See Eric Stokes' *The English Utilitarians and India*, p. 51.

২ *Ibid*, pp. 51-52.

for British India, in the room of the abominable existing system, a good system of judicial procedure, with a judicial establishment adequate to the administration of it; and for the composition of it, his reliance has all along been, and continues to be, on me".[১]

জেম্‌স্ মিলের ভারত-ইতিহাস রামমোহন পড়েছিলেন; শুধু মিল্ নয়, ব্রুস, অ্যান্‌ডারসন, টমাস্ রো, রেনল, ওর্মে, ডো, ম্যাল্‌কম্, প্রভৃতির লেখা বইগুলোও তাঁর পরিচিত ছিল। বেন্‌থামের পত্র-মধ্যে বিচার-বিভাগ সম্বন্ধে জেম্‌স্ মিলের যে উল্লেখ রয়েছে, সেই Judicial and Revenue System of India সম্বন্ধে রামমোহন পার্লামেণ্টের Select Committeeর সমক্ষে যে মত ব্যক্ত করেন, তার পটভূমে Utilitarian-বাদ বা বহুজনহিতের আদর্শ প্রকটিত হয়েছে।

রামমোহনের জীবনের ঘটনাবলী ও তাঁর মতামতের উৎস সন্ধান করতে গেলে আমরা য়ুরোপের Humanist-দের মধ্যে গিয়ে উপনীত হই। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের মনীষী বেন্‌থাম্, রিকার্ডো, রিচার্ড ওয়েন, মিল্ পিতা-পুত্র, প্রভৃতির মতামত সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন; শিক্ষাদান যে জনসমাজের মনোমুক্তির পরমপথ, এ তথ্য তিনি বিদেশী মনীষীদের মনের স্পর্শ থেকে পেয়েছিলেন বললে তাঁকে ছোটো করা হবে না। এই বহুজনহিতায় মতবাদ থেকে তিনি বাংলাভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ করেন, বেদান্ত-বিদ্যালয় স্থাপন করেন— উদ্দেশ্য প্রচুরতমের জন্য প্রভূততম কল্যাণ সাধন। তিনি হিন্দু ছেলেদের ইংরেজি শেখাবার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ডাফ-সাহেবের স্কুলের জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্র সংগ্রহ করে দেন, কারণ রামমোহন জানতেন, যে-কোনো উপায়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান জানতে পারলে বাঙালি-মনের মুক্তি হবেই হবে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ তিন দশক বাংলাদেশে কোম্পানির শাসকরা মুগল বাদশাহের দেওয়ানরূপে কাজ করতেন বা তার ভান করতেন মূর্খদের মন পাবার জন্য। ওয়ারেন হেস্টিংস লিখেছিলেন: "We have endeavoured

---

১ S. D. Collet, *Rammohun Roy*, (Third Edition, 1962), Appendix VI.

to adapt our regulation to the manners and understanding of the people, and exigencies of the country, adhering, as closely as we are able, to their ancient usages and institutions."[১]

লর্ড কর্নওয়ালিস নিরপেক্ষ ছিলেন সব বিষয়ে— শ্রীরামপুরের পাদরিরা কী করছেন তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। ওয়েলেসলি যুদ্ধ ও দেশজয়ে এত ব্যাপৃত ছিলেন যে তাঁর সমাজকল্যাণাদি বিষয়ে মনোযোগ দেবার অবসর মেলে নি। কিন্তু ১৮১৩ সালের পর ব্রিটিশ ধর্মপ্রাণ জনসাধারণ ও পাদরিদের মনোভাবের যে দারুণ পরিবর্তন হয় তার কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি; কিন্তু তা aggressive হতে চায় নি। কালে ব্রিটিশদের মধ্যে ধর্মপ্রচার-বিষয়ে মত কঠিন ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৮২৯ সালে জন্ ক্রফর্ড (Crawford) এক পুস্তিকায় স্পষ্ট করে লিখলেন যে গবর্মেণ্টকে পুরো-পুরিভাবেই 'ইংরেজ' গবর্মেণ্ট হতে হবে— মুখোশ খুলে ফেলাই উচিত। অপর একজন লেখক বলেন যে, "Instead of masquerading as the feudal subject of the Mughal Emperor at Delhi, striking coins with his image, and paying him homage through the British Resident at Delhi... English and not Persian should be used as the language of the Government."[২] কালে তা হয়েছিল— ১৮৩৫ সালে কোম্পানির নামে মুদ্রা ছাপা হল, পারস্য-ভাষার বদলে ইংরেজি রাজভাষা বলে ঘোষিত হল। মধ্যযুগীয়তার অবসান সম্পূর্ণ হল সেদিন— ইংরেজ সংস্কৃতি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পত্তন হল স্পষ্ট আকারে।

গত ত্রিশ বছরের মধ্যে খ্রীষ্টান পাদরি ও মানবদরদী ভদ্রদের প্রচেষ্টায় যে পরিবর্তন সাধিত হল তার ভবিষ্যৎ কী, সে সম্বন্ধে মেকলে ১৮৩৩ সালের সনন্দ গ্রহণের সময়ে পার্লামেণ্টে যে বক্তৃতা করেছিলেন, তার কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করে আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করছি :

"It may be that public mind of India may expand under our system till it has outgrown that system; that by good Government we may educate our subjects into a capacity for better Government; that, having become instructed in European knowledge, they may, in some

১ Eric Stokes, *The English Utilitarians and India*, p. 36.

২ *Ibid*, pp. 42-43.

future age, demand European institutions. Whether such a day will ever come I know not. But never will I attempt to avert or retard it. Whenever it comes it will be the proudest day in English history. To have found a great people sunk in the lowest depths of slavery and superstition, to have so ruled them as to have made them desirous and capable of all the privileges of citizens, would indeed be a title to glory all our own. The sceptre may pass away from us. Unforeseen accidents may derange our most profound schemes of policy. Victory may be inconstant to our arms. But there are triumphs which are followed by no reverse. There is an empire exempt from all natural causes of decay. Those triumphs are the pacific triumphs of reason over barbarism ; that empire is the unperishable empire of our arts and our morals, our literature and our laws." [১]

বাংলাদেশে যে ব্যাপটিস্ট পাদরিরা এসে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন তাঁদের কথা বলবার আগে, বাইবেলের প্রচার নিয়ে বিশেষভাবে প্রোটেস্টাণ্টদের পক্ষ থেকে যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তার একটি রেখাঙ্কন করতে চাই। কারণ যে-সব সমিতির নাম করব তাদের অনেকগুলির সঙ্গে ভারতের পরিচয় ঘটে শতাব্দীকালেরও বেশি আগে। দেশেবিদেশে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের প্রথম সোপান রূপে বাইবেলের তর্জমা-প্রচারের ব্যবস্থা পাদরিদের করতে হত ; কারণ, বিদেশে ইংরেজি বা অন্য য়ুরোপীয় ভাষায় অনূদিত বাইবেল কোনো কাজে লাগে না। ১৬৯৮ সালে ইংলন্ডে Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK) নামে এক সমিতি স্থাপিত হয় ; এই সমিতির পক্ষ থেকে আরবি ভাষায়[২] বাইবেলের

১ Speech of 10 July 1833; Macaulay, Campbell, *Works*, Vol. XI, pp. 585-86. Quoted by Eric Stokes, p. 45.

২ "a new Latin rendering made by Father Maracci, which appeared at Padua [Italy] in 1698." —A. J. Arberry, *The Koran*, p. 10.

এক অনুবাদ[১] হয়েছিল। কয়েক বছর পরে আর-একটি সমিতি স্থাপিত হয়— Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts (১৭০১); এঁরা উপনিবেশে, বাগিচায়, কারখানায় ধর্মপ্রচার করতেন; ভারতে এঁদের দেখা যায় না। ১৭০৯ সালে স্কচদের মধ্যে খ্রীষ্টানী ধর্ম-প্রচারের জন্য এক সমিতি গঠিত হয়। দু বছর আগে ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ডের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য সম্পন্ন হয়েছিল; স্কচরা যে সর্ববিষয়ে আপনাদের অস্তিত্ব বৃহত্তর ব্রিটিশ সত্তার মধ্যে মজ্জিত করে দেয় নি, তারই প্রমাণস্বরূপ Society in Scotland for Propagating Christian Knowledge গঠিত হয়; এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষক ও প্রচারকদের শিক্ষাদান। এঁরা Gaelic (Gaelic spoken in the Scottish Highlands) ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। ১৭৫০ সালে গরিব জনতার মধ্যে বাইবেল বিলির ব্যবস্থার জন্য Society for Promoting Religious Knowledge among the Poor নামে সমিতি স্থাপিত হল।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সৈন্য পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ায় সৈনিক-বিভাগের লোকের ধর্মোন্নতির জন্য The Bible Society মূলত গঠিত হয়

---

১ বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বাইবেলের যেমন আরবি তর্জমা হয়, কোরানেরও তেমনি য়ুরোপীয় ভাষায় রূপান্তর চলে।

"The first rendering of The Koran into a Western Language (Latin) was made by the English scholar Robertus Retensis in the twelvth century, at the instance of Peter the Venerable, Abbot of Cluny; it was completed in 1143, and enjoyed a considerable circulation in manuscript. Exactly four centuries later this mediaeval Latin version was published at Basle, ... It abounds in inaccuracies and misunder-takings, and was inspired by hostile intention"— A. J. Arberry, *The Koran*, 'Preface'.

ছাপা হরপে ইংরেজিতে কোরানের তর্জমা প্রকাশিত হয় ১৬৪৯ সালে, এটা ফরাসী থেকে ভাষান্তরিত; ফরাসীতে অনুবাদ করেন Sieur du Ryen, মিশরের আলেক-জেন্দ্রিয়াতে ফরাসী রাজার দূত। সেই ফরাসী তর্জমার ("Newly Englished, for the satisfaction of all that desire to look into the Turkish vani-ties") সঙ্গে ছিল তুর্কদের প্রফেট ও কোরানের লেখক মহম্মদের জীবনী: "With a needful caveat, or education for them who desire to know what use may be made of or if there is danger in reading the *Alcoran*." এই বই দিয়ে ইংরেজ পাঠকদের সঙ্গে ইসলামের পরিচয় করানো হয়। George Sale-এর কোরানের বিখ্যাত তর্জমা ১৭৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। তার আগে Alexander Ross ফরাসী অনুবাদ থেকে ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করেছিলেন (সপ্তদশ শতক)।

১৭৮০ সালে। ১৭৮৭ সালে ওয়েল্‌সে ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে দেখা গেল ওয়েল্‌শ্‌ ভাষায় বাইবেল নেই—ইংরেজি বাইবেল তারা বুঝতে পারে না; তখন ওয়েল্‌শ্‌ ভাষায় বাইবেলের তর্জমা করানো হল। শিশু ও বালক-বালিকাদের জন্য ১৭৮৫ সালে Society for the Support and Encouragement of Sunday Schools নামে সমিতি গঠিত হয়।

অষ্টাদশ শতকের উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ ধর্মপ্রচার-প্রতিষ্ঠান এই কটি। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষে বাইবেল প্রচারের জন্য ব্যাপটিস্ট পাদরি কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড যা করেছিলেন তা কোনো সমিতির তত্ত্বাবধানে বা অর্থ-সাহায্যে নিষ্পন্ন হয় নি বলে তাদের গুরুত্ব কিছু কম নয়। ব্যাপটিস্টদের অনুবাদ-কার্যের কথা আমরা আলোচনা করেছি।

উনবিংশ শতকে The British and Foreign Bible Society (৭ মার্চ ১৮০৪) স্থাপিত হয়। বাইবেল বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করা সম্বন্ধে এই সমিতির উদ্দেশ্যের কথা শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট পাদরিদের জানানো হল: "The design of translating the Scriptures into the Oriental languages has received the highest sanction. A resolution to that effect has been transmitted to us by the Secretary of a society, lately instituted ..."[১]।

শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট পাদরিরা যা আরম্ভ করেছিলেন, এই সমিতি কালে তা ব্যাপক ও বিরাট ভাবে কার্যকরী করেন। তবে ১৮০৪ সালের মধ্যে শ্রীরামপুর থেকে বাংলাভাষায় নিউ টেস্টামেণ্ট ও ওল্ড টেস্টামেণ্টের কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল।

খ্রীষ্টধর্ম ভারতে প্রচারের জন্য সর্বাগ্রে ইংরেজ ব্যাপটিস্টরাই উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। এঁরাই শ্রীরামপুরে আসেন অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে। বাইবেল প্রচারের দ্বারা ভারতে প্যাগান ও হীদেনদের আত্মার সদ্‌গতি হবে— এই আন্তরিক বিশ্বাস নিয়েই তাঁরা 'ধর্মগ্রন্থ' অনুবাদে ব্রতী হন।

কলকাতা মহানগরীতে যে 'ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস' আছে তা এসিয়ার

১ Rev. John Owen, *History of the British and Foreign Bible Society*, 1816.

মধ্যে অন্যতম বৃহৎ মুদ্রণ-যন্ত্রালয়— প্রায় দেড় শো বছর আগে স্থাপিত হয়েছিল। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষার হরপ এই ছাপাখানায় আছে।

ব্যাপটিস্টদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা দরকার। রামমোহন রায়ের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব নিয়ে এঁদের বিরোধ বাধে, সে বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে করেছি। Baptism শব্দটা গ্রীক— যেমন খ্রীষ্টধর্মের বহু শব্দ। Baptiz— bathe, bapto— dip, অর্থাৎ স্নান করা বা ডুব দেওয়া।[১]

খ্রীষ্টের সমসাময়িক বৈরাগী-সাধক জন্-এর কাছে ভক্তরা এলে তিনি জল দিয়ে দীক্ষা দিতেন। স্নান করে, পরিচ্ছন্ন হয়ে, ধর্মদেশনা শ্রবণ বা দীক্ষা গ্রহণ সব ধর্মেই আছে— বিশেষ করে প্রাচ্য দেশে। কালে শীতের দেশে যখন খ্রীষ্টধর্ম পৌঁছল তখন স্নানের বদলে মাথায় জল ছিটিয়ে দীক্ষাবিধি প্রচলিত হয়— অনেকটা আমাদের দেশে যেমন কলসসঞ্চিত গঙ্গোদক খড়কে করে মাথায় গায়ে কয়েক বিন্দু ছিটিয়ে দিলেই গঙ্গা-স্নানের পুণ্য অর্জিত হয়। ব্যাপটিস্টরা বলে যে, যারা সত্যবিশ্বাসী কেবল তাদেরই দীক্ষা দিতে হয়। দীক্ষা আধ্যাত্মিক প্রেরণা -উদ্ভূত। কিন্তু এ নিয়ে অনেক মতভেদ আছে, সে-সব আলোচনা এখানে নিরর্থক। তবে মতভেদ থেকেই অনেক অনাসৃষ্টি ঘটে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় দুঃখ পেতে হয় অনেককে। জার্মেনিতে একদল লোক এই মতামত নিয়ে খুব মাতামাতি শুরু করেন। জন্মের পর দীক্ষা গ্রহণের রীতি ছিল সকল খ্রীষ্টানেরই ধর্ম। কিন্তু এঁরা বললেন, 'আবার-দীক্ষা' (ana-baptism) চাই। এই আনা-ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায় মার্টিন লুথারের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে জার্মেনিতে অনেক উপদ্রব করে। এরা রাজনীতি, অর্থনীতি, গুরুবাদ, সমস্ত মিশিয়ে এমন কাণ্ড বাধিয়ে তোলে যে শেষকালে রাজশক্তির সাহায্যে এই ধর্মোন্মত্ত সম্প্রদায়কে নির্মূল করতে হয়।

ব্যাপটিস্টদের সঙ্গে আনা-ব্যাপটিস্টদের যোগ ছিল না। ইংলন্‌ডে অ্যাংলিকান চার্চ সরকার-অনুমোদিত বলে ঘোষিত হলে ব্যাপটিস্টদের দুজন

১ "A Sacrament or symbolic rite of universal obligation, instituted by our Lord as a means of admission into the Christian Church; practised by John the Baptist as a sign of repentence."—*The Holy Bible Cyclopedic Concordance,* p. 23.

নেতা দেশত্যাগ করে হল্যান্ড়ে চলে যান এবং আমস্টারডামে ১৬০৯-১১ সালে তাঁদের মতের মতো করে এক চার্চ স্থাপন করেন। এঁদের মধ্যে এক-জন ইংলন্ড়ে ফিরে এসে ১৬১২ সালে প্রথম ব্যাপটিস্ট চার্চ নির্মাণ করান। এঁদের বলত Armenian বা General Baptist। কিন্তু এঁদের মধ্যেও মতভেদ দেখা দিল। ক্যাল্‌ভিন-পন্থীরা ১৬৩৩ সালে Particular Baptist হয়ে নিজেদের চার্চ তৈরি করল। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে Particular Baptistরাই প্রবল হয়ে উঠল ও ১৭৯২ সালে Baptist Missionary Society স্থাপিত হল লন্ড়নে। এই নবীন ধর্মান্দোলনের মধ্যে এলেন উইলিয়ম কেরী। Particular Baptist Society for Propagating the Gospel amongst the Heathen-এর নেতারূপে কেরী এলেন বাংলাদেশে ১৭৯৩ সালে।

কেরীর জন্ম হয় এক তন্তুবায়ের ঘরে ১৭ অগস্ট ১৭৬১ সালে। তাঁর পিতা গ্রাম্য-পাঠশালায় শিক্ষকতা গ্রহণ করে পুত্র উইলিয়মকে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু অর্থাভাবে ১২ বছর বয়সে বালককে চাষের কাজে, জুতোর ব্যবসায়ে ঢুকে পয়সা রোজগার করতে হয়। এই অবস্থায় বালক গ্রীক ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন ও ধীরে ধীরে লাতিন ও হীব্রু ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হন। ১৭৮২ সালে তিনি ব্যাপটিস্ট মণ্ডলীতে যোগ দেন। জুতোর ব্যবসায়ের সঙ্গে তিনি এক অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। ১৭৮৯ সালে কাজকর্ম ছেড়ে প্রথমে ধর্মযাজকের কাজ নেন ও কিছুকালের মধ্যে পাকাপাকি রকমে পাদরি হন। ইতিমধ্যে জন্ টমাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। টমাস ১৭৮৩ সালে এক ভারতগামী জাহাজের ডাক্তার হয়ে বঙ্গদেশে আসেন, তিনিই বাংলাদেশে প্রথম ব্যাপটিস্ট ধর্মপ্রচারক। ১৭৯২ সালে দেশে ফিরে গিয়ে টমাস ব্যাপটিস্ট খ্রীষ্টানদের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশে পাদরি পাঠাবার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ পেশ করেন। টমাসের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে কেরী বাংলাদেশে এসে ধর্মপ্রচার করবার জন্য কৃতসংকল্প হন। ব্যাপটিস্ট সমিতি টমাসকে প্রচারক-রূপে ভারতে পাঠাতে চাইলে কেরী নিজে থেকেই তাঁর সঙ্গী হবেন বলে জানালেন।

বিলাতে থাকতে ব্যাপটিস্টদের এক ধর্মসভায় কেরী বলেছিলেন—

"Expect great things from God; attempt great things for God." এই বিশ্বাস ও উৎসাহ নিয়ে তিনি কাজে লাগলেন। বিলাতে থাকা-কালীনই কেরী একখানা পুস্তিকা লেখেন; বইটির নাম দেখলেই বোঝা যাবে ব্যাপটিস্টরা কী চাইছিলেন। পুস্তিকাটির নাম— 'Enquiring into the Obligations of Christians to Use Means for the Conversion of the Heathen'। 'হীদেন'-দের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার উপায় গ্রহণ করা খ্রীষ্টান-মাত্রেরই কর্তব্য। পাঠকের স্মরণ আছে, এই সময়ে চার্লস্ গ্রাণ্ট ও উইল্‌বার-ফোর্স ভারতে ধর্মপ্রচারের জন্য আন্দোলন করছেন— উপর-তলা থেকে চাপের আয়োজন খুঁজছেন। ঠিক এই সময়ে নিঃস্ব কেরী ভাবছেন বাংলাদেশে যিশুর বাণী প্রচার করবেন জনতার মধ্যে গিয়ে।

কেরী বুঝতে পারলেন, শুধু উপদেশ দিয়েই কর্তব্য শেষ করলে চলবে না, জীবন সমর্পণ করতে হবে খ্রীষ্টবাণী প্রচারের জন্য। তাই দেখি, পরের বৎসরেই (১৭৯৩) বাংলাদেশে আসবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু সে যুগে দেশ থেকে বের হওয়া খুবই কঠিন ছিল, ছাড়পত্র না নিয়ে কেউ ভারতে আসতে পেত না। টমাস অনেক চেষ্টার পর খবর পেলেন ইংরেজ-কোম্পানির এক জাহাজ ছাড়ছে আইল অব্ ওয়াইট থেকে, তাই লন্ডন থেকে স্টেজ কোচে এসে টমাস ও কেরী ভারতগামী জাহাজে উঠলেন। এমন সময় কাপ্তেন এসে বললেন যে, তিনি খবর পেয়েছেন তাঁরা ছাড়পত্র না নিয়েই ভারতে যাচ্ছেন। কাপ্তেনের হুকুম হল, এখনি জাহাজ থেকে নেমে যেতে হবে। সমস্ত আশা নিমেষে নিবে গেল। জিনিসপত্র নিয়ে নামতেই হল। পিট্-এর ইন্‌ডিয়া অ্যাক্ট্ পাস হবার পর থেকে ছাড়পত্র ছাড়া এ দেশে প্রবেশ সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছিল (১৭৮৪); তাতে বলা হয়, এ-হেন অপরাধীদের জেল ও জরিমানা দুইই হবে, তা ছাড়া তাদের দেশে তো ফিরে আসতেই হবে। ভারতেও আইন হয়, বিলাত থেকে জাহাজ এলেই সাগরমুখে পাইলটের হাতে আরোহীদের ছাড়পত্র পেশ করতে হবে। এই-সব কঠোর নিয়ম থাকায় কেরী যে কোম্পানির 'অক্সফোর্ড' জাহাজে আসতে পারেন নি, তাতে ভালোই হয়েছিল, হয়তো বিনা পাসে আসার অপরাধে তাঁকে স্বদেশেই ফিরে যেতে হত।

যাই হোক, টমাস তদ্‌বিরে লোক। লন্‌ডনে গিয়ে এক কফি-হাউসের আড্ডায় খবর পেলেন, দিনেমারদের একখানা জাহাজ আসছে। কয়েকদিন পরে সে জাহাজ এল। ইতিপূর্বে কেরী একাই যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, এখন মিসেস কেরীকেও রাজী করানো গিয়েছে সঙ্গে যাবার জন্য। তবে মিসেস কেরীর যাবার শর্ত হল, তাঁর বোনকেও সঙ্গে নিতে হবে। কেরী তাঁর স্ত্রী, শ্যালিকা আর চারটি শিশুকে নিয়ে জাহাজে উঠলেন। জাহাজে ওঠার আগের কদিন কী সংশয় আর উদ্‌বেগের মধ্যে কেটেছিল তা আমরা অনুমান করতে পারি নে। কেরী বলেছিলেন যে, তিনি যদি জাহাজে যেতে না পারেন তা হলে হেঁটেই যাবেন।

চার মাস জাহাজে কাটল। পালতোলা জাহাজ— আসছে আফ্রিকা ঘুরে। জাহাজ কলকাতায় পৌঁছল ১১ নভেম্বর ১৭৯৩ সালে। জাহাজে থাকাকালীন কেরী বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন টমাসের কাছে। অদ্ভুত লোক এই টমাস। একেবারে ধর্মপাগল, আবার অসংযত-চরিত্র। দিনেমার জাহাজ কলকাতার বন্দরে পৌঁছলে দেখলেন, ঘাটে রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) এসেছেন এঁদের স্বাগত করবার জন্য। রামরাম বসু পূর্ব থেকেই টমাসকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে সহায়তা করতেন। সেদিন থেকে রামরাম বসু মুনশি নিযুক্ত হলেন কেরী-সাহেবের। এই আর-এক অদ্ভুত চরিত্র।

কেরী জানেন না তাঁর ভবিষ্যৎ কী। সাত মাস নানা জায়গায় ঘুরলেন— সঙ্গে বিরাট পরিবার ও মুনশি রামরাম বসু। অবশেষে মালদহ জেলায় মদনাবাটীতে কাজ মিলল উড্‌নী-সাহেবের নীলকুঠিতে। মালদহের রেশমশিল্প বিখ্যাত বলে বহু ইংরেজ বানিয়া সেখানে এসেছে। মালদহের নামই হয় ইংরেজবাজার।

কেরী যে সামান্য বাংলা শিখেছিলেন তাই নিয়েই গ্রীক গস্‌পেল অনুবাদ শুরু করলেন মদনাবাটীতে পৌঁছেই— সহায় হলেন রামরাম বসু। কিন্তু 'মঙ্গল-সমাচার' বা গস্‌পেল-অনুবাদ তো হল, এখন ছাপানোর সমস্যা! তখন বাংলা হরপে বই ছাপা আরম্ভ হয়েছে বিলাতে। ১৭৯৭ সালে পঞ্চানন কর্মকারের চেষ্টায় হরপের ছাঁচ তৈরির কারখানা হয়েছে মাত্র। কেরী খোঁজ নিয়ে জানলেন নিউ টেস্টামেণ্ট দশ হাজার কপি বাংলায় ছাপতে খরচ পড়বে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা। কিন্তু এত টাকা কোথায়! দমবার পাত্র নন

কেরী। একটা প্রেস নিলামে কিনে মদনাবাটীতে পাঠিয়ে দিলেন নৌকা করে; তার পর কলকাতা থেকে হরপ কিনে এনে বাইবেল ছাপবার সব আয়োজন হল। এমন সময় উড্‌নী-সাহেব নীলকুঠির লোকসানী কারবার গুটিয়ে নিলেন— কেরী আবার নিরাশ্রয় হলেন। মদনাবাটীর কাছেই খিদিরপুর নামে একটা গ্রামে একটা নীলকুঠি কিনে সেখানে কেরী আবার নূতন সংসার পাতলেন। ছাপাখানার কাজ শুরু হল— নিজেরাই কম্পোজিটর, নিজেরাই মেশিনম্যান (১৭৯৯)।

ইতিমধ্যে ইংলন্‌ড থেকে কলকাতায় এলেন মার্শম্যান, ওয়ার্ড, প্রমুখ নূতন ব্যাপটিস্ট পাদরিরা (১৩ অক্টোবর ১৭৯৯)— কেরীর আসার প্রায় ছ বছর পরে। পাঠকের মনে আছে, ১৭৯২ সালে ইংলন্‌ডে ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি গঠিত হয়; এতদিনে উক্ত সমিতি অর্থাদি সংগ্রহ করে প্রাচ্যের হীদেনদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য শিক্ষিত পাদরি পাঠাতে পারলেন। কেরী নিজের মতে ধর্মপ্রচার করতেন, তিনি কোনো সমিতির দ্বারা নিযুক্ত হয়ে আসেন নি, তাই তাদের অর্থেরও প্রত্যাশী ছিলেন না। মার্শম্যান প্রমুখ পাদরিরা কলকাতায় এলে কোম্পানির কর্তারা জানিয়ে দিলেন যে, ধর্মপ্রচারের জন্য পাদরি-শ্রেণীর লোকদের ব্রিটিশ-ভারতে থাকতে দেবেন না।

মার্শম্যান প্রভৃতি নবীনদলের পাদরিরা ব্রিটিশ জাহাজে আসতে সাহস পান নি। দিনেমারদের জাহাজ সবই চলে গিয়েছে ইতিপূর্বে, আসা নিয়ে এক সমস্যা। এমন সময়ে জানতে পারলেন CRITERION নামে এক মার্কিন জাহাজ আসছে। অবশেষে সেই জাহাজে আশ্রয় পেয়ে শ্রীরামপুরে এসে পৌঁছলেন (অক্টোবর ১৭৯৯)। এ দিকে কলকাতার এক ইংরেজি পত্রিকার সাহেব-সম্পাদক লিখলেন, ব্যারোজন পোপবাদী পাদরি এসেছে এ দেশে; তা ছাড়া এরা বোনাপার্টির চরও তো হতে পারে। বেচারা সম্পাদক 'ব্যাপটিস্ট' নামে যে একটা সম্প্রদায় আছে তার নামও শোনে নি, ব্যাপটিস্ট ও প্যাপিস্টের পার্থক্য সে করতে পারে নি।

নিরুপায় হয়ে তখন ওয়ার্ড-সাহেব ও আর-একজন পাদরি নৌকাযোগে মালদহে খিদিরপুরে উপস্থিত হলেন কেরীর সঙ্গে পরামর্শের জন্য। ধর্ম-প্রচার সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে কথাবার্তার পর কেরী তিন সপ্তাহের সময় নিলেন

তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তার জন্য। এই সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কেরী স্থির করলেন, ঈশ্বরের বাণী প্রচারই তাঁর জীবনের আদর্শ হবে। তাই খিদিরপুরের ঘরবাড়ি বেচে দিয়ে ছাপাখানা ও সংসার নিয়ে পুনরায় তিনি ভাসলেন। ইতিমধ্যে মার্শম্যানরা আশ্রয় নিয়েছিলেন দিনেমারদের উপনিবেশ শ্রীরামপুরে, ইংরেজের আইন-কানুন ও বিধিনিষেধের এলাকার বাইরে। ১১ জানুয়ারি ১৮০০ সালে ব্যাপটিস্ট মিশনের পত্তন হল, এবং যে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস আজ ভারতের অন্যতম বৃহৎ ছাপাখানা তার সূত্রপাত হল কেরী-সাহেবের নিলামে-কেনা কাঠে-লোহায় মেশানো হাতে-টানা ছাপাখানা নিয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বছরের প্রথম মাসেই কলকাতার বাইরের এক শহরে মুদ্রাযন্ত্র বা ছাপাখানা স্থাপিত হল। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এই যুগান্তকারী ঘটনাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়; কারণ লেখন-বিদ্যা পুঁথিলেখকদের কলম থেকে মুক্ত হয়ে এল যন্ত্রী মানুষের হাতে।

কেরী বাইবেলের অনুবাদ প্রস্তুত করে চার দিকে বিনা মূল্যে বিতরণ করলেন, হয়তো ভাবলেন বই পড়েই লোকে খ্রীষ্টান হয়ে যাবে। কিন্তু তখন সাধারণ লোকের ক'জনের অক্ষর-জ্ঞান ছিল যে তারা বাইবেল পড়তে পারবে? ১৮০১ থেকে ১৮১৩ পর্যন্ত ব্যাপটিস্ট পাদরিদের কর্মপ্রচেষ্টা খুবই সীমিত ছিল। তাঁরা যশোহর, সুখসাগর, ঘোষপাড়া, প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করেন ও স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মিশে তাদের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। মোট কথা, বাংলাদেশের সাধারণ লোক বলতে যা বোঝায় তাদের কাছে এঁরা গিয়েছিলেন আত্মীয় বন্ধুর মতো।

কিন্তু এখানে একটা কথা বলে রাখি, শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্টরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করে বেড়াতে থাকলেও, কোম্পানির প্রতিনিধিরা বিশেষ কোনো বাধার সৃষ্টি করেন নি। ডিরেক্টরদের মত তাঁরা জানতেন; তবে যাঁরা কার্যক্ষেত্রে আছেন তাঁরা দেখছেন, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হলে এ দেশের লোকগুলো ইংরেজ-ভক্ত হয়— তারা দেখে সাহেবরা তাদের উপকার করছে। কিন্তু ১৮১৩ সালের আগে পাদরিদের এ দেশে আসতেই দেওয়া হত না। সে কড়া নিয়ম ১৮১৩ সালে শিথিল হলে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট পাদরি ছাড়াও অন্য নানা সম্প্রদায়ের পাদরিরা ব্রিটিশ ভারতের

নানা স্থানে প্রচারকেন্দ্র গড়ে তুলেছেন, কলকাতার মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই তাঁদের প্রচার-কার্য। মোট কথা, দেখা যাচ্ছে, ভারতের বিত্ত অপহরণ করার জন্য যেমন ব্রিটিশ-বণিকদের তৎপরতা, তেমনি ভারতের হিন্দু-মুসলমানের চিত্তজয়ের জন্য পাদরিদের আগ্রহ। সাধারণ দরিদ্র তথা-কথিত হিন্দুর ধর্মের ভিত অত্যন্ত কাঁচা, সেখানে পাদরিদের কার্য সফল হতে থাকে ভালোভাবেই। হিন্দুর ধর্মের খুঁটির জোর 'আচার-পালনে', 'জাত-মানা'য়— শাস্ত্র চোখেও দেখে না, পড়তেও পারে না, কারণ হিন্দুর শাস্ত্র বলে কোনো একটা গ্রন্থ নেই, যেমন আছে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের। তাই তাদের আচার-সর্বস্বতা ভাঙলেই ধর্মের ভিত যায় টলে, তখন তারা অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মপ্রচার-প্রচেষ্টা প্রায় ব্যর্থই হয়েছিল বলতে হবে; মুসলমানদের ধর্মের ইমারত বেশ পাকা ভিত্তির উপর খাড়া। হিন্দুর 'জাত' গেলেই 'ধর্ম' যায়, তখন তাকে আশ্রয় দিতে পারে ইসলাম অথবা খ্রীষ্টান ধর্ম; মুসলমানের জাত মারা শক্ত, কারণ তারা জাত মানে না।

যাই হোক, অসংখ্য বাধার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টান পাদরিরা নিজেদের কর্তব্য করে যেতেন—তাঁরা মনে করতেন 'ধর্ম' তাঁদের সহায়। প্রথম যুগের পাদরি-দের যে পরিমাণ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল তা আধুনিক যুগের কোনো ধর্মের প্রচারকদের কল্পনার বাইরে। কিন্তু পাদরিদের এই আপ্রাণ চেষ্টা তেমন ফলপ্রদ হয় নি। কেন হয় নি তার বিশ্লেষণ করেছিলেন রামমোহন রায়।

তিনি খ্রীষ্টানদের ধর্মপ্রচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখেছেন—"নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতাসূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রিষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে।"[১] এইভাবেই ব্যাপটিস্ট পাদরিরা ১৮০১ সাল থেকে শ্রীরামপুরকে

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩।

কেন্দ্র করে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও হিন্দু-মুসলমান উভয়ের ধর্ম ও সমাজের নিন্দায় প্রবৃত্ত হলেন। দীর্ঘকাল কোনো প্রতিবাদ হয় নি; রামমোহনকে কেন্দ্র করে প্রথম প্রতিরোধ হল 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকা থেকে। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

শ্রীরামপুরের কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, প্রভৃতি পাদরিরা আদর্শ খ্রীষ্টান জীবন যাপন করতেন। কিন্তু ১৮১৩ সালের পর, যখন বিলাত থেকে খ্রীষ্টান মিশনারীদের এ দেশে আসার বাধা দূর হল, তখন থেকে লন্ডনের মূল-সোসাইটির দৃষ্টি গেল শ্রীরামপুরের উপর। বিশ বছর আগে, ১৭৯৩ সালে, যাঁরা সমিতির কর্তা ছিলেন, তাঁদের স্থলে এসেছেন নূতন যুগের লোক; পুরোনো আমলের খরচ-খরচা নিয়ে মিশনের মিতব্যয়িতার যুগ আর নেই। এখন পাদরিদের হাতে প্রচুর অর্থ এসে পড়েছে বিদেশের প্রচার-খাতে—

"The old economy of missions, under which Dr. Carey and his associates embarked, had passed away. Missions had attained the maturity and organisation of a national enterprise."[১] বিলাতে মি. ফুলার ছিলেন ব্যাপটিস্ট সমাজের শিরোমণি— তাঁর মৃত্যুর পর নবীনদলের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান দখল করবার জন্য উৎসাহ দেখা দিল। কথা হল, বিলাতের ব্যাপটিস্ট মিশনের ট্রাস্টিরা শ্রীরামপুরেরও অছি হবেন, কারণ এঁরাও ব্যাপটিস্ট। মি. ওয়ার্ড এক পত্রে পরিষ্কার করে লিখে পাঠালেন যে দূরে বসে মিশন নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।[২] কেরীর কোনো আসক্তি ছিল না— তবুও নিজেদের হাতে-গড়া প্রতিষ্ঠান কার হাতে তুলে দেবেন, যাদের সঙ্গে বাংলার খ্রীষ্টানদের কোনো সম্বন্ধ নেই? বহু বাক্-বিতণ্ডার পর স্থির হল,

১ Marshman, *The History of the Serampore Mission*, p. 134.

২ Kaye বলেছেন, "Serampore Missionaries and the Baptist Missionaries are two separate bodies." p. 334.

"It appears that in the year 1815–17 the Serampore Missionaries baptised into their church between 4 and 5 hundred persons; and this had about 10,000 children into the schools. In the 3 years abovementioned, they distributed not less than 300,000 of religious tracts in 20 different languages besides translations of the Scripture." —John W. Kaye, *Christianity in India*, 1859, p. 333.

শ্রীরামপুরের পাদরি বা বিলাতে ট্রাস্টিদের সন্তান-সন্ততির কারও কোনো দাবি থাকবে না মিশনের সম্পত্তির উপর। এই ঝড় বয়ে যায় ১৮১৬ সালে। প্রসঙ্গত বলি, কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রথম ছ বছর (১৮০১-০৬) পাঁচ শো টাকা মাসিক বেতন পেতেন, পরে তা হাজার টাকা হয়; এই টাকা দিয়ে তাঁদের মিশনের কাজকর্ম, নিজ পরিবার প্রতিপালন, প্রভৃতি সবই চলত। তবে মার্শম্যান ও তাঁর স্ত্রী য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয় ছাত্রদের জন্য যে বোর্ডিং-বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তার আয় থেকে সামান্য উদ্বৃত্ত হত। এইভাবে কঠিন সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে মিশনের খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের কাজ চলল।

কেরী প্রমুখ শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট পাদরিরা উনিশ শতকের শুরু থেকেই বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট বাংলাভাষায় তর্জমা করে বিতরণ শুরু করেন। ১৮০১ অব্দে টমাস, রামরাম বসু, কেরী ও ফাউন্‌টেন কর্তৃক অনূদিত এবং কেরী-সম্পাদিত সমগ্র নিউ টেস্টামেণ্ট প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরের সদ্য-প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় এইটি প্রথমমুদ্রিত পুস্তক।[১]

অতঃপর ১৮০২ থেকে ১৮০৯ অব্দের মধ্যে ওল্ড টেস্টামেণ্টের সকল অংশ বাংলাভাষায় হিব্রু ভাষা থেকে তর্জমা হয়ে প্রকাশিত হয়।

বাংলাভাষায় বাইবেলের অনুবাদ যখন প্রকাশিত হয় তখন পর্যন্ত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম, শিখ— এগুলির কোনো ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ বাংলায় কেউ পড়তে পেত না। বাইবেলের বাংলা তর্জমা শেষ হবার (১৮০৯) ছ বছর পরে রামমোহন হিন্দুদের প্রস্থানত্রয়ের আংশিক অনুবাদ বাংলায় প্রকাশ করেন ও খ্রীষ্টান পাদরিদের অনুকরণে বিনা মূল্যে বিতরণ করেন।

১৮০১ সালে বাংলাভাষায় বাইবেলের তর্জমা আবির্ভূত হবার পর থেকে দেড় শো বছরের মধ্যে অখণ্ড বাংলায় খ্রীষ্টানদের জন্য যত খ্রীষ্টানী বই অনূদিত ও লিখিত হয়েছে, কলকাতায় ও মফঃস্বলে যত খ্রীষ্টানী পত্রিকা পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে, তার সম্যক্ আলোচনা এখন পর্যন্ত হয় নি।

---

১ গ্রন্থবর্ণনা এইরূপ : ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য /বিশেষত/যাহা মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যশোধনার্থে প্রকাশ করিয়াছেন/তাহাই ধর্ম্ম পুস্তক/তাহার অন্তভাগ। /তাহা আমাদের প্রভু ত্রাণকর্ত্তা যিশু খ্রীষ্টের। মঙ্গলসমাচার/গ্রাক ভাষা হইতে তর্জমা হইল।/শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।/ ১৮০১

মুসলমানী বাংলা সম্বন্ধে যেরূপ গবেষণা হচ্ছে, খ্রীষ্টানী বাংলা সম্বন্ধেও তদ্রূপ আলোচনার ক্ষেত্র রয়েছে।

বাইবেল কী, সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই আশা করছি। কারণ, এই বাইবেলের উপর খ্রীষ্টধর্মের নির্ভর এবং এই গ্রন্থকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর অগণিত ভাষায় গত দু হাজার বছর ধরে বহু লক্ষ গ্রন্থ পত্র পত্রিকা পুস্তিকা লিখিত হয়েছে ; কত কোটি কপি বিতরিত ও বিক্রীত হয়েছে তা বোধ হয় কেউ বলতে পারবে না।[১] তা ছাড়া য়ুরোপীয় তথা পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, কলা, সমাজতত্ত্ব, প্রভৃতি বহু বিষয় বাইবেল তথা খ্রীষ্টানীর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের মানসিক পরিবেশ ও পটভূমি বহুল পরিমাণে পাশ্চাত্য। সেই-জন্য পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্যতম প্রধান উৎস বাইবেল সম্বন্ধে কিছু তথ্য ও তত্ত্ব জানা একান্ত প্রয়োজন।

উনবিংশ শতকের প্রথম বর্ষ থেকে বাংলাদেশে বাইবেলের প্রচার শুরু হয়।[২] অতঃপর ১৮১৩ অব্দে খ্রীষ্টানদের এ দেশে আসা সম্বন্ধে বাধা-নিষেধ প্রত্যাহৃত হলে নানা সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান কিভাবে বাংলাদেশে এসে বাইবেল ও খ্রীষ্টানধর্মের প্রচার-কার্য আরম্ভ করেন সে কথা আমরা অন্যত্র

১ পৃথিবীতে লুপ্ত ও চলিত ভাষার সংখ্যা অনুমান করা হয়েছে ৩০৭৬ ; এর মধ্যে দশ-বারোটি ভাষা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এবং বিশ-ত্রিশটি সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষায় সাহিত্যের নানা রূপ প্রকাশ পেয়েছে। বাইবেলের অনুবাদ হয়েছে সাত শো'রও বেশি ভাষায়।

২ দেড় শো বছর পরে, ১৯৬১ সালে, উভয় বঙ্গে খ্রীষ্টানের সংখ্যা ৩,৫৩,৪৩৩ (পশ্চিমবঙ্গে ২,০৪,৫৩০ ও পূর্ব-পাকিস্তানে ১,৪৮,৯০৩)। এর ত্রিশ বছর পূর্বে, ১৯৩১ সালে, ছিল ১,৮৩,০০০ (দ্র. *Census of India*, 1961; *Population in Pakistan*, 1961 ও বঙ্গ-পরিচয়) ১৮০১ অব্দে বাংলাদেশে বোধ হয় একজনও বাঙালি খ্রীষ্টান ছিল না। তখন বাংলাদেশে ছিল হিন্দু ও মুসলমান— হিন্দু ছিল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। ১৮৮১ অব্দের সেন্সাসে দেখা যায় মুসলমানরা হিন্দুদের থেকে তিন লক্ষ বেশি— ১৯৩১ সালে ৫৬ লক্ষ বেশি। ১৮৮১ হতে ১৯৩১ পর্যন্ত ৫০ বছরে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয় ৫৫·২% হারে এবং ঐ সময়ে হিন্দু-দের বৃদ্ধি হয় ২২·৯% হারে ; অর্থাৎ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির হার দ্বিগুণেরও বেশি। খ্রীষ্টানদের সংখ্যা ১৮৮১ সালে ছিল ৭২,০০০ ; ১৯৩১-এ হয় ১,৮৩,০০০ ; ১৯৬১ অব্দে উভয় বাংলার খ্রীষ্টান-সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি। কিন্তু এই খ্রীষ্টানরাও বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত, কেবল ক্যাথলিক বা প্রোটেস্টান্ট বলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না।

সবিস্তারে আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গত বলি, সমকালীন দুটি ঘটনা স্মরণীয়— খ্রীষ্টান পাদরিদের পক্ষ থেকে বাইবেল-তর্জমার প্রচার ১৮০২ থেকে ১৮০৯ ও রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থ ও উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ ও প্রচার ১৮১৪ থেকে ১৮১৯।

'বেদ' শব্দের অর্থ যেমন জ্ঞান, 'কোরান' শব্দের মূলে আছে আরবি 'করা' ধাতু— যার অর্থ পড়া, আবৃত্তি করা, ইত্যাদি। পড়া হয় বলেই কোরানের এই নাম। এই কিতাবই 'ওহী', বা আল্লার আদেশপূর্ণ বাণী, তাই কিতাব মাত্রেরই নাম হল 'বই'।[১] 'বাইবেল' শব্দের অর্থও 'গ্রন্থ'। Biblia-র অর্থ বই— মিশর থেকে যে প্যাপাইরাস-শর আসত, তার ভিতরে যে সাদা পাতলা 'বিবলিয়া' পাওয়া যেত তাই জুড়ে জুড়ে কাগজের মতো করে তাতে লেখা হত বই। প্যাপাইরাস থেকে এসে গেল 'পেপার' শব্দ, আর বিবলিয়া থেকে চলিত হল 'বাইবেল'।

আমরা যে বাইবেল দেখি তার দুটো ভাগ— ওল্ড টেস্টামেণ্ট বা পুরোনো অনুশাসন এবং নিউ টেস্টামেণ্ট বা নূতন অনুশাসন। ইহুদিদের বিশ্বাস, তারা ঈশ্বরের বিশেষ 'প্রিয়' জাতি (chosen people)। ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের চুক্তি-নামা হয়; প্রথমে হয় মুসা, আব্রাহাম, ইশাহক, ইয়াকুব, প্রভৃতির সঙ্গে, পরে নূতন করে হয় খ্রীষ্টের সঙ্গে। সেই মতে বাইবেলের দুটি অংশ Covenant নামেই সংগৃহীত হয়েছিল। 'টেস্টামেণ্ট' যে বলা হয় এটা ভুল; গ্রীক-ভাষায় চুক্তিনামাকে বলা হয় diathe-kie, লাতিনে ভুল তর্জমা হল testament— যার মূল অর্থ ইচ্ছাপত্র বা উইল। যাক, এই টেস্টামেণ্ট নামেই দুই বাইবেল চলিত হল।

পৃথিবীর দুটি প্রাচীনতম ধর্ম— বৈদিক ও ইহুদি: এরা সনাতনী, অর্থাৎ এদের ইতিহাস শুরু হয়েছে আদিম মানুষের আবির্ভাব থেকে অথবা কোনো কল্পিত দেবতা থেকে। ভারতের ধর্ম মানবকেন্দ্রিক হল বুদ্ধকে নিয়ে। এবং তার পর শুরু হল অসংখ্য অবতারের আবির্ভাব। ইহুদি-ধর্মের বড়ো-রকম ছেদ পড়ল সেদিন যেদিন ধর্ম হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অর্থাৎ যিশুখ্রীষ্টকে

১ *Shorter Encyclopedia of Islam*—Articles-al-Kuran; 'Wahy' 'বহী' শব্দের অর্থ revelation। বাংলায় 'বই' শব্দ এই বহী থেকে এসেছে।

যেদিন থেকে অবতার ও ত্রাণকর্তা বলে প্রচার শুরু হল। পুরাতন টেস্টামেণ্ট কোনো এক ব্যক্তি বা অবতার -কেন্দ্রিক নয়। ইহুদি-সমাজ আচারপিষ্ট হলেও, ইহুদি-ধর্ম অবতার-আবিষ্ট হয় নি। আশ্চর্যের কথা, মানবকেন্দ্রিক ধর্মগুলোই বিশ্বধর্ম হয়ে উঠল, যেমন বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ইসলাম ; কিন্তু সনাতনী ধর্মগুলো, যেমন বৈদিক ও ইহুদি ধর্ম, এরা উপজাতীয় (tribal) স্তর অতিক্রম করে বিশ্বের দরবারে ঠাঁই করে নিতে পারল না— এর সংগত কারণ নিশ্চয়ই আছে। আচার-সর্বস্ব ধর্মে দেহের শুচিতা রক্ষা করতে করতেই মানুষের দিন যায়— 'বিশ্বকে' বাদ দিয়ে ও মানুষকে উপেক্ষা করে তারা 'বিশ্বনাথ'কে ডাকে, তাদের সে ডাক পৌঁছয় না যথাস্থানে। উপজাতীয় মনোভাব তারা পরিত্যাগ করতে পারে না, বিশ্বকে আহ্বান করে আত্মীয় করবার অসংখ্য বাধা তাদের। আজ পর্যন্ত 'হিন্দুধর্ম'-এর সংজ্ঞা বা definition খুঁজে পাওয়া যায় নি। আর Judaism বা ইহুদিধর্ম ইসরেইলি জাতির মধ্যে সীমিত থেকে গেল, ইহুদি-ধর্ম প্রচারধর্মী হতে পারে নি। এই দুই ধর্ম অন্যকে convert করে না, অর্থাৎ অন্যকে দীক্ষা দিয়ে নিজধর্মমধ্যে গ্রহণ করতে পারে না। অথচ হিন্দু-সমাজের চার পাশে যারা ছিল তারা বর্ণহিন্দুকে স্পর্শ করে পাপ অর্জনের সীমানার বাইরে ছেঁচতলায় আশ্রয় নিয়েছিল— তাদের অবস্থা না ঘরকা, না ঘাটকা। তাই এদের মধ্যে বেশির ভাগ পরে ইসলামে আশ্রয় নেয়, অথবা খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করে। মধ্যযুগে চৈতন্যমহাপ্রভুর সময় থেকে হিন্দুধর্ম প্রচার ও দীক্ষা দিতে আরম্ভ করে ; তখন থেকে বিশেষ মানবকে অবতার ও বিশেষ গ্রন্থকে বেদতুল্য জ্ঞানে প্রচার হল সম্প্রদায়গুলির ধর্ম। রামমোহনের চেষ্টা ছিল, 'হিন্দু'-সংজ্ঞার আবিষ্কার, যে সংজ্ঞার বলে হিন্দুধর্ম, 'বিশ্বধর্ম'-দরবারে আসন লাভ করবে। প্রতিমা প্রতীক -বর্জিত ও অপৌরুষেয়, প্রত্যাদিষ্ট (revealed) ধর্মগ্রন্থ -নিরপেক্ষ ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে হিন্দুধর্ম বিশ্বধর্ম হবে, এই ছিল তাঁর আশা। কিন্তু পৃথিবীর সকল বিশ্বধর্মই মানবকেন্দ্রিক ও ধর্মগ্রন্থগুলি revealed।

ইতিহাসে দেখা যায়, যে-সব ধর্ম মানবকেন্দ্রিক তাদের ধর্মগ্রন্থ (sacred books springing from a person) খুব সহজেই সাধারণ মানুষের দুর্বল মনকে স্পর্শ করে। কিন্তু যে-সব জাতির ধর্ম বিশেষ মানুষকে

কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নি, তাদের ধর্মগ্রন্থের পবিত্রতা, বৈশিষ্ট্য, ও বিশ্বমানবতার স্বীকৃতি পেতে সময় লাগে। প্রাচীন গ্রীস-রোমের 'ধর্ম' ছিল কিন্তু 'ধর্মগ্রন্থ' ছিল না। তাই বিশেষ ধর্মগ্রন্থ ও মানুষ-দেবতা বা অবতার নিয়ে খ্রীষ্টান-প্রচারকরা 'হীদেন'দের সামনে এসে গেলে, পুরাতন ধর্মকে সেখান থেকে অচিরকালের মধ্যে বিদায় নিতে হয়েছে অনগ্রসর জনতার ইতিহাসে। সাধারণ জনতা ব্যক্তিকে (person) পেয়ে কৃতার্থ বোধ করে, যিশুকে অবতার বলে মেনে তাঁকে অহৈতুক ভক্তি নিবেদন করে সার্থকজীবন হয়। বহু দেবতার স্থানে তারা মানুষ-দেবতাকে পায়। যুক্তির পথ, মননের পথ, যেমন বন্ধুর তেমনি জটিল; কঠোর মানসিক মেহনত সেখানে। তার থেকে অনেক সহজ মানুষ পুজা— আইকন বা ছবি হোক, পাথরের বা মাটির মূর্তি হোক, প্রতীক হোক অথবা শ্লোগান বা মন্ত্র হোক। যুক্তির বোঝা বইতে হয় না, ভক্তির রসালুতাই মুক্তির পথ খুলে দেবে, এই ভরসা। আর মুক্তি (salvation) শব্দটার অর্থ ও ব্যবহার নানা রূপে দেখা দেয়—বৈদান্তিকদের মুক্তিবাদ ও রবীন্দ্রনাথের মুক্তিতত্ত্ব এক বস্তু নয়।

যিশুখ্রীষ্টকে কেন্দ্র করে গ্রীকভাষায় নিউ টেস্টামেণ্ট সম্পাদিত হবার অনেক পরে হিব্রু বাইবেল বা ওল্ড টেস্টামেণ্ট ধর্মগ্রন্থরূপে সংহত ও সম্পাদিত হয়। ভারতে বেদের শ্রেষ্ঠত্ব যতই ঘোষিত হোক, বেদ-বেদান্ত থেকে বৌদ্ধ ত্রিপিটক-গ্রন্থ অনেক বেশি প্রসার লাভ করেছিল— দেশে-বিদেশে ত্রিপিটক অনূদিত হয়েছে। এর কারণ, বৌদ্ধধর্ম মানুষকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ হয়েছিল, বৈদিক ধর্ম সে পথে চলতে পারে নি। আর আসল পার্থক্য, বৌদ্ধরা খাওয়া-ছোঁওয়া নিয়ে মানুষের ভেদটা ঘুচিয়ে তাদের কাছে সদ্‌ধর্মের বাণী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সর্বমানবকে এক ধর্মে বাঁধবার চেষ্টা বুদ্ধদেবের পূর্বে পৃথিবীতে আর হয় নি। ইহুদি ও খ্রীষ্টানীর সঙ্গে ভেদও এখানেই— ইহুদিরা জাতিভেদটাকে উগ্র করে রেখেছিল— যিশু সেই বেড়া দেন ভেঙে।

প্রায় সকল ধর্মেই দেখা যায় যে, ধর্মগ্রন্থের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মধ্বজীদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, বিশ্বের সকল সত্য

তাদের ধর্মগ্রন্থেই নিহিত আছে, দুনিয়ার আর সব ধর্ম মিথ্যা। ··· "The process of canonization of a book, or of lifting it up from a merely good book into a sacred book, seems to be virtually a process of degradation or condemnation of all other books and religions... These books, by reason of the infallibility claimed for them, became everywhere fetter upon man's minds."১ মানুষ স্বেচ্ছায় এই ধর্মগ্রন্থের শৃঙ্খল তুলে নেয়। সেই শৃঙ্খলের কঠিন বাঁধন পুরুষানুক্রমে মানুষ বহন করে চলে, তাকে ভাঙতে বা তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে সাহস পায় না।

বেদ-চতুষ্টয় যেমন ভারতীয় আর্যদের ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বা সংস্কৃতি ও সভ্যতার আকরগ্রন্থ, কোরান যেমন আরব জাতির, ইহুদিদের পৌরাণিক কাহিনী ও সেমেটিক একেশ্বরবাদ -তত্ত্বকথায় পূর্ণ বাইবেল তেমনি ইহুদি-জাতির ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুরাণগ্রন্থ, ও মোক্ষলাভের নির্দেশ ও উপদেশাদি ইতস্তত আছে বলে— ধর্মগ্রন্থ।

বাইবেলের দুটি ভাগ— প্রাচীনটি হিব্রুভাষায় ও নূতনটি গ্রীকভাষায় রচিত। মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে, চারটি ভাষাতেই— বৈদিক-সংস্কৃত, হিব্রু, গ্রীক ও আরবি— পৃথিবীর প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলি লিখিত হয়েছে। সকল ধর্মই বলেন, তাঁদের ধর্মগ্রন্থ revealed বা ভগবানের বাণী। হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ বেদবেদান্তের কথা আমরা ইতিপূর্বেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এখন বাইবেল আলোচনার প্রবেশ-মুখে একটা কথা পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, হিন্দুর বেদবেদান্ত ও 'শাস্ত্র'-গ্রন্থ (canon), খ্রীষ্টানের বাইবেল এবং মুসলমানের কোরান এক-জাতীয় revealed ধর্মগ্রন্থ নয়। হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থোক্ত idea of revelation ও অন্যান্য ধর্মের revelation-এর মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা ideological ও qualitative— এই দু রকমের revelation-ধারণা নিয়ে একটা তুলনামূলক সুষ্ঠু আলোচনার বিরাট ক্ষেত্র আছে।

কোরান সম্বন্ধে মুসলমানদের মত যে, এ গ্রন্থ "is not the sacred

---

১ J. T. Sunderland, *The Original Character of the Bible*, revised by Clayton R. Bowen (1936), pp. 12-13.

book in the usual sense ...."। কোরান হচ্ছে "The faithful reproduction of the original scripture in heaven..."। ইসলামের মধ্যে এই মতের প্রতিবাদ হয়েছিল : "The Mutazalis and the more free-thinking theologians raised a protest... but... the victory was won by the orthodox school." মোতাজলীদের কণ্ঠ কট্টর মওলানারা স্তব্ধ করে দেন (*Shorter Encyclopedia of Islam*, p. 285)। Hughes-এর *Dictionary of Islam* গ্রন্থে revelationকে বলা হয়েছে inspiration। এই প্রেরণা দু ভাবের বলে সেখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে— 'বহী-জাহীর', যা বাইরে থেকে আসে (revelation) ও 'বহী বাতীন', যা অন্তর থেকে উদ্ভূত হয় (inspiration)। মুসলমানদের মতে কোরানের প্রত্যেকটি শব্দ দেববাণী— "emanating directly from the Deity"। (পৃ. ২১৪)

কোরান অখণ্ড ধর্মগ্রন্থ। ইহুদিদের বা খ্রীষ্টানদের কতকগুলি পুস্তকের সমষ্টিকে 'ধর্মগ্রন্থ' বলা হয়— কোরান সে-জাতীয় গ্রন্থ নয়। বাইবেলে দেখা যায়, ভগবান য়াহবা বহু ঋষির নিকট আবির্ভূত হয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু সেই কথাবার্তার মধ্যে যথেষ্ট অসংগতি আছে। খ্রীষ্টানদের নূতন ধর্মপুস্তক বহু পৃথক পুস্তকের সংগ্রহ-গ্রন্থ— বহু পরস্পরবিরোধী তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতে পূর্ণ। কিন্তু কোরান একই ব্যক্তির নিকট তেইশ বছর ধরে revealed হয়েছিল। মহাপুরুষ হজরত মহম্মদের উপর 'ভর' করে আল্লা কথা বলতেন। স্বয়ং নবী (Holy Prophet) কোরানের সুরা ও আয়াত গ্রন্থাকারে সাজিয়ে দেন 'under Divine guidance'। আবুবকর ও উসমান কোরানের প্রতিলিপি করে বিতরণ করেছিলেন।[১]

বাইবেলের পুরাতন ও নূতন অংশকে আমরা যত পৃথক করে দেখি, খ্রীষ্টান ভক্তেরা তা করে না,—"New Testament implies Old Testament; and it is precisely with the ways in which this new was continuous with the old, both in form and spirit, that we have to reckon at the start."[২]

১ Maulana Muhammad Ali, *The Quran*; Ahmadiya Anjuman in Ishaat-i-Islam, Lahore (1928).

২ Dr. J. Vernon Bartlet in *Peake's Commentary of the Bible*, p. 636.

ভারতে আমরা স্পষ্ট ধারণা করতে পারি না যে বাইবেল আমাদের এশিয়ার প্রফেট বা ঋষিদের কথায় পূর্ণ। বার্টলেট-সাহেব যথার্থ বলেছেন— "The Bible comes to us from far off times, and from lands distant not only in space but also in modes of thought." পাশ্চাত্য জগতের কাছে তার দূরত্ব যতটা, আমাদের থেকে তার দূরত্ব আরও অনেক বেশি হয়েছে। কারণ যে ইহুদি, তথা খ্রীষ্ট-ধর্ম, গ্রীক লাতিন প্রভৃতি ভাষাভাষী সন্ত-সাধকদের দ্বারা য়ুরোপে প্রচারিত হয়েছিল, সেই হেলেনিক, হেলেনিস্টিক ও রোমান লাতিন-ইতালীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সারা য়ুরোপের নাড়ীর যোগ ছিল অন্তঃসলিলারূপে। এই ইতিহাসের মধ্যে চোলাই হয়ে যে খ্রীষ্ট ভারতে এলেন তিনি Oriental Christ নন— তিনি এলেন পাত্রিআর্ক, পোপ, লুথারিয়ান, ক্যালভিনিস্ট ও বহু সাম্প্রদায়িক প্রচারকদের মাধ্যমে। আমাদের কাছে যে বাইবেল পেশ করা হল তার সঙ্গেও আমাদের নাড়ীর যোগ ছিল না। বাইবেলের হিব্রু ও গ্রীক অংশ বহু শতাব্দী থেকে আপন আপন ধর্মবিশ্বাসে দানা বেঁধে শক্ত হয়ে গিয়েছিল। ইহুদিধর্ম তার Torah বা কানুন, অর্থাৎ আচার উপবাস স্নান ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য সম্বন্ধে মতামত সুদৃঢ় করে তুলেছে। খ্রীষ্টের জীবন ও বাণীতে ইহুদিদের Prophecy and Messianic hope in a person সার্থক হয়েছে— এ কথা বিশ্বাস করত এক শ্রেণীর লোকে। ইহুদিরা স্মৃতি বা কানুন মেনে চলে; নূতন বিশ্বাসীরা মানুষকে দেবতার অবতার বলে প্রচার করল, খ্রীষ্টানধর্ম ইহুদিধর্মের নূতন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হল। তার পর দু হাজার বছর বহু জাতির বহু মতের ধারা এসে পড়েছে তার মধ্যে; তাই আমরা উনবিংশ শতকে যখন যিশুকে দেখতে পেলাম, তখন তাকে প্রাচ্য সাধক বলে চিনতে পারলাম না— "This distinction, at once of form and content, made a profound difference in spirit and the new covenant. Yet, throughout, there is a vital continuity, the unfolding of one Divine purpose and economy of special grace through special media of revelation."১ বলা বাহুল্য, ইহুদিদের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের

১ Bartlet, *Ibid.*

সম্বন্ধ চিরকাল অহিনকুলের ; ওল্ড টেস্টামেণ্টের প্রতি খ্রীষ্টানদের যদি সত্যই আনুগত্য থাকৃত তবে, যে ইহুদিদের ওটা ধর্মগ্রন্থ সেই ইহুদিদের প্রতি, খ্রীষ্টানদের ব্যবহার এমন নির্মম হল কেমন করে?

বাংলাদেশে, তথা ভারতে, তথা সারা দুনিয়ায় যে খ্রীষ্টানী প্রচারিত হয়েছে তা মূলত ইহুদি ধর্ম ও সংস্কারেরই বিস্তার-রূপ। যে মুহূর্তে খ্রীষ্টানরা হিব্রুভাষায় লিখিত ৩৯ খানি বইকে ধর্মগ্রন্থ (canon) বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, তখন থেকেই ইহুদির প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল। খ্রীষ্টীয় জগতের কোটি কোটি মানুষের মনের ও মতের নিয়ন্তা পরোক্ষে ইহুদিরাই রয়েছে। ইংরেজি বাইবেলের ১০৫৬ পৃষ্ঠার মধ্যে হিব্রু বাইবেল ৮০৮ পৃষ্ঠা ; গ্রীক বাইবেল ২৪৮ পৃষ্ঠা মাত্র দখল করে আছে। খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বধর্ম হয়েছে, কিন্তু তার পটভূমে রয়েছে ইহুদিদের উপজাতীয় ধর্ম ও তার ধর্মগ্রন্থগুলি।

ভারতের নূতন হিন্দু-জাগরণের মধ্যে আমরা পুরাতন বৈদিক, ঔপনিষদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক বা লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের অনুক্রমণ (continuation) দেখতে পাই ; বলা বাহুল্য, প্রাচীনের সমস্ত মত ও বিশ্বাসের বোঝা বহন করে চলা অসম্ভব, কিন্তু তাদের অস্বীকার করবার বা বদল করবার সাহস হয় না। খ্রীষ্টান ও ইহুদির মত ও বিশ্বাসের মধ্যে সেই ছেদ স্পষ্ট।

ভারতে ঐতিহাসিক যুগে খ্রীষ্টধর্ম আনে পোর্তুগীজরা। ক্যাথলিক-মার্কা ধর্মমত এবং ইগ্‌নেটাস লয়লা ও সেণ্ট জেভিয়ারের বিশ্বাসের বোঝা চাপিয়ে দেয় দেশী খ্রীষ্টানদের উপর— এদের আনুগত্য পোপের প্রতি। লাতিন ভাষায় অনূদিত দুই বাইবেল এদের ধর্মপুস্তক। আদিযুগে সিরিয়ান খ্রীষ্টানরা এদেশে আসে— তাদের গুরু বা পাত্রিয়ার্কের নিবাস ছিল কনস্টান্টিনোপ্‌ল্— পরে হয় সিরিয়ার আন্তিয়োক। ধর্মবিষয়ে extra-territorial loyalty-র সূত্রপাত হল নূতন পরিস্থিতিতে।

য়ুরোপীয়রা ধন-জয়ের লোভে বণিক-বেশে ছড়িয়ে পড়ে দুনিয়াময়। তাদের পথ ধরে এসেছিল ধর্মের গোঁসাই পাদরিরা— তাদের পিছু পিছু আসে সৈনিক। ধার্মিকের সামনে ধনিকের মার্চেণ্টম্যান জাহাজ, পিছনে

রাজার সৈন্য ও ম্যান অব্ ওয়ার। কবি লিখেছিলেন, "বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে"— কথাটা আংশিক সত্য, কারণ বণিক ও সৈনিকের মাঝখানে ছিল 'ধার্মিক'। বণিক বিত্তজয় করে, সৈনিক রাজ্যজয় করে, আর ধার্মিকেরা চিত্তজয়ের জন্য খ্রীষ্টানী প্রচার করে। রাজনীতি, সাম্রাজ্যবাদ ও অর্থনীতির সঙ্গে এই খ্রীষ্টানী প্রচারের কী নিগূঢ় সম্বন্ধ তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

বৈদিকধর্ম থেকে আধুনিক ধর্মের যত তফাত, কোরানের ধর্ম ও খলিফাদের জীবন-আদর্শ থেকে বর্তমান যুগের ইসলামের ব্যবধান যতটা, খ্রীষ্টের ধর্ম থেকে আধুনিক খ্রীষ্টানীর দূরত্ব এ-সবের থেকে কিছু কম নয়।

ইহুদিদের বাইবেল বা ওল্ড টেস্টামেন্টের ভাষা হিব্রু ; এই সংগ্রহে ৩৯টি বই আছে— নানা আকারের, নানা সময়ের রচনা সে-সব।

হিব্রু বাইবেলকে আমাদের মহাভারত ও পুরাণাদির সঙ্গে তুলনা করলে ভালো হয়। ইহুদি জাতি বা উপজাতি -সমূহের নানা যুগের ভাবনারাশির সাহিত্যরূপ ওল্ড টেস্টামেন্টে সঞ্চিত আছে। সৃষ্টিতত্ত্ব, আদিমানবের জন্ম-কথা, পৌরাণিক কথা— য়ুসুফ, মোশী (Moses)-এর কাহিনী, রাজকাহিনী, বিচিত্র সুরের কবিতা, গান, দেবস্তুতি, জাতির প্রবাদবচন, প্রভৃতির সংগ্রহ-গ্রন্থ এই বাইবেল। তবে সাধারণ বাইবেলে যে ৩৯ খানি বই দেখতে পাওয়া যায়, তার সবগুলিই শুরু থেকে ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্রগ্রন্থ (canon) বলে স্বীকৃত হয় নি।

ইংরেজি অ্যাংলিকান বাইবেলে ৩৯টি পুস্তকের নাম আছে। তবে এখানে একটা কথা জানা দরকার যে, ইহুদিদের বইগুলি 'শাস্ত্র'-সম্মান এক-দিনে পায় নি— হাজার বছরের ইতিহাসের সঙ্গে এ শাস্ত্র-সাহিত্যের ইতিহাস জড়িত। পুরাতন বাইবেলের আদি রূপে মাত্র ২২টি বইকে শাস্ত্র বলে ধরা হয়েছিল। কোন্ বই শাস্ত্র বলে মানতে হবে তা নিয়ে মতভেদ ছিল। ফিলিস্তান বা এসিয়ান ইহুদি, যারা হিব্রু বই পড়ত, এবং মিশরীয় ইহুদি, যারা গ্রীকভাষায় সেপ্টুয়াজিন্ট পড়ত, তাদের মধ্যে বিশ্বাসের ভেদ ছিল। যাই হোক, canon-রূপে সব বই একসঙ্গে মান পায় নি ; অনেকগুলি আবার আদিযুগে লেখাই হয় নি।

সংস্কৃতেও অনুরূপ হয়েছে ; অষ্টাদশ পুরাণ, অষ্টাদশ উপপুরাণ, শতাধিক তন্ত্রগ্রন্থ, ঊনবিংশ স্মৃতিগ্রন্থ— বহু শতাব্দী ধরে, বহু দেশের নানা জাতির প্রয়োজন-সাধনের জন্য রচিত হয়েছিল। সবগুলিই 'শাস্ত্র' হতে সময় লেগেছিল। এবং এখনও সব 'শাস্ত্র'গ্রন্থ সকল হিন্দুর উপর প্রযুক্ত হয় না।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের মধ্যে হিব্রু বাইবেল রচিত হয়— অর্থাৎ প্রায় সহস্র বছরের সঞ্চিত সাহিত্য-সম্পদ। তবে আমরা পূর্বেই বলেছি, এই বিরাট সাহিত্য সম্পাদিত হয়ে পুস্তকাকার গ্রহণ করে অনেক পরে।[১] সে যুগের কথ্য ভাষা ছিল আরামাইক— হিব্রুর প্রাকৃত রূপ, সিরিয়ার ভাষা। সকলেই এই ভাষায় কথা বলে, যিশুখ্রীষ্টেরও ছিল এই ভাষা। কিন্তু যিশুর জীবনকথা ও উপদেশবাণী প্রভৃতি লেখা হয় গ্রীক-ভাষায়।[২]

হিব্রু বাইবেল যিশুর জন্মের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে গ্রীকভাষায় অনূদিত হয়। মিশরের গ্রীক টলেমিকদের রাজধানী আলেকজেন্দ্রিয়ার

---

১ "The manuscripts of the Hebrew Old Testament are all comparatively late, five or six centuries later than the great uncial manuscript of the New Testament. The oldest Hebrew manuscript with a date attached which can be accepted with confidence is the Codex Babylonices at Petrograd,...916 A.D."—Prof. G. A. Cooke, *The Languages of the Old Testament* : in *Peake's Commentary of the Bible* ; Nelson, p. 35.

"The translations of the various books (of the Old Testament) vary considerably in accuracy and style. The version of the Pentateuch is the best part, and next in value is the Book of Proverbs. The Book of Job contains many interpolations and there are considerable omissions in the poetic parts. The Books of Esther and the Psalms and Prophets appear to have been translated between 180 and 170 B. C., but in a very inferior manner."—*Everyman's Encyclopedia.*

২ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রীষ্টাব্দ সপ্তম শতক পর্যন্ত এই সহস্র বছর এই অঞ্চল ছিল গ্রীক ও পরে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। গ্রীকভাষা কালে পশ্চিম-এশিয়াবাসীদের ভদ্রভাষা হয়ে যায় ; এমনকি পারস্যের দরবারে গ্রীক ছিল অভিজাতদের ভাষা। পারস্যের শাহনশাহ 'গ্রীক' নাটকের অভিনয় দেখছেন, যখন রোমান-সেনাপতির ছিন্নমুণ্ড এনে তাঁকে দেখানো হল। মোট কথা সপ্তম শতকে ইসলামের আবির্ভাব ও আরবদের অভ্যুদয় পর্যন্ত গ্রীক ছিল এই অঞ্চলের ভাষা।

প্রচারের জন্য ইহুদিদের বাইবেল গ্রীকে ভাষান্তরিত হয় রাজাজ্ঞায় (খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৯৮-৮৫)। এই গ্রন্থের নাম সেপ্টুয়াজিণ্ট। কিংবদন্তী, ৭০ জন ইহুদি পণ্ডিত ৭০ দিনের মধ্যে এই অনুবাদ-কার্য শেষ করেছিলেন। প্রসঙ্গত বলি, এই অনুবাদ প্রিয়দর্শী অশোক পাটলিপুত্রের রাজা হবার আগেই নিষ্পন্ন হয়। হিব্রুভাষায় বাইবেল-সম্পাদন-কালে সেপ্টুয়াজিণ্ট-তর্জমা পদে পদে পণ্ডিতদের ব্যবহার করতে হত।

মিশরের ইহুদিরা হিব্রুতে বাইবেল পড়ত না বা পড়তে পারত না, তারা পড়ত গ্রীক সেপ্টুয়াজিণ্ট থেকে—আমরাও আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ ইংরেজিতে পড়েই আরাম পেতাম, এখন না-হয় মাতৃভাষায় সে-সব গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে বলে পড়ি— সংস্কৃত মূল কয়জন পড়ে রস গ্রহণ করতে পারেন! ইহুদিদেরও সেই দশা ছিল।

এই ওল্ড টেস্টামেণ্ট বা ইহুদিদের হিব্রু বাইবেল বেশ বড়ো বই। অবশ্য পূর্বেই বলেছি, বাইবেল একটা গ্রন্থ নয়, ৩৯টি বইয়ের সমষ্টি। রামমোহন তাঁর Appealগুলোর মধ্যে পুরাতন হিব্রু বাইবেলের মূল ও ইংরেজি অনুবাদ এবং সেপ্টুয়াজিণ্ট গ্রীক তর্জমার উল্লেখ ও উদ্ধৃতি করেছেন।[১]

ওল্ড টেস্টামেণ্ট হিব্রুভাষায় রচিত হয় বহুকাল পূর্বে। কিন্তু নবম শতাব্দীর পূর্বের কোনো পুঁথি পাওয়া যায় নি। নিউ টেস্টামেণ্টের পুঁথি

---

১ Final Appeal (*English Works*, p. 733): "...which is translated in the Greek Septuagint, though not very correctly.. ." পাদটীকায়, 'not very correctly' কেন লিখেছেন তার কৈফিয়তে হিব্রু ও গ্রীক শব্দের তুলনা করেছেন।

Second Appeal (*English Works*, pp. 641-42)... quotation differing from the Hebrew, but agreeing with the Septuagint; quotations slightly varying from the Septuagint...etc., p. 661.

বাইবেল-সাহিত্যের উপর রামমোহনের কী দখল ছিল তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

মার্শম্যান সাধারণ বাইবেল হতে একটা উদ্ধৃতি করেছিলেন। রামমোহন শেষ আবেদনে লিখেছেন: "To show the error in the translation of the verse in the English version, I quoted in my Second Appeal the verse in the original Hebrew, and a translation from the Arabic Bible, and another from the Septuagint, with a literal English translation... " (*English Works*, p. 867).

রামমোহন জানতেন, যখন হিব্রু মূলের অনুবাদ নিয়ে মতভেদ হত, পণ্ডিতরা তখন Septuagint-এর অনুবাদ গ্রহণ করতেন। অতঃপর হিব্রু মূল ব্যাখ্যার জন্য যে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেছেন তা বিস্ময়কর (দ্র. *English Works*, pp. 667-69)।

হিব্রু বাইবেল থেকে অনেক পুরাতন। হিব্রু বাইবেলের গ্রীক অনুবাদ সেপ্তুয়াজিণ্ট ছাড়া সিরিয়াক ও লাতিন ভাষায় ওল্ড টেস্টামেণ্টের অনুবাদ আছে। সিরিয়াক ভাষার বাইবেল হিব্রু থেকে সরাসরি করা হয়েছিল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে। রামমোহনের লেখার মধ্যে সিরিয়াক বাইবেলের উল্লেখ পাই।[১] লাতিন-ভাষায় ওল্ড টেস্টামেণ্ট আছে— প্রথমটা গ্রীক সেপ্তুয়াজিণ্টের তর্জমা। পরে Jerome of Bethlehem হিব্রু থেকে লাতিনে অনুবাদ করেন চতুর্থ শতকের শেষে। এই গেল ওল্ড টেস্টামেণ্ট-এর মোটামুটি পরিচয়— যার ভূরি ভূরি উদ্ধৃতি পাই রামমোহনের রচনায়।

পুরাতন ধর্মগ্রন্থ ইহুদিদের দেবভাষায় লিখিত, যে ভাষায় তাদের ঈশ্বর তাঁর আদরের লোকদের (chosen people) কাছে কথা বলতেন ঋষিদের মারফত; হিব্রুভাষা পুরোহিত ও ধর্মধ্বজীরাই জানতেন। আর নিউ টেস্টামেণ্ট গ্রীকভাষায় লিখিত— সেও শিক্ষিতরা ছাড়া পড়তে পারত না। পূর্বেই বলেছি জনতার ভাষা ছিল আরামাইক। সাধু পল গ্রীকভাষায় যিশুর কথা প্রচার করেন রোমান সাম্রাজ্যে, শিক্ষিতরা সবাই তা বুঝত। কিন্তু কালে গ্রীকচর্চা রোমানদের মধ্যে লোপ পেল।

রোমান সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিমে ভাগ হয়ে গেলে কনস্টান্টিনোপ্‌ল্ গ্রীক-সংস্কৃতির ও রোম লাতিন-ভাষার পোষক হল। ফলে গ্রীক বাইবেল থাকল প্রাচ্য-রোমান সাম্রাজ্যের পাঁচ পাত্রিয়ার্কের বা মোহান্তের ধর্মের ভাষা— কনস্টান্টিনোপ্‌লের পাত্রিয়ার্ক প্রধান মোহান্ত রোমের পোপের প্রতিদ্বন্দ্বী। স্বাজাত্য-অভিমানে গ্রীক বাইবেল তাঁরা লাতিনে অনুবাদ করে (এই অনুবাদ করেন জেরোম চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে) চার্চের পাঠ্য বলে ফতোয়া দিলেন— সাধারণ লোকে লাতিন বাইবেলকে আসল বাইবেল মনে করল। য়ুরোপময় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হলে, এই

---

[১] "The copy which is now in my hands was printed in London, by Thomas Roycraft, in the year 1656. It contains, besides the Targum (Aramaic translation or paraphrase of the Old Testament) of Jonathan, the original Hebrew Text, together with the Septuagint, Syriac, and Arabic translations, each accompanied with a Latin interpretation."— "Second Appeal", *English Works*, p. 670, footnote.

লাতিন ভাষার বাইবেল দেবভাষার সম্মানলাভ করে। গ্রীক নিউ টেস্টামেণ্ট প্রাচ্য-রোমান সাম্রাজ্যে প্রচলিত থাকল ইসলাম-বিজয়ের কাল পর্যন্ত।

কিন্তু কালে লাতিন ভাষা সরে গেল, যেমন ভারতে সংস্কৃতের দশা হল নানা প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষার অভ্যুত্থানে। লাতিন ভাষার স্থলেও সাম্রাজ্যের নানা স্থানে লাতিনের প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষা দেখা দিল। ইতালীয় ভাষা চালু হল ইতালিতে। নূতন সাহিত্য সৃষ্ট হল সেই ভাষায়; তৎসত্ত্বেও ধর্ম-চর্চার ভাষা থেকে গেল লাতিন। চার্চের ধর্মরক্ষীরা লাতিন দেবভাষা থেকে এক কদমও নড়লেন না। অথচ পণ্ডিত ছাড়া লাতিন ভাষা কেউ বোঝেও না, পড়েও না। পাদরি পুরোহিতরা না বুঝে সেই ভাষায় মন্ত্র পড়েন, নিরক্ষর যজমান সেই ভাষা না বুঝে আউড়ে যায়, অনেকটা আমাদের দেশে সংস্কৃত মন্ত্র পড়ার মতো। সকল ধর্মের রক্ষীদের বিশ্বাস, দেবভাষা ছাড়া আর অন্য কোনো ভাষায় ভগবানের কাছে স্তবস্তুতি পড়লে তা অগ্রাহ্য হয়ে যায়, তাই মাতৃভাষায় 'মন্ত্র' পড়া যায় না কোনো ধর্মেই। এরই প্রতিক্রিয়ায় ভারতে নানা সন্ত, ফকির, মহন্ত, বাউলের অভ্যুত্থান হয়— তাঁরা হৃদয়ের কথা নিজের মাতৃভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

ভারতে কিভাবে ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে বাইবেল প্রচারিত হয়, সে কথা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। কিন্তু দেশীয় ভাষায় প্রচারিত হবার পূর্বে পোর্তুগীজ ভাষায় অনূদিত বাইবেল য়ুরোপ থেকে এনে বিতরণের ব্যবস্থা করা হত, তার কারণ পোর্তুগীজ ভাষা প্রায় দুই শো বৎসর সুদূর প্রাচ্যে চলিত ছিল।

কেরী বাংলাভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে উনিশ শতকের প্রথম থেকেই বিতরণ শুরু করেন। ১৮০১ থেকে ১৮০৯ অব্দের মধ্যে কেরী গ্রীক ও হিব্রু ভাষা থেকে বাইবেল অনুবাদ করেন। রামমোহন যখন ধর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন (১৮১৫) তখন বাংলাদেশে বাইবেলের বহু সহস্র কপি বিতরিত হয়ে গেছে। রামমোহন ইংরেজি বাইবেল পড়ে যিশুর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি খ্রীষ্টানদের সঙ্গে কী শ্রদ্ধা রেখে আন্তরিকভাবে মেলামেশা করতেন সে আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে।

যিশুর প্রতি আকর্ষণের কারণেই তিনি বাইবেলের ভালো অনুবাদ হবার আশায় ইয়েট্‌স্‌ ও অ্যাডাম -এর অনুবাদ-কার্যে সাহায্য করতে অগ্রসর হন, কিন্তু কেন সে তর্জমা ব্যর্থ হয়ে যায় সে কাহিনী অন্যত্র বলেছি।

রামমোহন বুঝতে পারলেন, সাধারণ খ্রীষ্টান ত্রিতত্ত্ববাদী বা ট্রিনিটেরিয়ানরা বাইবেলের ভাষাকে নিজেদের মতের অনুকূলে অনুবাদ করতে চান। রামমোহন খ্রীষ্টান সাম্প্রদায়িক মতামতের মধ্যে প্রবেশ না করে যিশুর উপদেশ বাইবেল থেকে সংগ্রহ করে *Precepts of Jesus* প্রকাশ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সংস্কৃতে ও বাংলায় তার অনুবাদও করেন। এ নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি।

বাইবেলের পাঠ ও তার ব্যাখ্যা নিয়ে য়ুরোপে অষ্টাদশ শতক থেকেই গবেষণা শুরু হয়েছে; অবশ্য এ দেশের ধর্মপ্রচারক পাদরিদের সে-সবের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। সে যুগে কেন, আধুনিক যুগেও, বিজ্ঞানীর স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে ও দার্শনিকের মুক্ত মন নিয়ে ধর্মকথা বোঝবার ও বোঝাবার, শোনবার ও শোনাবার শিক্ষা কি ব্যাপক হয়েছে? গতানুগতিক ভাবধারা ও মামুলি বুলির পুনরাবৃত্তি করেই মানুষ তৃপ্ত। সকলেরই চেষ্টা, অতীতের সঙ্গে যে তাঁরা অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত তারই প্রমাণ উৎকট করে তোলা। ড. হেজ সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছেন, এটা "an age when a boundless credulity disposed men to believe in wonders as readily as in ordinary events, requiring no stronger proof... than... hearsay and vulgar report; an age when literary honesty was a virtue almost unknown, and when, consequently, literary forgeries were as common as genuine productions, and transcribers of sacred books did not scruple to alter the text in the interest of personal views and doctrinal prepossessions."[১] এই অন্ধ ভক্তি, মূঢ়তা ও শঠতার যুগে নিউ টেস্টামেন্টের শাস্ত্র সংকলিত হয়। ফলে চারটি গস্‌পেলের মধ্যে অসংখ্য অসংগতি দেখা

১ Dr. Hedge, *Way of the Spirit* (1877), p. 325; quoted by Sunderland, p. 127.

দিল ; তার উপর সাধু পল্‌-এর অদম্য প্রয়াস— একটি মানুষকে কেন্দ্র করে ধর্ম গড়ে তোলা— বিষয়টাকে আরও জটিল করে তোলে। প্রাচীন কালে গ্রন্থের অসংখ্য পুঁথি কপি হত। সেই-সব কপিই লোকে কিনত, পড়ত। নিউ টেস্টামেণ্টের উদাহরণ নেওয়া যাক। হিসাব করে দেখা গেছে যে, নিউ টেস্টামেণ্টের গ্রীক পুঁথির সংখ্যা প্রায় চার হাজার। এ ছাড়া লাতিনে অনূদিত পুঁথির সংখ্যা প্রায় আট হাজারের কাছাকাছি। এ ছাড়াও সিরিয়াক, কপ্‌টিক্‌, আর্মেনিয়ান, ইথিওপীয়, প্রভৃতি ভাষায় লিখিত বা তর্জমা নিউ টেস্টামেণ্টের পুঁথিও কিছু কম নয়। Kenyon বলেছেন, "There are now in existence twelve thousand manuscript copies of the New Testament, of which not two are precisely *alike.*" বারো হাজার পুঁথির দুটো প্রতির পাঠ মেলে না!

প্রশ্ন উঠতে পারে, ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে এটি কেন হয়? অনুলেখকরা আজকালকার টাইপিস্ট ও কম্পোজিটরদের পূর্বসূরি— বিষয়ের অর্থ বুঝে কপি করবার শক্তি তাদের অল্প, তাই কপির সময় ভুল হয়— বুঝতে বা ধরতে পারে না। কেন পাঠান্তর হয় সে বিষয়ে হ্যামন্‌ড সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন, পাঠান্তর দু কারণে হয়— এক অনিচ্ছা বা অজ্ঞান -কৃত ; দুই ইচ্ছাকৃত, সজ্ঞানে সম্পাদিত। দৃষ্টিক্ষীণতা, শ্রবণশক্তির দুর্বলতা, স্মৃতিবিভ্রম, প্রভৃতি প্রথম দফার অন্তর্গত ভুলের জন্য দায়ী। আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠান্তর ইচ্ছাকৃত— বিশেষ মত প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রন্থের পাঠের অদল-বদল বা নূতন পাঠ সংযোজন করা হয় ; এই শ্রেণীর অসৎ পণ্ডিতের অভাব কোনো দেশে কোনো কালে ছিল না, সংস্কৃতেও তার ভূরি প্রমাণ রয়েছে।

ইচ্ছাকৃত পাঠান্তর সৃষ্টি (conscious or intentional alterations for dogmatic reasons) হচ্ছে সর্বনেশে কাজ। নির্বোধের বা অসতর্ক অনুলেখকের ভুলকে ক্ষমা করা যায়, কিন্তু যারা ইচ্ছা করে শাস্ত্রের পাঠান্তর ঘটিয়ে লোককে বিভ্রান্ত করতে চায় তারা ক্ষমার অযোগ্য।[১]

১ C. Hammond, *Outlines of Textual Criticism Applied in the New Testament,* Oxford (1890), p. 16.

Possible sources of various readings :

(*Continued*)

বাইবেলের পাঠান্তর ও তার ব্যাখ্যা নিয়ে যে গবেষণা হয় তার সাধারণ নাম Biblical criticism। এর দুটো ভাগ—পাঠান্তর-আলোচনা বা textual বা lower criticism, ও higher criticism অর্থাৎ মূল পাঠ সাব্যস্ত হলে তার অর্থবোধ বা ব্যাখ্যান নিয়ে বিচার।

পাঠান্তরের তুলনামূলক বিচারের দ্বারা মূল পাঠের কাছাকাছি আসতে পারলে লেখকের মনোগত ভাব সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়। Textual ও higher criticism[১] অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হলেই অর্থ পরিষ্কার হয়।

ব্রিটিশ ম্যুজিয়ামের ডিরেকটর ও গ্রন্থাগারিক স্যার ফ্রেডারিক কেনিয়ন (Kenyon) তাঁর *Handbook to the Textual Criticism of the New Testament* (1920) গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে অতিবিস্তারে পাঠান্তর-সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে "The function of textual criticism is to recover the true form of an author's text from the various divergent copies that may be in existence." (p. 3).

Unconscious or Unintentional	1. Errors of sight. 2. Errors of hearings. 3. Errors of memory.
Conscious or Intentional	4. Incorporation of marginal glosses. 5. Corrections of harsh or unusual forms of words, or expressions. 6. Alterations in the text to produce supposed harmony with another passage to complete a quotation or to clear up a supposed difficulty. 7. Liturgical insertions. 8. Alterations for dogmatic reasons.

চতুর্থ সংখ্যা সম্বন্ধে মন্তব্য : "Another fruitful source of various readings is that the possessor of a MS. would write in the margin some explanatory note which a subsequent scribe, with the MS. before him for a copy, looked upon as having been an accidental omission, and incorporated in his new text." (p. 16)

কোনো পণ্ডিত পুঁথি পড়বার সময়ে শ্লোকের পাশে কোনো ব্যাখ্যা নোট করেছেন—পরবর্তীকালে অনুলেখক সেই অংশগুলি গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করলেন এই ভেবে যে, পূর্ববর্তী অনুলেখক কপি করার সময়ে ভুলটা শুধরে নিয়েছেন পাশে লিখে। এইভাবে গ্রন্থের শ্লোক-সংখ্যা স্ফীত হয়ে ওঠে। পুনার ভাণ্ডারকার গবেষণা-মন্দির থেকে 'মহাভারত'-এর পাঠান্তর-যুক্ত সংস্করণের উপর চোখ বোলালেই দেখতে পাওয়া যাবে, কতশত হাতের ছাপ রয়েছে এই বিরাট গ্রন্থে।

১ "The work of the higher critic is to examine the traditions of authorship, to try to date works on internal grounds, judging how far the external testimony to their date is reliable, and to consider what evidence there is of unity of authorship in a work or what older sources may have been drawn on.— *Chambers's Encyclopedia*, Vol. II, p. 302.

মূল পাঠে যেমন বিবিধ প্রকারের ভুল ও কারচুপি চলে, অনুবাদের মধ্যেও তা দেখা যায়। বাইবেল-অনুবাদের মধ্যেও এ ধরনের স্বেচ্ছাকৃত ভুল ও অপব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নয়— সাম্প্রদায়িক ধর্মধ্বজী ও আদিপর্বের বাবাজিরা (Fathers) এ-সব কাজ উদার হস্তে করেছেন; ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা নিয়েই শাস্ত্রসাহিত্য।

আমরা ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে একটা উদাহরণ নিয়ে ব্যাখ্যার ও দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্য এখানে পেশ করছি। *Solomon's Songs* বাইবেল-পাঠকদের কাছে অতি সুপরিচিত; ইংরেজি বাইবেলে এই গীতাবলি একটা আধ্যাত্মিক কাহিনী রূপে ব্যাখ্যাত হয়ে আসছে। ঈশ্বর-প্রেমের প্রকাশ বলে এটি বাংলা বাইবেলে 'শলোমনের পরম-গীত' নামে অনূদিত হয়েছে। ইংরেজি বাইবেলের অনুবাদের উপক্রমণিকায় বলা হয়েছে—"The church's love unto Christ··· Christ's love to the church; the church glorieth in Christ. The church and Christ congratulate one another..." ইত্যাদি।

পুরাকালের খ্রীষ্টান বাবাজিদের (Fathers) মধ্যে Origen-এর খুব নাম, তিনি সলোমনের গীতকে Christ and Church বলে যে ব্যাখ্যা করেছিলেন সেটাই ইংরেজি বাইবেল-তর্জমায় গৃহীত হয়েছে। Driver তাঁর *Literature of the Old Testament* গ্রন্থে বাইবেলের এই বই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে বলেছেন: "There is nothing in the poem to suggest that it is an allegory; and the attempt to apply it to details results in great artificiality and extravagance." (p. 423).

ইংরেজি বাইবেলের ভাষায় *The Song of Songs* -এর নামের অনুকরণে Sir Edwin Arnold গীতগোবিন্দের অনুবাদ করে তার নাম দেন *The Indian Song of Songs*।[১] *Solomon's Songs* ও গীতগোবিন্দ একজাতীয় রূপক বা আধ্যাত্মিক কাব্য। সংস্কৃতে লিখিত হলেই তাকে যেমন শাস্ত্র আখ্যা দেওয়ার প্রবণতা ছিল, হিব্রুতে কিছু রচিত দেখলেই ইহুদিরা তাকে

---

১ Sir Edwin Arnold (1820-1904): *The Indian Song of Songs* from the Sanskrit of the *Gitagobinda* of Joydev.]

বাইবেলের অন্তর্গত করে শাস্ত্রের (canon) সম্মান দান করত। সলোমনের গীত হিব্রু থেকে গ্রীকে তর্জমা হয়ে সেপ্টুয়াজিণ্টের অন্তর্গত হওয়ায়, এর শাস্ত্রত্বের (canon) দাবি আরও বেড়ে যায়। ইহুদি পণ্ডিতরা এই কবিতার রূপক-অর্থ সর্বপ্রথম ব্যক্ত করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর অন্তে রাব্বি আকিবা এই 'গীতাবলি'কে শাস্ত্র সম্মান দিয়ে বলেন, 'the most sacred book' এবং এর মধ্যে 'the relation of Yahweh and his people' প্রকাশ পেয়েছে।[১]

The Song of Songs বা পরমগীত সম্বন্ধে একদল পণ্ডিত বলেছেন যে, তা অশ্লীল, শাস্ত্রগ্রন্থে স্থান পাবার অযোগ্য। অন্যদল বলেন, না, এটি রূপক—য়াহবা ও ইহুদি-জাতির মধ্যে যে নিবিড় সম্বন্ধ তারই আধ্যাত্মিক প্রকাশ। খ্রীষ্টানরা পরবর্তী যুগে য়াহবার স্থলে খ্রীষ্ট ও ইহুদি জাতির স্থলে চার্চ বসিয়ে তার রূপক-ব্যাখ্যা গড়ে তুললেন ; এবং সেইজন্য জেম্‌স্‌-এর বাইবেলে *The Song of Songs* শাস্ত্রগ্রন্থরূপে সন্নিবেশিত হয়। কোন্ গ্রন্থ কোন্ আদর্শ থেকে 'ধর্মগ্রন্থ' বা 'শাস্ত্রে'র সম্মান পেতে পারে, সেই মান বা standard প্রতিষ্ঠা করা একটা দুরূহ কাজ। Samuel Davidson তাঁর *The Canon of the Bible* গ্রন্থে (1880) বলেছেন, "Definite grounds for the reception or rejection of books were not very clearly apprehended।" মুক্ত মনে তথ্য সন্ধান ও তত্ত্ব বিচারের শিক্ষা আমরা বাল্যাবধি পাই নে ; কারণ ধর্মীয় ও সামাজিক মতামত বিষয়ে অভিভাবকরা চান যেন তাঁদের সন্তানরা তাঁদেরই ধারা বহন করে সন্তান নাম সার্থক করেন। প্রবীণদের চিরাচরিত বাসনা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিয়ে নবীনরা

---

১ "More than a century ago literary critics as Herder and Goethe felt that the book was a string of pearls or collection of beautiful love-lyrics, but during the past century the dramatic theory, in some form, has received the support of many distinguished scholars."

সিরিয়াতে এই ধরনের প্রেমগীতি বিবাহের সময়ে গীত হত— যেমন অনেক দেশেই ছিল। "It appears that the wedding festival lasts a week, that among the peasants the threshing floor was decorated as a throne, and that on it the bride and groom received homage, and were addressd as king and queen.... The book glorifies the love of man and woman, and associates this with the sweetness of spring."— Prof. W. G. Jordon, *The Song of Songs*, p. 419.

যেন 'বড়ো' হয়; মনের মুক্তির কথা তাঁরা ভাবতেই পারেন না। কিন্তু তা সম্ভব নয় মানুষের সন্তান সম্বন্ধে; সে যদি তার পূর্বপুরুষের প্রতিচ্ছবি হত তবে আজও আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মতো আরণ্যক ও গুহাবাসী থাকতাম। নর-বানরের ভেদ গড়ে উঠত না। আমরা পিতৃ-পিতামহের ছাঁচে গড়া নই, তাঁদের বাণীর ও মতের পুনরুক্তি ও চর্বিত-চর্বণ করছি না— এটাই মানুষের ধর্ম।

আমরা *The Song of Songs*-এর উদাহরণ নিয়ে কেন আলোচনা করলাম তার কৈফিয়তটা দেওয়া উচিত। মূলের ভাব ও ভাষা কিভাবে বিশেষ মতাবলম্বী অনুবাদকরা নিজেদের মতের অনুকূলে পরিবর্তিত করেন, এটি তারই দৃষ্টান্ত। সলোমনের তিন কুড়ি স্ত্রী এবং চার কুড়ি রক্ষিতা ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও, লেবাননের একটি মেষপালিকাকে দেখে, তাকে পাবার জন্যে তিনি উদগ্রীব হয়ে ওঠেন, সেই কাহিনীর[১] আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেছেন পণ্ডিতরা।

বিশেষ কোনো জাতির লোক বিশেষ একটা গ্রন্থকে 'ধর্মগ্রন্থ'রূপে যখন প্রচার করতে চায় তখন তাদের সংগৃহীত 'বই'টার মধ্যে যা-কিছু আছে সবটাকেই পবিত্র বলে মনে করে। তা না হলে *Solomon's Songs* -এর মতো love idyl কাব্যনাট্য আধ্যাত্মিকতার আবরণে ভূষিত হত না, গীতগোবিন্দও ধর্মকাব্য হয়ে মন্দিরে গীত হত না; আর পুরুষমেধ-যজ্ঞ ও শুনঃশেফ-কাহিনী বৈদিক ধর্মসাহিত্য ও রামায়ণে স্থান পেত না।

'শাস্ত্র' অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় রচিত যে-কোনো গ্রন্থ থেকে শ্লোক উদ্‌ধৃত করে অথবা স্বয়ং অনুষ্টুপ-ত্রিষ্টুপে শ্লোক রচনা করে সতীদাহের সপক্ষে ও বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে, এবং ঠিক অনুরূপভাবেই শ্লোক সংগ্রহ করে সতীদাহের

---

১ "There are three score queens,
And four score concubines,
And virgins without number,
My love, my undefiled, is but one ;
She is the only one of her mother ;
She is the pure one of her that bare her.
The daughters saw her, and called her blessed ;
Yet the queens and concubines, and they promised her."
— Moulton, *Readers' Bible*, p. 1446.

বিপক্ষে এবং বিধবা-বিবাহের পক্ষে যুক্তি খাড়া করা হয়েছিল। দেব-ভাষায় রচিত শ্লোক canon-এর মর্যাদা পেয়ে আসছে; সেই-সব তথা-কথিত শাস্ত্রকে অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন বা mysterious করে তুলে নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত লোকদের অভিভূত করে ধর্মধ্বজীরা একচ্ছত্র শাসন চিরস্থায়ী করতে চেয়েছেন। কিন্তু সব দেশেই সব ধর্মেই বহু পণ্ডিত আছেন যাঁরা colour-blind, অর্থাৎ বর্ণবোধহীন— সাতটা রঙ তাঁরা পৃথক করতে পারেন না। তাই তাঁরা লৌকিক অলৌকিক, বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পান না। আধুনিক ভারতীয় সমাজেরও এটাই হচ্ছে ট্র্যাজেডি।

রামমোহন বাইবেল ভালো করেই পড়েছিলেন। শুধু ইংরেজি অনুবাদ নয়, নিউ টেস্টামেণ্ট মূল গ্রীকে ও ওল্ড টেস্টামেণ্ট মূল হিব্রুতে পড়েন। তিনি যে খুব খুঁটিয়ে পড়েছিলেন তার প্রমাণ রয়ে গেছে তাঁর খ্রীষ্টান জনসাধারণের কাছে তিনটি আবেদনের মধ্যে। নূতন বাইবেলের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের পরিচয় রয়ে গেছে *Precepts of Jesus* গ্রন্থে। তিনি বলেন— "Study first the books of the Old Testament, unbiased by ecclesiastic opinions, imbibed in early life, and then to study the New Testament."[১] ...সমগ্র বাইবেল পড়া সত্ত্বেও এবং প্রাচীন টেস্টা-মেণ্ট অধ্যয়ন করার উপদেশ দিয়েও নিউ টেস্টামেণ্টের ছাব্বিশটি বইয়ের মধ্যে রামমোহন চারটি গস্‌পেল থেকে *Precepts of Jesus* গ্রন্থ সংকলন করেন; এই চারটি গ্রন্থের মধ্যে অনুবাদ সীমিত রাখার কারণ অনুসন্ধান করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বোধ করি।

গস্‌পেল চারখানি— ম্যাথু, মার্ক, ল্যুক ও জন্। যিশু সম্বন্ধে তথ্য, তাঁর বাণী, এই চারখানি গস্‌পেলে পাওয়া যায়; আর পাওয়া যায় অ্যাক্ট্‌স, এপিস্‌ল্‌স প্রভৃতি থেকে। পণ্ডিতরা বলেন, সাধু পলের লেখাই যিশু সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন রচনা। গস্‌পেলগুলির রচয়িতা কে বা কারা তা জানা যায় না; যিশুর মৃত্যুর পর দরিদ্র শিষ্যের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়; তাঁদের সরল বিশ্বাস, গুরু ফিরে আসবেন (Resurrection)। তাই তাঁর

---

১ "Final Appeal", *English Works*, p. 688.

সম্বন্ধে আলোচনা মুখে মুখেই চলতে থাকে। বহু বছর পরে যিশুর বাণী (logia) দেশের কথ্যচলিত ভাষা আরামাইকে সংগৃহীত হয় (আনুমানিক খ্রীষ্টাব্দ ৬০)। পণ্ডিতরা বলেন, মুখে মুখে শোনা কথা থেকে যে যার মতো করে গস্‌পেল সম্পাদন করেন। তাঁরা বলেন জন্-এর গস্‌পেল এসিয়াতেও লিখিত হয় নি।

ম্যাথু, মার্ক ও ল্যুক -এর সুসমাচার-ত্রয়ের মধ্যে বহু তথ্য ও তত্ত্বের মিল দেখে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, সে সবের অন্তরালে কোনো উৎস (Source = জর্মান ভাষায় Quelle = Q সংক্ষেপিত প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়) ছিল। "This hypothetical source used to be spoken of as the 'Logia'।[১] এ সম্বন্ধে প্রায় সমকালীন (১২৫ খ্রীষ্টাব্দ) নজির রয়েছে এক বিশপের লেখায়; তিনি বলেন, "Matthew, in the Hebrew dialect [Aramaic], compiled the Logia, and each one interpreted them according to his ability."[২] এই অজানা উৎস থেকে ম্যাথু তাঁর গস্‌পেলে বহু বাণী উদ্‌ধৃত করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তবে Logia-র সব উদ্‌ধৃতিই যিশুর বাণী এ কথা তো মানবার মতো নয়; কারণ, অনেক উক্তিই পুরাতন বাইবেলের নানা প্রফেটের বাণী রূপে চলিত ছিল। পুরাতন বাইবেলে পাওয়া যায় না এমন বাণী যিশুর মুখে খুবই কম গস্‌পেল-লেখকরা যোগান দিতে পেরেছিলেন।

এই তিনটি গস্‌পেলের মধ্যে মার্ক-এর বইটিতে জীবনের তথ্য বেশি পাওয়া যায়। অন্যেরা এর থেকেই তথ্য সংগ্রহ করেন, আর কিছুটা শোনা কথা বা কল্পনা থেকে ভরিয়ে তোলেন। "If Mark is our oldest Gospel, it throws great new light upon the whole development of New Testament thought. For Mark is unquestionably the simplest Gospel, the one that represents Jesus as the most distinctly and simply human, and enunciates his message in the most easily understood form. While Matthew begins with a long and impossible geneological table and a whole cycle

১ Canon B. H. Streeter, "The Synoptic Problem", *Peake's Commentary of the Bible*. p. 672.

২ A. J. Grieve, "Matthew", *Peake's Commentary of the Bible*, p. 700.

of miraculous birth stories ; while Luke devotes the most of its first two chapters also to birth stories filled with supernatural marvels, and while John begins its story in heaven, by representing the Eternal word[১] as becoming incarnate and descending to Earth, Mark begins with the simple and plain words, "The beginning of the Gospel of Jesus Christ."[২]

ম্যাথু, মার্ক ও ল্যুকের বাইবেলের মধ্যে মিল ও অমিল নিয়ে পণ্ডিতরা অনেক গবেষণা করেছেন ; তাঁরা এর নাম দিয়েছেন Synoptic Problem। এঁদের আলোচনা এই তিন গস্‌পেলের মধ্যে সীমিত— জন্‌-এর গস্‌পেল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের বলে তাঁরা জন্‌কে সিনপ্‌টিক সমস্যার অন্তর্গত করেন নি।[৩]

জন্‌-এর গস্‌পেল বা যোহন-কৃত সুসমাচার আর প্রথম তিনটি গস্‌পেলের মধ্যে ভেদ বেশ স্পষ্ট। James Warschaner তাঁর *The Problem of the Fourth Gospel* গ্রন্থে যা বলেছেন, তা উদ্ধৃত করছি—"Those in Matthew, Mark and Luke have for their main subject the kingdom of God, and how to inherit or enter it; while those in the fourth Gospel are as predominantly occupied with the person of Jesus, his natures, mission, relation to the father

১ "In Hebrew thought about God's relation to the world, the world of active command, rather than the reason which plans and purposes, is prominent.."— Dr. A. E. Brooke, "*John*", *Peake's Commentary of the Bible*, p. 745। সেইজন্য জন্‌-এর গস্‌পেল শুরু হয়েছে এই কথা বলে যে, In the beginning was the word (Logos)। তারপরে word সম্বন্ধে যে-সব কথা আছে তা Tolstoy-এর মতে অর্থহীন। তিনি বলেন, Logos-এর অনেক অর্থ ; এখানে comprehension হওয়া উচিত, অর্থাৎ 'উপলব্ধি'র দ্বারা জানা প্রয়োজন। আমি তর্জমা করব 'জিজ্ঞাসা' শব্দ দিয়ে। তোলস্তয় ব্যাখ্যা করে বলেছেন— reasonable activity in relation to cause হচ্ছে Logos শব্দের নির্গলিত অর্থ, অর্থাৎ 'The comprehension of life stood for God.'। —*Four Gospels Harmonized and Translated*, Vol. I, pp. 24-25.

২ J. T. Sunderland, *The Origin and Character of the Bible*, revised by Clayton R. Bowen, Calcutta (1936), pp. 119-20.

৩ *A Companion to Biblical Studies*, Chapter VII, pp. 163-67 -এর মধ্যে The Synoptic Gospels সম্বন্ধে আলোচনা আছে। *Peake's Commentary of the Bible* গ্রন্থে Canon B. H. Streeter 'The Synoptic Problem' সম্বন্ধে দীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন (pp. 672-781)।

and to mankind, and salvation through belief in him as the SON. In other words, the Jesus of the synoptics is chiefly a great teacher of applied religion, the Jesus of the Fourth Gospel is a theological figure, expounding himself under a variety of thought-allegories, as the Bread, the Door, the Vine, etc., all of which are without parallel in the first three Gospels." (Quoted by Sunderland, p. 128) ।

জন-এর গস্‌পেল দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত বলেই পণ্ডিতরা সিদ্ধান্ত করেছেন— তখন যিশু সম্বন্ধে ভক্তদের ধারণা এবং ভাবনা বহুলপরিমাণে mystical হয়ে উঠেছে।

রামমোহন যে Precepts সম্পাদন করেন, তাতে জন্‌ থেকে উদ্‌ধৃতি অপেক্ষাকৃত কম— ম্যাথুর থেকেই বেশি; কারণ ধর্মের বা নীতির শ্রেষ্ঠ বাণী ম্যাথু-কর্তৃক Logia থেকে সংগৃহীত হয়েছিল।

নিউ টেস্টামেণ্টের চার গস্‌পেলই ছিল আদি খ্রীস্টানদের ধর্মশাস্ত্র বা canon (কানুন)। দ্বিতীয় দফায় বহু বৎসর পরে সাধু পলের পত্রসাহিত্য কানুন বলে স্বীকৃত হয়। একটা ধর্মমত উঠলেই তার পাশে বিরোধী মত ওঠে, বা পুরাতন সম্প্রদায় নূতনের সঙ্গে লড়বার জন্যে কোমর বাঁধে। খ্রীষ্টানদেরও শত্রুর অভাব হয় নি, তাই যিশুর শিষ্যরা (apostles) তাঁদের গুরু সম্বন্ধে কী মতামত পোষণ করতেন তা খ্রীষ্ট-অনুরক্ত জনতার কাছে পেশ করার প্রয়োজন হয়েছিল। তখন থেকে epistle প্রভৃতিকে শাস্ত্র বা কানুনের সম্মান দেওয়া হল। কিন্তু সব পত্র যে সাধু পলের রচনা তা তো নয়; কতকগুলির প্রাচীনত্বের দাবি সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তৎসত্ত্বেও দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকের মধ্যে এই-সব গ্রন্থকে কানুন বা শাস্ত্রগ্রন্থ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। এইভাবে নিউ টেস্টামেণ্টের চারখানি গস্‌পেল ছাড়া অন্য ২৫টি বই শাস্ত্রপদবাচ্য হয়।

যিশু সম্বন্ধে রামমোহন যে ব্যাপক ও গভীর আলোচনা করেছেন কোনো অখ্রীষ্টানকে তাঁর পূর্বে বা পরে তা করতে দেখি না। যিশু-খ্রীষ্টের কিংবদন্তীমূলক জীবনের মধ্যে এমন মহত্ত্ব ছিল যা রামমোহনকে

আকৃষ্ট করে। শুধু 'সৎ উপদেশ'-এর সংগ্রহ মানুষকে তৃপ্তি দেয় না; সংস্কৃত পালি ধর্মগ্রন্থ বা পৃথিবীর নানা সদ্‌গ্রন্থ থেকেই সদুপদেশ সংগ্রহ করে কোনো ভক্তের মুখে তাঁর নিজ বাণী বলে প্রচার করা যায়। কিন্তু বাইবেলের উপদেশের সঙ্গে মিশে আছে ভক্ত যিশুর কর্মময় জীবন—উপদেশে যা বলেছেন জীবনে তা পালন করেছেন, এ দৃষ্টান্ত তুলনাহীন। তাঁর মানবপ্রেম, আর্তসেবা, দুঃখীর দুঃখ দূর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা এবং সত্যের জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ—প্রত্যেক দরদী হৃদয়কেই আকর্ষণ করে। এই প্রেমের ঠাকুর এইজন্যই তো বিশ্বের প্রণম্য হয়েছেন। কিন্তু অতিভক্তের চোখে তিনি অবতার, ঈশ্বর; মানুষ সম্বন্ধে এ মূঢ়তা রামমোহন সহ্য করতে পারেন নি। যিশুকে তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ সাধক রূপেই শ্রদ্ধা করেছিলেন।

যিশু সম্বন্ধে গত দু হাজার বছর ধরে কত আলোচনা হয়েছে। কিন্তু গস্‌পেল-বর্ণিত জীবনকথা থেকে তাঁর কায়াময় জীবনসত্তার ছবি ফুটে ওঠে না, এমন-কি ঘটনাবলীও এমন পরস্পরবিরোধী যে শেষ পর্যন্ত একটা জীবনালেখ্য সৃষ্টি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। মহাজ্ঞানী Schweitzer আজীবন খ্রীষ্টের বাণী ও আদর্শ রূপায়ণের চেষ্টা করে এসেছিলেন; তিনি ঐতিহাসিক যিশুকে খুঁজে বের করবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর *The Quest of the Historical Jesus* গ্রন্থে, গত দেড় শত বছরের মধ্যে যে-সব ফরাসী ও জরমান পণ্ডিত ঐতিহাসিক যিশুকে খুঁজে বের করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে বেড়িয়েছেন, তাঁদের সকল তথ্য বিচার করেছেন; কিন্তু যাঁকে খুঁজছিলেন তাঁর ছায়াময় প্রতীকই দেখতে পেলেন, কায়াময় রূপকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন না। সোয়াইটজার এই সুবৃহৎ গ্রন্থে যিশু সম্বন্ধে আলোচনা করে যা বলেছেন, সেই কথাটাই নারদ বলেছিলেন বাল্মীকিকে—

> "নারদ কহিলা হাসি, সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
> ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
> রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

সোয়াইটজার বললেন, "We can find his designation which expresses what He (Jesus) is for us. He comes to us as one unknown, without a name.... He came to those men who knew him not. He speaks to us the same word 'Follow thou

me !' and sets us to the tasks which He has to fulfil in our time. He commands and to those who obey him.... He will reveal himself in the foils, the conflicts, the suffering which they shall pass through in His fellowship and as an ineffable mystery, they shall learn in their own experience who He is." (p. 401) আপনার মনোভূমির গহনে সাধক যিশুকে অনুভব করা যায়— কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে ধরা-ছোঁওয়া যায় না।

রামমোহন যেভাবে খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদের অমরত্ব প্রমাণ করবার জন্য লেখনীধারণ করেছিলেন, অর্ধশতাব্দী পরে আর-একজন মনীষী তেমনি খ্রীষ্টানধর্মের ত্রিত্ববাদ ও খ্রীষ্ট সম্বন্ধে পুঞ্জীভূত মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করে বিরাট গ্রন্থ লিখেছিলেন, তিনি কাউন্ট লিও তোলস্তয় (Tolstoy, 1828-1910)।

আমরা ম্যাথু, মার্ক, ল্যুকের গস্‌পেলের মধ্যে, ঐতিহাসিক ঘটনার ভাষার ও ভাবের মিল ও অমিল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যে Synoptic আলোচনা হয়েছে, তার আভাস মাত্র দিয়েছি। তোলস্তয়ের *Four Gospels Harmonized and Translated* নামে দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থ গস্‌পেলগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য-সন্ধানের বিরাট প্রয়াস; এই গ্রন্থ তিনি পঞ্চাশোর্ধে লেখেন (১৮৮০-৮২)।[১] এই গ্রন্থ পড়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, রামমোহনের সঙ্গে তোলস্তয়ের খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে মতের ও ভাবনার অদ্ভুত মিল দেখে। যিশু ও গস্‌পেল সম্বন্ধে তোলস্তয়ের শ্রদ্ধাভক্তি না থাকলে তিনি কখনও এত পরিশ্রম করে সেগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যের সন্ধান করতেন না; তিনি বললেন— "The reader must not forget that the customary conception that all four Gospels,

---

১ *The Complete Works of Count Leo Tolstoy* : Vol. XIV-XV. Translated from the original Russian and edited by Leo Wiener, Assistant Professor of Slavonic Languages at Harvard University ; Dent, 1904 (2 vols.).

তোলস্তয়ের এই বইটির শেষে Short Exposition of the Gospel নামে একটি পরিচ্ছেদ আছে; এটি "is an extract from a large work which is lying in manuscript and cannot be printed in Russia"। তোলস্তয় প্রচলিত খ্রীষ্টানীতে বিশ্বাস করতেন না। সেইজন্য তাঁর মৃত্যুর পর গ্রীক চার্চের ধর্মধ্বজীরা চার্চপ্রাঙ্গণে তাঁর দেহ কবরিত করতে দেবে না, তা তিনি জানতেন। যাস্‌নায়া-পলিয়ানাতে বার্চ-অরণ্যে এক বৃক্ষতলে তাঁর মরদেহ কবরিত হয়েছিল।

with all their verses and letters, are sacred books, is, on the one hand, a very gross error, and on the other, a very gross deception." (Vol. II, p. 371)।

তোলস্তয় বিশ্বাস করতেন না যে, গস্‌পেল যেভাবে আমাদের কাছে এসেছে, তার সবটাই ম্যাথু, মার্ক, ল্যুক -লিখিত। আর "certain books cannot become sacred from the first to the last line for the very reason that men say that they are sacred" (p. 372)। লোকে বললেই কোনো গ্রন্থ 'শাস্ত্র' হয় না। তোলস্তয় স্পষ্ট ভাষায় বললেন, গস্‌পেল ম্যাথু-প্রমুখ শিষ্যদের লেখা যে বলা হয় তা 'is a fable'। বহু যুগ ধরে "the Gospels were selected, complemented and expounded"। বহুকাল ধরে সংগৃহীত, সংযোজিত ও ব্যাখ্যাত হয়ে তথ্য ও তত্ত্ব জমে ওঠে। তোলস্তয় Holy Ghost -এর কল্পনাতে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলেছেন, গস্‌পেল "by no means productions of the Holy Ghost who spoke to the evangelists"। তোলস্তয়ের মতে যিশুর নিজস্ব ধর্মমত অতি মহান্, কিন্তু "false interpretations"-এর জন্য দায়ী "Paul, who did not properly understand Christ's teaching" (p. 376)। Old Testament -এর পরিপূরকরূপে New Testament "was introduced into Christianity by Paul"— এত বড়ো সত্য কথা কোনো খ্রীষ্টভক্ত সাহস করে বলতে পারেন নি।

হিন্দিতে প্রবাদ আছে, গুরু মিলে লাখে লাখ, চেলা না মিলে এক— এর অর্থ হচ্ছে, গুরুর কথা জীবনে রূপায়িত করবার জন্য উপযুক্ত শিষ্য দুর্লভ। খ্রীষ্টকে নিয়ে সাম্প্রদায়িক শিষ্যদের মধ্যে কি কম তাণ্ডব চলেছিল! "All the differently believing christians call themselves true christians and deny each other··· They all say one and the same thing : our church is the True, Holy, Catholic, Apostolic, Universal Church. Our Scripture is holy."[১]

এ কথা খ্রীষ্টানদের সম্বন্ধে যেমন খাটে, হিন্দুদের সম্বন্ধেও তেমনি; মুসলমানদের মধ্যে শিয়া, সুন্নি, কাদিয়ানীদের বিষয়েও প্রযোজ্য। প্রত্যেক

[১] Tolstoy, *Four Gospels Harmonized*, Vol. I, p. 7.

সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থের যে অনুবাদ করেন তাকেই প্রামাণিক বলে মানেন।

প্রাচীন ইহুদি ধর্ম ও সমাজনীতি থেকে যিশুর জীবন ও ধর্মজিজ্ঞাসা যে একটা বড়ো রকমের বিপ্লব তা খ্রীষ্টধর্মের গুরুদের হৃদয়ংগম হতে সময় লেগেছিল। খ্রীষ্টীয় চার্চের এবং ইহুদিদের ধর্মবিশ্বাস, আচার ও পালপার্বণ মানার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে আশমান-জমিন তফাত মনে হতে পারে। আসল ভেদটা ছিল সমাজভাবনায়। খ্রীষ্টীয় চার্চ আজ পর্যন্ত ইহুদি ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে নি, তাই তারা সমস্ত মৃত পৌরাণিক অবৈজ্ঞানিক অদার্শনিক তত্ত্বের বোঝা অন্য-সকল সমাজের মতোই বহন করে নিয়ে চলেছে: "...the blunder made by the church in acknowledging the Old Testament as much a divinely inspired Scripture as the New Testament, is, in the most obvious way, reflected in this that the Church recognizes this in words, but not in fact, and so has fallen in contradictions from which it would never extricate itself, if sound reasoning were at all obligatory for it."[১]

সেইজন্য তোলস্তয় তাঁর বাইবেল-আলোচনায় পরিষ্কার বললেন, "...so I leave out the writings of the Old Testament, the revealed scriptures..."[২]

এই প্রাচীন পরম্পরার বা tradition-এর বোঝা থেকেই ধর্মের যত ভুল-বোঝাবুঝির জন্ম হয়েছে : "...this doctrine of the tradition...was the chief cause of the distortion of the christian teaching and of its misunderstanding." (vol. II, p. 376)। পল্-এর সময় থেকে doctrine of the church -এর পত্তন হল— chain of revelation -এর শুরু এখানেই। তোলস্তয় বলছেন, "These false interpreters call Jesus a God." 'হোলি গোষ্ট' ভাবনাকে তোলস্তয় রামমোহনের ন্যায়ই তিরস্কার করেছেন— the interpretation...that... the revelation of the Holy Ghost...is the only true revelation, and that all the rest are false, produces hatred and the so-called sects... But the

[১] *Four Gospels Harmonized,* Vol. I, p. 13.
[২] *Ibid.*

proclamation that the expression of a given dogma is divine, of the Holy Spirit, is the highest degree of pride and stupidity. ... nothing more stupid can be said than··· the assertion of a man that God is speaking through his mouth."

তোলস্তয়ের মতে, খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টের ধর্ম বলে যা প্রচার করেন, সে-সব 'foreign to Christ' (p. 380)। খ্রীষ্টের মত বলে প্রচারিত হয় "God is a trinity, that the Holy Ghost descended on the apostles··· that seven sacraments are needed for salvation, ... " ইত্যাদি। এ সমস্তই তোলস্তয় খণ্ডন করেছেন।

রামমোহন যে উদ্দেশ্য থেকে *Precepts of Jesus* সম্পাদন করেছিলেন, তোলস্তয়ের উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল দেখতে পাচ্ছি : "I look on Christianity not as an exclusive divine revelation, nor as on a historical phenomenon, but as on a teaching which gives us the meaning of life." রামমোহনও এই জীবনের অর্থসন্ধানে ধর্মবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন—*Precepts of Jesus*-কে বলেছিলেন Peace and Happiness -এর উৎস। এ প্রসঙ্গে তোলস্তয়ের উদ্দেশ্য তুলনীয় :

"We must study only Christ's teaching, as it has reached us, that is, those words and actions which are ascribed to Jesus and which have a dialectic significance." (Vol. II, p. 384) গ্রন্থের শেষ বাক্য উদ্‌ধৃত করলাম : "If they do not renounce the lie there is but one thing left for them to do : to persecute me for which I, finishing this writing, am prepared with joy and with fear for my weakness" (Vol. II, p. 385)। তুলনা করা যায়—"It was the abolition of Suttee which let loose the floods of reactionary fury. Avarice and bigotry··· had been hard hit ; and they demanded a victim. Rammohun was marked out as the guilty party. He was the traitor within the gates, who had sold the keys to the infidel oppressor. Therefore he must die."[১]

---

১ S. D. Collet, *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, p. 286.

রামমোহন আরবি ফার্সি ভালো করে পড়েছিলেন, মূল কোরান থেকে তাঁর অনেক উদ্‌ধৃতি তার প্রমাণ। আবার বাইবেলও যে সযত্নে অধ্যয়ন করেন তার ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে তাঁর তিনটি *Appeal*-এর মধ্যে; এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা অন্যত্র হয়েছে। সংস্কৃত শ্রুতি ও বেদান্ত তিনি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁর বাংলা গ্রন্থাবলীর প্রতিটি পৃষ্ঠা।

সকল ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ (canon) প'ড়ে, তিনি কোনোটিকেই চরম ও পরম সত্য বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বুঝেছিলেন, সব ধর্মের মধ্যেই কিছু সত্য আছে, কিন্তু কোনো ধর্মেরই সবটা সত্য নয়। আধুনিক কালের মানুষের এটাই হচ্ছে ধর্মাদর্শ— ধর্মের পূর্বে বিশেষণ প্রযুক্ত হলেই বিশুদ্ধ ধর্মভাবনার সমাধি সুনিশ্চিত।

হিন্দুদের বেদান্তের ব্রহ্ম, সেমেটিকদের য়াহবা (Jehovah) ও ইসলামের ঈশ্বর, এঁদের কেহই রামমোহনকে তৃপ্তি দেন নি। হিন্দুর বেদান্তের ব্রহ্ম নির্বিকার নির্বিকল্প, মানুষের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে— তাঁর অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব সম্বন্ধে সাধারণ মানুষও নির্বিকার। এর বিপরীত হল প্রতিমা প্রতীক -পূজা— যেখানে ঈশ্বরে আরোপিত গুণাগুণের শিল্পীসৃষ্ট মূর্তিকে কেন্দ্র করে হিন্দুরা তাঁদের নিয়ে রীতিমত গৃহস্থালি গড়ে তোলে কল্পিত স্বর্গে ও বাস্তব সমাজে। রামমোহন কোনোটিকেই চরম বলে গ্রহণ করতে পারলেন না।

সেমেটিক য়াহবা ছিলেন কালদিয়া-উর (Ur) অঞ্চলে ইহুদিদের গ্রাম্য দেবতা— শীতলা-ঠাকুরানীর মতো, দোলায় (Ark) চড়িয়ে লোকে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। দেবতা ছিলেন পরিবারের রক্ষাকর্তা, আমাদের দেশের গৃহদেবতা কুলদেবতা বাস্তুদেবতার মতো। ইহুদিরাও মনে করত, প্রত্যেক জাতির নিজ নিজ দেবতা তাদের রক্ষা করেন। একই ঈশ্বর সর্বকালের সর্বলোকের আশ্রয় ও গতি— এ ভাবনা অস্পষ্ট ছিল। কালে, ধীরে ধীরে ঈশ্বরের অমূর্তশক্তির কল্পনা এল ইহুদিদের ঋষিদের মনে। য়াহবা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণার আমূল সংস্কার হল ব্যাবিলনে নির্বাসনে বাস-কালে জরথুস্ত্রীয়দের সংস্পর্শে আসার পর। সেমেটিক-ধর্মের দেবতা রাজার আদর্শে কল্পিত— তিনি ন্যায়দণ্ড ধারণ করে

আছেন। পুণ্যবান ও পাপী দুই জাতের মানুষ আছে— পুণ্যবান চিরকাল স্বর্গসুখ ভোগ করবে, পাপী চিরন্তন নরকে পুড়বে— বিচার হবে কিয়ামত দিনের পর। এই ধারণা থেকে খ্রীষ্টানদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি দেখা দেয় —বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী— faithful ও heathen -এর ভেদ। মুসলমানদের মধ্যে হল মুসলিম ও কাফের -ভেদ। ইসলামের চোখে 'মুসলমান' ও 'বুদপরস্ত'-পূজক এক নয়, অমুসলমান রাজ্য-মধ্যে একই অধিকার পেতে পারে না; তারা মুসলিমের জিম্মি, আমানত— সমান নয়। সেমেটিকদের ভগবান অবিশ্বাসী পাপীর উপর নিষ্ঠুর। সেমেটিক-ধর্মের সমস্ত ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে বিদ্রোহী ঋষি যিশু বললেন, 'ক্ষমা করো, ক্ষমা করো দুর্বলকে, পাপীকে।' তিনি পাপী-উদ্ধারের জন্য এলেন; যে অস্পৃশ্যদের ঘর ইহুদিদের শুচি পুরোহিতরা কস্মিনকালেও মাড়াতেন না, সেখানে গেলেন প্রেমের প্রতীক যিশু। কিন্তু যিশুর প্রেম কখনও উচ্ছ্বাসে প্রকাশিত হয় নি; কর্মে, আর্তসেবার মধ্য দিয়ে তা রূপ গ্রহণ করে— যা কালে খ্রীষ্টানদের বৈশিষ্ট্য হল পৃথিবীর সর্বদেশে— আমাদের সময়ে কলকাতায় মারিয়া থেরেসার আর্তসেবা যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন: "I am not come to call the righteous, but sinners to repentance." "They that be whole need not a physician but they that are sick." (Matthew, 9 : 12, 13)

রামমোহনকে আকর্ষণ করেন প্রেমের ঠাকুর যিশু— তাঁর সেবার আদর্শ, তাঁর আত্মনিবেদনের বাণী। ইহুদি বা সেমেটিকদের ন্যায়দণ্ডধারী ঈশ্বর তাঁর মনকে স্পর্শ করতে পারে নি। বেদান্তের নির্বিকল্প নির্বিকার ব্রহ্মের উপাসনা ধ্যানের মধ্য দিয়ে সম্ভবে, কিন্তু বেদ-বেদান্তের মধ্যে কোথাও মানব-সেবার কথা শোনা যায় না। যিশুর আর্তসেবার কর্মময় রূপ ও তাঁর প্রেমের বাণীর অনুরূপ উপদেশ তিনি বেদান্তাদি গ্রন্থে পান নি। বাইবেলের গস্‌পেলের মধ্যে যে উপদেশ পেলেন তা, তাঁর মনে হল, সকল মানবের সুখ-শান্তির আকররূপে স্বীকৃত হবার যোগ্য। বেদান্তের ব্রহ্মবাদের পরিপূরক যিশুর প্রেমধর্ম— এই দুইয়ের সংযোগে ধর্মসাধনা পরিপূর্ণ হবে। ভাগবতেও প্রেমধর্ম প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু তা পৌরাণিকতা ও প্রতীক-প্রতিমাদির পূজা হোম নৈবেদ্য প্রসাদ প্রভৃতি বিচিত্র অনুষ্ঠানে আকীর্ণ বলে রামমোহন বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্মে কখনও আকৃষ্ট হন নি।

রামমোহন তাঁর *Precepts of Jesus* -এর উদ্ধৃতিগুলি প্রচলিত ইংরেজি বাইবেল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন (১৮২০ অব্দ)। যাকে authorized version বলে সেরকম ইংরেজি বাইবেল মুদ্রিত হয় ১৬১১ সালে ইংলন্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের সময়ে। এই পাঠই রামমোহন ব্যবহার করেন ; বর্তমানে সচরাচর আমরা যে বাইবেল দেখি তা revised version বা পরিমার্জিত রূপ। তার নূতন অংশ বা New Testament মুদ্রিত হয় ১৮৮১ অব্দে ও Old Testament ১৮৮৫ অব্দে। সংশোধনের কাজ শুরু হয়েছিল ১৮৭০ সালে। সুতরাং এই পরিমার্জিত রূপ রামমোহন ব্যবহার করেন নি।

ইংরেজিতে বাইবেল অনূদিত হয় চতুর্দশ শতকের আট দশকে (১৩৮২-৮৮ খ্রীষ্টাব্দ), অনুবাদক জন্ ওয়াইক্লিফ ও তাঁর বন্ধুরা। হাতে লেখা এই বাইবেল চলল শতাধিক বছর। ষোড়শ শতকে উইলিয়াম টিন্‌ডেল নিউ টেস্টামেণ্ট গ্রীক থেকে তর্জমা করেন ; কিন্তু ইংলন্‌ডে ছাপাতে পারলেন না, জারমেনিতে গিয়ে তা মুদ্রিত করেন (১৫৩৫-৩৬)। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে ইংরেজি ভাষায় মুদ্রিত বাইবেল পাওয়া যায় নি।

বাইবেলের পণ্ডিত রূপে কভারডেল খুবই খ্যাতিমান। ক্রমওয়েলের সময়ে ইনি বাইবেলের অনুবাদ প্রস্তুত করে প্যারিসে তা ছাপানো শুরু করেন। কিন্তু লোকভাষায় বাইবেল ক্যাথলিক দেশে ছাপা হচ্ছে, এই সংবাদ পেয়ে Inquisitor-General, অর্থাৎ ক্যাথলিক-ধর্মের রক্ষক, মুদ্রণ-কার্য বন্ধ করে দেন। ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের ধারণা, লাতিন-ভাষায় অনূদিত বাইবেলই আসল ধর্মশাস্ত্র এবং লোকভাষায় ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ পাষণ্ডের কাজ।

১৮৮১ সালে যখন বাইবেল সংশোধন করার জন্য কমিটি গঠিত হয়, রোমান-ক্যাথলিকরা তাতে যোগদান করেন নি। এতদিন পর্যন্ত ক্যাথলিকদের সমস্ত ধর্মকর্ম পাদরিরা লাতিন-ভাষায় চালিয়ে আসছেন। বর্তমানের নূতন পোপ কিছুটা সংস্কার করেছেন— বলছেন, যজমানের ভাষায় ধর্মকথা শোনাতে হবে। সকল ধর্মের রক্ষীরা মনে করেন, দেবভাষায় শাস্ত্র না পড়লে তা ফলপ্রদ হয় না— সে ধর্মমূঢ়তা থেকে এখনও সব দেশের সভ্য মানুষ মুক্তি পায় নি। শাস্ত্রগ্রন্থ লোকভাষায় প্রচার করেছিলেন বলে রাম-

মোহন হিন্দুধর্মরক্ষীদের (Pillars of the Hindu Society) কাছ থেকে কিভাবে তিরস্কৃত হয়েছিলেন, সে কথায় যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে।

বাইবেল অধ্যয়ন করে রামমোহনের ধারণা হয় যে, খ্রীষ্টানরা যেভাবে যিশুকে লোকসমক্ষে প্রায়-দেবতা বা অবতার বানিয়ে প্রচার করছে, তার সমর্থন মূল গ্রন্থে পাওয়া যায় না ; আর তা ছাড়া এ নিয়ে খ্রীষ্টানদের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। অথচ যিশুর উপদেশের মধ্যে যে বিশ্বজনীন ভাব রয়েছে তা তুলনাহীন। হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ভাবনা যেমন করে তিনি বেদান্তের বঙ্গানুবাদের মধ্য দিয়ে সর্বলোকের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, এবং ইংরেজিতে অনুবাদ করে অভারতীয়দিগকে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছিলেন, ঠিক তেমনি করে যিশুর বাণী সংগ্রহ করে, তার বাংলা ও সংস্কৃত অনুবাদ করারও তাঁর ইচ্ছা ছিল। ইংরেজি সংগ্রহটি মুদ্রিত ও বিতরিত হয়, কিন্তু বাংলা ও সংস্কৃত অনুবাদ শেষ পর্যন্ত করে উঠতে পারেন নি। হয়তো কাজের চাপে, অথবা *Precepts* প্রকাশের পর খ্রীষ্টান পাদরি ও সাধারণে তাঁকে যেভাবে হেনস্তা করেন তাতে, তাঁর ভারতীয় ভাষায় খ্রীষ্টের উপদেশ মুদ্রণ ও প্রচারের উৎসাহ শমিত হয়ে যায়।

১৮২০ সালে, তখনও পৃথিবীতে সর্বধর্মের সার সংগ্রহ ক'রে, মানুষের মনকে সংস্কারমুক্ত করবার ও শিক্ষা দেবার চিন্তা তেমনভাবে দেখা দেয় নি। এই সময়ে যিশুর উপদেশাবলীর (*Precepts*) ভূমিকায় রামমোহন যে কথা বলেছিলেন তা কালব্যবধানে বাতিল হবার মতো নয়।

"...in matters of religion, particularly men in general, through prejudice and partiality to the opinions which they once form, pay little or no attention to opposite sentiments (however reasonable they may be) and often turn a deaf ear to what is most consistent with the laws of nature, and conformable to the dictates of human reason and divine revelation."

যিশুর উপদেশ কেন তাঁর ভালো লাগল তার কারণ দর্শিয়ে লিখেছেন—

"This simple code of religion and morality is so admirably calculated to elevate men's ideas to high and liberal notions of God, who has equally subjected all living creatures, without distinction of caste, rank or wealth, to change, disappointment,

pain and death, and has equally admitted all to be partakers of the bountiful mercies... that I cannot but hope the best effects from its promulgation in the present form."

Precepts of Jesus[১]-এর ভূমিকায় তিনি আরও বলেন যে, নিউ টেস্টামেণ্টের নানা তথ্য বাদ দিয়ে কেবলমাত্র নৈতিক উপদেশ (moral precepts) পাঠ করে নানা মতের ও নানা স্তরের বুদ্ধিমান লোকের হৃদয়-মনের উন্নতি হবে— "...improving the hearts and minds of men of different persuasions and degrees of understanding." (*English Works*, p. 484)

এই সংগ্রহ-পুস্তক সম্বন্ধে একটা বিষয় লক্ষ্য করার মতো। প্রথম পৃষ্ঠায় রামমোহন লিখেছেন যে, 'সুসমাচার চারি খণ্ডের রচয়িতা কারা সে-সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত তথ্য জানিনে।' তাই বিজ্ঞানীমনের পরিচয় দিয়ে লিখলেন— 'ascribed to the Four Evangelists'। দ্বিতীয় আর-একটি তথ্য লক্ষণীয়: চারটি গস্‌পেলকেই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সাধু পলের রচনা থেকে এক পংক্তিও উদ্‌ধৃত করেন নি। এর কারণ নিশ্চয়ই আছে। গস্‌পেলগুলি সমসাময়িক শিষ্যদের রচনা বলে লোকবিশ্বাস। কিন্তু সাধু পল্ না ছিলেন যিশুর সমসাময়িক, না তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য। পল্ ছিলেন ইহুদি শাস্ত্র ও গ্রীক দর্শনে মহাপণ্ডিত– যিশুকে তিনি গড়েছেন তত্ত্ব দিয়ে; যেমন বুদ্ধকে করেছেন অসঙ্গ, বসুবন্ধু, নাগার্জুনাদি দার্শনিকরা। সাধু পলের পত্রসাহিত্যের মধ্যে 'খ্রীষ্টধর্ম' সৃষ্ট হয়েছে। সহজ মানুষ ভক্ত-যিশু থেকে খ্রীষ্টতত্ত্বের প্রতীক-যিশু বড়ো হয়ে উঠেছে তাঁর রচনার মধ্যে। পল্ জানতেন গ্রীসে ও রোমে ধর্মপ্রচার করতে হলে গ্যালিলি হ্রদের তীরবাসী জেলে-মালোদের যিশু সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনী ও ভক্তির বাণী যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি করবে না; প্লেটো-অ্যারিস্টটলের যুক্তিবাদের ধারকদের সঙ্গে তত্ত্বকথা তুলে আলোচনা করতে হবে। তাই সাধু পল্ 'খ্রীষ্টতত্ত্ব' (Christology) গড়ে তুললেন।

---

১ *The/Precepts of Jesus*/ The/ Guide to Peace and Happiness ;/extracted from/the Books of the New Testament,/ascribed to the Four Evangelists./ with/Translations into Sungscrit and Bengalee./ Calcutta :/ 1820. Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road, Calcutta.

যিশুর বাণী ও খ্রীষ্টতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য জেনেই রামমোহন *Precepts*-এ চার গস্‌পেলের বাইরে উদ্ধৃতির জন্যে যান নি।

রামমোহন-প্রতিশ্রুত *Precepts*-এর বঙ্গানুবাদ শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়ে ওঠে নি। রামমোহনের মৃত্যুর প্রায় পঁচিশ বছর পরে রাখালদাস হালদার[১] এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন—"সুখশান্তির উপায়-স্বরূপ যিশু প্রণীত হিতোপদেশ" (১৮৫৯)।

Precepts সম্বন্ধে আর-একটি সংবাদ সংগ্রহ করেছেন মিস্‌ কলেট -লিখিত রামমোহনের জীবনীর সম্পাদকগণ। ১৯০০ সালে Earl of Northbrook লেখেন *The Teachings of Jesus Christ in His Own Words* (London); এই বইয়ের ভূমিকায় আছে—

"My purpose has been to put before them [The people of India] the teaching of Christ in his own words as recorded in Four Gospels... The learned and distinguished Hindu, Raja Rammohun Roy, published eighty years ago a compilation called 'The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness,' with the same object in view, but in a different shape."[২]

রামমোহনের *Precepts* ও *Appeal* দুটি লন্ডনে মুদ্রিত হয় ১৮২৩ অব্দে। Dr. T. Rees-কে রামমোহন এক পত্রে (৪ জুন ১৮২৪) লেখেন যে ইংলন্‌ডে ও আমেরিকায় সত্যসন্ধানী এত বন্ধু আছেন জেনে তিনি আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছেন। তাঁরা যিশুর পবিত্র সরল ধর্মমত উদ্ধার করে পরিবেশন করছেন: "...are engaged in attempting to free the originally pure, simple and practical religion of Christ from the heathenish doctrines and absurd notions gradually introduced under the Roman power..." (*English Works*, p. 921)

প্রথম নিবেদনে (*An Appeal to the Christian Public*) রামমোহন স্পষ্টই বলেন যে, তিনি ভূমিকায় এ কথা উল্লেখ করেছিলেন যে "The

১ রাখালদাস হালদার সম্বন্ধে তথ্য, দ্র. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী (১৯৬২), পরিশিষ্ট, পৃ ৪০৬-১১। ইনি শিল্পী অসিতকুমার হালদারের পিতামহ।

২ S. D. Collet, *Raja Rammohun Roy*, p. 534.

dogmatical and historical atters are rather calculated to do injury." (*English Works*, p. 556)

অধ্যাত্মজীবনের অর্থ তখনই পূর্ণ হয় যখন ধর্ম ও নীতি (religion and morality) যুগ্মভাবে মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে। 'ধর্ম' শব্দের ব্যবহার দ্বারা তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি ও নির্ভরশীলতা এবং 'নীতি' শব্দের দ্বারা মানুষের সামাজিক লোকব্যবহার কতখানি সার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন— "Religion and Morality— meaning by the former,... our duty to God, and by the latter,... our duties to mankind, and to ourselves..." (*English Works*, p. 561)। রামমোহন বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনাদির সঙ্গে কর্ম, অর্থাৎ মানবকল্যাণকর্ম-সাধন, অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত, এইটি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। অদ্বৈতবাদী হলেই মানুষকে সংসারবিমুখ ও পরিবারের প্রতি উদাসীন হতে হবে, এমন মত তিনি পোষণ করতেন না।

সমস্যা হয়েছিল religion শব্দের অর্থ নিয়ে। খ্রীষ্টান পাদরিরা খ্রীষ্টতত্ত্ব, ইহলোক, পরলোক, স্বর্গ, নরক, পাপপুণ্য, প্রভৃতি নানা বিষয়কে ঈশ্বরপ্রীতি ও ঈশ্বর-উপাসনার সঙ্গে জড়িয়ে দেখেন; এটা যে কেবল খ্রীষ্টান-ধর্মেরই বৈশিষ্ট্য তা নয়। সকল ধর্মেই ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও জীব-কল্যাণ-সাধনই মুখ্য কর্তব্য বলে স্বীকার করে; কিন্তু দেখা যায় যুগপৎ মহৎ আদর্শ ও উপদেশের সঙ্গে নানা জাতি-উপজাতির বিশ্বাস ও সংস্কার মিশিয়ে এমন কতকগুলি স্ববিরোধী যুক্তিহীন আচারসর্বস্ব institution বা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যার নাম দেওয়া হয় 'ধর্ম'। কিন্তু কালে ধর্ম-নামে এই institution মানুষের মনের মুক্তির সহায় হয় না। তাদের সংস্কার-মূঢ় মনগড়া ধর্ম হয়ে ওঠে মানুষে মানুষে ভেদের ও হিংসার প্রতীক। রামমোহন চেয়েছিলেন, খ্রীষ্টধর্মকে সেই আবর্জনারাশি থেকে মুক্ত করে খ্রীষ্টের বিশুদ্ধ বাণীকে যুক্তি ও ভক্তির প্রেরণার উৎস বলে প্রতিষ্ঠা করবেন।

বেদান্তসূত্র ও উপনিষদের ভাষাবিবরণ প্রকাশিত হলে হিন্দুসমাজ যেভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, *Precepts* মুদ্রিত হলে (১৮২০) খ্রীষ্টান-সমাজ তেমনি রামমোহনের বিরোধী হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা মনে

করতেন, শাস্ত্রব্যাখ্যার একমাত্র অধিকারী তাঁরাই ; তেমনি খ্রীষ্টান পাদরিরা ভাবতেন, যিশুখ্রীষ্টকে বোঝবার ও বোঝাবার অধিকার তাঁদের একচেটিয়া।

শ্রীরামপুরের পাদরি মার্শম্যান পণ্ডিত, গোঁড়া খ্রীষ্টান ও তর্কযুদ্ধে অপরাজেয়। তাঁর সম্পাদিত *Friend of India* পত্রে (৩য় বর্ষ, ফেব্রুয়ারি ১৮২০) রামমোহনের *Precepts* বইয়ের সমালোচনা লিখলেন Deocar Schmidt[১] ; মার্শম্যান সাহেব তার উপর সম্পাদকীয় দীর্ঘ মন্তব্য করলেন। পাদরি স্মিট বললেন, এই গ্রন্থ সত্যের পক্ষে ক্ষতিকর— "...greatly injure the cause of truth।" রামমোহন যিশু সম্বন্ধে সত্যধারণা প্রচারের জন্য নিজ ব্যয়েই গ্রন্থ ছাপিয়ে বিলি করেছিলেন ; কিন্তু খ্রীষ্টানী গোঁড়ামির অবৈজ্ঞানিক, অদার্শনিক মতামতের সমর্থন করতে না পারাটাই তাঁর অপরাধ। মার্শম্যান সম্পাদকরূপে রামমোহন সম্বন্ধে লিখলেন, 'an intelligent Heathen, whose mind is as yet completely opposed to the grand design of the Saviour's becoming incarnate'— মুক্তিদাতা যিশুখ্রীষ্টের অবতারত্ব মানবার শক্তি রামমোহনের মতো heathen-এর নেই ! পাদরি মার্শম্যান আরও বললেন যে, লেখক Deist and Infidel, সনাতন-ধর্মে আস্থাহীন, নাস্তিক বা অবিশ্বাসী— অর্থাৎ প্রবল পক্ষের ধর্মে বিশ্বাসবান না হলেই সে হয় Infidel ! তিনি আরও বললেন, যিশুকে একজন ধর্মপ্রবর্তকরূপে দেখলে তো সর্বনাশ ; তাঁকে পূজা করতে হবে— 'adoring him as the Lord of all, the Redeemer of men, the sovereign

---

১ Deocar Schmidt সম্বন্ধে আমরা 'ব্রাহ্ম-পৌত্তলিক সম্বাদ' গ্রন্থের আলোচনা-কালে কিছু তথ্য দিয়েছি।

Precepts প্রকাশিত হলে স্মিট কিছু মন্তব্য করেন : "Some remarks on that publication which Dr. Marshman inserted in the *Friend of India* and to which he added some judicious observations of his own..."

Schmidt বিলাতে চার্চ মিশনারী সোসাইটির সেক্রেটারিকে এক পত্রে লেখেন—

"R. Roy wrote to me, after having read that article, that he found the observations of the Editor highly offensive, especially the application to him, of the term 'Heathen', and that he found himself under the necessity of vindicating his character as a believer in one true and living God." (পত্র, ১৮ এপ্রিল ১৮২০)।

দ্র. *A Tract against the Prevailing System of Hindoo Idolatry*, [Ed.], Stephen N. Hay ; Firma K. L. Mukhopadhyaya, 1963.

judge of quick and dead'— অর্থাৎ যিশু অবতার, ত্রাণকর্তা, জগন্নাথ, জীবিত ও মৃতের পরম নিয়ন্তা।

যিশুকে রামমোহন আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন, তা না হলে তাঁর উপদেশ-প্রচারের জন্য এত শ্রমস্বীকার করতেন না। কিন্তু তাই বলে যিশুকে দেবতা, অবতার বা ত্রাণকর্তা বলে মানতে তিনি অক্ষম— তাঁর বুদ্ধি ও বিচারে সেটা বাধে। তিনি ভাবলেন, *Precepts*-এর ভূমিকায় তিনি যে কৈফিয়ত লিখেছিলেন সেটা যথেষ্ট পরিষ্কার করে বলা হয় নি, তাই লিখলেন— An Appeal to the Christian Public in defence of 'The Precepts of Jesus' by a friend to Truth— যিশুর হিতোপদেশের সমর্থনে খ্রীষ্টান সাধারণের নিকট জনৈক সত্যসন্ধানীর নিবেদন।

খ্রীষ্টান-সমালোচক রামমোহনকে heathen বলেছিলেন। খ্রীষ্টানয়ুরোপীয়-দের বিশ্বাস যে, অখ্রীষ্টান দুনিয়ার সকল বাসিন্দাই হীদেন, অর্থাৎ এদের আত্মার মুক্তি নেই। রোমান-ক্যাথলিকরা প্রোটেস্টান্টদের বলে পাষণ্ড (heretics), বিধর্মী (infidels) ; প্রোটেস্টাণ্টরা পাল্টা জবাবে ক্যাথলিকদের বলে প্রতিমাপূজক ; ত্রিত্ববাদীরা একেশ্বরবাদীদের খ্রীষ্টান আখ্যাই দেয় না ; একেশ্বরবাদীরা তাদের বলে pagan— মানুষ পূজা করে ব'লে। চিরকাল প্রভুশক্তিসম্পন্ন জাতিরা অন্যদের ধর্ম বা মত সম্বন্ধে এই ধরনের শব্দই প্রয়োগ করে আসছে— গ্রীকরা দুনিয়াসুদ্ধ মানুষকে 'বর্বর' মনে করত; হিন্দুরা অহিন্দুদের 'ম্লেচ্ছ', 'যবন', প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করে দূরে রাখত; মুসলমানদের কাছে অমুসলমানরা 'কাফের', তারা করুণার পাত্র, 'জিম্মি', 'আমানত' মাত্র। কিন্তু যারা সম্প্রদায়গত-প্রাণ বা দলবদ্ধ-ধর্ম-ব্যবসায়ী, তাদের পক্ষে বিরুদ্ধ সমালোচনা, এমন-কি সত্য কথাও, সহ্য করা সম্ভব হয় না। তাই রামমোহন যে *Appeal* লিখলেন তা খণ্ডন করবার জন্য মার্শম্যান আবার প্রবন্ধ লিখলেন (মে ১৮২০)।

রামমোহন *Second Appeal to the Christian Public* পুস্তিকায় মার্শম্যানের প্রবন্ধের চুলচেরা সমালোচনা করলেন। যিশুর মাহাত্ম্য কীর্তন করবার জন্য যে আগ্রহ নিয়ে রামমোহন *Precepts* ছাপিয়েছিলেন, পাদরি মার্শ-ম্যানের খোঁচা খেয়ে তা সম্পূর্ণ অন্য রূপ গ্রহণ করল, খ্রীষ্টকে মাথায় রেখে খ্রীষ্টানের ধর্মতত্ত্বে যে ত্রিত্ববাদ আছে, রামমোহন তাকেই আক্রমণ

করলেন। এই কূট সমালোচনার জন্য মার্শম্যানের কটুবচন দায়ী। "In reviewing the *First Appeal*, the Reverend Editor fully introduced the doctrines of the Godhead of Jesus and the Holy Ghost, and of the Atonement, as the only foundation of Christianity; whereby he compelled me, as a professed believer of one God, to deny, *for the first time publicly*, those doctrines; and he now takes occasion to accuse me of presumption in teaching doctrines which he has himself compelled me to avow."[১]

রামমোহন তাঁর খ্রীষ্টান বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় পত্র-ব্যবহারে সরল ভাবে the unscripturality and unreasonableness of the doctrine of the Trinity সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করে আসছেন।[২] মার্শম্যান প্রমুখ পাদরিদের দ্বারা প্ররোচিত হয়েই তিনি ত্রিত্ববাদের অসারতা প্রমাণের জন্য এই প্রথম লেখনী ধারণ করলেন। পাদরিরা মনে করেন রামমোহন *Precepts of Jesus* প্রকাশ দ্বারা 'injurer of the cause of Truth' হয়েছেন! যিশুর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভক্তি ছিল বলেই তিনি খ্রীষ্টানদের কাছে তিন-তিনবার আবেদন পেশ করেন; যিশুর ভক্তিধর্মের সঙ্গে ত্রিত্ববাদের সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রদ্বারা সমর্থিত হয় না, এই কথাটাই জোর দিয়ে বললেন।

কিন্তু পাদরি-সাহেব ছাড়াও তখন কলকাতায় এমন দু-চারজন উদার-মতাবলম্বী ইংরেজ ছিলেন, যাঁরা রামমোহনের বক্তব্য বুঝতে চেষ্টা করতেন; তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন বাকিংহাম সাহেব। বাকিংহাম তাঁর *Calcutta Journal* পত্রিকায় (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩), রামমোহনের এই শেষ প্রবন্ধ

---

১ *English Works*, p. 687; *Final Appeal to the Christian Public*, p. 80.

২ আমার মনে হয়, রামমোহনের ঐস্লামিক শিক্ষা থেকেই তাঁর পক্ষে একেশ্বরবাদ সহজাত বিশ্বাস রূপে দাঁড়িয়েছিল। কোরানে পড়েছিলেন ত্রিত্ববাদের নিন্দা: "So believe in God and his messengers, and say not 'Three'. (Sura 5.169 : Arberry, *The Koran Interpreted*, p. 125)। পুনশ্চ: "They are unbelievers who say, 'God is the Third of the Three. No God is three but One." (Sura 5.79. *Ibid.*, p. 140)। আরবের খ্রীষ্টানরা সে যুগে Allah, Al-Masih ও Maryam অর্থাৎ ঈশ্বর, ঈশ্বরের পুত্র ও মাতা মেরীকে নিয়ে ত্রিত্ব কল্পনা করত (দ্র. Hugher, *Dictionary of Islam* (1885), p. 646)।

প্রকাশিত হবার পর যে মন্তব্য করেছিলেন, তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :

"The great interest that has been already excited both in Europe and in Asia by the writings of this most learned Brahmin and excellent man [Rammohun Roy], renders it incumbent on us to lose no time in bringing to the notice of our Readers the above volume, which has just issued from the Press—'The Final Appeal to the Christian Public' is the last of series of essays published by the same author, in reply to the strictures made upon his Religious creed by the Baptist Missionaries, through the *Friend of India*, a publication conducted by them."১

সম্পাদক ঠিকই বলেছিলেন যে, এক দিকে একটিমাত্র ব্যক্তি, অপর দিকে ইংরেজের মিশনের সমস্ত শক্তি তাঁকে আক্রমণ করেছে!

"A public disputation... between a single Native of India, beyond question one of the most learned, and the whole strength of the English Religious Mission, composed of many individuals of acknowledged learning and piety, must be attended with great interest to by all Friends of True Religion; and we cannot but admire the hardihood of the individual who dares the unequal contest against so many able men, in such a case."

১৮২৩ সালে রামমোহনের শেষ বক্তব্য *Final Appeal* ছাপতে Baptist Mission Press রাজি হল না। কারণ ইতিমধ্যে বিলেতে *Precepts*-এর সঙ্গে প্রথম দুটি আবেদন একত্র ছাপিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় বিলেতের লোক দেখতে পেয়েছে, এক ভারতীয় হিন্দুপণ্ডিত খ্রীষ্টতত্ত্বকে তাদেরই শাস্ত্রের সাহায্যে আক্রমণ করবার মতো বিদ্যা রাখেন। শেষ আবেদনও বিলাতে অল্পকাল পরে পৃথকভাবে মুদ্রিত হয়।

খ্রীষ্টান-পাদরিদের সঙ্গে বিতর্কের শেষ বছরে ধর্ম নিয়ে আক্রমণ

১ *Rammohun Roy and Progressive Movement in India*, p. 507.

করলেন ডাক্তার টাইট্‌লার (Tytler) ; ইনি কোম্পানির চিকিৎসক, মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ ও হিন্দু কলেজের অন্যতম শিক্ষক, কলকাতা-সমাজের পদস্থ লোক, কিন্তু ধর্মবিষয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন। রামমোহনের একেশ্বরবাদ সমর্থন তাঁর অসহ্য হয়ে ওঠে। তিনি রামমোহনকে এক পত্র লিখে (৩ মে ১৮২৩) খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠতা ও হিন্দুধর্মের নিকৃষ্টতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন ও রামমোহনকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। রামমোহন জবাবে লিখলেন যে, ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনার অধিকারী ব্যক্তির পত্র ছাড়া অন্যের পত্রের তিনি উত্তর দেন না। একজন বাঙালির এমন ধৃষ্ট-উক্তি শুনে টাইট্‌লার ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে 'বেঙ্গল হরকরা'তে এক পত্র লেখেন। রামমোহন তার উত্তর ঐ পত্রিকায় পাঠালে তাঁরা সেটা ছাপলেন না, কারণ হরকরা ও ফ্রেন্‌ড অব ইন্‌ডিয়া পত্রিকাদ্বয় ছিল রামমোহন-বিরোধী। পত্রটি 'রামদাস' নামে প্রেরিত হয়— যদিও সকলেই জানতেন লেখক কে। উভয়ের মধ্যে যে পত্র-যুদ্ধ চলে, আজ তার মূল্য নেই : কিন্তু রামমোহনের তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ পত্রগুলি এখনও উপভোগ্য।[১]

রামমোহনের সঙ্গে খ্রীষ্টান-পাদরিদের বিরোধিতার কারণ, পাদরিরা খ্রীষ্ট থেকে খ্রীষ্টানিকে এবং ধর্ম থেকে অনুষ্ঠান বা ধার্মিকতাকে বড়ো করে দেখতেন। সাম্প্রদায়িক মতের মধ্যে আবদ্ধ পাদরিরা বাইবেলের চেয়ে বাইবেলের ভাষ্য টীকা-টিপ্পনীর মতামত নিয়ে মাতামাতি করে আসছেন গত দু হাজার বৎসর ধরে। পণ্ডিতদের উপর পাদরিদের আস্থা বেশি। শাস্ত্রের অর্থভেদ নিয়ে গোঁড়ামি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের— কেউ কাউকে টেক্কা দিতে পারবে না। রামমোহন সকল ধর্মের

১ A Vindication of the Incarnation of the Deity, as the common basis of Hindooism and Christianity against the schismatic attacks of R. Tytler, Esq., M.D., ... by Ram Doss, Calcutta : Printed by S. Smith and Co., Hurkaru Press, 1823. গ্রন্থের Dedication : To all Believers in the Incarnation of the Deity. উৎসর্গপত্রমধ্যে ব্যঙ্গ করে লিখিত হয়েছে—"all Believers in the Manifestation of God in the flesh, whether Hindoo or Christian, might unite . . . to check the alarming growth of the Unitarian heresy . . . ।" এটি লিখিত হয় ১৮২৩ সালের ৩ জুন তারিখে। এটির বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায় : একেশ্বরবাদের ন্যায় পাষণ্ডমত প্রচারিত হবার বিরুদ্ধে হিন্দু ও খ্রীষ্টান, যাঁরা রক্ত-মাংসের দেহ-বিশিষ্ট ভগবানের প্রকাশে বিশ্বাসবান, তাঁরা সমবেতভাবে এই মতবাদকে বাধা দেবেন।

ধুরন্ধরদেরই এই কথা বলেছিলেন— ধর্মের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ, শাশ্বত, তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করো ; অবান্তর, অবিশ্বাস্য, অযৌক্তের মত বর্জন করে ধর্মকে বিচারবুদ্ধির দ্বারা বিশুদ্ধ করে মেনে নাও, সেটাই যথার্থ divine revelation। সেই divine revelation বিশ্বধর্ম বা universal religion প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করবে।

রামমোহন *Precepts of Jesus* কেন সম্পাদন করেছিলেন তার কৈফিয়ত তিনি খ্রীষ্টান-সাধারণের কাছে পেশ করেন— সেটি প্রথম *Appeal*-এই বলেছিলেন। তিনি ভাবতেই পারেন নি যে, খ্রীষ্টান-পাদরিরা তাঁর এই কাজের জন্য বিরক্ত হয়ে তাঁকে আক্রমণ করবেন। কিন্তু পর পর আক্রমণ চলতে থাকলে তিনি *Second* ও *Final Appeal* প্রকাশ করেন। এই নিবন্ধের পুরা নাম 'Second Appeal to the Christian Public in Defence of *The Precepts of Jesus*' ; *Final Appeal*-এও ঐ কথাই লেখা ছিল। *Second Appeal* তাঁর ইংরেজি গ্রন্থাবলীর ৫৬৫ পৃষ্ঠা থেকে ৬৭৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ; আর *Final Appeal* ৬৭৭ পৃষ্ঠা থেকে ৮৭৪ পৃষ্ঠা— সুতরাং এগুলিকে পুস্তক বলা যায়।

আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিবেদনের পরিচ্ছেদগুলির নাম লিপিবদ্ধ করছি; নামগুলি দেখলেই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারবে।

Second Appeal-এ নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদগুলি আছে :

I. General Defence of the Precepts in Question. II. Natural Inferiority of the Son to the Father. III. Separate Consideration of the Seven Positions of the Reviewer. IV. Inquiry into the Doctrine of the Atonement. V. On the Doctrines and Miraculous Narrations of the New Testament. VI. On the Impersonality of the Holy Spirit. Miscellaneous Remarks. এই নিবন্ধের শেষে দুটি পরিশিষ্ট (Appendix) আছে :

(i) On the Quotations from the Old Testament Contained in the New ; (ii) On the References Made to the Old Testament in Support of the Deity of Jesus.

Postscript : [হিব্রু গ্রন্থ থেকে বহু আলোচনা আছে]

Final Appeal[১] -এর সূচী :

Preface. Chapter I. Introductory Remarks. Chapter II. Inquiry into the Doctrine of the Atonement. Chapter III. Inquiry into the Doctrine of the Trinity. Section—I. The Pentateuch and Psalms. Section—II. The Prophets. Chapter IV. On the Editor's Replies to the Arguments contained in Chapter II of the Second Appeal. Chapter V. Remarks on the Replies to the Arguments Found in Chapter the Third of the Second Appeal. [মার্শম্যানের ৭ দফা প্রশ্নের বিচার আছে এই পরিচ্ছেদে] Chapter VI. On the Holy Spirit and Other Subjects.

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রামমোহন যখন বাইবেল অধ্যয়ন করে ত্রিত্ববাদীদের সঙ্গে মসীযুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন, তখন তাঁর ইচ্ছা হয় যে, বাইবেল সম্বন্ধে গবেষণার জন্য একটা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলে ভালো হয়। *Final Appeal to the Christian Public* গ্রন্থের উপসংহার অংশে লিখছেন—

"As Christianity is happily not a subject resting on vague metaphysical speculations, but is founded upon the authority of books written in languages which are understood and explained according to known and standing rules, I therefore propose,... to *establish a monthly periodical publication*, commencing from the month of April (1823), to be devoted to *Biblical Criticism*, and to subject Unitarian as well as Trinitarian doctrines to the test of four arguments... for the sake of method and convenience, I propose that, beginning with the Book of Genesis, and taking all the passages in that portion of Scripture, which are thought to countenance the doctrine of the Trinity, we should examine them one by one, and publish

১ পাদটীকায় আছে : The Final Appeal was published in reply to elaborate answer to the Second Appeal by Dr. Marshman, printed in the fourth number of the Quarterly Series of the *Friend of India*, December, 1821.

our observations upon them; and that next month we proceed in the same manner with the Book of Exodus, and so forth with all the Books of the Old and New Testament, in their regular order."

"If any one of the Missionary Gentlemen, for himself, and in behalf of his fellow-labourers, choose to profit by the opportunity thus afforded them, of defending and diffusing the doctrines they have undertaken to preach, I request, that Essay on the Book of Genesis, of the kind above-mentioned, may be sent to me by the middle of the month and if confined within reasonable limits, not exceeding a dozen or sixteen pages, I hereby engage to cause it to be printed and circulated at my own charge, should the Missionary Gentlemen refuse to bestow any part of the funds intended for the spread of Christianity towards this object ; and also, that a reply (not exceeding the same number of pages) to the arguments adduced, shall be published along with it by the beginning of the ensuing month. That the new mode of controversy, by short monthly publications, may be attended with all advantages which, I, in common with the searchers after truth, expect, and of which it is capable ; it will be absolutely necessary that nothing be introduced, of a personal nature, or calculated to hurt the feeling of individuals— that we avoid all offensive expressions ...and that never allow ourselves for a moment to forget that we are engaged in a solemn religious disputation." (*English Works*, pp. 680-81)। এই *Final Appeal* লিখিত হয় ১৮২৩ অব্দের ৩০শে জানুয়ারি।

আমাদের মনে হয়, তিনি জানুয়ারি (১৮২৩) মাসের শেষে Biblical Criticism সম্বন্ধে মাসিক পত্র প্রকাশ করবেন বলে যে আশা করেছিলেন তা কার্যকরী হয় নি ; বোধ হয় খ্রীষ্টান পণ্ডিত-পাদরিরা এই দুরূহ কর্মে প্রবৃত্ত হবার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারেন নি। তাই রামমোহনকে ১৮২৩ সালের মে মাসে তিনটি ৮ পৃষ্ঠার পুস্তিকা প্রকাশ করতে দেখি :

1. A Few Queries for the Serious Consideration of Trinitarians. Part I. Calcutta, May 9, 1823 ; pp. 8.

2. A Few Queries for the Serious Consideration of Trinitarians. Part II. Calcutta, May 12, 1823 ; pp. 8.
3. Two Dialogues. Calcutta, May 16, 1823 ; pp. 8.
   (a) Dialogue First between a Trinitarian Missionary and Three Chinese Converts.
   (b) Dialogue Second between a Unitarian Minister and an Itinerant Bookseller.

এই আলোচনায় Mr. Wright নামে এক ব্যক্তি যোগদান করেন, তিনি দ্বিতীয় পুস্তিকা লিখেছিলেন।[১] আর কোনো নামকরা পাদরি জ্ঞানের রথে রশি টানতে অগ্রসর হন নি।

ফ্রেন্‌ড অব ইন্‌ডিয়ায় প্রকাশিত ব্যাপটিস্ট পাদরিদের ইংরেজি সমালোচনা ও রামমোহনের উত্তর-প্রত্যুত্তরের পালা শেষ হবার আগেই, রামমোহনকে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ'-এর সঙ্গে বিতর্কে নামতে হল। 'সমাচার দর্পণ'-এর হিন্দুশাস্ত্রে-সুপণ্ডিত জনৈক লেখক ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বহু কূট প্রশ্ন উত্থাপন করে যে এক প্রবন্ধ লেখেন তার লক্ষ্যস্থল রামমোহন রায় ; কারণ তিনিই হিন্দুধর্মকে তার অবান্তর আবর্জনা থেকে মুক্তি দিয়ে বিশ্বধর্মের আসনে বসাতে চেয়েছেন। হিন্দুধর্মের মধ্যে বিশ্বধর্মের প্রেরণা এলে সে হবে খ্রীষ্টানির প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী। হিন্দুধর্মের ও সমাজের দুর্বলতার উপর আঘাত করেই খ্রীষ্টানি জয়যুক্ত হচ্ছে এবং ইসলাম জয়যুক্ত হয়েছিল। সেই হিন্দুধর্ম এখন বিশ্বধর্মের আসন নিতে উদ্যত ; তাই বেদান্ত—যার উপর রামমোহন তাঁর বিশ্বধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, তাকেই আঘাত করার জন্য হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে কূট প্রশ্ন করা হয়েছিল।

'সমাচার দর্পণ' লিখেছিলেন : "সর্ব্বদেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি আমার নিবেদন এই বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা নগরে নানা জাতীয় ভাষা ও শাস্ত্র ও প্রজ্ঞ একত্র আছেন। শাস্ত্রার্থের সন্দেহ ছেদস্থল এরূপ অন্যত্র প্রায় নাই তন্নিমিত্ত ধারাবাহিক কয়েক প্রশ্ন এই নিবেদিতেছি অনুগ্রহাবলোকনপূর্ব্বক সমুদায়ের সদুত্তর যদি সমাচার দর্পণদ্বারা দেন

১ দ্রষ্টব্য, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৬, পৃ. ১০৩।

তবে আমার আনন্দ এবং জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত এবিষয়ে শ্রমলেশ ও ব্যয়াভাব ইতি।"১

এই ভূমিকা করে লেখক ছয়টি অনুচ্ছেদে বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র ও পুনর্জন্ম প্রভৃতির মধ্যে অসংগতি কোথায় তা সংক্ষেপে বিবৃত করে তার উত্তর আহ্বান করেছেন।' রামমোহন এই আহ্বানে সাড়া দিলেন ও 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা'র বেনামে উত্তর লিখে সমাচার দর্পণ আপিসে পাঠিয়ে দিলেন। লেখার রীতি ও যুক্তির প্রাখর্য দেখেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ বোধ হয় বুঝেছিলেন, এ রচনার প্রণেতা রামমোহন। তাই জানালেন :

"শ্রীযুত শিবপ্রসাদ শর্ম্ম প্রেরিত পত্র এখানে পঁহুছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ বহিষ্কৃত করিয়া কেবল ষড়দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা সর্ব্ব সমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই।"২

পাদরি মার্শম্যান তখন ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া ও সমাচার দর্পণের সম্পাদক; রামমোহনের *Precept* নিয়ে তখন মসীযুদ্ধ চলছে। ইংরেজির মাধ্যমে যে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলছিল, তা সাধারণ বাঙালি পাঠক পড়তে বা বুঝতে পারত না, কারণ তখনও ইংরেজির চর্চা দেশব্যাপী হয় নি। কিন্তু রাম-মোহন-প্রেরিত সমাচার দর্পণের প্রবন্ধে তর্কস্থলে এমন সব যুক্তি, উপমা এবং তুলনামূলক তত্ত্বকথা লিখিত হয়েছিল, যা সম্পাদক 'অজিজ্ঞাসিত' (irrelevant) বিষয় বলে মনে করলেন। তাঁদের আশঙ্কা—এবং সে আশঙ্কা অলীক নয়—বাইবেল ও খ্রীষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে যে-সব কথা ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে তা যদি বাংলায় প্রকাশিত হয় তবে তা মিশনের প্রচারকার্যের বাধাস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে। পাঠকের স্মরণ আছে নিশ্চয়ই যে, রামমোহনের *Final Appeal* ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসেও মুদ্রণে আপত্তি হয় (১৮২৩)।

রামমোহন সমাচার দর্পণে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশের বাধাকে নীরবে মেনে নিলেন না—তিনি নূতন পত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হলেন; তার নাম দিলেন 'ব্রাহ্মণ-সেবধি': The Brahmunical Magazine: The Missionary and

১ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩২৪। ২ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৩২৬।

the Brahmun। এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণে রামমোহন লিখেছিলেন :

"I accordingly sent a reply in the Bengalee language, to which, however, the conductors of the work [editor?] calling for it [*Samachar Darpana*], refused insertion ; and I therefore formed the resolution of publishing the whole controversy with an English translation in a work of my own, "the Brahmunical Magazine", now reprinted, which contains all that was written on both sides."[১]

১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা'র নামে 'ব্রাহ্মণ সেবধি' প্রকাশিত হল— তার এক পৃষ্ঠায় বাংলা, অপর পৃষ্ঠায় ইংরেজি অনুবাদ। এইভাবে তিনটি সংখ্যা বের হয় প্রথম দফায়। প্রথম সংখ্যা এইভাবে আরম্ভ হয়েছে :

"শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল [১৮০১ সালে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন স্থাপিত হয়] কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে [প্রকাশ্যে] তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। …বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুর্ব্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্ম্মান্তিক কোনমতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা

১ See *English Works.*

ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব্ব প্রকারে অনৈক্যতার মুল হয়।...

..."নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা লোভ প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচারসহ হয় না তবে বিচারবলে হিন্দুর ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্ম্মের উৎকৃষ্টত্ব ইহা স্থাপন করেন সুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক অনেকেই তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেক অথবা স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়েন... সত্য ও ধর্ম্ম সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম নহে। সংপ্রতি শ্রীরামপুরের মিসনরি ছাপাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের অযুক্তিসিদ্ধ দোষোল্লেখের লিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন সে সকল প্রশ্নকে ও তাহার প্রত্যেক উত্তরকে... ছাপান গেল...।"[১]

অতঃপর রামমোহন 'সমাচার দর্পণে'র ছয় দফা প্রশ্নের জবাব লেখেন 'ব্রাহ্মণ সেবধি'তে। দর্শনাদি মতবাদের সপক্ষে যা বলবার তা তো বললেন; কিন্তু পুরাণ-তন্ত্রাদি সম্বন্ধে তাঁর উক্তি জানবার মতো— কারণ, এ-সব গ্রন্থ পৌত্তলিকতা ও নানা রকমের যুক্তিহীন সংস্কারকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু রামমোহন বিদেশী খ্রীষ্টান-পাদরিকে হিন্দুধর্মের সমালোচনা বা নিন্দা করতে দেখে হিন্দুধর্মের পক্ষ থেকে ঐ-সব গ্রন্থের মূলগত বক্তব্যের দার্শনিক সমর্থনে প্রবৃত্ত হন :

"পুরাণাদি শাস্ত্রে সর্ব্বথা ঈশ্বরকে বেদান্তানুসারে অতীন্দ্রিয় আকার-রহিত কহেন..." কিন্তু "...মন্দবুদ্ধি লোক অতীন্দ্রিয় নিরাকার পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া সম্যক্ প্রকারে পরমার্থ সাধন বিনা জন্ম ক্ষেপ করিবেক কিম্বা দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবেক অতএব নিরবলম্বন হইতে ও দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরকে মনুষ্যাদি আকারে... বর্ণনা করিয়াছেন ...কিন্তু বারংবার ঐ পুরাণাদি সাবধান পূর্ব্বক কহিয়াছেন যে এ সকল রূপাদি বর্ণন কেবল কল্পনা করিয়া মন্দবুদ্ধির নিমিত্ত লিখিলাম বস্তুত পরমেশ্বর নামরূপহীন ও ইন্দ্রিয়গ্রামবিষয়ভোগরহিত হয়েন।"[২]

---

১ ব্রাহ্মণ সেবধি, রামমোহন গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩-৪।

২ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৪।

অতঃপর রামমোহন সংস্কৃতে লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে 'প্রামাণ্য' শাস্ত্র কী, সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "মিসনরি মহাশয়েরা উপনিষদাদি ও প্রাচীন স্মৃত্যাদি ও শিষ্টসংগৃহীত পরম্পরাসিদ্ধ তন্ত্রাদি এ সকলের অর্থের বিবরণ ইংরেজী ভাষাতে প্রায় করেন না কিন্তু বেদ-[বেদান্ত] বিরুদ্ধ শিষ্টের অসংগ্রহীত পরম্পরায় অসিদ্ধ গ্রন্থের বিবরণ আপন ভাষাতে করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম অতি কদর্য্য ইহাই সর্ব্বদা প্রকাশ করেন।"

প্রশ্ন—প্রামাণ্য-গ্রন্থ কী? রামমোহন লিখছেন: "যে যে পুরাণ ও তন্ত্রাদির টীকা আছে ও যে যে পুরাণাদির বচন মহাজনধৃত হয় তাহারি প্রামাণ্য অন্যথা পুরাণের অথবা তন্ত্রের নাম করিয়া বচন কহিলে প্রামাণ্য হয় এমৎ নহে অনেক পুরাণ ও তন্ত্রাদি যাহার টীকা নাই ও সংগ্রহকারের ধৃত নহে তাহা আধুনিক হইবার সম্ভব আছে কোনো কোনো পুরাণ তন্ত্রাদি এক দেশে চলিত আছে অন্য দেশীয়েরা তাহাকে কাল্পনিক কহেন বরঞ্চ এক দেশেই কতক লোক কাহাকে মান্য করেন কতক লোক নবীনকৃত জানিয়া অমান্য করেন। অতএব সটীক কিম্বা মহাজনধৃত পুরাণ তন্ত্রাদির বচন মান্য হয়েন।"[১]

প্রতিপক্ষ আঘাত দিলে, তার উত্তর দেবার যুক্তি ও শক্তি রামমোহনের ছিল। সমাচার দর্পণে পঞ্চম প্রশ্নে এইরূপ ছিল:

"পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রাদিতে ঈশ্বরের নানাবিধ নাম ও রূপ ও ধাম মানিয়া উপাস্য উপাসনা জীবের সহিত জীবের কল্যাণদায়ক বিধানে স্থিরপূর্ব্বক গুরুকরণীয় গৌরব ও গুরুবাক্যে দৃঢ়তার বিধান কহিয়াছেন এবং ঐ সাকার ঈশ্বর অস্মদাদির ন্যায় স্ত্রীপুত্র ও বিষয়ভোগী ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী স্থিরপূর্ব্বক বিভুত্ব মানিতেছেন ইহা অতিআশ্চর্য্য...।"[২]

লৌকিক হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে খ্রীষ্টান লেখক আরও যে মন্তব্য করেন তা এখন ভাববার বিষয়। কিন্তু রামমোহন সে দিক দিয়ে আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না ক'রে খ্রীষ্টানদের আক্রমণ করলেন অন্য কথা এনে: "... মিসনরি মহাশয়দিগ্যে বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি যে তাহারা মনুষ্যরূপবিশিষ্ট য়িশুখ্রিষ্টকে ও কপোতরূপবিশিষ্ট হোলি গোষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কি

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৫।
১৮২৩ সালের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা থেকে কী কী বই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল, তার একটা তালিকা করতে পারলে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হত।

২ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৩।

না আর সাক্ষাৎ ঈশ্বর যিশুখ্রীষ্টের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ভোগ ও হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভোগ তাঁহারা মানেন কি না" ইত্যাদি— "... যদি এ সকল তাঁহারা স্বীকার করেন তবে পুরাণের প্রতি এ দোষ দিতে পারেন না যে পুরাণ মতে ঈশ্বরের নাম রূপ সিদ্ধ হয়..."[১] ইত্যাদি।

রামমোহন প্রশ্ন করলেন, যদি "...তাবৎ অসম্ভব বস্তু যাহা সৃষ্টির প্রণালীর অতি বিপরীত তাহা ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা সম্ভব হয় তবে হিন্দুরা ও মিসনরিরা উভয়েই আপন আপন অবতারের সংস্থাপনের জন্যে এই অযোগ্য সিদ্ধান্তকে অবলম্বন সমান রূপে করিতে পারেন।"[২]

রামমোহনের বিজ্ঞানী-মন প্রকৃতিতে যা ঘটা সম্ভব নয় তাকে সত্য বলে মানার যৌক্তিকতা খুঁজে পায় নি। *Precepts of Jesus* প্রকাশের (১৮২০) পর থেকেই খ্রীষ্টান-পাদরিদের সঙ্গে রামমোহনের বিরোধের সূত্রপাত, সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। সমাচার দর্পণের প্রশ্নের উত্তর 'ব্রাহ্মণ সেবধি'তে প্রকাশিত হয় পরের বছরেই, যখন খ্রীষ্টানদের কাছে রামমোহনের Appealগুলি পেশ করা হচ্ছে, তখন। সে-সব লেখা খ্রীষ্টধর্ম-তত্ত্ব নিয়ে চুলচেরা আলোচনায় পূর্ণ; কিন্তু হিন্দুদের ধর্ম নিয়ে যে সমালোচনা পাদরিদের পক্ষ থেকে সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়েছিল তার উত্তর কেবলমাত্র বাংলাতে দিলেই চলবে না— হিন্দুধর্ম ও দর্শনের সপক্ষে যুক্তি বা defence অবাঙালিরও জানা দরকার। সেইজন্য *The Brahmunical Magazine* পত্রিকায় সেগুলি যুগপৎ ইংরেজিতে প্রকাশ করেন। তাই প্রথম তিনটি প্রবন্ধ বাংলা ও ইংরেজিতে একই সঙ্গে একই পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র ইংরেজি রচনা হল বিদেশী খ্রীষ্টানদের হিন্দুধর্মের তত্ত্ব-বিষয়ে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা— এটা self-defence; আর যুগপৎ যে Appeal চলছিল, সেগুলো খ্রীষ্টধর্মতত্ত্বের আক্রমণ, সে aggressive। এই দুই পথেই রামমোহন চলেছেন। তাঁর জীবনের চারটি বছর, ১৮২০ থেকে ১৮২৩ সাল, এই খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নে ও বিতর্কে কেটে যায়।

দু বছর পরে, ১৮২৩ অব্দের অগস্ট মাসে, *Brahmunical Magazine*-এর ব্রাহ্মণ সেবধি অর্থাৎ বাংলা অংশ তিনটি বাদ দিয়ে কেবল ইংরেজি তিনটি

১ রামমোহন-গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৫।
২ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৬।

রচনা একত্রিত করে পুনর্মুদ্রিত হয়। ভূমিকায় বলেছেন যে, তৃতীয় সংখ্যায় তিনি যে-সব প্রশ্ন করেছিলেন, পাদরিরা তার জবাব দু বছরের মধ্যে দেন নি, তাতেই The Hindoo Community... have made up their minds that the arguments of the *Brahmunical Magazine* are unanswerable— অর্থাৎ উত্তর যখন পাওয়া যায় নি, তখন ধরেই নেওয়া হচ্ছে খ্রীষ্টান-পাদরিরা তাঁর যুক্তি মেনে নিয়েছেন। বোধ হয় এই উক্তি দেখেই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে আবার এক দফা প্রশ্ন তুলে এক পুস্তিকা বাংলায় প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকার উত্তর ১৮২৩ অব্দের ১৩ নভেম্বরে প্রদত্ত হয় ইংরেজিতে এবং এটাই *Brahmunical Magazine*-এর চতুর্থ (বোধ হয় শেষ) সংখ্যা। পত্রোত্তরটির কিয়দংশ—

"Notwithstanding my humble suggestions in the third number of this Magazine, against the use of offensive expressions in religious controversy, I find, to my great surprise and concern, in a small tract lately issued from one of the missionary presses and distributed by missionary gentlemen, direct charges of *atheism* made against the doctrines of the Vedas, and undeserved reflections on us as their followers. This has induced me to publish, after an interval of two years, a fourth number of the Brahmunical Magazine."[১]

Brahmunical Magazine-এর চতুর্থ রচনাটির দুটি পরিচ্ছেদ : A reply to certain queries directed against the Vedanta এবং Reasons of a Hindoo for rejecting the doctrines of Christianity— শেষোক্ত পরিচ্ছেদে রামমোহনের খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে ইতিহাস-জ্ঞানের গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই নিবন্ধে আছে ত্রিত্ববাদের কঠোর বিশ্লেষণ ও বিচার। আধুনিক খ্রীষ্টান পণ্ডিতদের দ্বারা লিখিত ত্রিত্ববাদের দশ রকমের পৃথক ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে তিনি সমালোচনায় বলেছেন—

"Are not these explanations of the Trinity, given by the persons most versed in the Scriptures, sufficient to puzzle any man, if not drive him to atheism ?" (*English Works*, p. 191. তু. তোলস্তয়ের মত)

১ 'Preface' to the Brahmunical Magazine or the Missionary and the Brahmun to be continued occasionally. No IV, Calcutta, 1823। পত্রিকার শেষে মুদ্রিত— Shivuprusad Surma : Calcutta, November15, 1823.

রামমোহন বললেন, যদি কোনো হিন্দু বা মুসলমান খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে মনস্থ করে, তখনই সে জানতে পারে যে, দশজন বিখ্যাত পণ্ডিত, এমনকি আর্চবিশপ যিনি বিশপ-শ্রেণীর প্রধান, তাঁদের মধ্যেও ত্রিতত্ত্ব সম্বন্ধে মতের আসমান্-জমিন ফারাক— তখন সে কি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণের হঠকারিতার জন্য অনুতপ্ত হবে না? যে জাতি শিল্পে, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে এত উন্নত, যারা স্বাধীনতা-স্পৃহার এত উচ্চে অধিষ্ঠিত, তারা যে এখনও কী করে পোপবাদীদের অসম্ভব বীভৎস মতামত মানতে পারে যে তারা "should neglect their religious faith so much as to allow it still to stand upon the monstrously absurd basis of popery?" (*English Works*, p. 191)—এ অতি বিস্ময়কর।

তৎকালীন কলকাতার বিশপ ডক্টর হেবার (Heber) -এর ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে মত বড়োই অদ্ভুত। রেগিনাল্ড হেবার কলকাতার তৃতীয় বিশপ— মিড্‌লটনের পরেই এ দেশে আসেন (১৮২৩)। ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ভারতে আসার পর মাত্র তিন বছর জীবিত ছিলেন; সেই সময়ের মধ্যে রচিত *Indian Journal* পড়লে দেশের তৎকালীন বহু তথ্য আমরা জানতে পারি। এত পাণ্ডিত্য, এত বুদ্ধি— ধর্মালোচনার বেলায় যেন সব বিকৃত হয়ে গেল। হেবার ত্রিত্ব সম্বন্ধে লেখেন: "The second and third persons in the Trinity are no other than the angels *Michael* and *Gabriel*. It was the second person, who conversed with Moses from Mount Sinai, and the third person, who constituted the Jewish Shekinah."

রামমোহন মন্তব্য করছেন—

"The theory of the Godhead proposed by this pious and learned prelate, although it is at variance with the opinions of several other divines, must yet be gratifying to Hindoo Theologians, who have long cherished the doctrine of the Metempsychosis, or the transmigration of spirits from one body to another." (*English Works*, p. 191)

রামমোহন নানা যুক্তি দেখিয়ে বললেন— "the doctrine of the Trinity and the idea of a *Mangod* or *Godman* to be unnatural and pregnant with absurdity, and not a mere innocent speculation." (*English Works*, p. 193)

ক্যাথলিকরা মন্ত্রঃপূত রুটি ও মদকে যিশুর মাংস ও রক্ত জ্ঞানে আহার ও পান করেন; প্রোটেস্টান্টরা এই প্রথাকে বিদ্রূপ করে বলেন Panarius Deus বা Breaden God— রুটিমাখা দেবতা!

রামমোহনের প্রশ্ন, দেহধারী মানুষকে কোন্ দৈবশক্তিবলে তাঁরা ঈশ্বরের সব শক্তি ও গুণের আধার বলেন, অথচ এক টুকরা রুটি Divine Spirit-এ পূর্ণ হয়, ক্যাথলিকদের এই বিশ্বাসকে নিন্দা করেন?

বর্তমান যুগের অতি-আধুনিক যুবকরা মনে করতে পারেন, ধর্ম সম্বন্ধে অদ্ভুত বিশ্বাস পোষণ অতীতের ব্যাপার। তাঁরা মনে করেন, মানুষ বিজ্ঞান-চর্চা করে গত দেড় শো বছরের মধ্যে অনেকখানি সংস্কারমুক্ত হয়েছে। কিন্তু তা যে হয় নি, তা তো পৃথিবীর যে-কোনো দেশের প্রতি ক্ষণমাত্র দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারা যায়— 'শিক্ষাপ্রাপ্ত' হলেই মনের মুক্তি হয় না। পৃথিবীময় যে ধর্মমূঢ়তা বিরাজমান তা দেখলে মনে হয়, রামমোহনের এই যুক্তিবাদের শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। পোপ, কার্ডিনাল, বিশপ, আর্চবিশপ, সাধু, সন্ন্যাসী, মোহান্ত, অবতার, জীবন্তবুদ্ধ, মাতাজি, পীর, মেহদী, ইমাম, আগাখাঁদের কেন্দ্র করে এখনও যে রাজসিকতা ধর্মের নামে চলছে, তা বুদ্ধিমান বা সংস্কারমুক্ত মানুষের ধর্মলক্ষণ বলে স্বীকার করা যায় না। রামমোহন ভেবেছিলেন সর্বধর্মের শ্রেষ্ঠ বাণী জীবনে মেনে নেবেন— খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা ও বাইবেল অধ্যয়ন করেছিলেন সেই উদ্দেশ্য নিয়েই। কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন, যারা খ্রীষ্টের ক্ষমার বাণী প্রচার করে, যারা তাঁর মৈত্রীর কথা অন্যকে শোনায়, তাদের নিজেদের জীবন ও বাণী বহুযুগের প্রাচীন ধর্মপাণ্ডাদের মতের ও কথার প্রতিধ্বনি মাত্র।

যে গ্রেট ব্রিটেন সর্ববিষয়ে তখন জগতের আদর্শস্থল—শক্তিতে অপরাজেয়, বাণিজ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বিজ্ঞানে-শিল্পে সর্বদেশের শিখরে অধিষ্ঠিত, সেই গ্রেট ব্রিটেনের মানুষের ধর্মবুদ্ধি মধ্যযুগীয় স্থূল পরম্পরাগত বিশ্বাস ও কুসংস্কারের সঙ্গে বাঁধা পড়ে আছে। ১৮২৪ সালে রামমোহন বিলেতে ডক্টর টি. রীজ (T. Rees)কে এক পত্রে British National (Anglican) Church-এর মৃদু সমালোচনা করে লেখেন যে. ইংলন্ডেশ্বরকে সকল দলের লোক, সকল

মতের লোকই the most accomplished person of his time ইত্যাদি বলে মানে; সেই রাজা কেন তাঁর শক্তি প্রয়োগ করবেন না ঐ উনচল্লিশ দফা মতবাদের শৃঙ্খল ভাঙবার জন্য—("use his royal influence to remove from the members of his National Church the fetter of a solemn oath, imposed by the Thirty-nine Articles") এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়! খ্রীষ্টধর্মের ৩৯টি ধারা প্রবর্তিত হয় ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের সময়ে; অবশ্য এটা করেন চার্চের বড়ো বড়ো পাণ্ডারা। এই ৩৯টি মতের অনেকগুলি সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ আছে, খ্রীষ্টানির আদিযুগ থেকে বিবাদ চলছে; অথচ সেই মত ইংলন্ডেশ্বর has not caused to be discontinued the repetition of that general denunciation found in the concluding part of the Athanasian[১] creed, to wit, 'This is the catholic faith, which except a man believe faithfully, he cannot be saved.' (*English Works*, pp. 921-22)

অ্যাংলিকান চার্চের উনচল্লিশ দফা মতে যে লোক সায় দেয় না তার মুক্তি নেই—এরকম ধর্মতত্ত্বকে সমালোচনা না করে স্বীকার করা অসম্ভব এটাই রামমোহনের সিদ্ধান্ত। ইংলন্ডের খ্রীষ্টানদের পরবর্তী যুগে এই তত্ত্ব নিয়ে অনেক ভাবতে হয়েছে।[২] গতানুগতিক পরম্পরাগত সংস্কারপিষ্ট ধর্মবিশ্বাস দীর্ঘকাল সমাজে যদি লালিত হতে থাকে, তবে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ঘটবে দু ভাবে—এক, প্রতিক্রিয়ায় ধর্মবিমুখতা ও নাস্তিকতা আসবে যুবকদের মনে; আর দুই, *status quo* বজায় রাখবার জন্যে হবে একদলের প্রাণপণ চেষ্টা; কারণ ধর্মের মূঢ়তাকে জিইয়ে রাখতে পারলেই তাদের আর্থিক লাভ। বর্তমান জগতে সর্বত্রই ধর্মের একই দশা—এক দিকে নাস্তিকতা, অন্য দিকে ধর্মোন্মত্ততা। নাস্তিকতা ও ধর্মোন্মত্ততা একই অজ্ঞানবৃক্ষের ফল। স্থল জল আকাশ পর্যন্ত বিশেষণের সীমার দ্বারা সীমিত—আমার দেশ, আমার সাগর, আমার আকাশ হয়েছে এবং সেই সীমান্ত রক্ষার

---

১ Athansius (C. 297-373): Bishop of Alexandria (Egypt) bitterly opposed to Arius. His name has become synonymous with orthodoxy. His doctrine of Trinity and Incarnation is one of the three creeds of Western Christianity.

২ Rev. H. C. Shuttleworth, *The Church of England—Religious Systems of the World* (1901), p. 508 and also 'Thirty-nine Articles', *Chambers's Encyclopedia*, Vol. XIII.

অন্য সকল জাতি আপাদমস্তক যুদ্ধের বর্ম পরে প্রতিবেশী বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিনাশ করবার জল্পনা-কল্পনায় মত্ত। ঠিক তেমনি মানুষের শাশ্বত 'ধর্ম' শব্দের পূর্বে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন খ্রীষ্টান মুসলমান প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করে ধর্মকে শতধা করে আসছে; বহু শতাব্দী ধর্মের নামে নরহত্যা করেছে। আজ আবার সেই ধর্মকে কেন্দ্র করে নূতন রাজনীতি গড়তে চাইছে মানুষ—স্থল জল আকাশ নিয়ে যেমন ভাগাভাগি, বিধাতাকে নিয়েও তাই চলছে দুনিয়াভর।

১৮০১ অব্দে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনে কাজ শুরু হয় কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, য়েটস, অ্যাডাম, প্রভৃতি কয়েকজনকে নিয়ে। তাঁদের কর্মক্ষেত্র দিনেমার-নগরের মধ্যে সীমিত হয়। তাঁরা বাইবেলাদি গ্রন্থ বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় তর্জমা করে ও মিশন প্রেসে ছাপিয়ে বিনা মূল্যে হিন্দু মুসলমান জনতার মধ্যে বিতরণ করতেন। ভেবেছিলেন এই ভাবে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হবে।[১]

শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্টদের মিশন খোলার তেরো বছর পরে, ১৮১৩ সালের পর, ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতে খ্রীষ্টান-পাদরিদের প্রবেশের বাধা দূর হয়।

স্বভাব-রক্ষণশীল ব্রিটিশদের ধর্মের গোঁড়ামি অষ্টাদশ শতকে চিন্তা-নায়কদের গ্রন্থাদি প্রচারের ফলে কিছুটা শমিত হয়েছে। এককালে ইংরেজের এক রাজা পোপের সঙ্গে বিবাদ করে রোমের হেপাজত থেকে চার্চকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন; কিন্তু তার পর নিজেই হন ধর্মরক্ষক —Defender of faith। কালে ইংলন্ডের চার্চ হয়ে উঠল ন্যাশনাল চার্চ— 'অ্যাংলিকান' নামে খ্যাত হল। এদের ক্রীড বা ধর্মগোঁড়ামি যারা না মানত তারা বহু শতাব্দী নানা রকমের অসুবিধার মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়ে আসছিল। ব্রিটেনের মনের মুক্তি কিভাবে হয়েছিল, সে ইতিহাস-বিবৃতির

---

১ It appears that in the year 1815-16-17, the Serampore missionaries baptized into their Church between 4 and 5 hundred persons; and that they had about 10,000 children in their schools. In the three years above mentioned, they disrtibuted not less than 3,00,000 copies of religious tracts in 20 different languages, besides translations of the scriptures..." John W. Kaye, *Christianity in India* (1859), p. 333.

স্থান এ গ্রন্থ নয়। তবে ১৮১৩ অব্দে গোঁড়ামি কিছুটা কমল; কিন্তু ক্যাথলিকদের অধিকার দিতে আরও কয়েক বছর কাটে, ১৮২৯ সালে তাদের মুক্তি হয়।

আমরা পূর্বে বলেছি, অ্যাংলিকান চার্চের প্রথম বিশপ হয়ে কলকাতায় এলেন হেনরি মার্টিন ১৮১৪ সালে—অ্যাংলিকান কম্যুনিয়নের কেন্দ্র স্থাপিত হল কলকাতায়। মার্টিন অল্পকাল পরে মারা যান, তখন আসেন মিডল্‌টন-সাহেব; এঁর সময় থেকে চার্চের কর্মতৎপরতা খুবই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এখনও কলকাতায় এঁর নামে একটা রাস্তা আছে। মিডল্‌টন-সাহেবের বড়ো আশা ছিল যে, রামমোহনের ন্যায় খ্রীষ্টভক্ত যেভাবে খ্রীষ্টানদের চার্চে যাওয়া-আসা করেন, হয়তো কালে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে 'উদ্ধার' পাবেন। মিডল্‌টন রামমোহনকে প্রলোভন দেখান "He would be honoured in England, as well as in India; his name would descend to posterity as that of the modern Apostle of India—"। বলা বাহুল্য, মিডল্‌টনের এই প্রচেষ্টার ফল হল উলটো, তিনি মিডল্‌টনের সঙ্গে পরে আর সাক্ষাৎ করতে যান নি— তাঁর মন এমনই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন অ্যাডাম-সাহেব। এই বিশপ মিডল্‌টন যে কলেজ স্থাপন করেন (১৫ অক্টোবর ১৮২০) তা 'বিশপস কলেজ'[১] নামে খ্যাত ছিল।

অ্যাডাম ও য়েটস গ্রীক বাইবেল থেকে গস্‌পেল অনুবাদ করতে গিয়ে একটা গ্রীক শব্দের বাংলা অর্থ নিয়ে হোঁচট খেলেন এবং তাঁদের মধ্যে মতৈক্য হল না বলে অনুবাদের কাজই বন্ধ হয়ে গেল। রামমোহন তাঁদের সহায়তাকরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সেখানে যেতেন; তাঁর ইচ্ছা ছিল অনুবাদের ভাষা আরও একটু বোধগম্য হয়। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন, বাইবেলের খ্রীষ্টতত্ত্বকথা নিয়েই খ্রীষ্টানে খ্রীষ্টানে মতভেদ, সুতরাং বাঙালি বা ভারতীয়দের কাছে বাইবেলের তর্জমা কখনও ফলপ্রসূ হতে পারবে না। অথচ দেখছেন খ্রীষ্টের বাণী কী মহান, খ্রীষ্টধর্মের মানবপ্রীতি কী ব্যাপক! সেই কথা

১ In 1818, Archbishop of Canterbury, President of the Society for the propagation of the Gospel, placed £ 5,000 at the disposal of Bishop Middleton of Calcutta—John W. Kaye, *Christianity in India* (1859), p. 305.

ভেবেই তিনি *Precepts of Jesus* সম্পাদন করেন; তাঁর ইচ্ছা ছিল, যিশুর বাণী বাংলায় ও সংস্কৃতে অনুবাদ করেও বিতরণ করবেন। খ্রীষ্টের বাণী তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

Precepts মুদ্রিত হওয়ায় খ্রীষ্টান-পাদরিরা রামমোহনের উপর কী পরিমাণ বিরক্ত হন সে ইতিহাস আমরা বিবৃত করেছি। খ্রীষ্টান-সাধারণের কাছে তাঁর তিনটি নিবেদন পাঠ করলে এই ধারণা স্পষ্ট হবে যে, রামমোহন খ্রীষ্টকে চেয়েছিলেন জীবনের সাধনায়; কিন্তু খ্রীষ্টানদের ধর্মতত্ত্ব দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী বুঝতে পেরে, তাদের ধর্মতত্ত্ব প্রতিহত করতে প্রবৃত্ত হন।

উভয় বাইবেল পড়ে রামমোহন এইটে বুঝলেন যে, এই গ্রন্থদ্বয় ইহুদি-জাতির ইতিহাস-সংস্কৃতির সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত; ইহুদিদের পৌরাণিক কাহিনী, কিংবদন্তী, প্রবাদ, আচার-ব্যবহার সবই বাইবেলের অঙ্গ। যাঁরা বাংলা বাইবেলের পাঠক, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, গ্রন্থদ্বয়ের প্রতি ছত্র ইহুদিদের ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, লোকসাহিত্য, লোকধর্মের সঙ্গে বিজড়িত—সে বই কী করে বাঙালির 'ধর্মগ্রন্থ' হতে পারে? হিন্দুর ইতিহাসে, পুরাণে তো ঐ শ্রেণীর কাহিনীর অভাব নেই! কী করে হিন্দুরা বাইবেলকে ধর্মপুস্তকরূপে গ্রহণ করতে পারবে?

আমাদের মনে হয় রামমোহন ভুলে গিয়েছিলেন, ঠিক এই সমস্যাই ইসলামের আবির্ভাবের সময়ে একদিন ছিল। কোরানের ভাষা আরবি—সে ভাষার সঙ্গে ভারতীয় কোনো ভাষার দূরতম সম্বন্ধও ছিল না। আরবের ইতিহাস, সেমেটিক ধর্মবিশ্বাস, পুরাকালের কাহিনী, কিংবদন্তী, সমস্তই তো ইসলামের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। হজরত মহম্মদ শেষ নবী, কিন্তু তিনি ইহুদিদের পূর্বগামী নবী ও প্রফেটদের ধর্মমতের ও আরবদের সমস্ত আচার-বিচার ইসলামের অঙ্গীভূত করেন। সেই ইসলাম ইতিহাসের সমস্ত তথ্য ও তত্ত্বের সম্ভার নিয়ে কীভাবে পৃথিবীতে প্রসারলাভ করেছিল! আসলে শাস্ত্রহীন মানুষের আচারসর্বস্ব জীবনের মুখোমুখি হলে, অথবা শাস্ত্রের অত্যাচারে উৎপীড়িত মানুষ সাম্য-মৈত্রীর বাণী শুনলে, মুক্তির আহ্বানে সাড়া দেবেই। প্রচারের বলে কোরানের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরবতত্ত্ব-বিদদের সকল প্রকার মতামতেই নূতন-দীক্ষিতরা অভ্যস্ত হয়ে গেল। যারা

'বুৎ-পরস্ত'— বুদ্ধের পাথরমূর্তি পূজা করত— তারা সে-সব এমনভাবে ত্যাগ করল যে এখন তারা কল্পনাও করতে পারে না যে তারা এককালে মুসলমান ছিল না— বৌদ্ধ বা হিন্দু ছিল, এবং তাদের দেবদেবীর পূজা করত, আচার বিধিনিষেধ মেনে চলত। আসলে এক কথা বার বার শুনতে শুনতে, তার মধ্যে যে কোথাও ফাঁক আছে তা লোকে বুঝতে পারে না। ইসলামের ধর্মশিক্ষাবিধি অত্যন্ত বাস্তবঘেঁষা দীনিয়াত, এবং তাই আজ সারা দুনিয়ায় খ্রীষ্টধর্মের প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলাম।

ঠিক এমনি ভাবেই বৈদিক আর্যদের ধর্ম অনার্যরা গ্রহণ করেছিল অন্ধের মতো, নইলে বৈদিক তথা সংস্কৃত ভাষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দ্রবিড় ভাষা-ভাষীরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ ও সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষা বলে স্বীকার করে নিতে পারত না। হিন্দুধর্ম ও দর্শনের সেরা কয়েকজন লোকের জন্মস্থান দ্রবিড়দেশ।

ইসলামের মওলানারা মধ্য-এসিয়া থেকে স্পেন পর্যন্ত নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। খ্রীষ্টধর্ম নিজবাসভূমে (ফিলিস্তান-ইসরায়েলে) পরবাসী হয়েও ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর সর্বত্র। বৌদ্ধধর্মও ভারতভূমে লুপ্তপ্রায় হয়েও ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্ব-এসিয়া থেকে দক্ষিণ-এসিয়ায়। এই-সব কারণেই গত দেড় শত বছরের মধ্যে ভারতের প্রত্যন্তবাসী বহু উপজাতি ও প্রশান্ত মহা-সাগরীয় অসংখ্য দ্বীপবাসী খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে— আফ্রিকার অধিক সংখ্যক লোক ইসলাম নিয়েছে।

রামমোহন এই-সব প্রচার-সাফল্য দেখে যান নি। কিন্তু পাশ্চাত্য পাদরিদের পক্ষ হতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের রাজনৈতিক দিকের বিপদ কোথায় তা অনুমান করেই সমস্ত অন্তর দিয়ে চেয়েছিলেন যে, যিশুর সুখ ও শান্তির বাণী প্রচারিত হোক, পাদরিদের খ্রীষ্টানি নয়। কারণ, খ্রীষ্টানি এখন খ্রীষ্ট থেকে অনেক দূরে সরে এসে যা প্রচার করছে তা যিশুর বাণী নয়, তা খ্রীষ্টানি মতবাদ।

Precepts লেখার পর প্রায় চার বছর ধরে রামমোহন খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব ও বাইবেল গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। এই পর্বে যে নিবেদন তিনটি লিখে-ছিলেন, সেগুলি য়ুরোপ-আমেরিকার খ্রীষ্টান-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সর্বদেশের ভাবুকরা মনে করলেন ভারত খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উর্বরক্ষেত্র।

১৮২৪ সালে আমেরিকার কেম্‌ব্রিজের Rev. Henry Ware রামমোহনের কাছে Precepts of Christianity and the means of promoting its reception in India বা ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের আশা-ভরসা কিরকম তৎসম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করে এক পত্র পাঠান। রামমোহন সযত্নে সেই পত্রের উত্তর দেন। তাঁর জবাবের প্রথমেই রেভারেণ্ড অ্যাবে ডুবয়[১] (Abbe Jean A. Dubois)-এর সদ্য-প্রকাশিত 'পত্রাবলী' থেকে যা উদ্‌ধৃত করে দিয়েছিলেন, আমরা তারই চুম্বক করে দিচ্ছি।

অ্যাবে দীর্ঘকাল দক্ষিণ-ভারতে ছিলেন। ভারত সম্বন্ধে তাঁর মতো তথ্যাভিজ্ঞ বিদেশী সে-যুগে ছিল না বললেই চলে।

অ্যাবে ডুবয় বলেন, ভারতীয়দের খ্রীষ্টধর্ম-দীক্ষা বিষয়ে দুটো কথা ভাববার মতো। প্রথম প্রশ্ন— ভারতীয়দের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার লোক পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। দ্বিতীয় প্রশ্ন— দীক্ষার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বিত হচ্ছে সেটাও বিচার্য; বাইবেল ভারতীয় ভাষাসমূহে যথাযথভাবে অনূদিত হওয়া সম্ভব কি না সেটাও ভাববার বিষয়। এই দুই প্রশ্নের উত্তরেই রেভারেণ্ড ডুবয় বলেন, 'না, কোনোটাই সম্ভব নয়'—

"It is my decided opinion, first, that under existing circumstances there is no human possibility of converting the Hindoos to any sect of Christianity ; and, secondly, that the translation of the Holy Scriptures circulated among them, so far from conducing to this end, will, on the contrary, increase the prejudices

---

১ জঁা ডুবয় (Abbe Jean A. Dubois) ভারতপ্রবাসী ফরাসী ক্যাথলিক ধর্মযাজক, পণ্ডিচেরীতে বেশির ভাগ সময় থাকতেন। তিনি ভারতে ৩০ বছর বাস করেন এবং হিন্দু-সমাজের আচার-ব্যবহার, ধর্মমত প্রভৃতি বিষয়ে একখানি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ লেখেন। মাদ্রাজের ইংরেজ সরকার এই গ্রন্থের স্বত্ব কিনে নিয়ে বিলেতে বইখানি ছাপান ১৮১৬ সালে। ডুবয় পরে এর একটা পরিশোধিত সংস্করণ প্রস্তুত করেন, বহুকাল পরে (১৮৯৭) সে সংস্করণ ইংরেজিতে মুদ্রিত হয়। ১৮২৩ সালে ডুবয় ভারত ত্যাগ করেন; ১৮৪৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। ফ্রান্সে ফিরে অ্যাবে *Letters on the State of Christianity in India* লেখেন। রামমোহন সেই গ্রন্থ থেকেই ভারতে খ্রীষ্টানি প্রচারের ব্যর্থতা সম্বন্ধে অ্যাবের মত উদ্‌ধৃত করেন। Henry K. Beauchamp, অ্যাবে জঁা ডুবয়-লিখিত *Hindu Manners, Customs and Ceremonies*-এর ফরাসী পুঁথি তর্জমা ও সম্পাদন করেন (১৮৯৭), এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি অ্যাবের পত্রাবলীর সামান্য আলোচনা করেছেন। প্রোটেস্টাণ্টরা এই পত্রাবলীর কঠোর সমালোচনা করেন।

of the natives against the Christian religion, and prove, in many respects, detrimental to it. These assertions, coming from a person of my profession, may to many appear bold and extraordinary."

এই কথা বলে অ্যাবে ডুবয় দক্ষিণ-ভারতে যে লুথারিয়ান মিশন প্রায় শতাব্দীকাল কাজ করছেন তাঁদের, মোরাবিয়ান ভ্রাতৃমণ্ডলী, কেরালার নেসটেরিয়ান খ্রীষ্টান ও সর্বশেষে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্টদের প্রত্যেককে আপন আপন কার্যাবলীর ফল কী হয়েছে, তার হিসাব-নিকাশ করতে বলেছেন—

"Behold the Baptist Missionaries at Serampore : inquire what are their scriptural successes on the shores of the Ganges ; ask them whether those extremely incorrect versions, already obtained at an immense expense, have produced the sincere conversion of a single pagan ; and I am persuaded, that, if they are asked an answer upon their honour and conscience, they will all reply in the negative." (*English Works*, p. 879)

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকের অভিজ্ঞতা ডুবয় ব্যক্ত করেছিলেন ; কিন্তু ঐ শতাব্দীর গোড়ার দিকে খ্রীষ্টান-পাদরিদের প্রচারকার্য যতটা নৈরাশ্য-জনক ছিল, কয়েক দশকের মধ্যে তার অভাবনীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল। রামমোহন ১৮২৪ সালে লিখেছিলেন— "I have no personal knowledge of any native converts respectable for their understanding, morals, and condition in life." (*English Works*, p. 879)। কথাটা ১৮২৪ সালে সত্য ছিল, কিন্তু ১৮৩০ সালে আলেকজাণ্ডার ডাফ-এর কলকাতায় আবির্ভাবের পর শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্য থেকে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় যুবককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা সম্ভব হয়েছিল। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন— শিক্ষিত হিন্দুরা বাংলা বাইবেল পড়ে খ্রীষ্টভক্ত হন নি, তাঁরা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে য়ুরোপীয় সাহিত্যদর্শনে সুপণ্ডিত নব্য বাংলার (Young Bengal) সদস্য। রামমোহনের সময়ে এ সমস্যার উদয় হয় নি ; রামমোহন বিলাত যাবার পূর্বে ডাফ-সাহেবকে প্রতিষ্ঠিত করে যান, ডাফের বিদ্যালয়ের জন্য তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্র সংগ্রহ করে দেন— তিনি ভেবেছিলেন, ইংরেজির মাধ্যমে বাঙালির মনের মুক্তি হবে, বাইবেল

পড়লেই সবাই খ্রীষ্টান হয়ে যাবে না। রামমোহনের ভাবনাই কালে রূপ গ্রহণ করে— বাঙালির মনের মুক্তি এল ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে য়ুরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন আয়ত্ত করে।

বাইবেল অনুবাদের দুরূহতা সম্বন্ধে রামমোহন আমেরিকার রেভারেণ্ড ওয়্যারকে যা লিখেছিলেন তা আমরা উদ্‌ধৃত করছি—

"About four years ago, the Rev. Mr. Adam, and another Baptist Missionary, the Rev. Mr. Yates, both well reputed for their oriental and classic acquirements, engaged, in common with myself, to translate the New Testament into Bengallee, and we met twice every week, and had for our guidance all the translations of the Bible, by different authors, which we could procure. Notwithstanding our exertions, we were obliged to leave the accurate translation of several phrases to future consideration, and for my own part I felt discontented with the translation adopted of several passages, though I tried frequently, when alone at home, to select more eligible expressions, and applied to native friends for their aid for that purpose. I beg to assure you, that I... do not recollect having engaged myself once, during my life, in so difficult a task, as the translation of the New Testament into Bengallee."[১]

রামমোহন মনে করেন যে, কেরী প্রমুখদের বাইবেল অনুবাদ খুব ব্যস্ততার মধ্যে করা হয়েছিল; পাদরিরা 'were too hasty to engage themselves in so difficult an undertaking'— এই ভেবেই তিনি সহায়তা করতে রাজি হন। অনুবাদের সমস্যা কোথায়, তা নিয়েও রামমোহন ভেবেছিলেন :

"Ideas, in general, are as differently expressed in the idioms of the East from those of the West...."[১]

এশীয় ভাষার মাধ্যমে য়ুরোপীয় ভাবধারা প্রকাশ খুবই শক্ত কাজ,

১ A Letter on the Prospects of Christianity addressed to the Rev. Henry Ware, of Cambridge (U. S. A.) : Calcutta, February 2, 1824. (*English Works*, pp. 875-85).

কারণ, অধিকাংশ ভাষার গদ্যরচনার মান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, গদ্য লেখা মাত্র শুরু হয়েছে। কিন্তু য়ুরোপীয় ভাষায় এশীয় ভাবনার ভাষান্তর তত কঠিন নয়, কারণ সে-সব গদ্য ভাষা বহু শতাব্দী ধরে লিখিত হচ্ছে। মোট কথা, অনুবাদের বা ভাষান্তরের সমস্যা সম্বন্ধে রামমোহন খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন।

অ্যাডাম রামমোহনের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে আলোচনা করতে করতে খ্রীষ্ট-ধর্মের ত্রিত্ববাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন ও অবশেষে ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টান হন— আগে তিনি ছিলেন ব্যাপটিস্ট। এই ঘটনা কলকাতায় খ্রীষ্টান-সমাজে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। অ্যাডাম যে Unitarian Society স্থাপন করলেন, তাতে কলকাতার বহু ভদ্র সদস্য হলেন, তবে ইংরেজ কম। ব্রিটিশ সদস্য যে কজন যোগ দিলেন তাঁরা স্কচ। হোমরা-চোমরা সাহেবরা বড়ো কেউ এর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না, কারণ বেশির ভাগ ইংরেজ গোঁড়া অ্যাংলিকান চার্চের সদস্য, অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁরা সহানুভূতিহীন। রামমোহন এই Unitarian Societyর জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিলেন; দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্রত্যেকে আড়াই হাজার করে টাকা দান করলেন; সবারই মন তখন পশ্চিমের দিকে।

সাধারণ হিন্দুর পক্ষে আত্মীয়-সভা বা ব্রাহ্মসভার সদস্য হওয়া যেমন কঠিন, সাধারণ খ্রীষ্টানের পক্ষে ত্রিত্ববাদ বর্জন করে ইউনিটেরিয়ান হওয়ার তেমনি বাধা। অ্যাংলিকান ও ব্যাপটিস্টদের পক্ষে ত্রিত্ববাদ অস্বীকার খ্রীষ্টান-ধর্ম পরিত্যাগের সামিল। অ্যাডামের অদম্য চেষ্টায় ইউনি-টেরিয়ানদের একটি সমাজ-গৃহ পাওয়া গেল। রামমোহন ও তাঁর বন্ধুরা এখানেই যেতেন উপাসনায়। খ্রীষ্টান বন্ধুরা তাঁকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন, এত চার্চ থাকতে তিনি কেন ইউনিটেরিয়ান ধর্মস্থানে যান; তার উত্তরে রামমোহন বলেছিলেন যে, আমার সহজবুদ্ধি সর্বশক্তিমান ভগবানের এক বা একাধিক শরীর কল্পনা করতে পারে না, "My plain understanding ···is incapable of forming a notion of one or more fellow-creators each equally possessed of omnipotence and omnipresence." রাম-মোহন তাঁর বন্ধু চন্দ্রশেখর দেবের বেনামে *Answer of a Hindoo* (1827)

পুস্তিকা লিখে বের করেন— উত্তরগুলো ছিল দশ দফায়। সেগুলো পড়লে ত্রিশ বছর বয়সের যে যুবা তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহ্-হিদ্দীন ফার্সি-ভাষায় লিখেছিলেন, সেই যুক্তিবাদী মানুষটির আরও পরিণত রূপ দেখতে পাই।[১]

ইউনিটেরিয়ান শব্দের অর্থ একেশ্বরবাদী— ঈশ্বরের কোনো শরিক নেই। সে অর্থে তো মুসলমানরাও এই পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু ইউনিটেরিয়ান শব্দের দ্বারা খ্রীষ্টীয় সমাজের বিশেষ একটি সম্প্রদায়কেই বোঝায়। অ্যাডাম ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টান; তিনি মনে করতেন একেশ্বরতত্ত্ববাদী খ্রীষ্টান হওয়াই উচিত। রামমোহন সম্বন্ধেও তাঁর আশা ছিল যে, কালে তিনিও হয়তো ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন।

রামমোহনের খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখে অ্যাডামের মতো অনেকেরই মনে হয়েছিল যে, তিনি খ্রীষ্টধর্মই গ্রহণ করবেন। মিডল্টন ভেবেছিলেন, রামমোহন চার্চ অব ইংলন্ডে প্রবেশ করবেন; অ্যাডাম ভেবেছিলেন, তিনি ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টান হবেন— কিন্তু রামমোহন সকলকেই নিরাশ করেন। কেম্‌ব্রিজ থেকে (বস্টন) রেভারেণ্ড হেনরি ওয়্যার (Henry Ware) রামমোহনকে ২০ দফা প্রশ্ন করে এক পত্র লিখেছিলেন— ভারতে খ্রীষ্টধর্মের ভবিষ্যৎ কী এবং ইউনিটেরিয়ান মতে খ্রীষ্টানি মত প্রচার করা সম্ভব কি না এটাই ছিল তাঁর পত্রের মর্মকথা। রামমোহন অতি যত্নের সঙ্গে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দেন। সেই উত্তর পড়লে ভারতে খ্রীষ্টানধর্ম প্রচারের সাফল্য লাভের বাধা কোথায় তা স্পষ্ট হয়। তিনি পরিষ্কারভাবেই বলেন যে, গোঁড়া পাদরিদের দিয়ে কোনো কাজ এ-দেশে হবে না—কাজ হবে ইংরেজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শিক্ষকরা যদি এ দেশে আসতে পারেন তবেই— "... it would be advisable,... that one or two, if not more, gentlemen, well qualified to teach English literature and science, and noted for their moral conduct,

১ "Certainly they disbelieve, who say, God is the third (person) of the three; The Messiah, son of Mary, was but an apostle; apostles before him had indeed passed away: and his mother was a truthful woman; they both used to eat food." —*The Quran*, part VI, section 10: Trs. Md. Ali, p 121. 'Used to eat food' বলার অর্থ যে, যিশু ও তাঁর জননী সাধারণের ন্যায় মানুষ ছিলেন।

should be employed to cultivate the understandings of the present ignorant generation, and thereby improve their hearts, that the cause of truth may triumph over false religion, and the desired comfort and happiness may be enjoyed by men of all classes." সর্বশ্রেণীর লোক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ উপভোগ করতে পারবে কী করে—এই সমস্যা সমাধানের আশু প্রয়োজন। রামমোহন পুনরায় ঐ পত্রে লিখছেন—

"...induce you and your riends to send to Bengal as many serious and able teachers o ' European l earning and science and Christian morality, unmingled with religious doctrines,... to spread knowledge gratuitously among the native community,...

"There are numerous intelligent natives, who thirst after European knowledge and literature, but not many who wish to be made acquainted with the Christian religion...

"The desire of educating children in the English language and in English arts is found even in the lowest classes of the community, and I may be fully justified in saying that two-thirds of the native population of Bengal would be exceedingly glad to see their children educated in English learning."

রেভারেণ্ড ওয়্যারকে এই পত্রখানি লিখিত হয় ১৮২৪ অব্দে এবং লর্ড আমহার্স্টকে ইংরেজি ভাষা এ দেশে প্রচলনের জন্য পত্র দেন ১৮২৩ অব্দে।

রামমোহন খ্রীষ্টান-পাদরিদের সঙ্গে যে ত্রিত্ববাদ (Trinity) নিয়ে মসী-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, সে ত্রিত্ববাদ ইহুদিদের হিব্রু বাইবেলের মধ্যে পাওয়া যায় না। নূতন বাইবেলের চার গস্‌পেলের মধ্যেও তা অস্পষ্টভাবে উল্লিখিত। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, গ্রীকরা যখন খ্রীষ্টান হল[১] তখন তাদের নানা মতামত নূতন ধর্মের অঙ্গ রূপেই এসে যায়। সাধু অগস্টাইন এই ত্রিত্ব-

১ "...purifying the religion of Christ from those absurd, idolatrous doctrines and practices, with which the Greek, Roman, and Barbarian converts to Christianity have mingled it from time to time." (*English Works*, p. 876). A letter (addressed to the Rev. Henry Ware of Cambridge, U.S.A.) on the prospects of Christianity. Calcutta, February 2, 1824.

বাদ স্পষ্ট করে তোলেন : যিশু ঈশ্বরের সন্তান, তাঁর অবতার ; ঈশ্বরের কাছ থেকে যে দয়া আমরা পাই, আর তাঁর উদ্দেশে আমাদের যে প্রার্থনা, একেই অনেকে হোলি গোস্ট (Holy Ghost) বলেছেন। কিন্তু এই তিন শক্তি বা person— Father, the Son, the Holy Ghost— সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। এসিয়া-মাইনর বা আনাটোলিয়ার (বর্তমান তুর্কিরাজ্য) নিশিয়া নগরের সম্মেলনে Arius নামে বিশপের ত্রিত্ব-বিরোধী মতবাদকে পাদরি পুরোহিতরা অশাস্ত্রীয় বা পাষণ্ড (Heretic) বলে ঘোষণা করলেন। এই সম্মেলনে প্রাচীনপন্থীরা বললেন যে, 'the son was of the same substance as the father' ; তার উপরেও বলা হল— 'And I believe the Holy Ghost'।[১] এই সম্মেলনে নেতৃত্ব করেন Athansius— মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ। মোট কথা, কি ক্যাথলিক, কি প্রোটেস্টাণ্ট, সকলেই আথানেসিয়ান ত্রিত্ববাদে আজ পর্যন্ত বিশ্বাসী।

Arius-এর প্রায় হাজার বছর পর ইতালিতে Socinus খুড়ো-ভাইপো ত্রিত্ববাদ অ-কবুল করে বললেন, ত্রিত্ববাদ শাস্ত্রের বা বাইবেলের বিরুদ্ধ মত ; মানুষ দেহে অমর হয় না, আত্মায় সে অমর। মধ্য-য়ুরোপে কিছুকাল এ মত প্রচারিত হয় ; কিন্তু গোঁড়া পাদরিরা এ মত সহ্য করেন নি। যাই হোক, Socinus-দেরকেই Unitarianism-এর অগ্রদূত বলা যায়। তাঁরা বলেন, যুক্তিবাদের উপর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ; যুক্তির বিরোধী সব মত অগ্রাহ্য। ইংলন্ডে আন্দাজ ১৭০০ অব্দে ইউনিটেরিয়ান মতবাদের আবির্ভাব হয়। শতাধিক বছর পর্যন্ত কোনোরকমে টিঁকে থাকে ; তার পর ১৮১৩ অব্দের পর থেকে

---

১ As to the nature of those doctrines of Christianity deemed essential in the earliest times, I shall content myself with making a few extracts from the Ecclesiastical History of Mosheim, a celebrated author among Trinitarians, which will prove that the doctrine of the Trinity, so zealously maintained as fundamental by the generality of modern Christians, made not its appearance as an essential, or even a secondary article of Christian faith, until the commencement of the fourth century ; and then it was introduced after long and violent discussions by the majority of an assembly, who were supported by the authority of a monarch."

—Second Appeal to the Christian Public, *English Works*, pp. 627-28.

তাদের অস্তিত্ব স্পষ্টতর হয়ে ওঠে এবং এর কিছুকাল পরেই কলকাতায় অ্যাডামের Unitarian Society স্থাপিত হয়।

রামমোহন ইউনিটেরিয়ান চার্চে কেন যেতেন তার আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি। কিন্তু সে চার্চে যাওয়া বন্ধ করলেন কেন? যাওয়া ও না-যাওয়া কি খেয়াল-বশের ঘটনা! আমরা তাঁর জীবন-কাহিনী থেকে জানতে পারি যে, ১৮২১ সালে কলকাতায় ইউনিটেরিয়ান কমিটি গঠিত হয় এবং একটি ভাড়াবাড়িতে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টানরা উপাসনার জন্য সমবেত হতে আরম্ভ করেন। 'Rammohan is one of the warmest supporters' —এ কথা লেখেন অ্যাডাম ১৮২২ সালের জানুয়ারি মাসে।

রামমোহন 'ইউনিটেরিয়ান প্রেস' নাম দিয়ে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গেই ইউনিটেরিয়ানদের চার্চে যেতেন। কিন্তু তিনি দেখলেন যে, অ্যাডামের আস্থা ও বিশ্বাস 'খ্রীষ্টীয়' ইউনিটেরিয়ানবাদের উপর সমধিক— বাইবেল অভ্রান্ত, খ্রীষ্ট অবতার, প্রভৃতি মতামত তিনি সাধারণ খ্রীষ্টানের মতোই বিশ্বাস ও প্রচার করতেন। রামমোহনের আশা ছিল, এই চার্চের মাধ্যমে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রচারিত হবে— তা সর্বধর্ম-নিরপেক্ষ, যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মজ্ঞান। কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল না। ধীরে ধীরে রামমোহন অ্যাডামের চার্চ থেকে সরে এলেন। অ্যাডামের আশা ছিল, রামমোহন সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করবেন। কিন্তু রামমোহনের পক্ষে হিন্দুধর্মের অবতারবাদও যেমন, খ্রীষ্টধর্মের দেবত্ববাদও তেমনি অগ্রহণীয়।

রামমোহন বুঝেছিলেন, ধর্মসাধনার জন্য প্রত্যেক জাতির নিজ নিজ ভাষা ও ধর্মগ্রন্থের মধ্য দিয়ে যে সাধনার ধারা চলে আসছে তাকেই সর্বজন-গ্রাহ্য করতে হবে। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ অতীতের সঙ্গে ঐতিহাসিক বন্ধনে বাঁধা। সেই ভাষার বন্ধন, ভাবের বন্ধন মেনে নিয়েই তার বহতাকে (progress) অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। ভারতের ভাব-গঙ্গায় অসংখ্য ভাব-ধারা মিলিত হলেও তার মৌলিক বহতার পথ তেমনি আছে। এই চলমান ধারা স্থান-কালে অব্যাহত।

রামমোহন ইসলামের পথে চলে ভেবেছিলেন, মানবের ঐক্যসাধন

বিশুদ্ধ যুক্তি-আশ্রয়ী হয়ে সার্থক হবে। খ্রীষ্টের ধর্মীয় ও নৈতিক উপদেশ সংগ্রহ করে ভেবেছিলেন, মানুষ তার শান্তি ও সুখ পাবে সেখানে। সর্বত্রই দেখলেন, সবাই বিশেষ মতের বেষ্টনীর মধ্যে বন্দী; বিশুদ্ধ যুক্তির পথাশ্রয়ী লোক মুষ্টিমেয়। আর বুঝলেন, ভারতের হিন্দুকে 'বিশ্বধর্ম'শিক্ষা তারই শাস্ত্র থেকে চয়ন করে দেখাতে হবে। কী ভাবে তা তিনি করেছিলেন সে কথা অতিবিস্তারে আমরা আলোচনা করেছি।

অ্যাডাম এক পত্রে লিখেছিলেন যে, রামমোহন "is both a Christian and a Hindu— Christian with Christians and a Hindu with Hindus..."। কথাটা অতি সত্য— হিন্দুর শ্রেষ্ঠ অদ্বৈত-ভাবনা ও বেদান্ত তিনি যেমন গ্রহণ করেছিলেন, যিশুর হিতোপদেশ ও ভক্তি, এমন-কি ইসলামের নৈষ্ঠিক একেশ্বরবাদ তথা জাতিবর্ণ-ভেদ-হীন সমাজ-চেতনা তাঁকে তেমনি আকর্ষণ করেছিল। লৌকিক হিন্দুধর্ম তিনি ত্যাগ করেন, লৌকিক খ্রীষ্টধর্মও তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা ছিল অসম্ভব, আবার পরধর্ম-অসহিষ্ণুতার জন্য লৌকিক ইসলামকেও তিনি প্রশংসা করতে পারেন নি।

হিন্দু-সমাজের প্রধান অন্তরায় তাদের জাতিভেদ; এ বিষয়ে রামমোহন 'ব্রাহ্মণ সেবধি'তে যা লিখেছিলেন তা আমরা পূর্বে উদ্‌ধৃত করেছি। একখানি ইংরেজি পত্রে তিনি যা লিখেছিলেন, দেড়শো বছরের কালান্তরেও তার সত্যতা হ্রাস পায় নি। ১৮২৮ অব্দের ১৮ জানুয়ারি লিখছেন:

"I agree with you that in point of vices the Hindus are not worse than the generality of Christians in Europe and America; but I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions and sub-divisions among them, has entirely deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise... It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social

comfort. I fully agree with you that there is nothing so sublime as the precepts taught by Christ, and that there is nothing equal to the simple doctrines he inculcated..."[১]

ইংরেজি পত্রাংশটির ভাবানুবাদ প্রদত্ত হল :

"আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, হিন্দুদিগের ধর্মপ্রণালী তাহাদের রাজনৈতিক উন্নতির অনুকূল নহে। জাতিভেদ আর বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ, তাহাদিগকে স্বদেশানুরাগে বঞ্চিত করিয়াছে। ইহা ভিন্ন বহুসংখ্যক বাহ্য অনুষ্ঠান ও প্রায়শ্চিত্তের বহুপ্রকার ব্যবস্থা থাকাতে তাহাদিগকে কোন গুরুতর কার্যসাধনে সম্পূর্ণ অশক্ত করিয়াছে। আমার বিবেচনায় তাহাদের ধর্মের কোন পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ তাহাদের রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্যও ধর্মের পরিবর্তন আবশ্যক।"[২]

রামমোহনের ন্যায় খ্রীষ্টভক্ত খ্রীষ্টানির উপর যে বিরূপ হয়েছিলেন তা কেবল theological বা ধর্মতত্ত্বীয় মতবিরোধজাত নয়। খ্রীষ্টান পাদরিরা খ্রীষ্টের সঙ্গে য়ুরোপের অতীত ইতিহাসের আবর্জনা ভারতীয়দের মনের উপর চাপিয়ে, তাদের বুদ্ধিকে, তাদের ব্যক্তিত্বকে আপনাদের অনুকূলে আনতে চায়— তাতেই তাঁর আপত্তি। খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের সঙ্গে ইংরেজের রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও ব্রিটিশ বাণিজ্য-প্রসার যুক্ত— এ কথা রামমোহন বুঝতে পেরেছিলেন। আমার মনে হয়, সেইজন্যই তিনি এমন তীব্রভাবে খ্রীষ্টানি-প্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। পাদরিরা জানতেন যে, যদি ভারতীয় হিন্দুদের মনকে তাদের নিজ ধর্ম সংস্কৃতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে শ্রদ্ধাহীন করে তুলতে পারা যায়, এবং যুগপৎ খ্রীষ্টানি ধর্মমতে তাদের দীক্ষিত করা যায়, তবে তারাই হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম রক্ষক। দেশীয় খ্রীষ্টানরা দেখছে, তাদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে পাদরিরা ; অক্ষর-শিক্ষা তারা পাচ্ছে ; নানাবিধ কারুশিল্প তাদের শেখানো হয়েছে, তজ্জন্য তাদের আর্থিক সাচ্ছল্য এসেছে— যা তাদের অখ্রীষ্টান আত্মীয়জনের হয় নি। ইংরেজ তাদের উন্নতির সহায় এ কথা তারা জানে, তাই তারা কখনও চাইবে না যে,

---

১ *English Works*, pp. 929-30.

২ অনঙ্গমোহন রায় -সংকলিত, 'রাজর্ষি রামমোহন' (১৯৩৩), পৃ. ৫৭।

ইংরেজ ভারত ত্যাগ করে যাক। এরা ভারতের আদিবাসী— কিন্তু এতকাল হিন্দু-মুসলমান শাসকরা তো কখনও তাদের দিকে ফিরে চান নি! ভবিষ্যতে এই-সব প্রশ্ন তীব্র হয়ে উঠবে, এ যেন রামমোহন বুঝতে পেরেছিলেন। তাই খ্রীষ্টানিকে প্রতিরোধ করেও খ্রীষ্টকে চেয়েছিলেন, পাদরির পরিবর্তে এ দেশে শিক্ষক-বিজ্ঞানী আনার জন্য আবেদন করেছিলেন; খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের স্থলে য়ুরোপীয় সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান চেয়েছিলেন।

ডিগবিকে-লিখিত পূর্বোদ্‌ধৃত পত্রে রামমোহনের স্বদেশ ও স্বজাতি -প্রীতি অতি স্পষ্ট হয়েছে। তাঁর সমকালীন বন্ধুদের মধ্যেও সেই ভাবধারা কী রূপ নেয় তা একটা ছোটো ঘটনা থেকে জানা যায়। একদিন রামমোহন যখন ইউনিটেরিয়ান সোসাইটির উপাসনা থেকে ফিরছিলেন, পথে তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব তাঁকে বললেন, "দেওয়ানজি, আমরা বিদেশীর ধর্ম-মন্দিরে কেন যাব? আমাদের নিজেদের ধর্মগৃহ নির্মাণ করা উচিত।" 'নিজেদের ধর্মগৃহ চাই'— এ কথাটা রামমোহনের মনে লাগে।

কিছুকাল পরে ১৮২৮ অব্দের ২০ অগস্ট (৬ ভাদ্র) জোড়াসাঁকো এলাকায় কমললোচন বসু বা ফিরিঙ্গি কমলের একটি বাড়ি ভাড়া করে সেখানে 'ব্রহ্মসভা' স্থাপিত হল— এই 'ব্রহ্মসভা' স্থাপন ব্যাপারটি ভারতের জাতীয়তা স্ফুরণের প্রথম স্পন্দন। বিদেশীর ধর্মমন্দিরে যাব না, নিজেদের উপাসনা-গৃহ চাই— এই সামান্য ভাবনার মধ্যে জাতীয়তাবোধের সুপ্ত-অঙ্কুর দেখতে পাওয়া গেল।

এতদিন খ্রীষ্টানদের সঙ্গে যে যোগ ছিল তা ছিন্ন হল। হিন্দুরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি মিলন-স্থান পেল।

ব্রহ্মসমাজগৃহে দুজন তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ বেদ পড়তেন,[১] উৎসবানন্দ

---

১ মহর্ষির আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে, তিনি যখন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন তখন একটি পৃথক ঘরে বেদ পড়া হত, শূদ্ররা সেখানে প্রবেশ করত না (আত্মজীবনী, পরিশিষ্ট ১৯)। কিন্তু রামমোহন যে শূদ্রদের প্রবেশাধিকার নিষেধ করেছিলেন, এমন কোনো সমকালীন তথ্য চোখে পড়ে না। ১৮৩০ থেকে ১৮৪৩ সালের মধ্যে যাঁদের উপর মন্দিরের ভার অর্পিত ছিল, তাঁরা রামমোহনের ধর্মমতের মধ্যে যে প্রবেশ করেছিলেন এমন তো মনে হয় না; তা হলে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন 'বেদী' থেকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতারত্ব ব্যাখ্যা করেন কেমন করে! তেমনি বেদপাঠ অন্তরাল থেকেই করার ব্যবস্থা হয়; অথবা যে ব্রাহ্মণরা বেদপাঠ করতেন তাঁরা অব্রাহ্মণের কাছে বেদ-পাঠ করা অশাস্ত্রীয় মনে করে নিবৃত্ত হয়েছিলেন। রামমোহন যে এ-সমস্তর সমর্থক ছিলেন, তার প্রমাণ আমরা পাই না।

বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ পাঠ করতেন ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বাংলায় ভাষণ দিতেন। উপাসনার শেষে মন্ত্র ও ব্রহ্মসংগীত গীত হত যন্ত্র-সংযোগে। সংগত করতেন গোলাম আব্বাস। কিন্তু উপাসনাবিধি ভারতীয় পরম্পরা-সিদ্ধ নয়। স্বীকার করতেই হবে, এই ভাবের উপাসনাবিধি ইসলামের মসজিদ ও খ্রীষ্টীয় চার্চের অনুকরণেই কৃত। মুসলমানদের উপাসনা-বিধিতে গান নিষিদ্ধ; খ্রীষ্টান-চার্চের গান বা সাম্‌-সংগীত লোকপ্রিয়, শিখ-গুরুদ্বারে যন্ত্র-যোগে ভজন ও গ্রন্থসাহেব পাঠ সুবিদিত। বেদীর মতো স্থান থেকে মসজিদে ও চার্চে ধর্ম-উপদেশ করা বিধি; হিন্দু-মন্দিরে আচার্যের জন্য এ শ্রেণীর আসন অজ্ঞাত, কারণ মন্দিরে পুরোহিত 'পূজা' করেন, ভক্তেরা পূজা দেয়। ধর্মপ্রচারের জন্য যে ব্রহ্মসভা বা ব্রহ্মসমাজ (ব্রাহ্মসমাজ) স্থাপিত হল তা খ্রীষ্টান, মুসলিম ও শিখ ধর্মদেশনাপদ্ধতি ও য়ুরোপীয় চার্চের অনুকরণে গঠিত বলেই আমাদের মনে হয়।

হিন্দুদের ধর্মসাধনা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। সংঘ-উপাসনার আদর্শ রামমোহন প্রত্যক্ষভাবে পেলেন ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টানির উপাসনাবিধি থেকে, অবশ্য মুসলমান ও শিখদের সংঘ-উপাসনাও যে রামমোহনের মনে ছিল না তা মনে হয় না। গান্ধীজির প্রার্থনাসভা ও বিনোবাজির প্রার্থনা-সভা ব্রাহ্মসমাজের congregational worship -এর রূপান্তর।

১৮২৮ সালের ৬ ভাদ্র কমল বসুর বাটীতে 'ব্রাহ্মসমাজ'-এর প্রথম অধি-বেশন হয়। আশ্চর্য লাগে—রামমোহনকে আচার্যের কাজ করতে দেখি না। পরম্পরাক্রমে যে ব্রাহ্মণগণ ধর্মদেশনার অধিকারী, তাদেরই উপর এই কাজ ন্যস্ত করেছিলেন— নিজেকে সেখানে এগিয়ে দেন নি। দেবেন্দ্রনাথের জীবনেও তাই দেখি। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন ও সতেরো বছর পরে ১৮৬০ সালে সর্বপ্রথম বেদীতে বসে উপাসনা করেন।

রামমোহন 'ব্রাহ্মসমাজ'-এর ভার অর্পণ করেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপর। এই রামচন্দ্র তাঁর গুরুস্থানীয় হরিহরানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রামমোহন কলকাতায় স্থিত হয়ে বসলে হরিহরানন্দ তাঁর ভাইকে তাঁর কাছে এনে দেন। ১৮৪৫ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক) এই বিবরণটি পাওয়া যায়—

"রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ যত্ন দ্বারা মানিকতলাতে ব্রহ্মোপাসনা জন্য ক্ষুদ্র আকারে 'আত্মীয়-সভা' নাম্নী এক সভা সংস্থাপিতা হয়, তাহাতে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক ব্যাখ্যান করিতেন।"

অতঃপর কমল বসুর বাড়িতে 'ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত হলে সেখানে নিয়মিতভাবে সপ্তাহে উপদেশ করিতেন।[১]

এর পর চিৎপুর রাস্তার উপর 'ব্রাহ্মসমাজ'-গৃহ নির্মিত হয়। সমসাময়িক সংবাদপত্রে এই সভা সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল তা আমরা উদ্‌ধৃত করছি; এটি 'সমাচার দর্পণে' ১৮৩০ সালের ১৬ জানুয়ারি, অর্থাৎ 'ব্রহ্মসভা'-গৃহ উন্মুক্ত হবার এক সপ্তাহ পূর্বে, প্রকাশিত হয়।

"চিৎপুরের রাস্তার ধারে নূতন ধর্ম্মশালা।— গত সোমবারের ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে কএক জন গুণশালী ও ধনবান হিন্দুরা একত্র হইয়া চিৎপুরের রাস্তার ধারে ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং ধর্ম্মার্থে তাহাতে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছেন। তাহার ত্রষ্টদীড অর্থাৎ পাট্টায় লেখে যে ত্রষ্টিরা কেবল আদ্যন্ত রহিত জগৎ স্রষ্টিস্থিতি কর্ত্তা ঈশ্বরের আরাধনার্থে শিষ্টাচারি লোকসকলের সমাগমার্থে চিরকালের নিমিত্ত সেই অট্টালিকা রাখিবেন ঐ পাট্টায় আরো লেখে যে সে সহরদ্দের মধ্যে কোন প্রতিমা

---

১ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৮১৫ থেকে ১৮২৭ সাল পর্যন্ত রামমোহনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে মনে হয়। এই সময়ের মধ্যে ১৮১৭-১৮ সালে তৎকৃত জ্যোতিষসংগ্রহসার (পৃ ১৫৫) ও অভিধান (বাংলাভাষার প্রথম অভিধান) প্রকাশিত হয়। ১৮২৭ সালের মে মাস থেকে সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন, ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত ঐ কাজে তিনি বহাল ছিলেন। ১৮৪০ সালে হিন্দু কলেজের সংলগ্ন বাংলা পাঠশালার অধ্যাপকরূপে মাস ছয় মাত্র কাজ করেন। ১৮৪১ সালে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটারির পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৪৩ সালের ৭ পৌষ দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকদের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন। এই বছরের মাঘ মাসে পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হন এবং কাশী যাবার পথে মুর্শিদাবাদে মৃত্যু হয়— ১৮৪৫ সালের ২০ ফাল্গুন। দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৯, পৃ. ১৫।

পরমেশ্বরের/উপাসনা বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যান/শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক/... ব্রাহ্মসমাজ/কলিকাতা/বুধবার ৬ ভাদ্র/শকাব্দা/১৭৫০ [১৮২৮]।

২য় ব্যাখ্যান ১৩ ভাদ্র; ৩য়, ২০ ভাদ্র; ৪র্থ, ৩০ ভাদ্র [এতদিন বুধবারে উপাসনা হইত, এইবার হইতে শনিবারে প্রবর্তিত হয়]; ৫ম, ৭ আশ্বিন; ৬ষ্ঠ, ১৩ আশ্বিন; ৭ম, ২০ আশ্বিন; ৮ম, ২৭ আশ্বিন; ৯ম, ১০ কার্ত্তিক; ১০ম, ১৭ কার্ত্তিক/... ১২, ১ অগ্রহায়ণ:

নূতন গৃহে উপাসনা ১১ মাঘ প্রবর্তিত হলে সেদিনও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভাষণ দান করেন। দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৯, পৃ. ২৮।

কি ছবি কি কোন বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি কেহ লইয়া যাইতে পারিবে না এবং তাহার মধ্যে কোন বলিদান কি নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ হইতে পারিবে না এবং তাহাতে ধর্ম্মার্থে কি খাদ্যার্থে কোন প্রাণিহিংসা হইতে পারিবে না এবং অন্য কোন মতাবলম্বিরা যে কোন সাকার কি নিরাকার বস্তুর আরাধনা করিবেন তন্নিন্দাসূচক বাক্য ঐ অট্টালিকায় কহা যাইবে না এবং যে ধর্ম্মানুশীলন অথবা প্রার্থনাদিতে জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি কর্ত্তার ধ্যাননিষ্ঠা হয় অথচ মনুষ্যেরদের প্রতি দয়া ও ধর্ম্ম যাহাতে জন্মে এতদ্ব্যতিরেকে আর কোনবিষয়ক অনুশীলন তাহাতে হইবে না। এবং ত্রষ্টিরা তত্রত্যারাধনার্থে এক জন বিশিষ্ট লোককে মনোনীত করিবেন এবং ঐ স্থানে প্রতি দিন অথবা সপ্তাহের মধ্যে এক দিন আরাধনা হইবে।"[১]

কয়েকটি ঘটনার সন-তারিখ অতঃপর দেওয়া গেল; ঘটনাবলীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমান করা যাবে:

১৮২৮, অগস্ট ২০ (৬ ভাদ্র): রামমোহন রায় 'ব্রহ্মসভা' স্থাপন করেন 'কমল বসু'র ভাড়াটিয়া বাড়িতে। ঐ বছরের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ-নিষেধ আইন জারি করেন।

১৮৩০, জানুয়ারি ১৭: রক্ষণশীল হিন্দুরা রামমোহনের অশাস্ত্রীয় সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ছ দিন পরে (১৮৩০, জানুয়ারি ২৩॥ ১১ মাঘ) জোড়াসাঁকোস্থ চিৎপুর রাস্তার উপর 'ব্রহ্মসভা'-গৃহের উদ্‌বোধন হয়।

১৮৩০, মে ২৭: পাদরি আলেকজাণ্ডার ডাফ্ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য সস্ত্রীক কলকাতা আসেন এবং কমল বসুর বাড়িতে ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১৮৩০, নভেম্বর ১৯: রামমোহন ইংলন্ড যাত্রা করেন।

রামমোহনের বিদেশযাত্রার ফলে কলকাতায় নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। রামমোহনের অভাবে ব্রাহ্মসমাজ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে; রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সে ক্ষমতা ছিল না যাতে করে তিনি রামমোহনের

---

১ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩২০।

অনুচর ও শিষ্যদের সংঘবদ্ধ করে রাখতে পারেন। কেউ কেউ কঠোর ব্রহ্মোপাসনার সঙ্গে লোকাচরিত প্রতিমা-পূজাদিও পালন করতে থাকেন। রামমোহনের ন্যায় শক্তিমান নেতার অনুপস্থিতিতে তাঁদের সেই পূর্বের মনোবল অনেকখানি নিস্তেজ হয়ে যায়।

রামমোহনের অনুপস্থিতিকালে দুটি বিরুদ্ধ শক্তিকে প্রবল হয়ে উঠতে দেখা গেল। রাধাকান্ত দেব ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দুরা যেমন উদগ্র হয়ে উঠলেন, হিন্দু কলেজের ডিরোজিওর শিষ্যরা তেমনি হিন্দুধর্মদ্বেষী হয়ে ওঠেন। তরুণ বাঙালি বা ইয়ং বেঙ্গল ডিরোজিওর কাছে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও অবাধচিন্তার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ব্যাবহারিক সমাজ-সংস্কারে মন না দিয়ে হিন্দুসংস্কার ধ্বংস করার দিকে বেশি উৎসাহী হয়ে উঠলেন। রামমোহন বিলাতযাত্রার পূর্বেই তরুণ-বাংলার এই নির্ভীক অভিযান লক্ষ্য করেছিলেন ; কিন্তু তাদের গতিনির্দেশ করার সুযোগ তাঁর হয় নি, কারণ রামমোহন এবং ডিরোজিও আর তাঁর ছাত্রদের বয়সের ব্যবধান অনেক।

প্রবীণ ও রক্ষণশীলেরা দলবদ্ধ হয়েছেন ; তাঁদের প্রবলতম 'শত্রু' রাম-মোহন বিলাতযাত্রা করায় তাঁরা কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত। এবার তাঁদের দৃষ্টি গেল হিন্দু কলেজের প্রতি। ১৮৩১ সালের ২১ এপ্রিল ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজের শিক্ষকের পদ থেকে অপসারিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এই প্রতিক্রিয়াপন্থী ও প্রাচীনপন্থী হিন্দুনেতাদের প্ররোচনায়। ডিরোজিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ—ছাত্রদের মধ্যে নির্বিচারে তিনি হিন্দুধর্মবিরোধী মতামত ও নাস্তিক্যবাদ প্রচার করছেন— আড়াই হাজার বছর আগে সোক্রাতিসকে এই অপরাধে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্র ও প্রাক্তন ছাত্রদের আচারব্যবহার ও ডিরোজিওর পদচ্যুতিকে কেন্দ্র করে প্রবীণ-নবীনের প্রচণ্ড বাদ-প্রতিবাদে কলকাতার সমাজ বেশ সরগরম হয়ে ওঠে। রামমোহনের অনুপস্থিতি, হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওর অপসারণ এবং যুগপৎ প্রাচীন হিন্দু রক্ষণশীলদের অত্যাচারের সুযোগ গ্রহণ করলেন পাদরি ডাফ-সাহেব ও তাঁর সহকর্মীরা। এতকাল খ্রীষ্টান পাদরিরা দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর মধ্যে খ্রীষ্টানধর্ম প্রচার করে আসছিলেন ; ব্যাপটিস্টরা ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রণী। ডাফের দৃষ্টি

গেল বাংলার শিক্ষিত উচ্চবর্ণের প্রতি। প্রবীণদের ধর্ম সম্বন্ধে গোঁড়ামির চাপে হিন্দু কলেজের যুবকরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। এই বিভ্রান্তি ও ক্ষোভের সুযোগ নিয়ে ডাফ-সাহেব কয়েকজন ভদ্রবংশীয় হিন্দুকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে ফেললেন ; এই-সব যখন ঘটছে, রামমোহন তখন ইংলন্ডে।[১]

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে রামমোহন ভারত ত্যাগ করে ইংলন্ডে যান ; সেখানে তিন বছর পরে ১৮৩৩ অব্দের সেপ্টেম্বরে তাঁর মৃত্যু হয়। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ভার কার্যত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপর ন্যস্ত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সমাজগৃহ দেখতে যান ১৮৪২ সালের গোড়ায়। রামমোহনের দেশত্যাগের পর সমাজের প্রতি লোকের আকর্ষণ খুবই শিথিল হয়ে যায়। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' সমাজের ভার গ্রহণ করে। ১৮৪৩ সালের অগস্ট (ভাদ্র ১৭৬৫ শক) মাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ঐ বছর ৭ পৌষ (২২ ডিসেম্বর) দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ কুড়িজন যুবক 'ব্রাহ্মধর্মে' দীক্ষা গ্রহণ করেন বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের কাছে। অর্থাৎ রামমোহনের দেশত্যাগের তেরো বছর ও তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পরে সমাজের ভার দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন।

১৮২৮ সালে হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর প্রবেশ ও ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ— এই পনেরো বছরকে বলা যেতে পারে ভারতীয় রেনেসাঁস বা হিন্দুভারতের নবজন্মের পর্ব। আমাদের আলোচনা এই পর্বের দ্বারে উপনীত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত হল।

—

১ শ্রীবিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড ; সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে গৃহীত। দ্র. পৃ. ২২-২৩।

শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পুস্তকের কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অনুচ্ছেদ এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

প রি শি ষ্ট

১

লর্ড মিণ্টোকে লিখিত রামমোহনের পত্র

মিথ্যা-অভিমানে-ক্ষুব্ধ স্যার ফ্রেডেরিক হ্যামিলটন কর্তৃক অপমানিত হয়ে রামমোহন রায় বড়লাট লর্ড মিণ্টোর কাছে প্রতিকারের জন্য যে আবেদন করেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত রামমোহন রায় (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৬) গ্রন্থ থেকে সেটি এখানে সংকলিত হল :

To the Right Hon'ble Lord Minto,
Governor-General, etc. etc.
The humble petition of Ram Mohun Roy

Most humbly sheweth,

That your petitioner, in common with all the native subjects of the British Government, looks up to your Lordship as the guardian of the just rights and dignities of that class of your subjects against all acts which have a tendency either directly or indirectly to invade those rights and dignities, and your petitioner more especially appeals to your Lordship as, from the nature of the treatment, however degrading, which he has experienced and from the nature of the existing circumstances with reference to the rank and distinction of the gentleman from whom it proceeded, your petitioner is precluded from any other means of obtaining redress.

Confiding therefore in the impartial justice of the British Government and in the acknowledged wisdom which governs and directs all its measures in the just spirit of an enlarged and liberal policy, your petitioner proceeds with diffidency and humility to lay before your Lordship, the following circumstances of severe degradation and injury, which he has unmeritedly experienced at the hands of Sir Frederick Hamilton.

On the 1st of January last, your petitioner arrived at the Ghaut of the river of Bhaugulpur, and hired a house in that town. Proceeding to that house at about 4 o'clock in the afternoon, your petitioner passed in his palanquin through a

road on the left side of which Sir Frederick Hamilton was standing among some bricks. The door of the palanquin being shut to exclude the dust of the road, your petitioner did not see that gentleman, nor did the peon who preceded the palanquin, apprize your petitioner of the circumstance, he not knowing the gentleman, much less supposing that, that gentleman (who was standing alone among the bricks), was the collector of the district. As your petitioner was passing, Sir Frederick Hamilton repeatedly called out to him to get out of his palanquin, and that with an epithet of abuse too gross to admit of being stated here without a departure from the respect due to your Lordship. One of the servants of your petitioner who followed in the retinue, explained to Sir Frederick Hamilton, that your petitioner had not observed him in passing by; nevertheless that gentleman still continued to use the same offensive language, and when the palanquin had proceeded to the distance of about 300 yds, from the spot where Sir Frederick Hamilton had stood, that gentleman overtook it on horseback. Your petitioner then for the first time understood that the gentleman who was riding alongside of his palanquin, was the collector of the district, and that he required a form of external respect, which, to whatever extent it might have been enforced under the Mogul Government, your petitioner had conceived from daily observation, to have fallen under the milder, more enlightened and more liberal policy of the British Government into entire disuse and disesteem. Your petitioner then, far from wishing to withhold any manifestation of the respect due to the public officers of a Government which he held in the highest veneration, and notwithstanding the novelty of the form in which that respect was required to be testified, alighted from his palanquin and saluted Sir Frederick Hamilton, apologizing to him for the omission of that act of public respect on the grounds that, in point of fact, your petitioner did not see him before, on account of the doors of his palanquin being nearly closed. Your petitioner stated however at the same time that even if the doors had been open, your petitioner would not have known him, nor would have supposed him to be the collector of the district. Upon this

Sir Frederick asked your petitioner how the servant of the latter came to explain to him already, with your petitioner's salam, the reason of your petitioner's not having alighted from his palanquin. Your petitioner's servants stated in reply to the observations of Sir Frederick Hamilton that, he had not been desired by your petitioner to give that explanation, but that seeing that your petitioner had gone on and knowing that the doors of the palanquin were almost shut, he had explained that circumstance to Sir Frederick Hamilton, in the hope of inducing that gentleman to discontinue his abusive language, but that he, the servant, had not expressed your petitioner's salam as he had had no communication with your petitioner on the subject; Sir Frederick Hamilton then desired your petitioner to discharge the servant from his service and went away. In the course of that conversation, calculated by concession and apology to pacify the temper of Sir Frederick Hamilton, that gentleman still did not abstain from harsh and indecorous language. The intelligence of your petitioner's having been thus disgraced has been spread over the town, and your Lordship's humane and enlightened mind will easily conceive, what must be the sensations of any native gentleman under a public indignity and disgrace, which as being inflicted by an English gentleman, and that gentleman an officer of Government, he is precluded from resenting, however strong the conviction of his own mind that such ill-treatment has been unmerited, wanton and capricious. If natives, therefore, of caste and rank were to be subjected to treatment which must infallibly dishonour and degrade them, not only within the pale of their own religion and society, but also within the circle of the English societies of high respectability into which they have the honour of being most liberally and affably admitted, they would be virtually condemned to close confinement within their house from the dread of being assaulted in the streets with every species of ignominy and degradation. Your petitioner is aware that the spirit of the British laws would not tolerate an act of arbitrary aggression, even against the lowest class of individuals, but much less would it continue an unjust degradation of persons of respectability whether that

respectability be derived from the society in which they move or from birth, fortune, or education ; that your petitioner has some pretensions to urge on this point, the following circumstances will shew :—

Your petitioner's grandfather was at various times, chief of different districts during the administration of His Highness the Nawab Mohabutjung, and your petitioner's father for several years, rented a farm from Government the revenue of which was lakhs of rupees. The education which your petitioner has received, as well as the particulars of his birth and parentage, will be made known to your Lordship by a reference to the principal officers of the Sudder Dewani Adawlats and the College of Fort William, and many of the gentlemen in the service of the Hon'ble Company, as well as other gentlemen of respectability and character. Your petitioner throwing himself, his character and the honor of his family on the impartial justice, liberality and feeling of your Lordship, entertains the most confident expectation that your Lordship will be pleased to afford to your petitioner every just degree of satisfaction for the injury which his character has sustained, from the hasty and indecorous conduct of Sir Frederick Hamilton, by taking such notice of that conduct, as it may appear to your Lordship to merit.

And your petitioner in duty bound shall ever pray.

12th April 1809.

২

মহানির্বাণ-তন্ত্রের স্তোত্র

ওঁ নমস্তে সতে তে সর্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্ব-রূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥ ৫৯

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগতকর্তৃপাতৃপ্রহর্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পম্ ॥ ৬০

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্ ॥ ৬১

পরেশ প্রভো সর্বরূপাবিনাশিন্
অনির্দেশ্য সর্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্‌ভাসকাধীশ পয়ায়াদপায়াৎ ॥ ৬২

তদেকং স্মরামস্তদেকং জপাম-
স্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥ ৬৩

—মহানির্বাণতন্ত্রম্। তৃতীয়োল্লাসঃ ॥

'ব্রাহ্মধর্মঃ' গ্রন্থ সংকলন-কালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই স্তোত্রটির ভাষা ও ভাবের পরিবর্তন করেন।

রামমোহন রায় -রচিত গ্রন্থ

আরবি-ফারসি

১. তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন [লিথোছাপা], ১৮০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৮৪ সালে ঢাকা গবর্মেণ্ট মাদ্রাসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী ওবেদুল্লা ইহার ইংরেজি তর্জমা করেন : *Tuhfat-ul-Muwahhidin*, or, *A Gift to Deists.*

বঙ্গানুবাদ— নববিধান সমাজের ভাই গিরিশচন্দ্র সেন -কৃত। ধর্মতত্ত্ব পত্রিকায় ১৮২১ শক বৈশাখ-ভাদ্র মাস মধ্যে ৮ সংখ্যায় অনূদিত হয়। ইহা ছাড়া ১৯৪৯ সালে জ্যোতিরিন্দ্র দাস -কৃত ওবেদুল্লা সাহেবের ইংরেজি তর্জমার বাংলা অনুবাদ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।

২. মনাজিরাৎ-উল্‌-আদিয়ান্‌ বা নানা ধর্মের বিচার। গ্রন্থ বা পুস্তিকা। রামমোহন এই নামে একখানি গ্রন্থ রচনার সংকল্প করেছিলেন, কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে প্রস্তাবিত এই গ্রন্থ আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল কি না সংশয়ের বিষয়।

৩. জবজ্‌-ই-তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন। অ-নামে প্রকাশিত পুস্তিকা— কলিকাতা, ১৮২০ ? ব্রিটিশ ম্যুজিয়াম গ্রন্থাগারে আছে।

Javaj-i-tuhfat ul Muvahhidin. An Anonymous defence of Rammohun Roy's "Tuhfat···" against the attacks of the Zoroastrians. Calcutta. [1820 ?]

—দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৬, কলিকাতা, আষাঢ় ১৩৫৩।

বাংলা ও সংস্কৃত

১. বেদান্ত গ্রন্থ [ব্রহ্মসূত্রের ভাষাবিবরণ]। ১৮১৫। পৃ. ১৭+১৬৬ The Bengalee Translation of the Vedant, or Resolution of all the Veds; the most celebrated and revered work of Brahminical Theology, establishing the unity of the Supreme Being, and that He is the only object of worship. Together with a preface by the Translator. Calcutta: From

the Press of Ferris and Co., 1815.

রামমোহন-গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১-১১৩

২. বেদান্তসার। ১৮১৫। পৃ. ২২। দ্র. ইংরেজি গ্রন্থ-তালিকা।

রামমোহন-গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১১৫-১২৬

৩. তলবকার উপনিষৎ (কেনোপনিষৎ)। ১৭৩৮ শকাব্দ, ইংরাজি জুন ১৮১৬। পৃ. ১৭

রামমোহন-গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১৮৫-১৯৪

৪. ঈশোপনিষৎ। ভূমিকা; অনুষ্ঠান; অনুবাদ। পৃ. ২০+৪+১৩। জুলাই ১৮১৬।

রামমোহন-গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ১৯৫-২১১

৫. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, ১৮১৬-১৭। তিনটি পুস্তিকা—সংস্কৃত ভাষায় রচিত। অগ্রহায়ণ ১২২৩

রামমোহন-গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ১-৪০; ১০১-১০২

৬. ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার। [মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বেদান্ত চন্দ্রিকার উত্তরে রচিত] পৃ. ৩+৬৪। ১৮১৭ (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৭৩৯ শক)।

রামমোহন-গ্রন্থাবলী ১: মৃত্যুঞ্জয়ের বেদান্ত চন্দ্রিকা পৃ. ১২৭-১৫২; ভটাচার্য্যের সহিত বিচার পৃ. ১৫৩-১৮৪

৭. কঠোপনিষৎ। অগস্ট ১৮১৭। পৃ. ৫৭

রামমোহন-গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২১২-২৩৬

৮. মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। অক্টোবর ১৮১৭। পৃ. ২৩+১৯। ভূমিকা, ২১ আশ্বিন ১২২৪।

রামমোহন-গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২৩৭-২৫৫

৯. গোস্বামীর সহিত বিচার। জুন ১৮১৮। পৃ. ৫০

"ভগবদ্‌ গৌরাঙ্গপরায়ণ গোস্বামিজী পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তর।"

রামমোহন-গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৪১-৬৪; ১০২-১০৩

১০. সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ। নভেম্বর ১৮১৮। পৃ. ২২।

রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৩, পৃ. ১-১২; ৫৯-৬০

এই পুস্তকের উত্তর-স্বরূপ কাশীনাথ তর্কবাগীশ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে

'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' প্রচার করেন। দ্র. রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৩, পৃ. ১৩-২৪

১১. গায়ত্রীর অর্থ। ১৭৪০ শকাব্দ (১৮১৮)
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ১-৮ ; ৭৭

১২. মুণ্ডকোপনিষৎ। মার্চ ১৮১৯।
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ১, পৃ. ২৫৬-২৬৮ ; ২৭২

১৩. সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ। ১৮১৯, পৃ. ৩৩।
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৩, পৃ. ২৫-৪৮ ; ৬০

১৪. আত্মানাত্মবিবেক। শঙ্করাচার্যকৃত। বঙ্গানুবাদ প্রকাশকাল : ১৮১৯ ?
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৯-২৩ ; ৭৭

১৫. কবিতাকারের সহিত বিচার। ১৭৪২ শকাব্দ। ১৮২০। ভূমিকা ও প্রত্যুত্তর, পৃ. ২৩+৪৯
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৬৫-৯৩ ; ১০৩

১৬. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার। দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত, হিন্দী বাংলায় এবং ইংরেজিতে অনুবাদ।
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৯৪-১০০ ; ১০৩

১৭. ব্রাহ্মণ সেবধি : ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ। ১৮২১ সালে তিন সংখ্যা প্রকাশিত।
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৫, পৃ. ১-৩১ ; ৩৩-৩৪

১৮. চারি প্রশ্নের উত্তর। মে ১৮২২। পৃ. ২৬
সমাচার দর্পণ ১২২৮, চৈত্র ২৫ তারিখের সংখ্যায় ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী যে চারিটি প্রশ্ন করেন, তাহার উত্তর।
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৬, পৃ. ১-২০ ; ১৮৫

১৯. প্রার্থনা পত্র। মার্চ ১৮২৩। পৃ. ৪+৭৭। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামে বাংলা ও ইংরেজি একসঙ্গে প্রকাশিত হয়।
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ২৫-২৮

২০. পাদরি ও শিষ্য সংবাদ। ১৮২৩
[ইংরেজি অনুবাদ যুগপৎ প্রকাশিত হয়।]
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৫, পৃ. ৩৭-৫৯

২১. গুরু পাদুকা। ১৮২৩। পৃ. ৬
সমাচার চন্দ্রিকায় পৌত্তলিকতার সমর্থনে প্রত্যুত্তর।

২২. পথ্য প্রদান। ১৭৪৫ শকাব্দ। ডিসেম্বর ১৮২৩। পৃ. ২৬১
কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন -রচিত পাষণ্ড পীড়ন-এর উত্তরে লিখিত।
MEDICINE for the sick offered By One who laments his inability to perform all righteousness. Calcutta. Printed at the Sungscrit Press, 1823.
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৬, পৃ. ২১-১৮০ ; ১৮৫

২৩. ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ। ১৭৪৮ শকাব্দ। ১৮২৬
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ২৯-৩৩ ; ৭৮

২৪. কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার। ১৭৪৮ শকাব্দ। ১৮২৬
রামচন্দ্র দাস ছদ্মনামে রচিত।
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৬, পৃ. ১৮১-১৮৪ ; ১৮৫

২৫. বজ্রসূচী। ১৭৪৯ শকাব্দ। ১৮২৭
সংস্কৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ।
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৪৩-৪৮ ; ৭৮

২৬. গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানং। ১৮২৭
সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদ সহ।
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৪, পৃ ৩৫-৪২ ; ৭৮

২৭. ব্রহ্মোপাসনা। ১৮২৮
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৪, পৃ ৪৯-৫৩ ; ৭৮

২৮. ব্রহ্মসঙ্গীত। ১৮২৮
রামমোহন ও তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের দ্বারা বিরচিত সংগীত।
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৫৫-৬৪ ; ৭৯

২৯. অনুষ্ঠান। ১৭৫১ শকাব্দ। ১৮২৯। পৃ. ৬+৪
আচার্য ও শিষ্যের প্রশ্নোত্তর-ক্রমে উপাসনা-পদ্ধতি।
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৬৫-৭৩ ; ৭৯

৩০. সহমরণ বিষয়। ১৮২৯। পৃ. ১১
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৩, পৃ. ৪৯-৫৮

৩১. ক্ষুদ্র পত্রী।
(বিতরণার্থ মুদ্রিত)। "ব্রহ্মবিষয়ক কয়েকটি সুশ্রাব্য ছন্দোবদ্ধ শ্রুতি, শ্রুতিমর্ম্ম ও গীত এক এক খণ্ড দীর্ঘায়ত কাগজের এক পৃষ্ঠে মুদ্রিত।"
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৭৫-৭৬; ৭৯

৩২. গৌড়ীয় ব্যাকরণ। ১৮৩৩। পৃ. ৯৭
রামমোহন-গ্রন্থাবলী ৭, পৃ. ১-৬৭; ৬৯

৩৩. ব্রাহ্ম-পৌত্তলিক সম্বাদ। ব্রজমোহন মজুমদারের নামে প্রকাশিত। ১৮১৯-২০।
দ্র. স্টিফেন হে -লিখিত *A Tract against the Prevailing system of Hindu Idolatry.*

৩৪. ভগবদ্গীতা। সংস্কৃত মূল ও বাংলা পদ্যানুবাদ। বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে প্রকাশিত। কলিকাতা। ১৮১৯। পৃ ১৯০
"এই অনুবাদ রামমোহন রায়ের বেনামী রচনা কিনা বলিবার উপায় নাই।"

সংকলন-গ্রন্থ

১. রাজা রামমোহন রায় -প্রণীত গ্রন্থাবলি। ১৮৮০। পৃ. ৮১৪।
রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্তৃক সংগৃহীত ও পুনঃপ্রকাশিত।

২. রামমোহন-গ্রন্থাবলী।
বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ হইতে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস কর্তৃক প্রকাশিত।
১ম খণ্ড: শ্রাবণ ১৩৫৮; ২য় খণ্ড: আষাঢ় ১৩৫৯; ৩য় খণ্ড: অগ্রহায়ণ ১৩৫০; ৪র্থ খণ্ড: আষাঢ় ১৩৫৯; ৫ম খণ্ড: শ্রাবণ ১৩৫৮; ৬ষ্ঠ খণ্ড: ফাল্গুন ১৩৫২; ৭ম খণ্ড: আষাঢ় ১৩৫৯।

সম্পাদিত গ্রন্থ

"১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শারীরক মীমাংসা', এবং ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক প্রভৃতি কয়েকখানি উপনিষদের মূল ও ভাষ্য। 'কুলার্ণব' সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য।"

ইংরেজি গ্রন্থ ও পুস্তিকা

1. Translation of an Abridgment to the Vedant [বেদান্তসার], or Resolution of all the Veds...By Rammohun Roy. Calcutta, 1816. pp. 3 + 14.
   এই ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকার বঙ্গানুবাদ গ্রন্থমধ্যে দেওয়া হইয়াছে। পরবৎসর জর্মান ভাষায় Auflosung des Wedant (Jena, 1817) নামে প্রকশিত হয়।
   English Works, II; pp. 57-72
2. Translation of the Cena [Kena] Upanishad, one of the chapters of the Sama Veda... printed at the Hindoostanee Press, 1816. p. VII+II.
   English Works, II; pp. 11-20
3. Translation of the Ishopanishad, one of the chapters of the Yajur Veda... printed at the Hindoostanee Press, 1816. p. XXII+8.
   English Works, II; pp. 39-56
4. A Defence of Hindoo Theism in reply to the attack of an advocate for Idolatry at Madras. Calcutta, 1817. p. 29.
   English Works, II; pp. 81-93
5. A Second Defence of the Monotheistical System of the Veds, in reply to An Apology for the present state of Hindoo Worship. By Rammohun Roy. Calcutta, 1817. p. 58.
   মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের Apology for the present system of Hindoo worship পুস্তিকার উত্তরে রচিত।
   English Works, II; pp. 95-125
6. Counter-Petition of the Hindoo inhabitants of Calcutta against Suttee. 1818 [রামমোহনের রচনা বলিয়া অনুমান]
7. Translation of a Conference between an advocate for, and an opponent of, the practice of Burning Widows Alive: from the original Bungla. Calcutta. 1818, November 30.
   English Works, III; pp. 87-97
8. Translation of the Moonduk Opunishad of the Utharvu-Ved. Calcutta : Times Press. 1819. p. 25
   English Works II, pp. 1-10
9. Translation of the Kuth-Opunishud of Ujoor-Ved. Calcutta. 1819. p. 40
   English Works, II, pp. 21-38

10. An Apology for the Pursuit of the Final Beatitude independently of Brahmanical Observances, 1820. [English version of সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার]
11. A second conference between an advocate and an opponent of the practice of Burning Widows Alive (Translated from the original Bengalee), Baptist Mission Press, Circular Road, 1820. (Dedicated to the Marchioness of Hastings, February 20, 1820)
    English Works, III, pp. 99-127
12. The Precepts of Jesus, The Guide to Peace and Happiness, extracted from the books of the New Testament, ascribed to the four Evangelists, Calcutta, Baptist Mission Press, 1820, pp. IV+82
    English Works, V, pp. 1-54
13. An Appeal to the Christian Public in Defence of "The Precepts of Jesus" by a friend of Truth, Calcutta, 1820, p. 20
    English Works, V, pp. 55-71
14. Second Appeal to the Christian Public in defence of "The Precepts of Jesus":
    - Chapter I General defence of the precepts in question
    - Chapter II Natural inferiority of the son to the father
    - Chapter III Separate consideration of the seven Positions of the Reviewer
    - Chapter IV Inquiry into the doctrine of the Atonement
    - Chapter V On doctrines and miraculous narrations of the New Testament
    - Chapter VI On the impersonality of the Holy Spirit, Miscellaneous Remarks.
    - Appendix No.I On the quotations from the Old Testament contained in the New
    - Appendix No.II On the references made to the Old Testament in support of the Deity of Jesus : Postscript.

    English Works, VI, pp. 1-97
15. The Brahmanical Magazine or the Missionary and the Brahmun. Being a vindication of the Hindoo Religion against the attacks of Christian Missionaries, By Shiva-

Prusad Surma. Nos. 1, 2 & 3, 1821; No. IV, Calcutta, 1823.
English Works, II, pp. 135-189

16. Brief remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females, according to the Hindoo Law of Inheritance, by Rammohan Roy, Calcutta, printed at the Unitarian Press, 1822
English Works, I, pp. 1-101
17. Final Appeal to the Christian Public in Defence of "The Precepts of Jesus", Unitarian Press, Calcutta, 1823
English Works, VIII, pp. 1-178
18. Humble suggestions to his countrymen who believe in the One True God, By Prusanna Koomar Thakoor. Calcutta, 1823. [প্রার্থনাপত্রের অনুবাদ]
English Works, II, pp. 199-201
19. Petitions against the Press Regulations
(i) Memorial to the Supreme Court, March 1823
(ii) Appeal to the King in Council, 1825
English Works, IV, pp. 1-31

20-21. A Few Queries for the serious consideration of Trinitarians.
Part I, May 9, 1823, p. 8
Part II, May 12, 1823, p. 8

22. A Dialogue—Between a Missionary and Three Chinese Converts. Calcutta, May 16, 1823, p. 8
English Works, IV, pp. 75-79
23. A Tytler Controversy:
A vindication of the Incarnation of the Deity, as the common basis of Hindooism and Christianity, against the Schismatic attacks of R. Tytler, Esq. M. D....by Ram Doss, Calcutta, Hurkuru Press, 1823
English Works, IV, pp. 53-74
24. A letter on European Education, Calcutta, 14 December 1823
25. A letter to the Reverend Henry Ware on the Prospects of Christianity in India. Calcutta, 1824
English Works, IV, pp. 43-52
26. Translation of a Sunskrit Tract on Different Modes of

Worship by a Friend of the Author, Calcutta, 1825
English Works, II, pp. 195-198

27. Bengalee Grämmer in the English Language by Rammohan Roy, Calcutta, Unitarian Press, 1826, p. 140
28. A Translation into English of a Sunskrit tract, inculcating The Divine Worship; esteemed by those who believe in the Revelation of Veds as most appropriate to the nature of the Supreme Being, Calcutta, 1827
English Works, II, pp. 73-80
29. Answer of a Hindoo to the question "Why do you frequent a Unitarian Place of worship instead of the numerously attended Established Churches ?" 1827
English Works, II, pp. 191-194
30. Symbol of the Trinity. 1828 (?) Printed in the Asiatic Journal, July 1829, pp. 71-72
31. The Universal Religion : Religious Instructions founded on Sacred Authorities, Calcutta, 1751 S. [1829]
English Works, II, pp. 127-134
32. The Padishah of Delhi to King George the Fourth of England, February 1829
33. Petition to the Government against Regulation III of 1828 for the resumption of Lakheraj Lands, 1829 (August?).
34. Address to Lord William Bentinck, Governor-General of India, upon the passing of the Act for the abolition of the Suttee, 1830
35. Abstract of the arguments regarding the burning of widows, considered as a religious rite. Calcutta, 1830
English Works, III, pp. 129-136
36. Essay on the Rights of Hindoos over ancestral property, according to the Law of Bengal. Calcutta, 1830, p. 47
English Works, I, pp. 11- 35
37. Anti-Suttee Petition : To the Honourable the Commons of the United Kingdom of Great Britain and Ireland in Parliament Assembled. (It was presented in opposition to the appeal of the advocates of Suttee to the authorities in England in favour of the practice.)
English Works, III, pp. 137-138

38. The English in India should adopt Bengali as their language (unpublished). See, *The Modern Review*, December 1928, pp. 635-636.
39. Hindu authorities in favour of slaying the cow and eating its flesh.
40. Opinion on Grants' Jury Bill. 'I. Native Justices of the Peace. II. Native Jurors. Extracts from a letter on Grants' Jury Bill, 1833, January 22
English Works, IV, pp. 33-42

বিলাত হইতে প্রকাশিত রামমোহনের গ্রন্থ :

1. Translation of an Abridgment of the Vedanta by Rammohan Roy, London, Printed for T. and J. Holt, Upper Berklay Street, Portman Square, 1817
2. The Precepts of Jesus...to which are added the First and Second Appeal to the Christian Public, in reply to the Observations of Dr. Marshman, of Serampore, London, 1823
3. Final Appeal to the Christian Public in defence of the 'Precepts of Jesus', London, Hunter, 1823
4. Answers to queries by the Rev. H. Ware of Cambridge (U.S.), C. Fox, 1825
5. Treaty with the King of Delhi. Decision thereon by the Governor-General of India. Reports of the British Resident and Political Agent at Delhi : with Remarks. London. Printed by John Nichols, 47 Tottenham Court Road, 1831
6. Some remarks in vindication of the Resolution passed by the Government of Bengal in 1829 abolishing the Practice of Female Sacrifices in India, Nichols and Sons, Printers, Earl's Court, Cranbourn Street, Leicester Square, London (1831) pp. 8-14
7. Essay on the Right of Hindoos over Ancestral Property according to the Law of Bengal,...Second Edition : with an appendix, containing letters on the Hindoo Law of Inheritance, Calcutta, printed 1830, London, Smith, Elder and Co., 65, Cornhill, 1832
English Works, pp. 37-57
8. Exposition of the practical operation of the Judicial and

Revenue systems of India, and of the general character and condition of the native inhabitants, as submitted in evidence to the Authörities in England. With notes and Illustrations; also a brief preliminary sketch of the ancient and modern boundaries, and of the history of that country. Elucidated by a Map. London, Smith Elder and Co., Cornhill. 1832.
English Works, IV, pp. 3-9

9. Questions and Answers on the Judicial system of India. London, August 19, 1831
English Works, Part III, pp. 11-38
10. Questions and Answers on the Revenue System of India, London, September 19, 1831
English Works, III, pp. 39-53
11. Paper on the Revenue System of India, London, August 19, 1931.
English Works, III, pp. 54-61
12. Additional queries respecting the Condition of India, London, September 28, 1831, Notes, Appendix : Bengal Civil Officers (Their Salary)
English Works, III, pp. 62-77
13. Remarks on Settlement in India by Europeans. London, July 14, 1832
English Works, III, pp. 78-85
14. Answers of Rammohan Roy to Queries on the Salt Monopoly, March 19, 1832
15. Translation of several Principal Books, Passages and Texts of the Veds and of some contorversial works in Brahmunical Theology. 2nd. Edn. London, Parbury, Allen & Co. 1832, p. 282
16. Appeal to the British Nation against a violation of common justice and a breach of public faith by the Supreme Government of India with the Native Inhabitants, London (1832)
17. Translation of the Creed maintained by the Ancient Brahmins, as founded on the Sacred Authorities, 2nd. Edn., reprinted from the Calcutta edition, London, Nichols and Son, 1833, p. 16
18. Autobiographical sketch, October 1833.

(Published by S. Arnat after the death of Rajah in the Athenaeum. October 5, 1833)

সংকলন-গ্রন্থ

1. The English Works of Raja Rammohan Roy including some additional letters and an English translation of the Tuhfatul Muwahiddin with an introduction by Ramananda Chatterjee, Panini Office, Allahabad, 1906. গ্রন্থমধ্যে প্রায়শই *English Works* বলিয়া উল্লিখিত।
2. The English Works of Raja Rammohan Roy : Edited by Kalidas Nag and Debajyoti Burman, Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta, 1945-51. (Parts I-VI)

এই পুস্তক প্রণয়নে ব্যবহৃত বাংলা গ্রন্থ

১. অনঙ্গমোহন রায়, 'রাজর্ষি রামমোহন', ১৯৩৩।

২. অনির্বাণ, 'বেদমীমাংসা ১ম'। সংস্কৃত কলেজ।

৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য', কলিকাতা, ১৯৫৯।

৪. আকবর আলী ও মোহম্মদ আলী হাসান, 'কোরান শরিফ', ২য় খণ্ড। ওসমানিয়া বুক ডিপো। ঢাকা।

৫. আবুল হায়াত, "আল্লা", "ইসলাম", 'ভারতকোষ' ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭১।

৬. কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, 'আত্মজীবনচরিত'। ১৩৬৩।

৭. কেদারনাথ মজুমদার, 'বাঙ্গলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড।

৮. ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, 'ভারতের সংস্কৃতি'। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৩। বিশ্বভারতী।

৯. গিরীশচন্দ্র সেন -অনূদিত, "তুহ্‌ফাৎউল মুয়াহিদ্দীন", 'ধর্ম্মতত্ত্ব', ১৮২১ শক।

১০. গোপীনাথ কবিরাজ, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ।

১১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস -অনূদিত, 'তুহ্‌ফাৎ উল মুয়াহ্‌হিদ্দীন', সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা।

১২. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৭৮২ শক।

১৩. তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, 'পলাশীর যুদ্ধ', নাভানা, ১৯৬৫।

১৪. তারাপদ চৌধুরী, 'বেদ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস'।

১৫. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', ৫ম সংস্করণ। ইণ্ডিয়ান প্রেস, ১৯২৮।

১৬. প্রমথ চৌধুরী [বীরবল], "উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির ভাষণ"। 'সবুজ পত্র', ফাল্গুন ১৩২১।

১৭. প্রমথনাথ তর্কভূষণ -সম্পাদিত, শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা। দেবসাহিত্য কুটীর। ১৩৬৮।

১৮. বালগঙ্গাধর টিলক। 'শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতারহস্য অথবা কর্মযোগ'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -অনূদিত। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে··· মুদ্রিত। ১৯২৪।

১৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'কৃষ্ণচরিত'। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণ।

২০. বিধুশেখর ভট্টাচার্য, 'মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ'।

২১. বিনয় ঘোষ, 'সাময়িক পত্রে বাংলার সামাজিক চিত্র', ২য় খণ্ড।

২২. বিশ্বকোষ, ২য় সংস্করণ, ১ম খণ্ড।

২৩. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, "সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ", বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭০।

২৪. 'বেদান্তদর্শনম্‌'। শারীরক ভাষ্য···। কালীবর বেদান্তবাগীশ -অনূদিত। দেবসাহিত্য কুটীর, কলিকাতা।

২৫. বেদান্ত সমন্বয়। নববিধান মণ্ডলীর উপাধ্যায় [গৌর গোবিন্দ] কর্তৃক উদ্‌ভাবিত। ১৮৩৪ শক (১৯১২)।

২৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ১৩৫৬।

২৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক পত্র'। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ।

২৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার', সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৩।

২৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়'। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৪।

৩০. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী'। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী -সম্পাদিত। বিশ্বভারতী, ১৯৬২।

৩১. মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্‌ (সানুবাদ), বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির।

৩২. মুরারিমোহন ঘোষ, "হেনরি টমাস্‌ কোল্‌ব্রুক", 'সাহিত্যের খবর', কার্তিক ১৩৬৭।

৩৩. মুসিদ্দিক খান, 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা'। বাংলা একাডেমী। ঢাকা, ১৩৭১।

৩৪. মৌলবী ওবেদ্‌উল্লা, 'তুহ্‌ফাৎ উল্‌ মুয়াহ্‌হিদ্দীন'-এর ইংরেজি অনুবাদ। দ্র. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস।

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতপথিক রামমোহন রায়', বিশ্বভারতী।

৩৬. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'যজ্ঞকথা', ১৩২৭।

৩৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', ১৩৬৪ সংস্করণ।

৩৮. "সংস্কৃত রাজাবলি গ্রন্থ"— সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ৪, ১৩৪৬।

৩৯. সজনীকান্ত দাস, 'উইলিয়ম কেরী', সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৫, কলিকাতা।

৪০. সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস'।

৪১. সজনীকান্ত দাস -সম্পাদিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় -লিখিত প্রবেশক ও টীকা সহ। ১৩৪৬।

৪২. সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, 'উপনিষদ', প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৩৭।

৪৩. সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ, 'ছান্দোগ্যোপনিষদ', ১৯২৬।

৪৪. সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ, 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ', ১৯২৮

৪৫. সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'বেদান্তদর্শন', পাটনা, ১৯৩১।

৪৬. সুরেন্দ্রনাথ সেন, 'প্রাচীন বাংলা পত্র সংকলন', ১৯৪২।

৪৭. সুরেন্দ্রনাথ সেন -সম্পাদিত, 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সম্বাদ', ১৭২৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৭।

৪৮. সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন'। রূপা, কলিকাতা।

৪৯. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'।

৫০. 'হরিহরানন্দ নাথ তীর্থস্বামী'। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৯।

নির্দেশপঞ্জী

—